রচনাবলী

সৈয়দ মুজতবা আলী

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬৫

—একশ পঞ্চাশ টাকা—

.......Public Library
11th FIN Com No..........
11th FIN Com. M R No. 78267

সম্পাদক
গজেন্দ্রকুমার মিত্র সবিতেন্দ্রনাথ রায়
সুমথনাথ ঘোষ মণীশ চক্রবর্তী

SYED MUJTABA ALI RACHANAVALI Vol. 8

An anthology of complete works by Syed Mujtaba Ali Vol. 8
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd. of
10 Shyama Charan Dey Street, Kolkata 700 073

Price Rs. 150/-

ISBN : 81-7293-036-4

শব্দগ্রন্থন
জে. রায় এন্টারপ্রাইজ, ১৫ শ্যামাচবণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও এস. সি. অফসেট, ৩০/২বি হরমোহন ঘোষ লেন
কলকাতা-৭০০ ০৮৫ হইতে সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	[১—২]
পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়	৭
বিদেশে	১০৯
বাঙলাদেশ	২১৭
উভয় বাঙলা	২৯৩
গ্রন্থ-পরিচয	৩৩৪

মুখবন্ধ

অষ্টম খণ্ডের বর্তমান সংস্করণে প্রথানুযায়ী কোন লেখক বা সমালোচকের ভূমিকা নাই। আমাদের এই মুখবন্ধ সেই ভূমিকা না থাকার কৈফিয়ত। অষ্টম খণ্ডে যে রচনাগুলি সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের কোনটিই সৈয়দ আলীর জীবদ্দশায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। একটিমাত্র অংশ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, সেও লেখকের তিরোধানের পর। এই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে পাঠকের নিজস্ব মতামত গড়িয়া ওঠার আগে সমালোচক বা ভূমিকাকারের মতামত চাপানো উচিত হইবে না, এই মনে করিয়াই ভূমিকা দেওয়া হয় নাই।

তবে এই গ্রন্থগুলি পড়ার সময় পাঠকের পক্ষে লেখক সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা আবশ্যক। সৈয়দ মুজতবা আলী সুপণ্ডিত্ ছিলেন, তাহা সুবিদিত। তিনি যে জমাইয়া আড্ডা দিতে ভালবাসিতেন তাহাও তাঁহার পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী প্রভৃতি রচনায় সুপরিস্ফুট। কিন্তু প্রায় নিরালা ঘরে একটি বা দুটি মনের মত সঙ্গী পাইলে—সে সঙ্গীর পাণ্ডিত্য থাকুক আর নাই থাকুক, সে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে যতই দীন হউক—তাঁহার হৃদয়মণিকোঠার গুপ্তকুঠুরীগুলির দরজা খুলিয়া যে পুরুষটি বাহির হইয়া আসিত তাহার রূপ বড় একটা রচনার মধ্যে পাওয়া যায় না। সে পুরুষটির হৃদয়ে নিখিল সৌন্দর্যের জন্য আকৃতি, অসহায় নরনারীর জন্য সীমাহীন সহানুভূতি, সকল অজানাকে জানিবার জন্য কৌতূহল, যে কোন দুর্গম স্থানে শারীরিক ক্ষমতা না থাকিলেও যাইবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আর সর্বোপরি সাধারণ মানুষের জন্য অপার ভালবাসা লইয়া সে এক অনন্য জগৎ। আমাদের ব্যক্তিগতভাবে জানা আছে—সাধারণ মানুষ হইতেই তিনি এই ধরণের একান্ত সঙ্গী বাছিয়া লইতেন। প্রয়োজন না থাকিলে ধনী খ্যাতিমান পণ্ডিত-অভিমানী বা উচ্চপদাধি-কারীদের এড়াইয়া চলিতেন। অবশ্য ব্যতিক্রম যে ছিল না তাহা নহে।

এই জন্যই উইলি নামের এক সাধারণ গ্রন্থাগার-কর্মীর বোমাবর্ষণে কর্তব্যরত অবস্থায় মারা যাওয়ার সংবাদ যখন তিনি শোনেন, তখন অবরুদ্ধ বেদনা চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। আবার বিদেশে স্বদেশীয় সঙ্গী যখন অর্থচিন্তায় বিব্রত, দেশে ফিরিবার কথা চিন্তা করেন—তখন তিনি স্বলিখিত রচনা বেতারে পাঠ করিয়া যা কিছু অর্থোপার্জন করেন, তাহা অকাতরে বন্ধুর হাতে তুলিয়া দেন। আবার কখনও নিজের আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা না করিয়াই বিদেশের গলিঘুঁজি খুঁজিয়া, পুরানোকালের চেনা আড্ডা, পুরনো বন্ধুর বাসস্থানের সন্ধানে তৎপর হন, লটের মত পুরাতন বান্ধবীর সহিত দেখা হইলে সমস্ত ভুলিয়া বিগত কালের বিষয় ও ঘটনা লইয়া গল্পে মত্ত হন।

ইহা ছাড়া আরও একটি ব্যক্তিগত নিভৃততর গুপ্তকুঠুরী ছিল এই মমতাবান লেখক-মানুষের, সে কুঠুরী সকলেরই থাকে—হৃদয়ের ব্যাপ্তির অনুসারে ছোটবড়—তাহা ভরা ছিল তাঁহার আত্মপরিজনের প্রতি মমতায়, তাহাদের নিরন্তর সঙ্গকামনার আকুলতায়। দেশবিভাগে বহু মানবের জীবনে সর্বনাশ আসিয়াছে—কিন্তু একটি যথার্থ শিল্পীর জীবনে এর ফল কি নিদারুণ হইতে পারে তাহা আমরা সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবন দেখিয়া

বুঝিয়াছি। পারিবারিক জীবনের প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি সত্ত্বেও তিনি ঘটনাচক্রে পত্নী ও পুত্রদের সহিত একনাগাড়ে দীর্ঘকাল বসবাস করিতে পারেন নাই। পত্নী ও পুত্রেরা বাংলাদেশ তদানীন্তন পাকিস্তানের নাগরিক হওয়ায়, উপরন্তু পত্নী মরহুম রাবেয়া আলী ওখানকার সরকারী শিক্ষা-বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার থাকায় ভারতে আসিয়া কখনই তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল থাকিতে পারেন নাই। সৈয়দ মুজতবা আলীও সাহিত্যচর্চার জন্য ভারত ছাড়িয়া বিশেষত কলিকাতা ছাড়িয়া নড়িবার অবকাশ পান নাই। ফলে পুত্রদের ও স্ত্রীর সহিত একত্র দীর্ঘকাল অবস্থান আলী সাহেবের জীবনে অল্পই ঘটিয়াছিল। এই ক্ষণস্থায়ী মিলনও রাহুগ্রস্ত হয় ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় এবং ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকালে। এই সময়ে স্ত্রী-পুত্রদের জন্য যে দুশ্চিন্তা ও ব্যাকুলতা, সে দায় তিনি একাই নীরবে বহন করিয়াছেন। পাকিস্তানস্থ আত্মীয়-পরিজনের জীবনাশঙ্কায় তিনি পাকিস্তানের ভারত-বিদ্বেষ বা স্বৈরাচারী দমননীতির বিরুদ্ধে কলম ধরিতে পারেন নাই। সেজন্য তাঁহার স্বদেশবাসী ঘনিষ্ঠবন্ধুও অনেকে ভুল বুঝিয়াছেন। সে গঞ্জনা ও ভুল বোঝাও তিনি নীরবে সহিয়াছেন। নিজের দুঃখ বেদনা অপরের কাছে গাহিবার ব্যক্তি তিনি ছিলেন না। তিনি নিজের দুঃখ-বেদনা দিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বাধ্য হইয়া যাঁহারা ও-পারের মানুষ হইয়া এ-পারে বসবাস করিতেছেন বা এ-পার হইতে ও-পাবে গিয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা নিশিদিন কি যন্ত্রণা বহন কবিতেছেন। তাঁহার জীবনের এই দিকটি দেখার সুযোগ আমাদেব হইয়াছিল বলিয়াই পাঠকদের কাছে নিবেদন করিতে পারিলাম। এই রচনাবলীতে সংকলিত 'পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়' 'বাংলাদেশ' ও 'উভয় বাংলা' গ্রন্থ তিনটি পড়িবার সময়ে পাঠকেরা এই কথাগুলি মনে রাখিলে হয়তো কিছু সুবিধা হইতে পারে। লেখকের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত বক্তব্য ও মনোবেদনা একই সঙ্গে এই তিনটি গ্রন্থে পরিস্ফুট। যদিও প্রথমোক্ত গ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তু আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, 'বিদেশে' গ্রন্থের প্রথমদিকের কিছু অংশ পূর্ব-প্রকাশিত 'মুসাফির' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু 'বিদেশে'র বাকী অংশের সঙ্গে সেটুকু অবিচ্ছেদ্য বোধ হওয়াতেই বাদ দেওয়া হয় নাই। আশা করি রসজ্ঞ পাঠক ইহা বুঝিয়া ক্ষমা করিবেন।

পরিশেষে সৈয়দ মুজতবা আলী ও তদীয় পত্নী বাবেয়া আলীর দুই তরুণ পুত্র সৈয়দ মশাররফ আলী (ফিরোজ) ও সৈয়দ জগলুল আলীর (কবীর) নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার একটি অবশ্য কর্তব্য মনে করি। কারণ তাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও যত্ন ব্যতিরেকে এই রচনাগুলির উদ্ধার অসম্ভব হইত।

সবিতেন্দ্রনাথ রায়
সম্পাদক-পক্ষে

পরিবর্তনে
অপরিবর্তনীয়

একদা এক ফরাসীর সঙ্গে পেভমেন্টের উপর শামিয়ানা-খাটানো কাফেতে বসে কফি খেতে খেতে রসালাপ করছি এমন সময় আমার পরিচিত এক ইংরেজ চেয়ার-টেবিল বাঁচিয়ে এগুচ্ছে দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকলুম। ফরাসীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললুম, "ইনি অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট—অনার্স।" ফরাসী পরম আপ্যায়িত হয়ে উৎসাহভরে শুধালো, "কোন্ সাবজেক্টে, মসিয়োঁ? হকি না টেনিসে?" ফরাসী মাত্রই বিশ্বাস, পড়াশুনা বাবদে ইংরেজ এক-একটি আস্ত বিদ্যেসাগর। ইংরেজ চলে যাওয়ার পর মুগ্ধকণ্ঠে বললে, "ধন্যি জাত, মসিয়োঁ। খেলাধূলা বিশেষ করে ক্রিকেটে—যেটাকে ওদের ন্যাশনাল প্যাসটাইম (জাতীয় চিত্তবিনোদন) বলা যেতে পারে—সেটাকে তুলে নিয়েছে শিক্ষাদীক্ষার উচ্চ পর্যায়ে। আপনাদের ন্যাশনাল প্যাসটাইম কি, মসিয়োঁ?" আমি ঈষৎ চিন্তা করে বললুম, "আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পা' সুদ্ধ জানু ঘনঘন দোলানো। বাচ্চারা বেঞ্চিতে বসে দুটো পা-ই। হিসেব করে দেখা গিয়েছে, ওদের জানু পা'তে দড়ি বেঁধে পাওয়ার তৈরী করলে তাবৎ দেশের বিজলী-সাপ্লাই পাওয়া যাবে।" ফরাসী বললে, "ওটা তো নিতান্তই হার্মলেস, নির্বিষ। শুনেছি জর্মানদের ন্যাশনাল প্যাসটাইম, বিশ-ত্রিশ বছর অন্তর অন্তর একটা বিশ্বযুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়া।" আমি প্রতিবাদ মুদ্রা দেখাবার তরে ডান হাত দিয়ে এক কোপে সামনের বাতাস দু'টুকরো করে কেটে দিয়ে বললুম, "নস্যি, নস্যি মসিয়োঁ, বিলকুল ধূলিপরিমাণ! আফগানিস্তানের নাম শুনেছেন? সেখানে কওমে কওমে ধনাধন গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি করে দু'দশ জনকে খতম করে দেওয়া তো নিত্যদিনের ওয়ারজিস, জিমনাসটিক্। আর তাবৎ মুল্লুক জুড়ে লড়াই, এক বাদশাকে তখ্‌ৎ থেকে হটিয়ে অন্য বাদশা বসানো—যদিও তারা বিলক্ষণ জানে, তাতে করে ফায়দা হবে না আদৌ, কুল্লে 'পিদরসুখতেই' (পিতৃদহনকারী, কুট্টি ভাষায় সব হা-ই) বরাবর, সোওয়াদ পাল্টাবার তরে একবার একটা ডাকুকে এস্তেক এস্তেমাল করে তজরুবাভী করেছে—এসব মুল্লুক-জোড়া প্যাসটাইমে ভদ্র আফগান মাত্রই মশগুল হয বছর পাঁচেক অন্তর অন্তর।"

ফরাসী এক গাল হেসে বললে, "আমরা যে রকম ৩১শে ডিসেম্বরের দুপুর রাতে গির্জেয় গির্জেয় ঘন্টা বাজিয়ে ফি বছর পূর্ণা সালটাকে ঝেঁটিয়ে খেদিয়ে দিয়ে নয়া একটা নিয়ে আসি। কেন, বাওয়া, পুরনোটা কী-ই বা এমন অপকর্ম করেছিল? দিব্য ঐ দিয়ে কাজ চলছিল না? তাও, মসিয়োঁ বুঝতুম, নয়াটাকে যদি বছর-বিশেকের গ্যারান্টি সহ আমদানি করতো। সেটাকে ফের ঝেঁটা!"

আমি গদগদ কণ্ঠে বললুম, "তাই না বেবাক মুল্লুকের সাকুল্যে লোক হদ্দ-মুদ্দ হয়ে হেথায়, এই প্যারিসে ঝামেলা লাগায়। তোমরা সব-কুচ চট্‌সে সমঝে যাও।"

আরেক গাল হেসে বললে, "তা আর জানবো না? ফ্রেন্স রিভলুশনে রাজা থেকে আরম্ভ করে নিত্যি নিত্যি কত না মুন্ডু কেটেছি—কিন্তু মাইরি, রাজারও তো মাত্র একটা মুণ্ডু সেটা কাটা গেলে ইতিহাস সেটা নিয়ে আসমান-জমীন ফাটায় কেন? আমরা জানবো না তো জানবে কে?"...ফরাসী সরেস মন্তব্য শুনে আম্মো ভাবি, কাবুলি বাদশার মুণ্ডুটা তো পার্মেনেন্ট এড্রেসেই রয়েছে। তবে অত ধানাই পানাই ক্যান?

রইবে শুধু তাস
আর এক রাজার সর্বনাশ

(প্রাক্তন) রাজা ফারুক নাকি একদা রাজসিক একটি আপ্তবাক্য ছেড়েছিলেন, "এই দুনিয়ায় একদিন টিকে থাকবেন শুধু পাঁচজন রাজা। তাদের চারটি আর ইংল্যান্ডের রাজা—একুনে পাঁচ, ব্যাস।" জানি, রাজার কথা সব কথার রাজা। তা সে রাজার মুখ থেকে বেরনো কথাই হোক, আর রাজা নিয়ে রূপকথাই হোক।

কিন্তু পাপ-মুখে কি করে কই, পেত্যয় যেতে মন যেন চাইছে না, মিসর রাজের ক্রমশঃ-প্রকাশ ভবিষ্যৎবাণী সত্যই কি কাবুলি মেওয়া রূপে প্রকাশ পেল? কাবুলে গণতন্ত্র! ডাকুহীন, রাজাহীন কাবুল! প্রকাশ, আলা হজরত পাদিশাহ ই দীন ওরা দুনিয়া আগা ই আগা বাদশাহ মুহম্মদ জহির শাহ, জীদ আজলালাহু দামং শওকতোহু ওয়া ইকবালোহু—তাঁর গৌরব বর্ধমান হোক, তাঁর শৎকৎ এবং শ্রীসৌভাগ্য চিরস্থায়ী হোক—আমি সংক্ষেপে সেরে, আশা করি কোন অলঙ্ঘ্য প্রোটোকল অমান্য করে সখৎ গুনাহ বা মোলায়েম মকরূহ-এ লিপ্ত হই'নি—তাঁর তাজ ও তখ্‌ৎ হারিয়েছেন। অতএব আমরা ফারুকের ভবিষ্যৎবাণী মাফিক আখেরী পঞ্চরাজ চক্রবর্তীর আরো নিকটবর্তী হয়েছি। উত্তম প্রস্তাব! কিন্তু এ তো অতিশয় পুরনো কাসুন্দি। তথাকথিত ঐতিহাসিক টয়েনবি যাকে বলেন প্যাটার্ন। না, এবাবে যে গাজী—কালক্রমে ইনি কাজী উপাধি অবশ্যই পাবেন—তখ্‌ৎ তাজ কেড়ে নিলে তিনি নাকি সেগুলো এস্তেমাল করবেন না। তিনি দেশের জন্য তাঁর কথায় 'ইসলামের ঐতিহ্যানুযায়ী' গণতন্ত্র ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু কিঞ্চিৎ অবান্তর হলেও যে প্রশ্নটা প্রাগুক্ত ফরাসিসও আজ জিজ্ঞেস কবতেন সেটা সংক্ষেপে বললে দাঁড়ায়, "এত ল্যাটে কেন?" ১৯৩৩-এ জহিব শাহ উনিশ বছর বয়সে রাজা হন। তাঁর পিতা বাদশা নাদির শাহ আততায়ীর গুলিতে শহীদ হন। আফগানবা সেই শেষ জাতীয় চিত্তবিনোদনেব পর ঝাড়া চল্লিশটি বছর ধরে এই মহামূল্যবান প্রতিষ্ঠানটিকে এ-বকম নির্মম বেদরদ পদ্ধতিতে অবহেলা করলো কেন? আফগান চরিত্র যাঁরা কণামাত্র চেনেন তাঁদের কাছে এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ভুতুড়ে ব্যাপার, বেআইনী তিলিসমাৎ বলে মনে হবে।

এর মোদ্দাটা আমাদের সোনার বাংলার একটি প্রবাদে অনায়াস-লভ্য। একে তো ছিল নাচিয়ে বুড়ি, তার উপর পেল মৃদঙ্গের তাল। পাঠান-আফগানরা নাচবার তরে হরহামেশা তৈরী, কিন্তু ঐ যে মৃদঙ্গটা ওতে দু'চারটে চাটিম চাটিম বোল তুললে তবে তো মৌজটা জমে এবং সে মৃদঙ্গ বাজাতেন আকছারই ইংরেজ মহাপ্রভুরা পেশোয়ারে বসে। ১৯১৭-এর পূর্বে কখনো বা রাশার জার—আমু দরিয়ার ওপারে বসে। এনারা নাচবার তরে কড়ি ভী দিতেন, নাচের সময় শাবাশী দিতেন, নাচ শেষে আপন আপন পছন্দসই 'আমির'-কে তখ্‌তে বসাতেন। শেষবারের মত ডুগডুগি বাজিয়েছিল ইংরেজ ১৯২৮। ২৯-এ। নাদির শাহকে মারাব পিছনে কেউ ছিল কিনা, সঠিক বলতে পারবো না।

পটভূমি

আমান উল্লা যখন দেশের তরে লড়াই দেন, তখন তাঁব জঙ্গীলাট ছিলেন নাদির খান।

স্বাধীনতা লাভের কিছুদিন পরেই, যে কোনো কারণেই হোক তাঁর মনে নাদিরের মৎলব সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হল, লোকটা আফগান ফৌজের এতই প্যারা যে, কখন যে একটা মিলিটারি কু লাগিয়ে নিজেই রাজা হয়ে বসবে না, তার কি প্রত্যয়! আমান উল্লা নিজেই তো রাজা হলেন সৎ ভাই, যুবরাজ এনায়েত উল্লাকে তাঁর হক্কের তখ্‌ৎ থেকে বঞ্চিত করে—যদিও সমস্ত ষড়যন্ত্র বলুন, প্যাসটাইম বলুন ব্যাপারটার পরিপাটী ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর আম্মাজান,—আমান উল্লার পেটে কতখানি এলেম ছিল সে তারিফ তাঁর পরম প্যারা দোস্ত তক করতে গেলে বিষম খেত। কিন্তু তার চেয়ে একটা মোক্ষমতর তত্ত্ব আছে, সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি বাবদে। আর্যদের ভিতর বহু প্রাচীনকাল থেকেই একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে—পিতা গত হলে বড় ছেলে পরিবারের কর্তা হবে। কোনো কোনো আর্য গোষ্ঠীতে তো সে আইন এমনি কট্টর যে, বড় ছেলে ভিন্ন অন্য ভাইরা পিতার সম্পত্তির কানা কড়িটাও পায় না, গ্রাসাচ্ছাদনও না। সর্ব ব্যবস্থার মত এ ব্যবস্থাটারও সদ-গুণ বদ-গুণ দুইই আছে। কিন্তু আফগানদের ভিতর সে আইন খুব একটা চালু হয় নি। আমান উল্লা নাদিরকে বিদেশে চালান দিয়েছিলেন।

লাঠি যার দেশ তার

কাবুলের সিংহাসনে বসার হক্ক শেষটায় বংশানুক্রমে গিয়ে দাঁড়ায় মূলতঃ কান্দাহারের আব্দুর রহমান, হবীব উল্লা, আমান উল্লাব গোষ্ঠীতে। তার অর্থ ঐ গোষ্ঠীর 'যার লাঠি তার মোষ।' আমান উল্লা, নাদির, জহির আর আজকের জেনারেল মুহম্মদ দাউদ খান সক্কলেরই যে কেউ গায়ের জোবে একবার কাবুলের তখ্‌তে বসে যেতে পারলে ক্রমে ক্রমে জালালাবাদ, গজনী, কান্দাহার শায়েস্তা করে তাঁবেতে আনতে পারলে তাবৎ আফগানিস্তান তাঁকে আলা-হজরত বাদশাহ বলে মেনে নেয়। কাতাখান-বদখশান মজার ই-শরীফের বিশেষ কোনো মাহাত্ম্য নেই।

উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি, জেনারেল দাউদ মাত্র কাবুলের প্রধান। সদরও বলতে পারেন। বেতার বলছে, কাবুলের বাইরে এখনো তাঁর রাজ্যবিস্তাব আবম্ভ হয় নি। তবে কাবুল উপত্যকার বাইরে উত্তর দিকে, অন্তত মাইল দশ পনেরো দূবের একটা জায়গা (চল্লিশ বছর হয়ে গেল, নামটা ঠিক মনে নেই, খুব সম্ভব জাবাল উস্-সরাজ) থেকে আসে বিজলি। সেটা নিশ্চযই জেনারেল দাউদের তাঁবেতে। নইলে সিমলে পাহাড় থেকে কাবুল বেতারে দাউদের জয়ধ্বনি আকাশবাণীর মনিটর শুনলো কি করে?

ওদিকে যদিও কাবুল বিমান বন্দর এক্কেবারে শহরের গা ঘেঁষে তবু বিলেত ছেড়ে কাবুলে যে প্লেন আসছিল সেটা সোজা দিল্লী চলে গেল কেন? লাহোর কিংবা করাচিতেই নামলো না কেন? হয়তো প্লেনে রাজ পরিবাবের দু'চারজন, কিংবা/এবং জহিরপন্থী কিছু লোক ছিলেন যাঁদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কাবুল যাওয়াটা মোটেই নিরাপদ নয়। পাকিস্তানে নামাটাও খুব সুবুদ্ধিমানের কাজ হত না! ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তানের কোনো দুশমনী নেই। ভারতই ভাল। কাবুল এ্যার-পর্টে নামাটা টেকনিক্যালী সম্ভবপর হলেও।

বহুকাল হল কাবুল বেতার শুনি নি। একদা সন্ধ্যে সাতটা আটটা থেকেই বিদেশের জন্য তাদের প্রোগ্রাম শুরু হয়ে যেত, পশতু এবং ফার্সীতে। রাত এগারোটার ঝোঁকে ইংরেজীতে, এবং পিঠ পিঠ ফরাসীতে। দেখি, বাত ঘনালে পাই কি না। তবে 'কু দেতা,'

বা 'কু দ্য পালে' হয়ে যাওয়ার পর নানা কারণে সচরাচর জোরদার ট্রান্সমিটার ব্যবহার করা হয় না বা যায় না।

অর্থই পরমার্থ

কার্ল মার্কস বলেছেন, অর্থনৈতিক কারণ ভিন্ন ইহ-সংসারে কোনো বিরাট পরিবর্তন হয় না। ইংরেজ এই নীতি অবলম্বন করে তার ন্যাশনাল প্যাসটাইম—'জাতীয় চিত্তবিনোদন' প্রতিষ্ঠান ফুটবল-ক্রিকেটকে তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অক্সফর্ড কেমব্রিজে সমাসন স্থলবিশেষে উচ্চাসন দিয়ে যে অত্যদ্ভুত সমন্বয় সাধন করলো তারই অর্ধশিক্ষিত অর্ধমল্লবীর সন্তানগণ স্থাপন করলো বিশ্ব জোড়া রাশি রাশি উপনিবেশ। কন্টিনেন্টের তাবৎ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়ামোদ তার চতুঃসীমানায় প্রবেশ করতে দিত না। অতএব উপনিবেশ স্থাপন ও তথায় রাজত্ব করার জন্য শিক্ষিত লোক পাঠালে তারা মরতো পটাপট করে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ৎসে ৎসে ফীভার ইত্যাদির নানাবিধ রোগে; পক্ষান্তরে আখড়া থেকে ধরে ধরে ডানপিঠে গাঁট্টা-গোঁট্টাদের পাঠালে তারা পট পট পটল তুলতো না বটে, কিন্তু পটল ক্ষেতের হিসেবনিকেশ থেকে আরম্ভ করে উপনিবেশের বাজেট, অডিট, আইন-কানুন, এক কথায় দেশ শোষণ করার জন্য যে সিভিল সার্ভিস গড়ে তুলতে হয় তার জন্য নিরঙ্কুশ অনুপযুক্ত। কেউ কেউ তো নামটা পর্যন্ত সই করতে পারতো না।

তাই ইংরেজ গলফ্ খেলার সময়ই হোক আর রিলেটিভিটি কপচাবার ওক্তেই হোক সব কিছু মা-লক্ষ্মীর আঁচলে বেঁধে দেয়।

পাঠানেব বর্ণচোরা সংস্করণের নাম ইংরেজ। পাঠানও তার ন্যাশনাল প্যাসটাইম—দু'দশ বছর পর পর কাবুলেব তখ্‌ৎ থেকে পুরানো বাদশাকে সরিয়ে নযা বাদশা বসানোর জাতীয চিত্তবিনোদনের সময় মার্কস-নির্দিষ্ট নীতি, ইংরেজ কর্তৃক হাতে-কলমে তার ফলপ্রাপ্তি, কোনোটাই ভোলে না।

"বিআ ব্-কাবুল, বরওম ব্-কাবুল,
বিআ ব্-কাবুল বরওয়ীম ব্-কাবুল।।

আয় তুই কাবুল, আমি চললাম কাবুল,
আয় তুই কাবুল আমরা চলি কাবুল।।"

"দীন দীন" রবে হুহুঙ্কার চিৎকার পাঠানের কাছে বিলকুল ফজুল। কাবুল লুট করাতে কি আনন্দ কি আনন্দ!

ন্যাশনাল প্যাসটাইমের সঙ্গে অর্থপ্রাপ্তির সমন্বয়।

দোনালা-বন্দুক

প্রেসিডেন্ট দাউদ খানের সর্বপ্রধান শিরঃপীড়া হবে এই পাঠান ডাকুরা পাল। ওদের সামলাতে হলে দরকার ফৌজ। দাউদ খান তাঁব ভাষণারম্ভে সম্বোধন জানিয়েছেন পেট্রিয়টদের, 'দেশপ্রেমিকদের'—ফার্সীতে 'দোস্তান-ই-মুল্‌ক' বা সমাসবদ্ধ 'ইয়ার-উল-মুল্‌ক' কিংবা আববা রজনীর 'শহর-ইয়ার'-এর ওজনে 'মুলক্-ইয়াব' অথবা সাদামাটা

'হম ওয়াত্ন' 'স্বদেশবাসী' যাই বলে থাকুন না কেন, পাঠান-হৃদয়ে আফগানিস্তান নামক রাষ্ট্রের প্রতি কোনো প্রকারের খাস, দিল-তোড় মহব্বতের কোনো নিশান আমি দেখি নি। যে অঞ্চলে সে বাস করে অর্থাৎ কওমী এলাকার প্রতি তার টান থাকা অসম্ভব নয়—পাখিটাও তার নীড়ের শাখাটির মঙ্গল কামনা করে—কিন্তু দেশপ্রেম! অতএব দেশপ্রেমী দাউদ দেশের দোহাই দিয়েছেন দোনালা বন্দুকের মত। কাবুল ও কাবুলাঞ্চলের সরকারী ফৌজ যেন তাঁর কাছ থেকে বড্ড বেশী টাকা-কড়ি না চায়। কাবুলের ভিতরকার আর্ক-দুর্গের তোষাখানায় কি পরিমাণ অর্থ তিনি পেয়েছেন সেটা তাঁর প্রথম ভাষণেই ফাঁস করে দেবেন এমনতরো দুরাশা তাঁর নব-নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রীও করবেন না। এবং এটাও অসম্ভব নয় যে, জহির শাহ ভিন-দেশ যাবার মুখে বাগ-ই বালার (আমাদের তেজগাঁও) কেন্দ্রীয় শাহী সৈন্যদের কমান্ডান্ট আপন দামাদ জেনাবেল শাহ ওয়ালী খানের হেপাজতে গ্যারিসনের মধ্যেই রেখে গিয়েছিলেন। বলা শক্ত মানুষ আপন দামাদ, না ভগ্নীপতি, কাকে বেশী বিশ্বাস করে? খবর এসেছে, জেনারেল ওয়ালীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। সেটা নিশ্চয়ই গ্যারিসন জয় করার পূর্বে দাউদের দ্বাবা সম্ভব হয় নি। হঠাৎ করে দাউদ ওটাকে জয় করার মত ফৌজ আর হাতিয়ার পাবেন কোথায়? এবং আর্ক-দুর্গই বা তিনি কাবু করলেন কি করে? সেখানে তো তাঁর বাস কবার কথা নয়।

দাউদের পূর্বকথা

আফগান রাজনীতিতে বলা উচিত ছিল কাবুলেব রাজনৈতিক দলাদলির প্রধান নেতা রাজ-গোষ্ঠীর সরদারগণ। দাউদ এদেরই একজন। জহির রাজা হন ১৯৩৩-এ। দাউদ তাঁর প্রধান মন্ত্রী হন ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে। অনুমান করা অসঙ্গত নয়, তিনি কুড়ি বৎসর ধরে তাঁর শক্তি সঞ্চয় করে চলছিলেন অর্থাৎ সবদারদেব মধ্যে যে কজনকে পারেন আপন দলে টানছিলেন। এটা যে প্রকাশ্যে তখ্ত্-নশীন বাদশার বিরুদ্ধে করা হয় তা নয়। গণতান্ত্রিক দেশে সংবিধান মেনে নিয়ে প্রত্যেক পলিটিশিয়ান যে রকম আপন দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করে হুবহু সেই রকম কাউকে দলের উচ্চাদর্শ দেখিয়ে কাউকে মন্ত্রিত্বের ওয়াদা দিয়ে, কাউকে বা ডাঁই ডাঁই কন্ট্রাক্টের লোভ দেখিয়ে ইত্যাদি। কোনো সবদাব যদি সত্যই পালের মধ্যে বড্ড বেশী জোরদার হয়ে যান, তবে বাদশা যে ঈষৎ শঙ্কিত হন সেটাও জানা কথা। তখন তাঁকে নিতান্ত নিজস্ব আপন দলে টানাব জন্য বাদশা তাঁব বোন বা মেয়েকে সেই সরদারের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হন। পাঠকের স্মরণে আসতে পারে, আমির হবীবউল্লা যখন দেখলেন, মোল্লাদের চিত্তজয় করে তাঁব অনুজ নসরউল্লা এত বেশী তেজিয়ান হয়ে গিয়েছেন যে তিনি রীতিমত শঙ্কিত হলেন—তাঁর মৃত্যুর পর আপন পুত্র যুববাজ ইনায়েৎউল্লা হয়তো রাজা হতে পারবেন না, রাজা হয়ে যাবেন নসরউল্লা। তাই তিনি যুবরাজকে বিয়ে দিতে চাইলেন নসর কন্যার সঙ্গে। নসর হয়তো বা আপন দামাদকে খুন করতে ইতস্তত করবেন—ঐ ছিল তাব গোপন আশা।....এ স্থলে, যদিও টায় টায় খাটে না, তবু হয়তো বা দাউদকে আপন দলে টানবার জন্য জহির বোনকে আদমের আপেলের মত তাঁর সম্মুখে ধরলেন। বস্তুত আফগান রাজগোষ্ঠীর হতভাগিনী কুমারীকুল সে দেশের রাজনৈতিক দাবা খেলায বড়ের মতই এগিয়ে গিয়ে ছকের মাঝখানে প্রাণ দেন, রাজাব দুর্গ অভেদ্যতর করবার জন্য

(কাসলিং)। কেউ কেউ আমৃত্যু কুমারীই থেকে যান—ক্রীড়ারম্ভে যে ছকে জন্মগত অধিকার বা কিস্মত বশত তাঁকে দাঁড় করানো হয়েছিল কিস্তিমাৎ পর্যন্ত সেখানেই অর্থহীন নিষ্কর্মার মত অবশ অচল হয়ে থাকেন। ষাট বছরের বুড়ো সরদারের সঙ্গে চৌদ্দ বছরের কচি মেয়ের বিয়ে হওয়াটাও আদৌ বিচিত্র নয়। কিন্তু উপস্থিত থাক সে দীর্ঘ দয়াধর্মহীন কাহিনী। শুধু বাদশার নয়, কুল্লে সরদার-বালাদের ঐ একই হাল।

পট বদল

১৯৪৭-এ হঠাৎ ইংরেজের পরিবর্তে দেখা দিল পাকিস্তান। আমানউল্লা ইংরেজ এবং রুশ দুই সপত্নের (সপত্নীর পুংলিঙ্গ বিশুদ্ধ সংস্কৃতে সপত্ন—মডার্ন কবিদের ভাষায় "পুং-সতীন") মাঝখানে ছিলেন মোটামুটি ভালই। আখেরের নতীজা—সে কাহিনী প্রাচীন ও দীর্ঘ।...বাদশা জহির হঠাৎ দেখেন তাগড়া ইংরেজ সপত্নের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পাকিস্তান—সেও আবার কাবুলের সঙ্গে ফ্লার্ট করা দূরে থাক ইন্ডিয়া নিয়ে সে ব্যতিব্যস্ত। খুদ বাদশার কি মতিগতি ছিল জানিনে, কিন্তু সরদার দাউদ হয়ে দাঁড়ালেন পয়লা নম্বরেব চেম্পিয়ান, পাঠানদের তাড়িয়ে দিয়ে পাকিস্তানকে কামড মেরে এক খাবলা গোশ্‌ত্ ফোকটে মেরে দিতে। তাঁর দল হল আরো ভারি। "বিআব-পেশাওয়াব" "চলি, চলো পেশাওয়ার/চে খুব উমদা সে-ভাণ্ডার।"

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এ রকম একটা জিগির চিত্তহারিণী হবেই। পেশাওয়াবে খাস পাঠানদের বাড়ী-গাড়ী অত্যল্পই। পাঞ্জাবীরা সেখানে বিস্তর ধনদৌলত সঞ্চয় করেছে পার্টিশনেব সময় বেধড়ক লুট করে। এবারে পাঞ্জাবী মৌমাছিদের খেদিয়ে দিয়ে বাড়ী আনতে হবে ইয়াব্বড়া বড়া মধু ভাণ্ড! আজ সদর দাউদ খাইবার পাস থেকে শুরু করে জালালাবাদ, সিমলা, খাক-ই-জব্বাব তক সব "দেশপ্রেমী" পাঠানদের যে ইঙ্গিত দিচ্ছেন সেটা কিঞ্চিৎ বঙ্কিম হলেও সুস্পষ্ট। অর্থাৎ কাবুলে বাদশা বদল হলে ঐ সব অঞ্চলের যে পাঠানবা এক জোট হয়ে ধাওয়া করে জালালাবাদ লুটতে—দাউদ তাদেব বলছেন, "হে দেশপ্রেমী পাঠান, তুমি আপন দেশ লুটতে যাবে কেন? তোমাকে তো বলেছি, পাকিস্তানের সঙ্গে, আমার যে বোঝাপড়া এতদিন তোমাদের ঐ নিষ্কর্মা জহিরের জন্য মুলতুবি ছিল, এখন সে শুভ-লগ্ন উপস্থিত। তোমাদের কম্পাসেব কাঁটাটা ঘুরিযে দাও।" ভালো-মন্দেব কথা হচ্ছে না; এটা সহজ পলিটিক্স। বেতারে শুনতে পেলুম, দাউদ প্রেসিডেন্ট হযেই বিদেশী রাজদূতদের ডেকে পাঠান—নিদেন প্রেসিডেন্টের তখ্‌তে না বসা পর্যন্ত ওঁদের ডাকা যায় না—এবং তাঁদের শান্তি শান্তি, সালাম ইয়া সালাম, সর্ববিশ্বে শান্তি এই বাণী উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, "কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে এইবারে আমার বোঝাপড়া শুরু হবে।" বেতারের রিপোর্টার মন্তব্য করেছেন, প্রেসিডেন্টের বলার ধরনটা আদৌ সুলেহ্-সন্ধি সূচক ছিল না (আমি নিজে ধবনটার গুরুত্ব অত বেশী দিই নে; কে না জানে, মানুষ রান্নার সময় যে গরমে ভাত ফোটায়, অতখানি গরমা-গরম গেছে না)।

এই মামুলী লেখনের গোড়াতে যে দোনালা বন্দুকের উল্লেখ করেছিলুম, এই তার দোসরা নাল।

কিন্তু পাকিস্তান যে ইসলামী রাষ্ট্র? আমরা পাকিস্তান আফগানিস্তান কোনো রাষ্ট্রেরই অমঙ্গল কামনা করি না। কিন্তু দাউদ কি উত্তর দেবেন সেটা কিঞ্চিৎ অনুমান করতে পারি। জালালাবাদ অঞ্চলের পাঠানদের চাপে পড়ে—যদিচ সেটাই একমাত্র চাপ ছিল না—একদা আমান উল্লার তখ্‌ৎ যায়। এখন এরা যদি—অবশ্য সেটা অনুমান মাত্র—জেনারেল দাউদকে সমর্থন না করে তবে তাঁর তো গত্যন্তর নেই। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাঁকে তখন কট্টরস্য কট্টর সুন্নী পাঠানদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতে হবে, "পাকিস্তানের সদর (শব্দার্থে বক্ষস্থল), ডিক্টেটর কে, যার হুকুমে তামাম পাকিস্তান ওঠ-বস করে? স্বৈরতন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো। সে তো শিয়া।"

নজীর স্বরূপ আরেকটা তথ্য সদর দাউদ বলবার হক্ক ধরেন। তিনি বলতে পারেন, "১৯৫৮ সালে যখন আমি প্রধানমন্ত্রী তখন পাকিস্তানের যে সদর ইসকন্দর মির্জা আমাদের সঙ্গে সুলেহ্ করতে চেয়েছিল, সে কথাবার্তা বলেছিল কার সঙ্গে? বাদশা জহিরের সঙ্গে। আমি কথাই বলি নি। কেন? সেও ছিল শিয়া। তারও একটুখানি পরে কে? ইয়াহিয়া। সেও শিয়া।"

মুশকিল।।

*

* *

কু দে'তা মূলত ফরাসী। কু=আঘাত, গুঁতো, দ্য—ইংরিজি অব, এতা=রাষ্ট্র, ইংরিজি স্টেট ঐ একই শব্দ। অকস্মাৎ, বলপ্রয়োগ করে, সচরাচর দেশের সংবিধান বা ঐতিহ্য উপেক্ষা করে যদি এক রাজার বদলে আরেক রাজা তখতে বসে যান, কিংবা রাজাকে হটিয়ে গণতন্ত্র, অথবা গণতন্ত্রকে হটিয়ে স্বৈরতন্ত্র (ডিক্টেটরী) পত্তন করেন তবে সেই বলপ্রয়োগ (কু) দ্বারা রাষ্ট্রের (এতা) রূপ বা ভাগ্য পরিবর্তনের নাম কু দে'তা। দেশ-বিভাগের পর সর্ব-প্রথম একটা কু দে'তার পূর্বাভাস দেন আধ-সেদ্ধ ডিরেক্টর ইসকন্দর মির্জা, আসল সুসিদ্ধ কু করলেন আইয়ুব। তাঁর পরের মাল সব ঝুট। ভুট্টো যদি মিলিটারী জুন্তাকে নির্মূল করে যা-ইচ্ছা-তাই বা যাচ্ছেতাই করতে পারেন তবে সেটা হবে তাঁর ব্যক্তিগত কু।

কু দ্য পালে রাজ-প্রাসাদের (পালে, পেলেস, প্রাসাদ) ভিতরকার আকস্মিক পরিবর্তন। কু দ্য পালে প্রতিষ্ঠানটি অতিশয় প্রাচীন, কিন্তু বাক্যটি প্রচলিত হয়েছে হালফিল। একদা যে কোনো ব্যক্তি রাজাকে গুম খুন করে দুম করে সিংহাসনে বসে যেতে পারলেই দেশের লোক গড়িমসি না করে তাঁকে রাজা বলে মেনে নিত। এখন অত সহজে হয় না। রাজা ফারুককে হটানোটার আরম্ভ হয় কু দ্য পালে দিয়ে, কিন্তু নজীব-নাসীরের পিছনে দেশের (এতা-র) লোক ছিল বলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে কু দে'তা-তে পরিবর্তিত হয়।

অতএব কু দে'তা বিরাটতর রাষ্ট্রবিপ্লব কু দ্য পালের চেয়ে।

জেনারেল দাউদ যে কর্মটি সমাধান করলেন সেটা স্পষ্টত কু দ্য পালে দিয়ে আরম্ভ, এখন যদি সেটা কু দে'তাতে পরিবর্তিত না হয় তবে বেশ কিছুকাল ধরে চলবে অরাজকতা, অর্থাৎ রাষ্ট্র-শক্তিধারীহীন রাষ্ট্রবিপ্লব বা সিভিল উয়ার। ইহ-সংসারে যত

প্রকারের যুদ্ধ হয়, কোনো দেশের কিস্মত ভাণ্ডারে যত রকমের গজব আছে, তার নিকৃষ্টতম নিষ্ঠুরতম উদাহরণ ভ্রাতৃ-যুদ্ধ।

চাণক্য বলেছেন, যে ব্যক্তি উৎসবে ব্যসনে দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজদ্বারে (যখন পুলিশ কাউকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায়) এবং সর্বশেষে বন্ধুকে শ্মশানে বয়ে নিয়ে যায়, সেই প্রকৃত বান্ধব।

"উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যঃ তিষ্ঠতি স বান্ধব।।"

দোস্ত কুজা আস্ত্?

মিত্র কুত্র অস্তি?

দোস্ত কোথায় আছে?

অতএব উল্লেখ নিতান্তই বাহুল্য, যে, সদর দাউদকে বন্ধুর সন্ধানে—ব্ তলাশে দোস্ত—বেরুতে হবে। ভ্রাতৃযুদ্ধের সময় বান্ধবের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। ওদিকে সম্ভাব্য বান্ধবরা নব রাষ্ট্রনেতাকে বাজিয়ে দেখতে চান, তিনি শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকবেন কিনা। পূর্বেই বলেছি, কাবুলের কর্ণধার হলেই যে তিনি তাবৎ আফগানিস্তানের প্রভু হতে পারবেন, এমন কোনো কথা নেই। অতএব আফগানিস্তানের সঙ্গে যে সব রাষ্ট্রের স্বার্থ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে বিজড়িত তারা সদব দাউদের নূতন রাষ্ট্রকে পত্রপাঠ ঝটপট স্বীকৃতি দেবার পূর্বে কান্দাহার, গজনী, জালালাবাদ তাঁর বশ্যতা মেনে নিয়েছে কি না, না মেনে থাকলে সেগুলোকে শায়েস্তা করবার মত তাঁর সৈন্যবল, অস্ত্রবল, অর্থবল পর্যাপ্ত কিনা তারই সন্ধান নেবে। ওদিকে, বলতে গেলে সর্বশেষ খবর অনুযায়ী কাবুল এইসব এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন। যে সব রাষ্ট্র আফগানিস্তানের প্রতিবেশী, যেমন রুশ, ইবান, পাকিস্তান—এঁরাও এ সব এলেকার কোনো পাকা খবর পাচ্ছেন না।

তৎসত্ত্বেও বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ রুশের মত রাষ্ট্র, যার "ওরিয়েন্টাল ধর্ম" শত শত বৎসর ধরে বিশ্বময় সুপরিচিত, এস্তক দশক দুত্তিন পূর্বে হিটলার চেম্বারলেন উভয়কে প্রায় উন্মাদাশ্রমে পাঠাবার মত বাতাবরণের সৃষ্টি করে তুলেছিল আর এদানির কেষ্ট বিষ্ণু, বাজনীতির ইস্কুলে নিতান্তই 'তিফল-ই মক্তববৎ' চ্যাংড়া, যাদের কোনো কিছুতেই তর সয় না, রাতারাতি চৌষট্টি-তলার এমারৎ নির্মাণ যাদের কাছে ডাল-ভাত—থুড়ি, হট-ডগ হাম-বুর্গার—সেই নিকসন কিসিংজারকে পকেটে পুরেছে যারা, তারা কিনা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে, প্রতিবেশী কুল্লে মুল্লুককে সুপারসনিক স্পীডে তালিম দিয়ে তেরাত্তির যেতে না যেতে দুশমনী মার্কিনী কায়দায়, বহু বৎসরের হারিয়ে যাওয়া ফিরে পাওয়া ভাইটির মত সদর দাউদকে নিয়ে পাঠানী বেরাদরী কায়দায় একই বর্তন থেকে গোশ্ত্-রুটি খেতে আরম্ভ করে দিল? আমি মূর্খ, বার বার আহাম্মুক বনে বনে ঐ তামাশায় দস্তুরমত চ্যাম্পিয়ন, আম্মো বেবাক অবাক। ক্ষণতরে ভাবলুম, "পূর্বদেশে" বিজ্ঞাপিত ধারাবাহিকের ধারাটা বেলাবেলিই পাথর দিয়ে বন্ধ করে দি। পরে দেখলুম কিলটা হজম করে নেওয়াই প্রশস্ততর।

রুশের এই সৃষ্টিছাড়া আচরণের কারণটা কি?

অবশ্যই প্রথম কারণ, শত বৎসরের পুরানো ইংরেজ সপত্ন বঁধুয়ার আঙিনাতে আজ আর নেই। সে থাকলে এই বরমাল্য দানের বদলাই নেবার 'তরে এনে দিত মোতির মালা। রুশকে আনতে হত লাল-ই-বদখশান—চুনী। ইংরেজ আনতো...গয়রহ ইত্যাদি।

অর্থাৎ দাউদ যাত্রারম্ভের পূর্বেই হয়তো বা রুশের আশীর্বাদ নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। হয়তো বা, রাজা জহিরের নিরপেক্ষ নীতি রুশ পছন্দ করতো না। দাউদ হয়তো ভিন্ন ওয়াদা দিয়েছেন। জহিরের নীতি একদিন হয়তো মার্কিনকে ইংরেজের ভ্যাকুয়ামে টেনে আনত। কান্দাহার জালালাবাদকে ঘায়েল করার জন্য রুশ আজ সদর দাউদকে যা দেবে, মার্কিন তার বদলে দাউদ বৈরীদের দিত মোতির মালা, রুশকে ছুটতে হত বদখশান... উপরে দেওয়া আড়াআড়ির "বাজার দর" দ্রষ্টব্য। অতএব মার্কিন নাগর রসবতীর সন্ধানে আসার পূর্বেই দাও স্বীকৃতি।

কয়েক বছর আগেও রুশ ঝটিতি দাউদকে এ রকম স্বীকৃতি দিত না, কারণ কিংবদন্তী অনুযায়ী যে হিন্দুকুশ পর্বত উত্তীর্ণ হবার সময় সে পর্বত বিস্তর হিন্দুর (আর্যের) প্রাণহরণ করে (কুশ্‌ৎ, তাই "হিন্দুকুশ"), সেটাকে অতিক্রম করে মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেও ট্যাঙ্ক-কামান কাবুলে আনাটা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। বেশ কয়েক বছর হলো বাদশা জহিরের অনুরোধে রাশানরা অপথে বিপথে কয়েকটা টানেল খুঁড়ে, লেভেল রাস্তা বানিয়ে, কে জানে ক'হাজার ফুট চড়াই উৎরাই তো এড়িয়েছে বটেই, তদুপরি না জানি ক'শ মাইল রাস্তাও কমিয়ে দিয়েছে।

তৃতীয় পক্ষ পাকিস্তান

তদুপরি সরাসবি দুশমন না হলেও পাকিস্তানের সঙ্গে রুশের ঠিক বনছে না। কারণটা অতীব সরল। পাকিস্তান নিক্‌সনের চতুর্দিকে সাত পাকের বদলে সত্তর পাক খাচ্ছেন। পাকিস্তানই অগ্রণী হয়ে মার্কিনের সঙ্গে তার দুশমন চীনের ভাবসাব করিয়ে দিয়েছে। এখন তার দাদ নিতে হবে। এবং এব সঙ্গে জড়িত আছে আরেকটি ফৌজি চাল। শেষ পর্যন্ত যদি চীনের সঙ্গে লেগে যায তবে আফগানিস্তানের ঘাঁটি থেকেও চীনকে কিছুটা বিব্রত করা যাবে।

কিন্তু একটা ব্যাপার আমাব মনে ধন্ধ সৃষ্টি করেছে। পাঠকের স্মরণে আসতে পারে, আমান উল্লাকে বিতাড়িত করার পিছনে ছিলেন, যাঁকে প্রায় আফগানিস্তানের পোপ বলা যেতে পারে, সেই শোর বাজারের হজরৎ। ডাকু বাচ্চা-ই-সাকোও কাবুলের দিকে এগিয়ে আসার পূর্বেই তাঁর আদেশে শাহী ফৌজের সেপাইরা বাগ-ই-বালা ত্যাগ করে যে যার বাড়ি চলে যায়। আমি পূর্বেই প্রশ্ন শুধিয়েছিলুম, আর্ক এবং বাগ-ই-বালা দাউদ খান দখল করলেন কি করে? যতদূর জানা গেছে, বলবার মত কোনোই প্রতিরোধ সেখানকার সৈন্যরা দেয় নি—হয়তো বা কু'ব পূর্বেই এরা আপন গাঁয়ে শোর বাজারের বর্তমান-গদি-নশীনের আদেশে চলে গিয়েছিল। এবং এটাও লক্ষ্য করেছি, সদর দাউদ সরকারী পদ্ধতিতে সাড়ম্বরে তাঁর প্রথম ভাষণেই বলেছেন, তাঁর নবীন রাষ্ট্র যদিও রিপাবলিক তবু সেটা "ইসলামের ঐতিহ্যানুযায়ী" গঠিত হবে। বলা বাহুল্য সেটা সুন্নী মজহব অনুযায়ী। তদুপরি দাউদ খান যখন দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে বোঝাপড়ার মত অনেক কিছু অনেক দিন থেকেই তাঁর রয়েছে তখন শোর বাজার সঙ্গে সঙ্গে স্মরণে আনেন, স্বয়ং মরহুম জিন্না থেকে আরম্ভ করে কোন্ কোন্ পাকনায়ক শিয়া। এমন কি শিয়া না হয়েও জফরউল্লা এঁদের আরেক ধাপ নিচে—তিনি কাদিয়ানী। গোঁড়া আফগান সদাসর্বদা কাদিয়ানী মাত্রকেই ইসলাম-ত্যাগী মুলাহিদ বলে গণ্য করে এবং তারা ওয়াজিব

উল-কৎল—যাদের কতল করা ওয়াজিব। কাবুলবাসী জাত হিন্দু বা শিখের কাছ থেকে হয়তো বা জিজিয়া তোলা যায়, কিন্তু তাদের উপর অত্যাচার করার বিধান নেই। স্বয়ং আমান উল্লার আমলে শহর-কাজীর হুকুমে একজন তথাকথিত কাদিয়ানীকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারা হয়। দাউদেরও শিয়াদের প্রতি নিজস্ব উৎকট জাতক্রোধ আছে। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে ইরানের শিয়া শাহের প্ররোচনায় জহির তাঁকে প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে বরখাস্ত করে সর্দারদের হিসেবে না নিয়ে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাদামাটা ডঃ ইউসুফকে প্রধানমন্ত্রীর পদ দেন। [১]

শোর বাজার-যাজক-সম্প্রদায় আমান উল্লা বিরোধী ছিলেন বলে "ধর্মবিদ্বেষী" সোভিয়েৎ আমান উল্লাকে যতখানি পারে সাহায্য করে—সেটা অবশ্য যৎসামান্য। কিন্তু তখন সোভিয়েৎ রাষ্ট্র মাত্র এগারো বৎসরের বালক। কম্যুনিস্ট বৈরীরা বলে, সোভিয়েৎ ইতিমধ্যে ধর্মবাবদে যথেষ্ট সহিষ্ণু হয়ে গিয়েছে, এমন কি প্রয়োজন হলে যাজক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আঁতাঁৎ করতেও এখন তার বিশেষ কোনো বাধা নেই। ইতালীর শান্ত সংযত কম্যুনিস্ট নেতা নাকি এ পথ সুগম করে দেন।

এ সব জল্পনা-কল্পনা যদি সত্য হয় তবে একটা অভিজ্ঞতা-জাত তত্ত্ব এস্থলে স্মরণে রাখা ভালো। কাবুল রাজদূতাবাসের একাধিক ইংরেজ কূটনীতিক আমাকে বলেন, আফগান ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়, বিদেশী কোনো রাষ্ট্রের মোটা রকমের মদৎ নিয়ে যিনিই এযাবৎ আফগান রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়েছেন, তিনিই আজ হোক কাল হোক জনপ্রিয়তা হারান এবং তাঁকে হটাবার জন্য নূতন ষড়যন্ত্র নূতন বিপ্লববাদীর অভাব হয় না। একটা প্যাসটাইম শেষ হতে না হতেই অন্য দুর্দৈবের কথা কল্পনা কবতেও আমাব মন বিকল হয়ে যায়। আমরা গরীব, আফগানিস্তান আমাদের চেয়েও নিঃস্ব। সেখানে অযথা শক্তিক্ষয় রক্তপাত সার্বিক দৈন্য বৃদ্ধি কবার জন্য গ্রহ কুগ্রহের যোগাযোগ।

ভারত একদা আফগানিস্তানের প্রতিবেশী ছিল, এখন নয়। সে স্বীকৃতি দিয়েছে একটিমাত্র বিষয় বিবেচনা করার পর। যে কোনো কারণেই হোক, তার বিশ্বাস হয়েছে সদব দাউদের গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টা সফল হবে। তদুপরি হয়তো বা কেউ কেউ বলবে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে যে বিলম্ব করেছিলে সেটাব পুনরাবৃত্তি করো না। ব্যক্তিগতভাবে আমি অন্তি অবশ্য বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানকে স্বীকৃতির ক্ষেত্রে একাসনে বসাই না, যদ্যপি আমি চিরকালই আফগানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। নীতির দিক দিয়ে, মানবতার দৃষ্টিবিন্দু থেকে বাংলাদেশের দাবী বহু বহু উচ্চে।

মিঃ ভুট্টো পড়েছেন ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে। ওদিকে মুর্শিদ নিকসনও "অসুস্থতা" ও ওয়াটার-গেট দুই গেরোর চাপে পড়ে সদর ভুট্টোর ভেট নামঞ্জুর করেছেন, এদিকে পাকদ্বেষী শিয়াবৈরী সদর দাউদ বড্ড বেশী মাত্রায় ভেট করতে চাইছেন যে।

রাজনীতি অবিশ্বাসে

ভারতের এক প্রাচীন রাজা তাঁর দেশের সর্বোত্তম চিকিৎসক, কামশাস্ত্রবিদ এবং রাজনীতিজ্ঞকে ডেকে বললেন, "তোমরা সবাই যে যার শাস্ত্রে পর্বতপ্রমাণ কেতাব-পুঁথির

১। ডঃ ইউসুফ বুদ্ধিজীবী ও রবিভক্ত। প্রধানমন্ত্রী হওযাব পরেব বৎসরই শান্তিনিকেতনে এসে কবির স্মৃতিব প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

যে সব কাঞ্চনজঙ্ঘা নির্মাণ করেছ সেগুলোতে আরোহণ করার প্রবৃত্তি এবং শক্তি আমার নেই। তোমরা তিনজন মিলে মাত্র একটা শ্লোকে আপন আপন বিদ্যে পুরে দাও। ঐ দিয়েই আমার কাজ চলে যাবে।" এস্থলে অক্ষম লেখকের সসঙ্কোচে নিবেদন, আসলে রাজা চার শাস্ত্রের চার সুপণ্ডিতকে ডেকেছিলেন, আমি চতুর্থ পণ্ডিতের বিষয়বস্তু তথা শ্লোকের চতুর্থাংশ বেমালুম ভুলে গিয়েছি। অতএব আশুতোষ ও অল্পতোষ পাঠককে বক্ষমাণ ত্রিলেগেডরেস দেখেই সন্তুষ্ট হতে হবে।

বৈদ্যরাজ তাঁর বরাদ্দ শ্লোকাংশে লিখলেন : 'জীর্ণে ভোজনং!' অর্থাৎ ইতিপূর্বে যা খেয়েছ সেটা হজম—'জীর্ণ'—হলে পর তবে 'ভোজনং' অর্থাৎ তখন খাবে। এই বিসমিল্লাতেই ডাক্তার এবং কবিরাজে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ডাক্তারের আদেশে, রুটিনমাফিক, পানকচুয়ালি, প্রতিদিন একই সময়ে ভোজনং! পক্ষান্তরে কবিরাজ বলেছেন, পূর্বাহ্নের পূর্বান্ন হজম হলে পর আপনার থেকেই ক্ষুধা পাবে, তখন খাবে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এটা ডাক্তারি প্রেসক্রিপশনের উল্টো বিধান। যেদিন শারীরিক পরিশ্রমের বাড়াবাড়ি সেদিন ক্ষিদে পায় তড়িঘড়ি। যেদিন কারফ্যুর কানমলার উঠান-সমুদ্র পেরোনো প্রাণের দায়, সেদিন ক্ষিদে পায় কি না পায়! অতএব পানকচুয়ালি ভোজন হয় কি প্রকারে? তদুপরি অদ্য-দিনের সুপার ডাক্তার রোগ ধরতে না পারলেই বলেন, নার্ভাস—একদা যেমন বলতেন এলার্জি। তা তাঁরা যা বলুন, যা কন—পাড়ার বারিক মালিক অবধি সব্বাই জানে, হৃদয়মন বিকল থাকলে ক্ষিদে পেট ছেড়ে মাথায় চড়েন।

মমেকসদয় পাঠক ঈষৎ অতিষ্ঠ হয়ে বলবেন, কোথায় কাবুলের হানাহানি আব কোথায় তুমি করছো ডাক্তার বদ্যি নিয়ে টানাটানি!

কনফেশন বা কৈফেয়ৎ

পয়লা কদম ফেলার নাম মকদ্দমা, এর হুবহু সংস্কৃত প্রতিশব্দ অবতবণিকা। মকদ্দমা বলতে আববীতে মামলা দায়েরেব পয়লা পর্ব—প্রিমা ফাসি কেস—বোঝায়। বাংলায় সাকুল্যে মোকদ্দমাটা বোঝায় এবং তারও বেশী আগা-পাশ-তলা মোকদ্দমা এবং তার সাথী আর পাঁচটা বিড়ম্বনা বোঝাতে হলে বলি, মামলা-মোকদ্দমা। 'ইতিহাসের দর্শন' শাস্ত্রেব আবিষ্কর্তা ইরন খল দুন তাঁব বিশ্ব-ইতিহাসের অবতরণিকা 'মুকদ্দমা'র জন্য বিশ্ববিখ্যাত।

আসলে যা বলার কথা সেটি মোকদ্দমাতেই বলে নিতে হয়। আমাবও "শাদীর পযলা রাতেই বেরাল মাবা" উচিত ছিল, অর্থাৎ বক্ষমাণ ধারাবাহিকের পযলা কিস্তিতেই। কিন্তু সে সময় ভাই-বেরাদর পাড়ার পাঁচো ইয়ার ছোঁক ছোঁক করছেন সদ্য সদ্য তাজা কাবুলি মেওয়া চাখবার তরে। আমার ফরিয়াদ শুনবে কে?

বাংলা দেশের পাঠক আমাকে চেনেন অল্পই। এব ভিতরে অনেকেই আবার আমাব উপর বাগত ভাব পোষণ করেন। মরহুম "পূর্ব পাকিস্তানের" সেকেন্ডারি বোর্ড আমার সর্বনাশকল্পে মল্লিখিত প্রথম পুস্তক থেকে তাঁদের স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থে বেপরোয়া ঝালে-ঝোলে-অম্বলে অর্থাৎ ক্লাস সিক্স থেকে ম্যাট্রিক অবধি দুপাঁচ পাতা তুলে দিতেন। আর কে না জানে, এনুয়েলের আজরাইল না আসা পর্যন্ত—রবি-কবির ভাষায়, "অপাঠ্য সব

পাঠ্য কেতাব সামনে আছে খোলা"—কোন্ মূর্খ পাঠ্যপুস্তককে পাঠের উপযোগী বলে মনে করে? বললে পেত্যয় যাবেন, "কাবুলিওয়ালা"র মত সরেস গল্প ক্লাসে পড়াতে গিয়ে আমি হিমসিম খেয়েছি? বরঞ্চ বাচ্চাটাকে জোর করে কুইনিন গেলানো যায়, কিন্তু জোর করে রসগোল্লা গেলাতে গেলে সে যা লড়াই দেয় তার সামনে যোদ্ধাও ভাবে মিঞা ওসমানীর জায়গায় একে জঙ্গীলাট বানালে নমাস আগেই স্বরাজ আসতো।

আমার লেখা ভালো না মন্দ তার সাফাই আমি গাইব কি? মোদ্দা কথা—আমার রচনা পাঠ্যপুস্তকে তুলে সেটা জোর করে জোরসে যাদের গেলানো হয়েছে তাদের বর্তমান আবাস ঢাকার ভিন্ন ভিন্ন হল-এ। সাধে কি আমি ওসব পাড়া এড়িয়ে চলি!

সূর্যসেন হল, বাপস! নব পরিচয়

তাই আমি নূতন করে আমার পরিচয় দিতে চাই। প্রায় বিশ বৎসর ধরে আমার লেখা এ দেশে পাওয়া যেত কালে কস্মিনে। ওপার বাংলা আমায় কিছুটা চিনেছে ঐ দুই দশক ধরে। "পূর্বদেশে"র বিজ্ঞপ্তি যে আমি সনাতন "আফগানিস্তান আজকের দৃশ্যপটে" ফেলে ধারাবাহিকভাবে লিখব, এ খবরটা যদি পাক-চক্রে সেখানে পৌঁছায় তবে ঘটিরা যে কী অট্টহাস্য ছাড়বে সে আপনারা হাইকোর্ট দর্শনে না গিয়ে স্রেফ বুড়ীগঙ্গার পারে বসেই ঘটিগঙ্গার জলমর্মরের সঙ্গে শুনতে পাবেন। ওরা এবং এ-পারে, বহু দূরের বগুড়াবাসীরা মাত্র গুহ্য তত্ত্বটি অবগত আছেন; পার্টিশেনের পরেই একটি বিশেষ দ্রব্য হেথাকার নওগাঁ থেকে চালান বন্ধ হয়ে যায়। ভদ্রলোকের ছেলে সরাসরি নওগাঁ যাই কি প্রকারে? তাই সেটাকে বগুড়াবাসের কামুফ্লাজে ঢেকে সেখানে ক'`ক মাস কাটাই। কিন্তু কপাল মন্দ। চীফ-সেক্রেটারী আজিজ আহম্মদ—আহা, কি 'আজিজ' প্যারা দোস্তই না পেয়েছিল মহাপুণ্যবান মরহুম পূর্ব পাকিস্তান—তিনি আমাকে হাতেব কাছে না পেয়ে লাগলেন আমার ইষ্টি-কুটুমের পিছনে। কিই বা করি তখন আমি আর? গুটি গুটি ফের কলকাতা। মেহেরবান আজিমুশশান আজিজ আহমদ খান জান-প্রাণ ভরে তসল্লীর ঠাণ্ডী সাঁস ফেললেন! পাকের চেয়ে পাক মশরিকী পাকিস্তানকে বরবাদ পয়মাল করার তরে যে বেদ-বখৎ হিন্দুস্থানী এসেছিল হেথায়, সে-ইবলিস গেছে! "জিন্দাবাদ সাহেবজাদ আজিজ" যদিও তিনিই পুব পাক বাবদে যে পাজ-সে পাক সব সে পহলী পালিসির (পলিসির খাঁটি আজিজী পাঞ্জাবী উচ্চারণ) পালিশ লাগিয়েছিলেন, তারই ফলে ডজন দুই বছর যেতে না যেতেই উপরকার দুই পাকের "ভাই বেরাদরী" ভণ্ডামির পলকা পলস্তরা উবে গিয়ে বেরিয়ে এল—গিল্টি, গিল্টি, নির্ভেজাল গিল্টি; আজিজের দুই চোখ, দিলজানের দুশমন রবিঠাকুরের কণ্ঠে তখন পাগলা মেহের আলীর চীৎকার "তফাত যাও, তফাত যাও। সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।"

ব্ এক্ গর্দিশে চর্খ-ই-নীলুফরী
ন্ আজিজ বজ্-আমদ ন্ নাদরী।

"সুনীল নীলাম্বুজের ন্যায় গভীর নীলাকাশ একটি বারের মত পরিবর্তিত হইয়াছে কি, না—নাদির এমন কি তাহার নাদরী হুকুম পর্যন্ত লোক পাইল"—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ। আমি শুধু প্রথম "নাদিরে"র স্থলে আজিজ লোকটাকে দিয়ে নাম

Birchandra State Central Library, Agartala, Acc. No. 19102
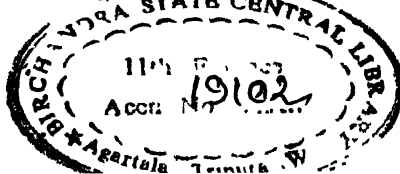
পরিবর্তন করেছি; স্বাধিকারপ্রমত্ত আজিজ "চোটাওয়ালা" নাদিরের মত ফরমান ঝাড়তেন বলে "নাদরী"র পরিবর্তন করার প্রয়োজন বোধ করি নি।

মেহেরবান সম্পাদক, অকারণ অকৃপণ অভাজন-অনুরক্ত পাঠক, আজ যদি প্রাণ খুলে দুটি মনের কথা কই তবে অপরাধ নিয়ো নি। সিকি শতাব্দী ধরে ট্যা-ফুঁ-টি করার উপায় ছিল না। ওপার বাংলাতেও না। এপারে যে আমার শতাধিক প্রিয়ের চেয়ে প্রিয়তর জন রয়েছে।

আচ্ছা, সে নয় আরেকদিন হবে।

গঞ্জিকা মিশ্রণ

নওগাঁয়ের সেই বিশেষ বস্তুটির সঙ্গে 'গুল' যোগ করে যে অনির্বচনীয় রস তৈরী হয় আমি তারই রাজা—গুলম্‌গির। আলম্‌গিরের ওজনে টায় টায়। এর পুরো ইতিহাস বারান্তরে।...নিতান্তই কপালের গেরো, গ্রহের গর্দিশে আমি দু'পাঁচজন গুণীর সংস্রবে একাধিকবার আসি। তাদেরই ঝড়তি পড়তি মাল নিজের নামে চালিয়ে বাজারে কিঞ্চিৎ পসার হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃত অবিমিশ্র সত্যঃ—গুরুগম্ভীর তত্ত্ব বা তথ্য ভেজাল না দিয়ে পরিবেশন করাটা আমার ধাতে সয় না, স্যাকরা যেমন আপন মায়ের জন্যে গয়না গড়ার সময়ও সোনাতে খাদ মেশাবেই মেশাবে। আমি উভয় বাংলার ক্লাউন ভাঁড়। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, সার্কাসের ক্লাউন হরেক বাজীকর, প্রত্যেক ওস্তাদের কিছু-না-কিছু নকল কবতে পারে। আম্মো পারি।

অতএব প্রকৃত চাণক্য, আজকের দিনের রাজনৈতিক ভাষ্যকার আলাস্টের কুক-এর অনুকরণে আমি অতি যৎসামান্য কিছু বলতে গেলেও তার সঙ্গে গাঁজাগুল মিশে যায়। আমি মূল বক্তব্যে নিজেকে কিছুতেই সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারিনে। কবিত্ব রস রক্তে থাকলে বলতুম, নাক বরাবর মোকামের দিকে হনহন করে না এগিয়ে মোকা বেমোকায় আকছারই পথের দু'পাশে নেমে ফুল কুড়োই, প্রজাপতি-স্পন্দন ভ্রমর গুঞ্জনে বার বার মুগ্ধ হয়ে হঠাৎ দেখি, তপ্তদিনের শেষে মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গিয়েছে—এবং মন্‌জিলে মা দূর আস্ত্‌। পথের পাশেই ঘুমিয়ে পড়ি। পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, এ তাবৎ বাঘ সিঙ্গির পেটের ভিতর যাই নি। সেই কুড়োনো ফুলের দু'চারটে পাঠকের সামনে অবরে সবরে পেশ না করতে পারলে আমার মেজাজ খাট্টা হয়ে যায়।

কামশাস্ত্রে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত লিখলেন, "তন্বী সকাশে মৃদ্বাচারী" অর্থাৎ তন্বীশ্যামা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী তথা সর্বনারীজনকে মৃদু-আচারে জয় করবে। জর্মন দার্শনিক বলেছেন, "নারী সকাশে গমনকালে বেত্রদণ্ডটি নিয়ে যেতে ভুলো না—ফেরগিস ডি পাইট্‌শে নিস্ট্‌"; প্রাগুক্ত কাম-পণ্ডিতের একদম বিরুদ্ধ বাণী, বিরুদ্ধ উপদেশ। আমার কোনো মন্তব্য নেই। আমি হাড়আলসে জড়ভরত। তাই বেকার বখেড়া না বাড়িয়ে স্ত্রী-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি।

রাজনীতিবিদ পণ্ডিত দুটি শব্দেই মোক্ষমতম তত্ত্ব "রাজনীতিতে অবিশ্বাস" প্রকাশ করলেন। অর্থাৎ রাজনীতির আগাপাস্তলা অবিশ্বাসে গড়া।

রাজনীতিতে অবিশ্বাস নয়, অবিশ্বাসে রাজনীতি।

আমান উল্লা অবিশ্বাস দিয়ে কর্মারম্ভ করে থাকলেও আখেরে নীতিভ্রষ্ট হয়ে রাজ্য খোয়ালেন।

নাদির শাহকে নির্বাসনে পাঠালেন। কিন্তু সসম্মানে। অর্থাৎ ফ্রান্সের রাজদূতরূপে। দারাপুত্রকে জামিনস্বরূপ কাবুলে আটকে রেখেছিলেন কি না, সেটা গুরুত্বব্যঞ্জক। আমি কাবুলে রাজগোষ্ঠীর অনেক বালক-কিশোরকে চিনতুম। বেশ ক'জন আমার ছাত্র ছিল। কিন্তু জহির খানের কথা একবারও শুনিনি। হয়তো বা কয়েক বৎসর পর নাদির যখন রাজদূত-কর্মে ইস্তফা দিয়ে প্যারিসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন তখন স্বভাবজাত কোমল-হৃদয় আমান উল্লা নাদিরের দারা-পুত্রকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, কিংবা হয়তো গোড়ার থেকেই আটক রাখেন নি।

একটা কথা এখানে ভালো করে মনে গেঁথে নিতে হয়। নাদির ফ্রান্সে পৌঁছেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধজয়ী মার্শাল পেতাঁ এবং স্যাঁ সির-এর ফরাসী অফিসারদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেন এবং আমি লোকমুখে শুনেছি, নাদির পেতাঁতে দিনের পর দিন বিরাট মিলিটারী ম্যাপ খুলে যুদ্ধবিদ্যা অধ্যয়নে নিমগ্ন হতেন। একদিন আমান উল্লা তখ্‌ৎ হারাবেন আর তিনি স্বদেশ জয় করার জন্য লড়াই লড়বেন, এহেন আকাশ-কুসুম তিনি তখন চয়ন করেছিলেন কি না, সে তথ্য নির্ধারণ করবে কে? প্রবাদ বাক্য আছে, "ভাগ্যলক্ষ্মী" কোনো না কোনো সময়ে হাতে একটা সুযোগ নিয়ে প্রতি মানুষের দোরে এসে আগল ধরে নাড়া দেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখেন, তাঁর কৃপাধন্য জন সে সুযোগের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে রাখে নি। নাদির অতি অবশ্যই ব্যত্যয়!....একদিন ফ্রান্সে খবর পৌঁছল আমান উল্লা তখ্‌ৎ হারিয়ে দেশত্যাগী হয়েছেন। নাদির তদ্দণ্ডেই স্বদেশমুখী হলেন। কিন্তু তিনি অর্থ-হীন, অস্ত্র-হীন। কি করে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করলেন সে ইতিহাস দীর্ঘ। ভারতে তখন আমান উল্লার প্রতি মাত্রাধিক সহানুভূতি। নাদির কিন্তু আমান উল্লার পক্ষে না বিপক্ষে সে সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। তিনি বললেন, "প্রথম কর্তব্য, ডাকু বাচ্চা-ই সকাওকে খেদানো; তখন দেখা যাবে।" তাবপর "আফগান জনসাধারণ" তাঁকে সিংহাসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালে তিনি স্বীকৃত হলেন। অবশ্য একথা সত্য, তখন তখ্‌তের জন্য অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। বসুন্ধরা বীরভোগ্যা; যদিও এস্থলে অবান্তর, তবু বহুজনহিতায় বলে রাখা ভালো, উপস্থিত তিনি তদ্বীরভোগ্যা।

প্রেসিডেন্ট দাউদ খান কিভাবে "নির্বাচিত" হয়েছেন সেটা সম্পূর্ণ অবান্তর। কিন্তু তাজ্জব মানতে হয়, অবিশ্বাস-শাস্ত্রে অবিশ্বাসী হলেও জহির শা'র নিরেট অতি-বিশ্বাসের আহাম্মুকী দেখে। তিনি কি আদৌ জানতেন না, দাউদ খান কতখানি শক্তিশালী? সেটি তো পরিষ্কার বোঝা গেল একটি মাত্র সাদামাটা তথ্য থেকে : ইহসংসারে আর কোন্ কু দে'তার নায়ক চব্বিশ ঘন্টার ভিতর কিংবা অল্পাধিককালের মধ্যে প্রথম স্বীকৃতি লাভ করার পব ঢাউস ধামা নিয়ে বসতে পেরেছেন স্বীকৃতি লাভের কামতরুতলে। পটাপট পড়তে লাগলো দুনিয়ার গোটা গোটা মোটা সরেস সরেস সব মেওয়া—কাবুলী মেওয়াকে সঙ্গে দেবার তরে, একটা হপ্তা ঘুরতে না ঘুরতে! এস্তেক অভিমানভবে, গোসসা করে কমনওয়েলথ বীবীকে তিনতালাক দেনেওয়ালা হী-ম্যান, হজরত আলীর তরবারি নামধারী অপিচ বাংলা-দেশকে-মেনে-নিতে-নিতান্তই-লজ্জাবতী নখ্‌রা রাণী সদ্‌র-ই-আলা আগা-ই-আগা মুহম্মদ জুলফিকার আলী ভুট্টো।

সু-উচ্চ স্বীকৃতিতরু শাখা থেকে তাঁর বাং-মাছ-পারা মোচড়-খাওয়া পতনভঙ্গির রঙ্গটা দেখতে আমার বড়ই সাধ যায়।

অবিশ্বাসস্য পুত্রা

মিস্টার ভুট্টোর অত্যধিক ভয় পাবার এখনো কোনো কারণ নেই। রুশ, মার্কিন, চীন, ইরান সবাই যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকে এবং মল্লভূমিতে সুদ্দুমাত্র সদর দাউদ পাকিস্তানের সদর ভুট্টোর মোকাবিলা করেন তবে ভুট্টোর বিশেষ কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আমি কোনো স্ট্যাটিসটিক্‌সের উপর নির্ভর করে এই ভাগ্যফল গণনা করিনি। ধরে নিলুম, দুই মল্লবীর লড়াই লাগার পর তাঁদের আপন আপন দেশে যা অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যবল আছে তাই নিয়ে লড়ে যাবেন। কোনো পক্ষই বিদেশী কোনো রাষ্ট্রের কাছ থেকে একটি কানাকড়ি কিংবা ডাড বুলেটও পাবেন না। জানি, আজকের দিনে এ রকম একটা ভ্যাকুয়ামে দুই পক্ষ বেশী দিন লড়তে পারবেন না। মার্কিন, রুশ, চীন—তিন রাষ্ট্রই যে বিশ্বের একচ্ছত্রাধিপত্য চান এ রকম একটা সিদ্ধান্ত কেউই কসম খেয়ে করতে পারবেন না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ তত্ত্বটা স্বীকার করে নিতেই হবে যে, এই তিনজনের প্রত্যেকেই প্রতিদিন ঘামের ফোঁটায় একে অন্যের কুমির দেখেন। মাঝরাতে হঠাৎ রাশা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে বসে ককিয়ে ওঠে, "ঐয্-যা! মার্কিন ব্যাটারা বুঝি কাম্বোজ গিলে ফেললে! হুঁ, কাল আবার রিপোর্ট পেয়েছি, মার্কিন মুর্গীটা এক ঝটকায় আরও এক ডজন এটম বম পেড়েছে। একুনে তা'হলে কত হল? আমার ভাঁড়ারে ক'টা?" মার্কিন ঐ একই দুঃস্বপ্ন দেখে, "বলশি ব্যাটারা যে বড্ড বেশী গুড়ি গুড়ি জাপানের সঙ্গে দোস্তী করার তরে এগোচ্ছে। আর মাটির তলায়, কিংবা ঐ বহুদূর আর্কটিকের সমুদ্রগর্ভে যদি এটম বম ফাটায় তবে হেথায় কি সেটা যন্ত্রপাতিতে ধরা পড়বে? হুঁ, সত্যি বটে বাবাজী ব্রেজনেফ এসেছিলেন বোষ্টমের নামাবলী পরে, বাজালেন শ্রীখোল, কিন্তু, দাদা কিসিংজার, ভুলে যেয়ো না, মাইরি, শ্রীযুত মলটফও বৈষ্ণবতর চন্দনের এ্যাব্বড়া তিলক কপালে এঁকে ঘোরতর-শাক্ত শ্রীহিটলারের সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ করতে এসেছিলেন শ্রীবৃন্দাবন—বার্লিন কুঞ্জে। ফলং? সর্বশেষ ফল হিটলারের গোটা মুল্লুকসুদ্দু গেলেন টেঁশে!" চীন কি স্বপ্ন দেখে তার ছোট্ট একটি নমুনা বলে গেছেন সাধনোচিতধামপ্রাপ্ত জওয়াহির লাল। চীন নেতা নাকি তাচ্ছিল্যিভরে বলেছিলেন, "লড়াইয়ের নামে শিউরে উঠবে তোমরা, এরা-ওরা, আর-সব্বাই—সে তো বাংলা কথা! কিন্তু আমি ডরবো কোন্ দুঃখে! দু'পাঁচ কোটি মরে গিয়ে তোমরা সবাই যখন চিৎপটাং, তখনো আমার আরো ক'কোটি রেস্ত থাকবে, হিসেব করে দেখেছো? দুনিয়াটা দখল করতে তখন আমাদের গাদা-বন্দুকটারও দরকার হবে না।" জাপানও যে কোনো স্বপ্নই দেখছে না, কে বলবে? কুল্লে দুনিয়ার "ত্রাহি ত্রাহি" চিৎকার বেপরোয়া ডোন্ট-কেয়ার করে ঐ যে হোথা ফ্রান্স পরশুদিন এটম বম ফাটালে, সেটা কি খয়রাতি হাসপাতাল খোলার হুলুধ্বনি?...অবিশ্বাস অবিশ্বাস, সর্ব বিশ্বে অবিশ্বাস! "শৃন্বন্তু বিশ্বে অবিশ্বাসস্য পুত্রা—"

অসকার ওয়াইল্ড্ বলেছেন, "আমাদের প্রত্যেকেরই বেশ কিছু বেকার বাজে জিনিস আছে যেগুলো আমরা স্বচ্ছন্দে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি, কিন্তু ভয়, পাছে কেউ

কুড়িয়ে নেয়।" আফগান দেশে মাইলের পর মাইল শুধু পাথর আর পাথর, কিংবা সিন্ধু দেশে বালি আর বালি; কিন্তু হলে কি হবে, আমি—মার্কিন যদি দখল না করি তবে বলশি ব্যাটা যে নেবে না, তারই বা কি পেত্যয়? ইন্ডিয়াই বা কোন্ তক্কে তক্কে আছে কে জানে? এই হল বিশ্ব ভুবনের শঙ্কা, বিভীষিকা।

অতএব এটা নিতান্তই কল্পনা-বিলাস যে, দাউদ খান আর ভুট্টোর ব্যারিস্টারে রোঁদের পর রোঁদ লড়ে যাবেন আর দুনিয়ার কুল্লে নেশন রাস্তার ছোঁড়াদের মত শুধু হাততালি দিয়েই মজাটা লুটে নেবেন। কথাটা খুবই খাঁটি কিন্তু এই কল্পনাবিলাসেও সুদ্দুমাত্র যে আকাশ-কুসুম চয়ন করা হয়, তা নয়। বিজ্ঞানীরা বিস্তর এক্স্পেরিমেন্টে প্রথম ভ্যাকুয়ামে সফল হলে পরে স্বাভাবিক বাতাবরণের প্রভাবদুষ্ট অবস্থায় অর্থাৎ রুশ-মার্কিন-ইন্ডিয়া-ইরানের আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির মৎলবের মাঝখানে—সেই এক্স্পেরিমেন্টের পুনরাবৃত্তি করে প্রত্যক্ষ ফল লাভ করেন।

যদিস্যাৎ

ভ্যাকুয়ামের লড়াইয়ে ব্যারিস্টারের বিশেষ ভয় পাবার কিছু নেই।

ধরে নিলুম, দাউদ খান প্রধানতঃ রুশ বা/এবং যে-কোনো জাতের কাছ থেকেই হোক অস্ত্রশস্ত্র যা কিছু জমায়েৎ অবস্থায় পেয়েছেন তথা জহির শাহ্ চল্লিশ বছর ধরে যা-সব কিনেছিলেন তাই নিয়ে নামলেন লড়াইয়ে। মোল্লাদের হুকুমে সেপাই পেতেও অসুবিধে হবে না। আর সরাসরি হুকুমটাও গৌণ—শোর-বাজার বারণ না করলেই হল। আসল যে যুক্তি শাহী ফৌজকে অনুপ্রাণিত উদ্বুদ্ধ করবে, তার দিল্ জানে জোশ পয়দা করবে সেটা অতি অবশ্যই—লুট করার সম্ভাবনা কতখানি? আফগান সরকার সেপাইদের যে কি মাইনে দেন সে আমার জানা আছে। পূর্বেই ধরে নিয়েছি অন্য কোনো রাষ্ট্র সদর্ দাউদকে কোনো অর্থসাহায্য উপস্থিত করবে না। আর করলেও যা হবে সেটা আমরা বিলক্ষণ অনুমান করতে পারি। ইনফ্লেশন। আঁৎকে উঠলে নাকি, সোনার বাংলার পাঠক? সিঁদুরে মেঘ দেখতে পেলে নাকি? কিন্তু পাঠান এই সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি চেনে না।

ইনফ্লেশন

ঈষৎ অবান্তর হলেও, পাঠক, তুমি উপকৃত হবে। বিশেষ উপস্থিত আমরা যখন কাবুল-পেশাওয়ার নিয়ে আলোচনা করছি। আমার জানা মতে যে মহাপুরুষ এ ভূখণ্ডে সর্বপ্রথম ইনফ্লেশন নামক গজব্টা অনুমান করতে পেরেছিলেন তিনি বাবুর বাদশা। হিন্দুস্থান জয় করার পর বাবুর বাদশার আমিররা কাবুলে ফিরে গিয়ে লুট-তরাজে বিস্তর যে-সব ধন-দৌলত জমা করেছিলেন সেগুলো দু'হাতে ওড়াবার জন্য বাবুরের কাছ থেকে বিদায়ের অনুমতি চাইলেন। তিনি বিস্তর যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে হিন্দুস্থানের মত ঐশ্বর্যশালী বিরাট রাজত্ব ত্যাগ করে কাবুল-কান্দাহারের মত নির্ধন দেশে ফিরে যাওয়াটার মত আহাম্মুকী তাঁর কল্পনাতীত। আমিররা পণ ছাড়েন না। শেষটায় তিনি যা বললেন (আমি স্মৃতি থেকে বলছি, পাঠক "বাবুরনামা"তে পাবেন) তার বিগলিতার্থ :

'ধরুন, এখন কাবুল-বাজারে দৈনিক ওঠে এক হাজার আণ্ডা। আপনার বিস্তর টাকা-কড়ি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই তো সেখানে তিন হাজার আণ্ডা হাজির হবে না। কাবুল এবং তার আশেপাশের শক্তি তো আর রাতারাতি বেড়ে যেতে পারে না। আপনারা একে অন্যের সঙ্গে লড়ালড়ি করার ফলে আণ্ডার দাম তখন যাবে চড়ে। যে আণ্ডা আগে এক পয়সা দিয়ে কিনতেন সেটা কিনবেন এক টাকা দিয়ে, যে গালিচা কিনতেন একশ' টাকা দিয়ে সেটা কিনবেন এক হাজার টাকা দিয়ে। লাভটা তা হলে কি হল? আগে যেরকম আমোদ-আহ্লাদ করতেন এখনও করবেন ততখানিই। মাঝখানে শুধু কাঁড়িকাঁড়ি মোহর দিনার ঢালাই হবে সার।'

অবশ্যই আমিররা এই সূক্ষ্ম অর্থনৈতিক তত্ত্বটির কানাকড়িও বুঝতে পারেন নি। তাঁরা যে শেষ পর্যন্ত বাবুর বাদশাকে বর্জন করে কাবুল চলে যান নি তার অন্য কারণ ছিল। কিন্তু আমিরদের দোষ দিলে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে। দুষ্টলোকে বলে বাংলাদেশে এখন ইনফ্লেশন। কেনবার জিনিস নেই, ওদিকে নোটের ছয়লাপ, ইনফ্লেশন হবে না তো কি, আসমান থেকে মন্না সলতা ঝরব? আমি নিজে জানি নে। মার্কিন মুল্লুকে তো কোনো দ্রব্যের অভাব নেই তবে ডলার মার্কেটের ধাক্কায় বিশ্বজোড়া ধুন্দুমার লেগে গেছে কেন? একাধিক গুণী বলছেন, নিক্সন কর্ণধার হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে ইনফ্লেশন, অবশ্য আমাদের তুলনায় ধূলি পরিমাণ এবং অর্থশাস্ত্রের প্রাচীন অর্বাচীন ডাঙর ব্যাঙ্কার প্রফেসার বাণিজ্যের কর্ণধার সব্বাই বলেছেন, এ-ইনফ্লেশনের কারণ এবং দাওয়াই যে মুনি বাৎলাতে পারবেন তিনি অর্থশাস্ত্রের ইতিহাসে অজরামর হয়ে বিরাজ করবেন।

দুশমন বাইরে না ভিতরে

মোদ্দা কথায় ফিরে আসি।

কবে সেই ১৯৫৩ থেকে দাউদ খান দাবী জানাচ্ছেন, ফ্রনটিয়ার এলাকাকে স্বায়ত্তশাসন দাও, আর (হিটলারি কায়দায়) আমাকে দাও খাইবার পাস পেরিয়ে করাচী অবধি একটা করিডব। আমাদের একটা বন্দর না হলে চলবে কেন? পাঞ্জাবীরা বুদ্দু। তারা তখন চাইলে না কেন, খাইবার গিরিপথের পশ্চিম মুখ থেকে কাবুল অবধি একটা কবিডব? কাবুলের গাছ-পাকা আঙুর, আপেল, নাসপাতি, জরদ-আলু, আলু বালু, শফৎ-আলু, গেলাস, চিলগুজা বাদাম, আখরোট আপন হাতে পেড়ে পেড়ে না খেলে তাদের গায় গত্তি লাগবে কি করে? স্বাস্থ্য বরবাদ হয়ে যাবে না? ইয়ার্কি পেয়েছ?

দাউদ পাকিস্তানকে আক্রমণ করবেন সঠিক কোথায়? বেলুচিস্তানের চমন অঞ্চলে না খাইবার পাস অঞ্চলে—না উভয়তঃ? হিটলারের পয়লা নম্বরী ট্যাঙ্ক সাঁজোয়া গাড়ি পর্যন্ত রাশার দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে করতেই ঘায়েল হয়ে যেত। হ্যাঁ, এখানে অত দূরের পাল্লা নয়। কিন্তু ট্যাঙ্কগুলোও তেমন সরেস নয়। আর রাস্তার চওড়াই? না, ওসব কোনো কাজের কথা নয়। বোমারু প্লেন? হঃ! ইয়েহিয়া পূর্ব পাক হারালো, তবু জাবড়ে ধরে রইল তার প্লেনগুলো।

ফ্রন্টিয়ার নো-মেনস-ল্যান্ডের পাঠানদের লেলিয়ে দেওয়া যায় না?

লুটতরাজ কোন অবস্থায়, কাকে করা যায়, কাকে করা যায় না, সেটা পুরুষানুক্রমে

করে করে পাঠান এ বিষয়ে পৃথিবীর সেরা স্পেশালিস্ট। টিক্কা খান কিভাবে নিরীহ, নিতান্ত নিরস্ত্র বেলুচের উপর বেদরদ বে-এক্তিয়ার কায়দায় বোমা ঝরাতে পারেন সে তো তারা বেলুচিস্তানে পাহারা দেবার সময় স্বচক্ষে দেখেছে, এবং এই বাংলাদেশেও তারই মদদে তারা লুট করার সময় পাঞ্জাবীদের খুব একটা পিছনে ছিল না। তার আখেরী নতীজা কি হয়েছে, সেটা ফ্রন্টিয়ারের পাঠানরা অবগত হয়েছে।

হিটলার বার বার তাঁর জেনারেলদের বলতেন, অত সতর্ক হয়ে পা টিপে টিপে রুশ দেশে অভিযান চালাবার কোনো প্রয়োজন নেই। ঐ রুশ দেশটা হুবহু একটা ঝুরঝুরে কুঁড়েঘরের মত, দরজাটার কাঠও পচাহাজা। মারো জোরসে বুট দিয়ে গোটা দুই লাথি। হুড়মুড়িয়ে বেবাক ঘর ধুলায় ধুলিসাৎ।

রাশার বেলা রোগ নির্ণয়ে হিটলার গোভলেট কবেছিলেন।

ব্যারিস্টার ভুট্টোর পশ্চিম-পাক বাড়িটা দেখে সক্কলের মনে কিন্তু, কিন্তু-কিন্তু নাও হতে পারে।

পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়—টীকা

জন্মের দিনই মানুষের নামকরণ হয় না, কিন্তু প্রবন্ধ লেখার প্রারম্ভেই শিবনামা একটা না দিয়ে উপায় নেই। এ সুবাদে কবিগুরুর একাধিকবার বলা বিশেষ একটি মন্তব্যের কথা মনে পড়ল। তদুপরি বাইশে শ্রাবণ আসন্ন। প্রাচীন দিনের কথা।...১৯২১ সাল। রবীন্দ্রনাথ তখন 'ষাট বছরের যুবক'। পূর্ণোদ্যমে বিশ্বভারতীয় সদ্যোজাত কলেজ বিভাগে ক্লাস নিতেন। নিজের কবিতা উপন্যাস এবং তাঁর প্রিয় ইংবেজ কবি শেলি কীটসের লিরিক। পাঠক হয়তো লক্ষ্য করেছেন, 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে কবিতাগুলোর কোনো শিরনামা নেই। তিনি নিজের থেকেই বললেন, কবিতায় শিরনামা পড়ে পাঠক ধরে নেয়, গোটা কবিতাটা বুঝি ঐ নামটা সার্থক করার জন্যই লেখা হয়েছে। তা তো নয়। কবিতা যখন উৎস থেকে বেরিয়ে যাত্রাপথে নামে তখন আপন গতিবেগে চলার সময় শিরনামার প্রতি দৃষ্টি রেখে সোজা পথে এগিয়ে যায় না। সে ডাইনে বাঁয়ে বাঁক নিয়ে নিয়ে তার নতুন নতুন রূপ দেখায়। (এই ভাবাংশটুকু কবি গানে বলেছেন, "নতুন নতুন বাঁকে বাঁকে গান দিয়ে যাই ধরিত্রীরে/পাতার ভেলা ভাসাই নীরে")। মিস্‌রির সুতোটা থাকে চিনির টুকরোর ঠিক মাঝখানে। তাই বলে সুতোটারই সব চেয়ে বেশী প্রাধান্য তো ধরেই না, ঐ সুতোটার অস্তিত্ব সার্থক করার জন্য মিস্‌রি আপন সত্তারও বিকাশ করে না। কবিতার বেলা তারও বেশী। কবিতা তার শিরনামার চতুর্দিকে ঘোরপাকও খায় না।'

বলা বাহুল্য, আমি জরাজীর্ণ ছলনাময়ী স্মৃতিব উপর নির্ভর করেই কবির বক্তব্যের নির্যাস নিবেদন করলুম। খোজা সম্প্রদায়ের লোক "জামাৎ-খানায়" তাদের 'নামাজ' শেষ করার পর যে রকম বলেন, 'ভুলচুক, মৌলা, বখ্‌শো' আমিও উন্নাসিক পাঠকের কাছে নিবেদন জানাই, ভুলচুক যা হয়েছে বখশিশরূপে মাফ করে দিয়ো।

কিন্তু 'বলাকা'র পরের কাব্য-গ্রন্থ "পলাতকা"য় কবি পুনরায় শিরনামা দেবার প্রথায় ফিরে গেলেন। বোধ হয়, নামের পবিবর্তে কবিতাতে অঙ্ক-শাস্ত্রসুলভ নম্বর লাগালে সেটা অপ্রিয় দর্শন তো হয়ই, তদুপরি এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না যে,

কোনো কোনো কবিতার শিরনামা আমার মত কবিত্বরসবঞ্চিত পাঠককে কবিতাটির মূল বক্তব্য বুঝে নিতে সাহায্য করে—অবশ্য তাবৎ কবিতাতেই যে মিস্‌রির সুতোর মত একটা মূল সূত্র থাকবে এহেন ফৎওয়া কোনো আলঙ্কারিকই এ-তাবৎ কবিকুলের স্কন্ধে চাপাননি।

বক্ষ্যমাণ ধারাবাহিকের জন্মদিনেই একটা নাম, নিতান্তই দিতে হয় বলে প্রথম লেখার কপালে সেঁটে দিয়েছিলুম। আজ তার ষষ্ঠী—যাকে আমার দেশে "ছটি", উত্তরবঙ্গে বোধ হয় "ষাইটলা" না কি যেন বলে। এদিনে অন্তত নামটা সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলতে হয়।

আসলে "পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়" বাক্যটি একটি ফরাসী প্রবাদ বাক্যের আবছায়া অনুবাদ। "প্ল্যু সা শাঁজ, প্ল্যু সে লা ম্যাম শোজ"—"যতই সে নিজেকে বদলায়, ততই তার মূলরূপ একই থাকে"—যতই তার 'পরিবর্তন' হয় না কেন, ততই ধরা পড়ে, 'সে অপরিবর্তনীয়'। এটাকেই অন্যভাবে বলা হয়, 'ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্তি করে।" তার অর্থ যতই ভিন্ন দেশে ভিন্ন বেশে কোনো একটা ঘটনা ঘটুক না কেন, আখেরে ধরা পড়ে, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই ঘটনাটা এমন কিছু সৃষ্টিছাড়া নতুন নয়। তাই এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক দাদা আদমের আমল থেকে আজ পর্যন্ত এই বিরাট বসুন্ধরা খুঁজে বেড়ান 'প্যাটার্নের' সন্ধানে। যেমন কাশ্মিরী শালে আমের প্যাটার্ন পশমের উপর সোনার জরি দিয়ে করা, বানারসী কিংখাপে সেই প্যাটার্নই রেশমের উপর রূপোর জরি দিয়ে করা, রাজশাহীর আম-সন্দেশে সেই প্যাটার্নই স্রেফ ছানা চিনি দিয়ে গড়া। মালমশলা যাই হোক, নির্মিত ও বস্তুটির চেহারাটি একই। খোল নলচে যতই পালটান— যেই হুঁকো সেই হুঁকো। কিংবা বলতে পারেন, একটা পশম আরেকটা রেশম—হরেদরে হাঁটুজল। কিংবা বলতে পারেন, পাড়ার মেধো ওপাড়ার মধুসূদন। কিংবা—না থাক!

যাত্রারম্ভেই বলে রাখা কর্তব্য, আমি কট্টর মোল্লাকুলজাত পাতি মোল্লা। আমার পূর্ব-পুরুষ ছিলেন রাজহাঁস, আমি ভাগ্যবিপর্যয়ে পাতিহাঁস। প্যাটার্ন হরেদরে একই। আমার পক্ষে মোল্লাদেব নিন্দাকীর্তন, যে-শাখায় বসে আছি তারই মূল কর্তন। আমি অত পাঁড় কালিদাস বা শেখ চিল্লী নই। তা সে যাই হোক, মূল কথা এই, আফগানিস্থানের ইতিহাস মোল্লা-মৌলবী ভিন্ন কল্পনা করা যায় না।

আমির হবীব উল্লা মোটের উপব সুখেই রাজত্ব করছিলেন কিন্তু কেন জানি নে, শেষের দিকে হঠাৎ তাঁর শখ গেল বিলিতি কায়দা-কানুন অনুকরণ করতে। খুব সম্ভব তাঁর এবং রাজপরিবারের দু'একজন রোগীকে বিলিতি ডাক্তার সারিয়ে দিয়েছিল বলে তাঁর বিশ্বেস জন্মে, বিলিতি আব পাঁচটা রীতিনীতি আমদানি করলে গোটা দেশটার ধন-দৌলত বেড়ে যাবে। সাধারণ জন ভাবে, আমান উল্লাই বুঝি সর্বপ্রথম বিলেত-পাগলা রোগে আক্রান্ত হয়ে রাতারাতি দেশটাকে গোবাসায়েব বানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বস্তুত দু'একটা ব্যাপারে তিনি আমান উল্লারও এক তলা উপরে বসে বসে বিলিতি খুশবাই-বিলাস উপভোগ করতেন। হবীব উল্লার হারেমটি ছিল বাছাই বাছাই সুন্দরীতে ভর্তি। কুল্লে আফগানিস্তানের তাবৎ কর্ত্তমের তরো-বেতরো পরী হুরী দিয়ে তিনি হারেমটিকে করে তুলেছিলেন বহু বৈচিত্র্যময় গুল-ই-বাকাওলীর গুলিস্তান। জানি নে, কি করে তাঁর নজরে পড়ে, রাশান ব্যালে নর্তকীদের কিছু ফটোগ্রাফ এবং রঙ্গিন ছবি। বড়ই পছন্দ হল তাঁর হাঁটুর ইঞ্চি ছয় উপর হঠাৎ যেন ছেঁটে দেওয়া সাতিশয় শর্ট স্কার্ট। হারেমের

অপেক্ষাকৃত তরুণীর পালকে তিনি সেই বেশে সাজিয়ে দিয়ে এক অজানা-অচেনা ভিনদেশী আনন্দদায়ী চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করলেন।

হারেমের ভিতর কি হয় না হয় সে নিয়ে মোল্লা সম্প্রদায়ের মাথা ঘামাবার কথা নয়। কিন্তু তবু এই বিজাতীয়বেশ—বেশাভাবও বলা চলে—উৎকট পল্লবিত বর্ণনাসহ তাঁদের কানে পৌঁছল। মোল্লাদের ভিতর রাজদ্রোহী মনোভাব দেখা দিল। সেইটেই প্রথম উস্কিয়ে দিয়ে নস্‌র উল্লা হয়ে গেলেন তাঁদের প্রিয়পাত্র। বহু বিচিত্র কৌশলে আমান উল্লার মাতা নস্‌রকে হটিয়ে করে দিলেন আমান উল্লাকে তাঁদের প্যারা। আখেরে হবীব উল্লা আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান।

আমান উল্লাও ঐ একইরূপে রাজ্য হারালেন। তাঁর মাতা, অসাধারণ বুদ্ধিমতী রমণী গোড়ার থেকেই বাবাজীকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন, 'আর যা করবার করিস, বিলিতি সং সাজিসনি।" হবীব উল্লাকে তাতিয়েছিল ছবি, ফোটো; আমান উল্লাকে খেপিয়ে দিল বিলিতি সিনেমা। কাবুলের সিনেমা হলে আমি যে সব রদ্দি ছবি দেখেছি সেগুলোর অনেকগুলো সে আমলে তো নয়ই, এ আমলেও বোধ হয় উভয় বঙ্গের সদাশয় সেন্সর দেখবারই সুযোগ পান না। মঞ্জুর না-মঞ্জুরীর কথাই ওঠে না। প্যারিসের বুলভার, লন্ডনের পিকাডেলি সার্কাসের স্বপ্ন দেখেছিলেন, আমান বিলেত যাবার পূর্বেই। আচম্বিতে বাস্তবে নেমে মালুম হল, সিংহাসন নেই, তিনি পিতৃনগর কান্দাহারের পথমধ্যে দাঁড়িয়ে।

যুবরাজ ইনায়েৎ রাজা হলেন। একে তো তখ্‌ৎ তাঁর ন্যায্য সম্পত্তি, তদুপরি তিনি শবিয়তের এমন কোনো বিধান ভঙ্গ করেন নি যে তাঁর বাদশা হতে কাবো কোনো আপত্তি থাকার কথা। কিন্তু শোর বাজারের হজরৎ বাজী হলেন না। ইনায়েৎ উল্লাকে কিন্তু তখ্‌ৎ-মূল্‌ক ত্যাগ করে বিদেশে চলে যাবার অনুমতি দেওয়া হল। তিনি প্লেনে চড়ার সময় স্বয়ং শোর বাজার এ্যারপোর্টে হাজির ছিলেন। সে প্লেন আকাশে অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হজরৎ রানউয়ের উপর দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে আজান দিলেন। সময়টা কোনো নমাজের আসন্নকাল নয়। আজানটা প্রতীক; "আফগানিস্থান থেকে কুফ্‌রের শেষ চিহ্ন ঝেঁটিয়ে বের করা হল।" আমার ভালো লাগে নি।

সেই প্যাটার্নের পুনরাভিনয় হল চুয়াল্লিশ বৎসর পর। সদব দাউদ সিংহাসনচ্যুত জহির পরিবারের অধিকাংশ জনকে প্লেনে কবে বিদেশ চলে যেতে দিয়েছেন। বিবেচনা করি, এবারে কোনো আজানধ্বনি উচ্চারিত হয় নি। এই যা তফাৎ! এই তফাৎটুকু থাকাতেই "পরিবর্তন"টা চোখে আঙ্গুল দিয়ে "অপরিবর্তনীয়ে"র দিকে নির্দেশ দিল। প্ল্যু সা শাঁজ—ইত্যাদি।

রিপাব্‌লিক!

বাংলাদেশ ভারত উভয়ই দাউদী সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—আপনার আমার বলবার আর কি থাকতে পারে, কিন্তু ঐ রিপাবলিকের ঢেঁকিটা গিলতে আমি অক্ষম এবং অনিচ্ছুক। বলা নেই, কওয়া নেই, কাবুলীর সেই কাঁঠাল-খাওযার কাহিনী থেকে কাঁঠাল বের করে অকস্মাৎ আমার মাথায় ফাটানো! কবেকার সেই ১৯৩০।৩১ থেকে অদ্যাবধি কেউ তো কখনো রিপাবলিকের কথা পাড়েনি। সর্দারদের সবাইকে জিরোতে দিয়ে রাজা জহির যখন খানদানী ফিউডেল

ঐতিহ্য ভঙ্গ করে গেরস্ত ঘরের ছেলে ডকটর ইউসুফকে প্রধানমন্ত্রী করলেন তখন তো রাজা দেশটাকে গণতন্ত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন—কই, তখনো তো কেউ রিপাবলিকের কথা তোলে নি! দাউদও ইউসুফকে মদদ দেবার তরে হিন্দুকুশ উত্তোলন করেন নি। তিনি উষ্মাভরে গোসসা ঘরে ঢুকে খিল দিলেন—গোড়াতে। পরে কি কি করলেন সেইটেই তো বিশ্ববাসী জানতে চায়। জানবে নিশ্চয়ই, একদিন।

রিপাবলিক, জমহুরিয়া যে নামে খুশী ডাকুন, পুরানো সেই হুঁকোটা এখন অবধি সেই ডাবা-হুঁকোটাই রইল।

শ্রাবণ হয়ে এল ফিরে

হঠাৎ শেষরাত্রে নামল আধো-আধো বৃষ্টি—রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্। সঙ্গে সঙ্গে পুরবৈয়া হাওয়া জানলাব পর্দাটাকে যেন নৌকোর ঝুলে-পড়া পালটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে করে দিল পূর্ণাঙ্গী। মাঝে মাঝে বারিপতন ক্ষান্ত দিচ্ছে, কিন্তু পুরবৈয়া হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদূর দক্ষিণ সমুদ্র থেকে, তরঙ্গিত নদীধাবার ঢেউয়ে ঢেউযে দোলায় দোলায় যে-বাতাস উত্তর পানে পাড়ি দিয়েছে মানস সরোবরেব তীর্থযাত্রায়—সে আমারই বাড়ির এক কোণে বেণুবনে পুরুবৈয়া হাওযাকে, গত বর্ষাব দীর্ঘ বিরহের পর ঘন ঘন আলিঙ্গন করছে। বেণুবনের পাতায় পাতায় মৃদু কূজন-গুঞ্জন-মর্মব আমার মর্মে যেন বিলোল হিল্লোল তোলে ক্ষণে ক্ষণে। দক্ষিণ হাওয়া বইতে শুরু কবেছিল মৃদু মৃদু, ভযে ভয়ে, কবে সেই শীতের শেষে। হিমালয়ের হিমানী মাখা নিষ্ঠুর শীতল উত্তবে হাওয়ার সঙ্গে লড়াই দিতে গিযে সে ভীরু হার মেনেছিল প্রথম অভিযানে—হুহু করে আবার দীনদরিদ্রেব সর্বাঙ্গে কাঁপন তুলে ধেয়ে গিয়েছিল উত্তরী-হাওয়া দক্ষিণ থেকে দক্ষিণতর দিকে, যেন পলাতক দখিন হাওয়ার বর্জিত রাজ্যে সম্মার্জনী সঞ্চালন কবতে করতে। দখিন হাওয়া কিন্তু মনে মনে সান্ত্বনা মানে; জানে, একা সে-ই ভীরু নয়, তার চেয়েও ভীরু আছে, একটি ক্ষুদ্র পুষ্প—মাধবী। উত্তরের বাতাসকে শেষ অভিযানে সম্পূর্ণ পরাজিত করে আবার সে যখন বনে বনে আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে ডালে ডালে তার বিজয় পতাকার কুসুম-কুসুম গরম পরশ বুলিয়ে দেবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠবে পারুল পলাশ পারিজাত, করবী দেবে সাড়া, বকুল পাবে ছাড়া, শিরীষ উঠবে শিউরে, চমকি নয়ন মেলি চামেলি রইবে তাকিয়ে, অপলক দৃষ্টিতে। তবু ভীরু মাধবীর দ্বিধা যায় না, দখিন পবনের প্রতি-বিজয় অভিযানের পরও, আঙ্গিনায় এসে যেন থমকে দাঁড়ায়—কিন্তু ঐ ভীরুটি, ঐ শঙ্কিতা-হিয়া কম্পিতা-প্রিয়া না এলে তো উৎসব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। গেয়ে ওঠে সবাই সমস্বরে :

> হে মাধবী, দ্বিধা কেন,
> আসিবে কি ফিরিবে কি—
> আঙ্গিনাতে বাহিরিতে
> মন কেন গেল ঠেকি।।

দেখেছি, দেখেছি, সব দেখেছি যুদ্ধশেষের প্রথম বসন্তে।

দখিন বাতাস বসন্তে ঘুরে মরে একা একা। তারপর আকাশের শুরু হয় গুরু গুরু—

গ্রীষ্মের দহন দাহ সাঙ্গ হয় যখন। নেমে আসে বারিধারা আর তখন বায়ু বয় পুরবৈয়া। দুই পবনে ঐ বেণুবনে হয় তাদের পুনর্মিলন।

অমা যামিনীর অন্ধকার। পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা ছিন্ন করে আর কোনো শব্দ নেই—শুধু মৃদু ঝর্ঝরে ক্ষণে ক্ষণে বরিষণ—রিম ঝিম রিম ঝিম। কখন যে বর্ষণ শান্ত হয় বুঝতে পারি নে। বাঁশের পাতার ভিতর দিয়ে পুব-দক্ষিণের বাতাস তোলে একই মর্মর ধ্বনি। এবারে এসে দেখি প্রতিবেশী তাঁর অশথ গাছটাকে কেটে ফেলেছেন। অশথের পাতা বাতাসে অতি সামান্য আভাস পেলেই আমাকে শোনাতো সারা দিনমান যেন ঝরণার গান। বাঁশবনের চেয়েও তার পল্লবে পল্লবে হিল্লোলে হিল্লোলে থরথর কম্পন দিয়ে ক্ষীণ বারিষণ ধ্বনির অনুকরণ করে রুদ্র তৃষা-তপ্ত বৈশাখের দ্বিপ্রহরে, নিদ্রাহীন ত্রিযামা যামিনীতে পীড়াতুর জনকে ঐ অশথ অকারণ ছলনা দেয় বার বার। এখানে নয়, বীরভূম, ছাপরা, আগ্রা, দিল্লীতে যেখানে দিনের পর দিন পুরোপুরি গ্রীষ্মকাল কাটে তাম্রসম বিবর্ণ আকাশ-বাতাসের মাঝখানে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে নিরম্বু নিরাশায়—তারপর আসে ধূসর পয়োধরহীন আষাঢ়, জনপদবধূ তাকিয়ে যাকে মায়ামমতাহীন দিকচক্রবালের দিকে, আসে শ্রাবণ—কোথায় সে বিরহী যক্ষের মেঘ-শ্রেণী যার দাক্ষিণ্য কঠিন পাষাণপ্রায় অম্বরকে মধুর মেদুর করে দেবে?—এমন সময় বাতায়নপাশে, মৃদু পবন যখন অশথ-পল্লবে মর্মরধ্বনি তুলে বর্ষণের ঝিরিঝিরি রব অনুকরণ করে ধ্বনি-মরীচিকার নিষ্ঠুর মোহজাল পেতে কাতরজনকে ছলনা করে, তখন কবিগুরুর সর্বশেষ কবিতা আসে স্মরণে, তার পরিপূর্ণ রুদ্র অর্থ নিয়ে—

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ কবি বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে সরল জীবনে।"

থাকুন দিল্লী, আগ্রা, দূরেই থাকুন তাঁদের বিরাট সৌধ বিপুল বৈভব নিয়ে। আর, আব ঐ 'মিথ্যা বিশ্বাসের বিচিত্র ছলনাজাল' নিয়ে। আমার এখানে, এই নির্ধন দেশে, সেই সুধাধারা আবার আসুক, আষাঢ় আকাশ ছেয়ে, এসো বৃষ্টিব সুবাস বাতাস বেয়ে।

আর আমাব দুই আঁখি যাক হারিয়ে সজল ধারায় ঐ ছায়াময় দূরে, ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে, ভরা গাঙের কূলে কূলে, দেশ থেকে দেশান্তবে, হয়তো বা জরাজীর্ণ এ জীবনের শেষপ্রান্তে।

ঐ নেমেছে; এবারে কিন্তু ঝমাঝম বিষ্টি। বিষ্টি আর বিষ্টি। বেণুবনমর্মর, ছিন্ন কদলীপত্রের ঝর্ঝর সব ছাপিয়ে দিয়ে। এবারে আর কোনো ছলনা নয়। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, মেঘ-ভাবে নুয়ে পড়া আকাশ নীরন্ধ্র অন্ধকারে বিলুপ্ত হয় নি। আমারই মত নিদ্রাহীন চোখ নিয়ে রাজপথের যামিনী-জাগরিণী দিবান্ধ প্রদীপমালার বিচ্ছুরিত জ্যোতি আকাশের নিম্নপ্রান্তে আতাম্র আরক্ত মৃদু প্রলেপ দিয়ে আলোকিত করে রেখেছে। গ্রামাঞ্চলে দূব ভিন গাঁয়ে আগুন লাগলে যে রকম তার লালচে আভা পশুপক্ষীর প্রাণেও আতঙ্কের সৃষ্টি কবে।

হ্যাঁ, আতঙ্ক। হিটলারও এই রকমেরই অনৈসর্গিক চন্দ্রালোকের বিবরণ শুনে শঙ্কাতুর কণ্ঠে শুধিয়েছিলেন, "কৃত্রিম চন্দ্রালোক? সে আবার কি?"

নিত্য দিনের প্রথানুযায়ী দ্বিপ্রহরে সামরিক মন্ত্রণাসভার দিবসের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়েছে। পশ্চিম-উত্তর রণাঙ্গনে মন্‌ট্‌গমেরি তখন হল্যান্ডের ভিতর দিয়ে হামবুর্গ

পানে এগোচ্ছেন। সে রণাঙ্গনে শত্রু-মিত্রের অগ্রগতি, পশ্চাৎ অপসারণ, তাদের বর্তমান ঘাঁটি ইত্যাদি সর্বশেষ প্রতিবেদন বলে যাচ্ছেন বিরাট ম্যাপে অঙ্গুলি নির্দেশ করে করে আঞ্চলিক এ্যাদদার্কা। বলতে বলতে তিনি উল্লেখ করলেন, 'অতিশয় অন্ধকার রাত্রি। এ রাত্রে মন্ট্‌গমেরীর পক্ষে আক্রমণ করা অসম্ভব। হঠাৎ বিরাট রণাঙ্গন আলোকিত হল কৃত্রিম চন্দ্রালোকে—'

বিস্মিত হিটলার এ্যাদ-এর কথা মাঝখানে কেটে দিয়ে শুধোলেন, "কৃত্রিম চন্দ্রালোক! সে আবার কি?" ধূম্রজাল, কুয়াশা বহুকাল ধরে রণ-কৌশলে সুপরিচিত কিন্তু কৃত্রিম চন্দ্রালোক!

এ্যাদ : "পূর্বেই বলেছি, রাত্রি ছিল অত্যন্ত অন্ধকার। অমাবস্যার রাত্রেও নুয়ে-পড়া রাশি রাশি মেঘ না থাকলে নীরন্ধ্র অন্ধকার সৃষ্টি হয় না। মেঘগুলো ছিল তুষার ধবল। মন্ট্‌গমেরি এ্যারপ্লেন-অন্বেষণকারী সব কটা সার্চলাইট মেঘের উপর তাগ্ করতে আদেশ দিলেন। সার্চলাইটের তীব্র রশ্মি মেঘে মেঘে প্রতিবিম্বিত হয়ে অত্যুজ্জ্বল যে-আলো সৃষ্টি করলো সেটা মেঘমুক্ত পূর্ণিমার মত।"

এখানে বর্ষা নামে তার ঘনতম ঘনাবরণে। মাঝে মাঝে পশ্চিম থেকেও বৃষ্টি আসে—সে বৃষ্টি অতিদূর আরবসাগর থেকে বেরিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে দুর্বল হয়ে যায়। তাই বিরহী যক্ষ যে-রামগিরি জনকতনয়াব স্নান-পুণ্যোদকে অভিষিক্ত হয়েছিল তারই উপরে দাঁড়িয়ে মেঘপুঞ্জকে অনুরোধ কবেছিল, 'আমার বিরহবার্তা নিয়ে তুমি, হে মেঘ, অলকায় গমন কবে আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করো। কিন্তু আমি জানি, তুমি দয়াশীল, দাতা। যে-সব ভূখণ্ডের উপব দিয়ে তুমি ভেসে যাবে সেগুলি নির্মম গ্রীষ্মের অত্যাচারে বিবর্ণ শুষ্ক দগ্ধপ্রায়। কাতর নয়নে জনপদবধূ উর্ধ্বে তোমার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করবে, বারিধারা ভিক্ষা চেয়ে। আমাব অনুরোধ, নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করো না, বিবহিণী প্রিয়াকে আমাব সন্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত।'

যে শ্যামাম্বুরাজি যক্ষেব কাতবতা শুনতে পায়নি তারা অলকার দিকে না গিয়ে মধ্যভারত, যুক্তপ্রদেশ, বিহার রাঢ়ভূমিতে বিগলিত আত্মদান করতে করতে যখন দীর্ঘ যাত্রাশেষে এই পুণ্যভূমিতে পৌঁছয়, তাদের সঞ্চয় সেকালে প্রায় নিঃশেষ! কিন্তু, ভো ভো বর্ষণ-ক্লান্ত মুসাফিব! আমবা অল্পেই সন্তুষ্ট। যৎ অল্পং তদ্ মিষ্টং। তোমার পদধ্বনি পূর্বাঙ্গণে, পূর্বদেশে নন্দিত হোক।

ঐ, ঐ যে বৃষ্টি আসে মুক্ত কেশে, আঁচলখানি দোলে। বাতাসে বাতাসে বর্ষণসিক্ত সজলভরা কণ্ঠে ভেসে আসছে ভোরের আজান। সাধ যায়, এই বর্ষণমুখরিত নগরীর উপকণ্ঠ পেরিয়ে দেখে আসি, বুড়ীগঙ্গায় কতখানি জল বাড়লো।

না, আমাকে কেউ যেতে দেবে না। এ বয়সে। বয়সের শেষে।

মনে পড়ল এক জাপানী কবির করুণ শেষ প্রশ্ন। ক্ষয়রোগে তিনি যাত্রার শেষপ্রান্তে প্রায় পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁর জীবনেব সবচেয়ে বড় আনন্দ ছিল, প্রতি বৎসর বাতায়নপাশে বসে অবিরল বরফপাত দর্শন। ববফ জমে উঠছে, মাঠে-ঘাটে-বাটে, জমে উঠছে, জমে উঠছে। তিনি দেখছেন, আর দেখছেন।

কিন্তু এবারে তুষার-বর্ষণ দর্শনার্থে তাঁর বিছানাতে উঠে বসাও কঠিন বারণ। মাঠ-বাট দেখতে পাচ্ছেন না। জাপানী তিন কলির হাইকাই পদ্ধতিতে রচা তাঁর শেষ কবিতা রেখে গেছেন তিনি :—

শুধায়েছি বার বার, কত বার!
হায়, শুধু প্রশ্ন—এ আমার,
এবারেতে কত উঁচু হয়েছে তুষার?

হাউ অফটেন,
হ্যাভ আই আসক্‌ট
হাও হাই ইজ দি স্নো ঃ?

ডানপিটে দুঁদে

একাধিকবার পরাজিত হয়ে জহীর উদ-দীন মুহম্মদ বাবুর মনস্থির করলেন, আপন পিতৃভূমি ফরগনা 'পীর মানে না দেশে দশে, পীর মানে না ঘরের বউয়ে', নীতি অবলম্বন করে তাঁর প্রকৃত মূল্য নিতান্তই যখন সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো না, তখন ভাগ্যান্বেষণে দেশান্তর অভিযানই প্রশস্ততর। এ-যুগে কিন্তু, কি তুর্কমানিস্থান কি আফগানিস্থান সর্বত্রই ভাগ্যান্বেষণকারীর সংখ্যা কমে আসছে। তার প্রধান কারণ, সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে হলে যে গুণটি মাত্রাধিক, অপর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজন তার নাম আত্মবিশ্বাস। এ-যুগের সবচেয়ে নাম-করা এডভেনচারার আডলফ হিটলারেব চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক, কূটনৈতিক, সংগ্রামবিদ, মনস্তাত্ত্বিক, অতিশয় সীমিত সংখ্যক তাঁর অন্তরঙ্গ জন এ্যাদ-দর্কা সেক্রেটারি স্টেনো পরিচাবক ভ্যালে—এমন কি তাঁর বৈরীকুল পর্যন্ত এক বাক্যে তাঁর সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন সেটি তাঁর আত্মবিশ্বাস। তাঁর অবিচল সদাজাগ্রত প্রত্যয় ছিল, নিয়তি (প্রভিডেন্স) তাঁকে নির্বাচিত করেছেন, জর্মানির ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্য। পরাজয়ের পর পরাজয়, পুনরপি পরাজয়,—তথাপি তাঁর আত্মবিশ্বাস এবং সর্বশেষ সংগ্রামে তিনি বিজয়ী হবেনই হবেন সে প্রত্যয় দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে চলছিল তাঁর জীবনান্ত পর্যন্ত। তাঁর অতিশয় অন্তরঙ্গ, নিত্য সহচরণ বিস্মিত অবিশ্বাসের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, তাঁব কল্পনাপ্রসূত স্বকৃত অনৈসর্গিক আত্মবিশ্বাসের এই ইন্দ্রজাল। বস্তুত তিনি ঠিক কোন্ মুহূর্তে পরাজয় স্বীকার করে আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হলেন সেটা চিরকালই অভেদ্য রহস্য থেকে যাবে।. জহীর উদ্-দীন বাবুরের আত্মবিশ্বাস হিটলারের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। কিন্তু বাবুরের সহচরদের মধ্যে সে আত্মবিশ্বাসের প্রতিনিয়ত বর্ধমান দার্ঢ্য লিপিবদ্ধ করার মত লিপি-কৌশলী কেউই ছিলেন না, অপরঞ্চ বাবুর অতিশয় সযত্নে রোজনামচার মাধ্যমে তাঁর আত্মজীবনী রেখে গিয়েছেন; ওদিকে হিটলার এ ধবনের "অপকর্ম" রীতিমত বিপজ্জনক বলে মনে কবতেন এবং তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস ছিল, "যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা একান্ত একা-একাই করে, সফলতা কামনা করতে পারে একমাত্র সেই-ই"।

দলপতি মাত্রই আর্টিস্ট্

এই সব এডভেনচারারদের সম্বন্ধে এতখানি সবিস্তর লেখার কারণ এই যে, পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় এ ধরনের লোক এখনও লুপ্ত হন নি। এঁদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ওয়াকিবহাল

হতে হলে এঁদের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করতে হয়। এডভেনচারার হওয়া মাত্রই এঁদের সর্বপ্রথম কর্ম হয় সাঙ্গোপাঙ্গ যোগাড় করা। ঐতিহাসিক মাত্রেরই বিস্ময়ের অবধি নেই, চব্বিশ বছরের "অপদার্থ" যে-ভ্যাগাবন্ড স্বদেশ অস্ট্রিয়া ত্যাগ করে ম্যুনিকে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর যে পূর্ববৎ আশ্রয়-সম্বলহীন ট্র্যাম্প, সে কি করে তার চতুর্দিকে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে হরেক রঙের চিড়িয়া যোগাড় করে ফেলল? এবং সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়, তার ভিতর ছিলেন সে যুগের দুই নম্বরের জঙ্গীলাট জেনারেল লুডেনডর্ফ। অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, আমরা যে "আত্মবিশ্বাস" নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছি, দ্বিতীয় পর্যায়ে পাই তারই বাহ্য প্রকাশ। এখানে দুঃসাহসিক ভাগ্যান্বেষীকে আর্টিস্ট রূপে আত্মপ্রকাশ করতে হয়। আর্টিস্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ঋষি তলস্তয় বলেছেন, "যে ব্যক্তি আপন অনুভূতি অন্যজনের ভিতর সঞ্চারিত করতে পারে সে আর্টিস্ট।" হিটলার তাঁর আত্মবিশ্বাস যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নর-নারীতে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে সঞ্চারিত করবার মত অলৌকিক শক্তি ধারণ করতেন সে সত্য তাঁর নিকটবর্তী প্রচ্ছন্ন শত্রুরা পর্যন্ত নিরতিশয় ক্ষোভ ও উষ্মার সঙ্গে স্বীকার করেছেন...বাবুরের সে টেকনিক বিলক্ষণ আয়ত্তাধীন ছিল, তদুপরি ভাগ্যান্বেষণেব অরুণোদয় থেকেই তাঁকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে হয়েছে। অসিহস্তে অশ্বপৃষ্ঠে বণাঙ্গনে যেখানেই সঙ্কটময় অবস্থা সেখানেই তিনি নির্ভয়ে তীরবেগে উপস্থিত হযেছেন, যে কারণে একাধিক পরাজযের পরও দূরদর্শীজন তাঁকে পরিত্যাগ কবে নি।

সাবধান! ভেজাল চিনে নেবেন!

অদ্যকার ভুট্টো, ইরানেব শাহ—বাবুরের তুলনায় শিশু। নিতান্তই যোগাযোগ এবং হতবুদ্ধি মজ্জমান জুন্তার শেষ ত্রাণ-তৃণ-খণ্ডরূপে প্রথম জনের কর্তৃত্ব লাভ, দ্বিতীয়জনও দ্রুতবেগে পলাযনের পর অবশেষে রুশের সদয় নিরপেক্ষতা ও ইংরেজের প্রতি নতিস্বীকার, এই দুই গ্রহের যোগাযোগেব ফলে আপন পূর্ব সত্তায় প্রত্যাগমন। আমাব মন লয, কৈশোরে চতুরঙ্গ খেলায় গজচক্র অশ্বচক্র বড়েচক্র পুনঃ পুনঃ ঢেঁকিবৎ ভক্ষণ করার পর, আপন আপন দেশে যখন গেলবার মত আর কোনো ঢেঁকি কোনো চাষী বউই তামাশা দেখবার তরেও দিতে রাজী হল না, তখন দুজনাই সহজতর কূটনীতি-চতুরঙ্গ-অঙ্গনে রঙ্গ-ব্যঙ্গে সঙ্গ দিলেন।—একে অন্যকে।

নিক্সন আর পাঁচটা ভুঁইফোঁড় মার্কিনের মত 'খানদানী মনিষ্যিদত্ত' বাদশাহী হাতের পিঠ চাপড়ানোটা পাবার তরে হামেহাল বড্ডই ছোঁক ছোঁক করেন। তদুপরি, আড়াই-তিন হাজাব বছরের প্রাচীনস্য প্রাচীন রাজসিংহাসনে আসীন—জানি নে, হয়ত কুল্লে দুনিয়ার প্রাচীনতম মনার্কি, যদ্যপি বর্তমান শাহটির পিতামহ প্রপিতামহের প্রস্তাব তুলছিনে—সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ কবলে শাহ-ইন-শাহের অনুগতজন অকস্মাৎ সাময়িক স্মৃতিস্তম্ভন বা আংশিক বধিরতায় আক্রান্ত হন। সর্বোপরি প্রশ্ন, দেড় হাজার বছরের প্রাচীন পেহলভি (সংস্কৃতে পহ্লবী) খেতাব হঠাৎ করে ভুড়ভুড়ি দিয়ে উঠলো. কোন্ রসাতল থেকে? একদা যে রকম তারই অক্ষম অনুকবণে গওহরী মহিমায় আড়াই-তিন হাজার বছরের পুরনো গান্ধার (প্রাচীন পেশাওয়ার জালালাবাদ অঞ্চল) ফান্দার আমাদের মত গাঁইয়া বেকুবদের চমক লাগবার তরে মরা লাশে ভূতের মত চাড়া দিয়ে

উঠেছিল? এর খাতিম উল্‌খিতাব হয়, যদিস্যাৎ অকস্মাৎ সদর-ই আলা ভুট্টো তাঁর এলাকার পঞ্চ সহস্রাধিক বর্ষীয় মোন-জো-দড়োর বলদ-মার্কা সীল সেঁটে কিছু একটা পাঁচহাজারী মনসব তলব করে তাবৎ পাপী-তাপী-পাকীজনকে শরীফ উল্‌আশরাফ খানদানে তুলে নেন।

প্রাণনাথ ডাকো

শ্রুতিধর পাঠক! অস্বীকার করতে পারবে না, এই মাত্র সেদিন আমি তোমাকে ফেয়ার ওয়ার্নিং দিয়েছি, গুলতানী না করতে পারলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। এবং আপসোসের কথা, বর্তমান গুলটি খুব সম্ভব তোমার ন'সিকে চেনা। কিন্তু পাঠক, আমরা সব্বাই চেনা জন, চেনা জিনিসকেই কি বেশী পছন্দ করি নে? মেলায় গিয়ে চেনা জনের মুখ খুঁজি, অচেনা লাইব্রেরীতে ঢুকলে তার দাম যাচাই করি চেনা বইয়ের সন্ধান নিয়ে, গোরস্তানে খুঁজি মরহুমদের চেনা নাম। তবু অতি সংক্ষেপেই সারছি। বাঙ্গাল গেছে শেয়ালদ বাজারে ঘটির তরকারি পট্টিতে। "বাইগনের সের কত?" ঘটি হেসে কুটি কুটি। "বাইগন! কি কইলে মাইরি!" বাঙ্গাল—চটিতং : "ক্যান, কইছি তো কইছি, অইছে কি?" ঘটি : "ছোঃ! কিবা নাম, বাইগন! বেগুন—আহা, কী মিষ্টিই না শোনায়!" বাঙ্গাল—উচ্চহাস্যে : "হঃ। মিষ্টি নামেই ডাকবা তয় 'প্রাণনাথ' ডাকো না ক্যান? স্যার কত প্রাণনাথের? ডাঙ্গব ডাঙ্গব প্রাণনাথ গুলাইন?"

শাহ্, গওহর, গদ্দিটা আবেকটু দড হলে মিস্টার ভুট্টোও—সবাই এ নীতিতে আমাগো "প্রাণনাথ নীতি"র প্রবর্তক প্রাণনাথ বাঙ্গালের অতিশয় অনুগত বশম্বদ শাকরেদ। "খানদানী খেতাবই যদি লইবা, তয় লওনা কইলজাডা ভইরা পুরানার পুরানা, হিডারও পুরানা খানদানী খেতাব।" হিটলারও বলেছেন, "মিথ্যে যদি বলতেই চাও তবে পাতি মিথ্যে বলো না। বলো প্যাঁড় মিথ্যে—ইয়াব্বড়াবড়া কেঁদো কেঁদো মিথ্যে। মিথ্যেটা যত বিরাট কলেবর হবে, পাবলিক গিলবে সেটা তত সহজেই।"

নিক্সন শাহ-এর মেহেরবানী পেয়ে বে-এক্তেয়ার। কোন্ চাঁড়াল বামুনের হাতে দৈবযোগে পৈতে পেলে—বুদ্দু জানবে কি করে, বিটলেটা খাঁটি নদীযার মাল, না জিঞ্জিরা-মার্কা ভেজাল—উল্লাসে নৃত্য ভরে ধানের মরাই খুলে দেয় না? অবশ্য নিক্সনের মুক্ত হস্তে ট্যাঙ্ক, প্লেন ঢালার অন্য কারণও আছে। কিন্তু তাঁব গোড়ার গলদ, শাহকে একটা মস্ত বড় এডভেনচারার বলে ধরে নেওয়া।...বরঞ্চ সদর দাউদের যা-হোক তা-হোক একটা ক্যালিবার আছে। লোকটা এডভেনচারার এবং গ্যামবলার। অসম্ভবের আশায় তিনি সম্ভাবনীয়টাকে বাজী ধরতে রাজী আছেন।

ঐতিহাসিক দাবী

এবারে আমি যা বলতে যাচ্ছি, সেটা কোনো ঠাণ্ডা-মগজের লোক বিশ্বাস করতে চাইবে না। কিন্তু যে সত্য আমাব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ, যে সত্যের সমর্থন আমি দীর্ঘকাল ধরে পেয়ে এসেছি সেগুলো এই দাউদ-সুবাদে আমাকে বলতে হবে। বিশ্বাস না করলে কারো কোনো ক্ষতি হবে না।

(১) ১৯২৭ সালের গ্রীষ্মকালে আফগান স্বাধীনতা দিবসে (জশন্-এ) জনগণ তথা কাবুলস্থ সর্ব রাজদূতের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য গণসভায় আমান উল্লা ঘন ঘন করতালি হর্ষধ্বনির মাঝখানে নানা কথার মাঝখানে সদম্ভে সগর্বে বলেন, "সিকন্দর শাহ্ পাঞ্জাব জয়ের পর বিরাট ভারত দখল না করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলো কেন? কারণ, আমরা—আফগানরা—তার "লেজ কেটে দিয়েছিলুম' বলে", অর্থাৎ আফগানরা আলেকজান্ডারের লাইন অব কম্যুনিকেশন কেটে দিয়েছিল! বিগলিতার্থ : আফগান জাত সিকন্দর-বিজয়ী।

(২) আফগানিস্থানের প্রাচীন ইতিহাস কোনো আফগান লিখেছেন কি না জানি নে। যে অর্বাচীন ইতিহাস কাবুলের ইস্কুল কলেজে পড়ানো হয় তার পনরো আনা, ভারতের গবেষণা-জাত ভারতে লিখিত ইতিহাস থেকে আফগানাংশ কেটে বের করে, আফগান জাতির গৌরব-গরিমা শতগুণ বৃদ্ধি করে স্থূল হস্তে প্রলেপ লাগানো দম্ভোক্তি।

(৩) সাধারণ আফগান নিরক্ষর। কাবুল কান্দাহারের স্কুলবয় 'সে ইতিহাসের' দুপাতা পড়ে বিশ্বাস করে, ভারতে ইংরেজাধিকার না হওয়া পর্যন্ত ঐ ভূখণ্ড ছিল আফগানিস্থানের কলোনী, জমিদারী—যা খুশী বলতে পারেন। মোদ্দা কথা : মুহম্মদ ঘোরীর আমল থেকে, বিনয় যাদের ভূষণ নয়, তাদের মতে গজনীর মাহমুদের কাল থেকে ইংরেজ কর্তৃক পাঞ্জাব বিজিত হওয়ার প্রাক্কাল পর্যন্ত আফগানিস্তান হিন্দুস্থানের উপব রাজত্ব করেছে, সাতশ', মতান্তরে হাজার বৎসর ধরে। হ্যাঁ, কোনো কোনো আফগন রাজা দিল্লী আগ্রায় কিছুকাল বাস করেছেন বটে। যদি বলা হয়—আর বলবেই বা কোন্ উন্মাদ—বাবুর তো তুর্কোমান, তিনি তো পাঠান বা আফগান নন, তবে অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও সরল উত্তর : বাবুর ছিলের কাবুলের বাজা। সেই কাবুল-রাজ দিল্লী জয় করেন। কিন্তু মৃত্যুর সময় আদেশ দেন, তাঁর মৃতদেহ যেন তাঁর "রাজধানী" কাবুলে গোর দেওয়া হয়। এর পর আর কি প্রমাণ চাই? বাবুব যে কাবুলের রাজা ছিলেন, সেটা তো তর্কাতীত! পরের মীমাংসাগুলো প্রথম সিদ্ধান্ত থেকে পিলপিল কবে বেবোয়।

(৪) ইংরেজ কর্তৃক ভারত শাসন একটা অতি আকস্মিক অতিশয় সাময়িক দুঃস্বপ্ন মাত্র। আফগানিস্থান পুনরায় তার হক্কের উপনিবেশ জয় করবে। ঘোরী. গজনবী, লোধী (লোদী) এ সব কওম, তাদের বাসভূমির নাম, এখনো কাবুলে নিত্যদিনের কাজকর্মে কথাবার্তায় ফিরে ফিরে আসে; হিন্দুস্থানে এ সব ইতিহাসের শুষ্কপত্রে মুদ্রিত নামমাত্র। সরকারীভাবে প্রচারিত পাকিস্তানই বা কি, আর ভারতই বা কি, আর বাংলাদেশই বা কি? আসলে সব কটা মিলে ওটা অখণ্ড হিন্দুস্থান (ভারতের কট্টর সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এতচ্ছ্রবণে অবশ্যই নিরতিশয় উল্লাস বোধ করবেন!)। সেইটে আমাদের প্রাপ্য।

(৫) সরদার দাউদ খান কাবুলের ওয়ারিসানের এই "অতিশয় সীমিত বিনয়ভবে" দাবী-দাওয়ায় কতখানি বিশ্বাস করেন, জানি নে, কিন্তু তিনি যে-দশ-বৎসর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সে সময় স্বাধীন, বিকল্পে আফগানিস্থানেব প্রদেশরূপে পখতুনিস্তান এবং পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে করাচী অবধি করিডরের (পুবোপাক্কা সবকারী ওয়াবিসান) সূত্রে পুনঃপুনঃ দাবী জানিয়ে তথাকথিত ইতিহাসপুষ্ট স্কুলবয়দের ড্যাম ফেবারিট হয়েছিলেন সেটা সর্ববাদীসম্মত। সে সব বয়-রা এখন 'ইসটুডিনট' এবং ফৌজী 'আপিসর'—এরাই নাকি দাউদের প্রধান সহায়ক।

আমি জানি, আসমুদ্রহিমাচল আফগানের এই দাবী, গৃহে প্রত্যাবর্ত আবুহোসেনের

তখ্‌ৎ দাবীর মত বুদ্ধির অগম্য, হাস্যস্কর বলে মনে করবে। অ হলে স্মরণ করিয়ে দিই প্রায় একশ বছর ধরে তৎকালীন ভারত-রাজ ইংরেজের সমুখে কাবুল রাজ কখনো লাহোর মূলতান কখনো পেশাওয়ার আটক্ অবধি দাবী করেছেন। ইংরেজের কাছে তখন ঠিক আজকের মত ঐ রকম 'দাবী' বুদ্ধির অগম্য হাস্যস্কর বলে মনে হয়েছে।

আর সত্যি বলতে কি, কোন্ দেশে এ ধরনের দাবীদার একদম নেই? তারতম্য শুধু সংখ্যাতে এবং দাবীব চৌহদ্দী নিয়ে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে আমরা বুক ফুলিয়ে গিয়েছি, এখনও যে একেবারে ভুলে মেবে দিয়েছি তাই বা কিরে কেটে বলি কোন হিম্মতে—

"একদা যাহার বিজয় সেনানী
হেলায় লঙ্কা করিল জয়!"
হেলায়!!

হাইকোর্ট দর্শনস্য দর্শনং

"বাঙ্গালে"র হাইকোর্ট দর্শনেব তবু একটা অর্থ আছে। কিন্তু যখন ইয়োবোপীয় এবং বিশেষ করে মার্কিন-বাঙ্গাল কলকাতা বা কাবুলের হাইকোর্ট দর্শনে যায় এবং সেখান থেকে দারুণ দারুণ রগরগে রিপর্ট পাঠায় তখন 'বাঙ্গাল'কে তসলিম জানাতে ইচ্ছে করে।

পূর্ববঙ্গবাসী একশ' বছর ধরে জানতো, নোয়াখালি বা সন্দ্বীপেব সুদূরতম প্রান্তেও যদি খুন হয এবং সদরের দায়বা-আদালতে যদি আসামীর ফাঁসিব হুকুম হয, তবে সে হুকুম কলকাতা হাইকোর্ট থেকে মঞ্জুরী না পাওয়া পর্যন্ত তাকে ঝুলতে হয না। বাঢ়েব তুলনায় পূর্ব বাংলার গ্রামবাসী একটু বেশী গরম মেজাজের হয়, তার আত্মসম্মান জ্ঞান একটু বেশী টনটনে। উচ্চশিক্ষিত শান্তিকামী নাগরিক এটাকে স্থলবিশেষে হিংস্র বলে মনে করতে পারে, কিন্তু আমার মত শক্তিহীন অর্থদীনকে দেশ-বিদেশে এত লাঞ্ছনা অবমাননা সক্ষোভে সহ্য করতে হয়েছে, এবং হচ্ছে যে, সে রগচটা বাঙ্গালেব ধৈর্যচ্যুতি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সখা সুপক্কবংশদণ্ডের অনুসন্ধান দেখে ঈর্ষাকাতর হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং অতি অবশ্যই তার মঙ্গল কামনা কবে। সে কথা থাক। অতএব খুন-খারাবী দেখে দেখে অপেক্ষাকৃত অভ্যস্ত মিম্বর উল্লা বা গদাই নমশূদ্র পাকেচক্রে যখন কলকাতা যায় তখন যদি সে সেই ভবনটি দেখতে চায় যার গর্ভগৃহে প্রতিদিন স্থির করা হয়, কে ঝুলে ঝুলে লম্বমান অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করবে আর কে-ই বা রোগশয্যায় মা-ধরণীর বক্ষ থেকে সমান্তরাল রেখাবৎ বিদায় নেবে, তখন আমি গাঁইয়া আশ্চর্য হব কেন? শহুরে কলকেত্তাই ব্যাপারটা আদৌ বুঝতে পারে না, কারণ তার সীমাসরহদের ভিতর তার অতি সুদূর ক্ষীণ পরিচিতজনের কাউকে কণ্ঠদেশে রজ্জুবদ্ধাবস্থায় লম্ববান দেহে ইহলোক ত্যাগ করতে হয়নি কিংবা সে সম্ভাবনাব সম্মুখীন হতে হয় নি। সে হাইকোর্টের মর্ম বুঝবে কি কবে? তাই হাইকোর্টের প্রতি "বাঙ্গালে"র গভীর শ্রদ্ধা, তার দর্শনলাভ তীর্থ দর্শনের সমতুল্য বিবেচনা কবাটা নিয়ে ঘটি ঠাট্টা-মস্করা করে!...ঢাকাতে যখন হাইকোর্ট নির্মাণ আরম্ভ হয়, তখন আমার কী উল্লাস, কী নৃত্য! আমি তখন কর্তা-ব্যক্তিদের পই পই করে অনুরোধ উপরোধ করি—অবশ্য ফোন মেরামতীর নিষ্ফল প্রচেষ্টাতে নিত্যি

নিত্যি পর্বতপ্রমাণ যা করতে হয় তার তুলনায় ধূলি পরিমাণ নস্যবৎ—আমাদের হাইকোর্টটিকে যেন কলকাতার তুলনায় লাগসই জুৎমাফিক বেশ খানিকটে উচ্চতর পর্যায়ে রূপায়িত করেন—যাতে করে শ্যামবাজারের রকে বসে ঘটিদের সগর্বে আদেশ দিতে পারি, ঢাকা গিয়ে সেথাকার হাইকোর্ট দর্শনজনিত অশেষ পুণ্যার্জন করতে পারে! কেউ শুনলো না আমার 'উচ্চাদর্শে'র প্রস্তাবটি! শুনলে কি হত? ঐ যে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ হুদো-হুদো ইন্ডিয়ান সেপাই হেথায় এসেছিল তারা আমাদের হাইকোর্ট দেখবার তরে মাথা উঁচু করতেই—দ্যাখ-তো-না-দ্যাখ—তাদের টুপি, পাগড়ী এস্তেক মন্টি তক মস্তকচ্যুত হয়ে গড়াগড়ি যেত না? যে দু'চারটি শেষ কুট্টিবেরাদর এখনো লিকলিক করে বেঁচে আছে তারা সরেস সরেস গণ্ডাদশেক মস্করা-কিসসা বানিয়ে টেরচা নয়নের বাঁকা টিটকিরি কেটে আপন জীবন ধন্য মেনে, স্বয়ং আপন জনাজার ব্যবস্থা করে দিয়ে কুট্টি বংশের শেষ প্রদীপটি ফুঁ মেরে নিভিয়ে দিযে ড্যাং ড্যাং করে পুলসিবাৎ পেরিয়ে যেত না? শুনতে পাই, কলকাতার লোক আজ নাকি আমাদের হ্যানস্তা করে। করবে না? দাসীর কথা বাসি হলে ফলে। তখন যদি হাইকোর্টটা উঁচু কবে বানাতে তবে—যাক গে।

মার্কিন খট্টাঙ্গ ভুটাঙ্গ পুরাণ

কড়ি আছে মার্কিনের। পয়লা ধাক্কাতেই তাঁরা হাজির হয়েছেন কাবুলে—হাইকোর্ট দেখতে। ঝটপট একাধিক রিপর্ট ভী তেনাদেব কাগজে বেরিয়েছে। কুল্লে এক দফা চোখ বুলিয়েই পুনরায সেই সত্য হৃদয়ঙ্গম করলুম, পৌনঃপুনিক "পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়" খুদা দাদ আফগানিস্তানের জিন্দাবাদ শহর-ই আলা কাবুল। অর্থাৎ কাবুল তথা আফগানিস্তান আপাতদৃষ্টিতে যতই পরিবর্তিত বলে মনে হোক না কেন, একটু ঘষলেই উপরকাব গিল্টি উপে যায়, আর বেরিয়ে পড়ে আসল দস্তা—খাজা মাল। তুলনা দিয়ে চোখের সামনে আনি, ফরেন মিনিস্টার ভুট্টো, হঠাৎ আইয়ুবের বিরুদ্ধে তাঁব চেল্লাচেল্লি, "গণতন্ত্র চাই. পিপলস পার্টিই পিপল, তাদের হুকুমেই চলবে দেশ", তারপর "অখণ্ড পাকিস্তান যে সংবিধানই তৈবি করুক না কেন (১৯৭১ শীতকাল) পিপিপি সেটা মানবে না", তারপব ঢাকাতে হত্যাকাণ্ড আবম্ভ হলে "শুকুর আলহামদুলিল্লাহ, পাকিস্তান ইজ সেভড", তারপর "ভুল বলেছিলুম, এই পোড়ার দেশে গণতন্ত্র চলতে পারে না, চাই সর্বাধিকারসম্পন্ন প্রেসিডেন্টের একচ্ছত্রাধিপত্য"—ইত্যাদি ইত্যাদি, পাঠককে আরো উদ্ধৃতি দিয়ে বেকাব বিরক্ত করবো না। মোদ্দা কথা, তিনি যত বার যত তরো-বেতরো ভোল পালটান, ভেক বদলান, খনে যাত্রার দলের ইয়া দাড়ি গোঁপ-ওলা নারদমুনি সাজেন, খনে কামিযে-জুমিয়ে চাঁচ-ছোলা শ্রীবাধার সাজ ধরেন, একটি ভেংচি কেটেছেন কি না কেটেছেন সঙ্গে সঙ্গে বেরিযে পড়েন ডিকটেটর ভুট্টো, যিনি তাঁর কলোনি মবহুম পূর্ব-পাকেব উপর একদিন-না একদিন কুলী সর্দারেব ডাণ্ডা বুলোবেনই বুলোবেন। একেই বলে পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়। এক্ষেত্রে তাঁব মৌলা মুরশিদ মিয়া নিক্সন। এতখানি সবিস্তর বুঝিয়ে বলাব কাবণ . এদানির আমার এক মিত্র, আইনকানুনে পযলা নম্বরী খলিফে বললেন, তাঁর ঘুঘু মক্কেলবা পর্যন্ত "পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়" তকমাটার অর্থ সঠিক ধরতে পাবেন নি! এই নিয়ে তিনে কত্তি তিন তিন দফে এফিডেভিট পেশ করা হল।

মার্কিনী রিপর্টে যে-সব মোক্ষম মোক্ষম খবরের উল্লেখ মাত্র নেই তার থেকেই আমি সত্য নির্ণয় করেছি।

"নেই তাই খাচ্ছো, থাকলে কোথা পেতে।
কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।।"

গোরুর ল্যাজটা কাটা পড়ে যাওয়ায় সেখানে যে ঘা হয়, মাছিগুলো তারই উপর মোচ্ছব লাগিয়েছিল। মার্কিনী রিপর্টের দগদগে ঘা থেকে আমি অক্লেশে অনুমান করলুম, আদি ল্যাজটার আকার-প্রকার গড়ন-ঢং কি ছিল এবং তৎসহ যুগপৎ আরেকটি ফালতো তত্ত্ব আবিষ্কার করে বাঙ্গাল, বাঙ্গালদের সম্বন্ধে বড়ই শ্লাঘা অনুভব করলুম : মার্কিনী রিপর্টারবা নিতান্তই সস্তা মার্কিন-কাপড়; কাবুলের হাইকোর্টটা যে কোথায়, সে তত্ত্বটাও নিরূপণ কবতে পারেন নি।

এনাদের এক মহাপ্রভু বলছেন, "প্রশস্ত ধূলিধূসরিত কাবুল উপত্যকার হেথাহোথা এলোপাতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে আছে ভাঙ্গাচোরা বুডঢা কাবুল শহর, সেই আদিকালের 'অপরিবর্তনীয়' চেহারা নিয়ে। কিন্তু বাহ্যদৃশ্যে ভুলো না রে, মন। 'পরিবর্তন' এসেছে আগাপাস্তলা প্রকম্পিত করে।

বটে!! কী সে যুগান্তকারী খুনিয়া পরিবর্তনটি?

"পূর্বে যেখানে "ঢুলুঢুলু নয়নে আধো ঘুমে আধা-চেতন কাবুলী কাস্টমস কর্মচারী যাত্রীদের আধাখেঁচড়া তদারকী করে না করে হাতেব অলস ইশারায় বিমানবন্দর থেকে তাদের বেরিয়ে যাবার পথ দেখিয়ে দিত, সেখানে" রোমহর্ষিত বিস্মিত মার্কিন বাঙ্গাল দেখলেন, "হাতে টমি-গান নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে যোদ্ধা (অশ্বারোহী কি না, বোঝা গেল না—লেখক) ট্যারমাকের উপর পাহারা দিচ্ছে, প্লেন থেকে নামবার পূর্বেই যাত্রীগণকে নিরাপত্তা-পুলিশ বাজিয়ে দেখে নিচ্ছে (ইন্সপেকট করে)।"

মার্কিনের বিস্ময় দেখে আমারও বিস্ময়ে বাক্যস্ফূরণ হচ্ছে না।

আচ্ছা পাঠক, তুমিই বলো, কোন্ সে মুল্লুক, হটেনটট বুশমেন যাদেরই হোক, যেখানে চল্লিশ বছরের সুপ্রতিষ্ঠিত রাজাকে বরখাস্ত করে কু দে'তা হলে বিমানবন্দর, রেল ইস্টিশন, জাহাজ বন্দর (কাবুলে এ দুটোই নেই), ছাউনি, থানা, গয়রহের সামনে তিন ডবল সশস্ত্র সৈন্য মোতায়েন করা হয় না? পঁচিশের কথা বাদ দাও, আইয়ুব যখন মেনি-বেড়াল মার্কা কু করেছিলেন তখন রাজধানীতে না, প্রাদেশিক শহরিকা ঢাকা, তারো নিচের সিলেট কুমিল্লায় সেপাই শাস্ত্রী হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড করেনি?

আরো গণ্ডা দুই কারণ আছে যে-গুলো দফে দফে বলার কি প্রয়োজন? ধুন্দুমারের সময় আন্তর্জাতিক স্মাগলারদের অবাধ আগমন, প্রাক্তন রাজা জহীরের গুপ্তচর প্রেরণ, কু-জনিত ইনফ্লেশনে টু পাইস কামাবার তরে বিস্তর চিড়িয়ার গমনাগমন, দাউদের রুদ্রদৃষ্টিতে বিপন্ন (প্রধানতঃ জহীরের) আত্মজনের যেটুকু সোনাদানা আছে সেটুকু সস্তায় ক্রয়কবণ, বিশেষ করে জাল পাস-পর্টের সাহায্যে পাকিস্তানী চরদের অহরহ শুভাগমন, আরো কত না বহুবিচিত্র রবাহূত জনগণ—অস্বাভাবিক অবস্থায় এদের সবাইকে মেকি সিকিটার মত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে হয়, ডবল জালের ছাঁকনির ভিতর দিয়ে ইস-পার উস-পার করতে হয়। এ কর্ম নিদ্রালু এক গণ্ডা কেরানী দিয়ে হয় না। বাংলা কথা!

বাচ্চাই সাকাও ছিল ডাকু। তদুপরি তার আমলে কাবুলের ভিতরে বাইরে কোনো এ্যার সার্ভিস ছিল না। তথাপি সে ফরেন অফিসের গুটিকয়েক জাঁদরেল কর্মচারীকে এ্যারপর্টে মোতায়েন করেছিল। মার্কিন রিপর্টার কাবুলবাজারে দু'চারটি নাতিবৃদ্ধ মুরব্বীকে শুধালেই তো জানতে পেতেন, ব্যাপারটা রত্তিভর নূতনত্ব ধরে না—তাই বলছিলুম, হাইকোর্টটা যে কোন্ মোকামে অবস্থিত সে খবরটাও সায়েব যোগাড় করেন নি।

শেষ প্রশ্ন, এই ভোজবাজির লীলাখেলা ক'দিনের তরে? পাঠক, আইয়ুবী-জঙ্গী চৌকিদারী এ দেশে কতদিন চলেছিল সে বাবদে তুমি স্পেশালিস্ট. আমি স্কুলবয়। টমিগান হাতে থাকলে ঘুষ খাওয়ার সনাতন সিসটেমে ঢোকার পন্থা সহজতর, প্রলোভন খরতর। আখেরে মায় আপিসার, বেবাক সেপাইকে ছাউনিতে ডেকে নিতে হয়—করাপশন আগাপাস্তলা ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে। আইয়ুবের গদিতে যখন ইয়াহিয়া আসন নিলেন তখন "ফিল্ড-মার্শালে"র প্রতি অনুরক্ত কোনো সেপাই-আপিসার উল্টো কু করলো না কেন? উত্তবটি প্রাঞ্জল। সব্বাই করাপট। করাপট-জনের কোনো নেমক-হালালী থাকে না, কারো প্রতি।

রুটি নেই? কেক খাব।

কু যত নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হোক, ভোজ্যদ্রব্যের দাম বাড়বেই। মার্কিন সংবাদদাতা সুসমাচার জানিয়েছেন, দাউদ মোটা মুনাফাখোরদের গুলি খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছেন। ফলে চালের দাম নাকি অর্ধেক কমে গিযেছে। মার্কিন সুদ্দুমাত্র চালের কথাটা তোলায় বুঝতে পারলুম তাঁর পেটে এলেম কতখানি! কাবুলের সাধারণজন ভাত খায় না। ওটা অতিশয় বিরল বিলাস বস্তু। একশ' মাইল দূরের জলালাবাদ অঞ্চল, দুশ' মাইল দূরের পাকিস্তান থেকে বিস্তর পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়ে তণ্ডুলকে পৌঁছতে হয় কাবুলে। পাকিস্তানী চাল কালোবাজার মারফৎ। সাদায় ক'শ গুণ ট্যাকসো, জানিনে। কাবুলের পয়সাওলা লোকও নিত্যি নিত্যি পোলাও খায় না। বুনেদী ফার্সীতে প্রবাদ, "প্রতিদিন ঈদ নয় যে হালুয়া খাবে—হর রোজ ঈদ নীস্ত কে হালওয়া ব-খুরীদ"। কাবুলে হালুয়ার পবিবর্তে পোলাও বলে।

কথিত আছে, বাচ্চাই সাকাও বাজবাড়িতে পয়লা খানার সময দেখে. সমুখে আমান উল্লার প্রাসাদ-পাচক প্রস্তুত জাফবানের ভুরভুরে খুশবাইদার পোলাও। সে নাকি লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বলেছিল, "ঐ খেয়েই তো আমান উল্লা বিলকুল বুজ-দিল (ছাগলের কলিজাওলা ভীরু) হয়ে যায়, আর রাজধানী ছেড়ে পালায় কান্দাহার।" সে নাকি রুটি, কিসমিস আর দু-চিলতে পনীর—তার মামুলী খাবারই খেয়েছিল।

মার্কিন সাংবাদিকের অত্যুজ্জ্বল রিপর্ট তথা কিসমিসের স্মরণ আমার হৃদয়ে সাংবাদিক হয়ে ফোকটে দুপয়সা কামাবার প্রলোভন জ্বলজ্বল চিতার মত প্রজ্বলিত হয়েছে—তদুপরি পাওনাদারেব ভয়ে বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ। ভাগ্যিস, আকছারই বিজলি মারে ফেল; তখন অন্ধকারের সঙ্গে আমার খুদাদাদ ঘোরতর কৃষ্ণ চর্মবর্ণটি অক্লেশে মিশিয়ে দিয়ে মীরপুর রোডের মোড়ে এক ইয়ারের অন্দরে দু-ছিলিম তামুক খেয়ে কলিজাডা ঠাণ্ডা করে আসি।

ভাবছি, কালই বহির্বিশ্বে টেলিগ্রাম ঝাড়বো :

"ঢাকায় কিসমিসের সের আশি টাকায় উঠেছিল। সমাজসেবীদের ভীতি প্রদর্শনহেতু কাল চড়াকসে চল্লিশে নেমেছে।"

লুফে নেবে, স্যর, সব্বাই লুফে নেবে।

বাবুর-নাম অবহেলা বিপজ্জনক

বাবুর বাদশার নাম স্মরণে এলেই আমার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়। একাধিক মিত্র অবশ্যই বলবেন, কটা লোকের আদৌ এই বিরলগুণটি থাকে যে সে তোমার কিংবা এবং তোমার মত আর পাঁচটা চুকুম-বুদাইয়ের মস্তিষ্কে ঘন ঘন আনাগোনা করবে? অথচ ইংরেজিতে এই কাণ্ডজ্ঞান সমাসটির অনুবাদ কমনসেন্স, এবং স্বয়ং ইংরেজই স্বীকার করে যে নামকরণের সময় ব্যাকরণে ভুল হয়ে গিয়েছে। কমনসেন্স সর্বদেশে সর্বকালে বড্ডই আন্‌কমন। বরঞ্চ এটাকে আন-কমন-সেন্স বা রেয়ারসেন্স বলাই প্রশস্ততর—যিনি কিনা গুণীজনের চৈতন্যলোকেও নিতান্তই ওয়ান্স ইন এ ব্লু মুন, বাংলায় বলি রাঙ্গা শুক্কুরবারে অবতীর্ণ হন! অর্থাৎ, অতিশয় কালে-কস্মিনে, নিতান্তই জীবনের বিরলতম শুভ মুহূর্তে। যেমন ধরুন এ-বাড়ির, পাশের বাড়ির, হয়তো বা আপনার বাড়ির টেলিফোনটি। এনার বেলাতেই বোঝা যায়, ইনি মহাপুরুষ। অসাধারণ অর্থাৎ আন-কমন-সেন্স দ্বারা যন্ত্রটি টুইটুম্বুর। সাতিশয় কালেভদ্রে আপনি এঁকে জাগ্রত অবস্থায় পাবেন। দুষ্টলোকে কয়, আমাদের রাজকর্মচারীরা এ বাবদে অলিম্পিক। আমি তীব্রকণ্ঠে, মৌলামুরশিদের দোহাই দিয়ে, যদি পাঠক হিন্দু হন তবে গঙ্গাজলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত অবস্থায় তামা-তুলসী স্পর্শ করে, ক্যাথলিক হলে তিনবার দেহের উত্তমার্ধে ক্রুশচিহ্ন এঁকে, বৌদ্ধ হলে উচ্চকণ্ঠে ত্রিশরণ মন্ত্রের শরণ নিয়ে, জৈন হলে—থাক্ ঐ তো সেকুলাব স্টেটের চিরন্তনী শিরঃপীড়া, সব্বাইকে আপন আপন অতিশয় ন্যায্য হিস্যে দিতে হয়, এস্তেক বেতার-প্রতিষ্ঠানেও শপথ নিয়ে বলেছি, এটা অতিশয় অন্যায়। অলিম্পিকের কুল্লে গোল্ড-মেডেল পাবার গগনচুম্বী পাঁতালস্পর্শী কুম্ভকর্ণবিজয়ী হক্ক ধরেন আমার টেলিফোনটি। অবিচল, অবিরল, নিশ্চল, সুবিমল এর কালকালান্তরব্যাপী নিদ্রাটি। সুবিমল বলাব সুযুক্তি : এনার নিদ্রাতে কোনো মল নেই। যথা

শুধু বেঘোরে ঘুম ঘোরে
গরজে নাক বড় জোরে,
বাঘের ডাক মানে পরাভব।
আঁধারে মিশে গেছে আব সব॥

(রবীন্দ্রনাথের সর্বাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্য থেকে উদ্ধৃত)

আমার টেলিফোনটি নাসিকাগর্জনের মত ইতরজনসুলভ কুকর্মদ্বারা ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত প্রতিবেশীকে অযথা অত্যাচার করেন না। করলেই তো তাঁর সর্বনাশ। তদ্দণ্ডেই তাঁর কান দিয়ে

অনেক কথা বলে নেব
এবে তোমার কানে কানে
কত নিশীথ অন্ধকারে
ছিল কত গোপন গানে॥

অর্থাৎ তখন তাঁকে ফের কর্মক্ষেত্রে নামতে হবে।

টেলিফোন সম্বন্ধে এতখানি বলার প্রয়োজন হল এই কারণে যে, গত রবিবার ১১-৮ তারিখে আমি লিখেছিলুম আমাদের হাইকোর্টটিকে কলকাতারটির চেয়ে উচ্চতররূপে নির্মাণ করার জন্য আমি হেথাকার "কর্তা-ব্যক্তিদের পই পই করে অনুরোধ করি—অবশ্য ফোন মেরামতীর নিষ্ফল প্রচেষ্টাতে নিত্যি নিত্যি পর্বতপ্রমাণ যা করতে হয় তার তুলনায় ধূলিপরিমাণ নস্যবৎ"। ইয়াল্লা ছাপাতে বেরুলো, "কোন মেরামতীর নিষ্ফল প্রচেষ্টাতে নিত্যি নিত্যি" ইত্যাদি অর্থাৎ "ফোন" স্থলে "কোন" ছাপা হয়ে গিয়েছে। পূর্বে কিংবা পরে ফোনের কোনো ইঙ্গিত ছিল না বলে পাঠকের পক্ষে আগাগোড়া বাক্যটাই অবোধ্য রয়ে গেল। কিংবা পাঠক ভাবলো, আমি একটা বুদ্দু, কি একটা বাজে রসিকতা করেছি যার মাথামুণ্ডু কোনো অর্থ হয় না—রস তো দূরের কথা। কিন্তু এর সঙ্গে তড়িঘড়ি একটা সত্য এস্থলে উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। টেলিফোন বিভাগ সরকার চালান। যদি বা সাহস সঞ্চয় করে টেলিফোনের প্রতি বক্রোক্তি করবো বলে মনস্থির করেছিলুম, সরকার বাবদে আমার সতত সশঙ্কিত অচেতন মন—যার জন্ম ইংরেজের গোলামীর যুগে—আমার কলমের কানটি আচ্ছাসে মলে দিয়ে শাসিয়েছে, "অমন কম্মটি করতে যাস নি। ফোন না লিখে ল্যাখ কোন।" এবং কলমও তাই লিখেছে, ছাপাখানাও তাই ছাপিয়েছে! এর সঙ্গে এটাও বলা উচিত মনে করি, ছাপাখানা যতই ভুল করুক, সে আমাদের মত কাঁচা লেখকের কত যে বানান সংশোধন করে দেয় সে তত্ত্ব কি কেউ জানে? নেশনাল প্রফেসর সুনীতি চাটুয্যেব নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। একদা অর্বাচীন এক সাহিত্যিক আমাদের সম্মুখে ছাপাখানার বিস্তর কুৎসা গেযে চলে যাওয়াব পব বাঘা বৈয়াকরণিক সুনীতি চট্টো বললেন, "হুঁ, ছাপাখানা যে আমাদের কত না বানান-ভুল শুধরে দিয়ে সমাজে ইজ্জত বাঁচায়, তাব খবব এ-চ্যাংড়া জানবে কোত্থেকে?" আমি ঘন ঘন সম্মতি তথা কৃতজ্ঞতা-সূচক মাথা নাড়িয়েছিলুম।

টেলিফোনের বেলাও তাই। ঐ বিভাগেব কর্মচারীরা ভদ্র এবং ডাক্তারের সঙ্গে এঁদের অনেকটা মিল আছে। ডাক্তাব কি কখনো রোগীকে বলে, "দাদা, যা গোরস্তান মার্কা নিউমোনিযাটি ঝড়-বিষ্টিতে যোগাড় কবে এনেছ, এতে নিদেন তিন হপ্তার ধাক্কা!" ফোন অফিসার কি করে বলেন, "ঝড়বৃষ্টিতে ফোনের তারটির যা হাল হয়েছে, সে তো, দাদা নতুন তারের দাওয়াই না আসা পর্যন্ত সাববার কথা নয়—সে তো দেড় মাসের ধাক্কা।" নিউমোনিয়া সারতে এক মাস লাগলেও কি আপনি ডাক্তারকে তাড়া লাগান? তবে? ফোনের বেলাই যত গোস্‌সা!

আমার ব্যক্তিগতভাবে একটা মস্ত সুবিধা রয়েছে। ফোন মাবফত আমার বেশুমাব পাওনাদার আমাকে বেলা-অবেলায় আর হুনো দিতে পাবে না। ঐ তো মানুষ মাত্রেরই দোষ। ভালো দিকটা দেখে না; দেখে শুধু খারাপ দিকটা।

হঠাৎ মনে পড়লো, কাবুলের দূর-আলাপনী প্রতিষ্ঠানটির চেহারাটা। সে-কেচ্ছা আরেকদিন হবে।

আহাম্মুকী

বিষয়টি গুরুতর। সমস্যাটি জটিল। আমার বিদ্যে অত্যল্প।

বাবুর বাদশা তাঁর ইয়ার আমীরদের মুদ্রাস্ফীতি বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন, "তোমার কাঁড়া কাঁড়া দিনারমোহর নিয়ে কাবুল পৌঁছনমাত্রই তো কাবুলের উৎপাদনক্ষমতা সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-ছোঁয়া লম্ফ মারবে না। বাজারে আগে যে-রকম হাজারটা আন্ডা উঠতো সেই হাজারটাই উঠবে। মাঝখানে শুধু তোমাদের দরাদরির আড়া-আড়িতে এক পয়সার মাল এক টাকা দিয়ে কিনবে।"

ঠিক ঐ পরিস্থিতিই গড়ে তুলেছিলেন ইংরেজ কোম্পানির জাঁদরেলরা বাবুদের মৃত্যুর তিনশ বছর পর, আজ থেকে দেড়শ বছর আগে। জঙ্গীলাট কীন কান্দাহার গজনী জয় করার পর বিপুল গৌরবে প্রবেশ করলেন কাবুলে এবং তাঁদের হাতের পুতুল শাহ শুজাকে তখ্‌তে বসিয়ে লেগে গেলেন বিপুলতর পরাক্রমে নববিজিত রাষ্ট্র আফগানিস্তানের উপর রাজত্ব করতে।

একে তো পুতুল রাজা মাত্রই আফগানের দুচোখের বিষ, তদুপরি শুজা ইন্দ্রিয়পরায়ণ —জনসাধারণ করলে অসহযোগ। অর্থাৎ খুব একটা স্বেচ্ছায় সেই সতের-আঠারো হাজার, কাবুলে মোতায়েন, ইংরেজ সেনাদলকে খাবারদাবার, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কাবুল উপত্যকার লোক এবং নিকটবর্তী জনপদবাসী বেচতে চায় না। ওদিকে গোরার পাল চায়, "প্রতিদিন হালুয়া খেতে"! জিনিসপত্রের দাম চড়চড় করে চড়বার পূর্বেই "সদাশয়" ভারতস্থ ইংরেজ সরকার ইনফ্লেশন ইন্ধনের জন্য সৈন্য এবং অফিসারদের বিলাস-ব্যসনের তরে পাঠাতে লাগলেন বে-হিসেব বে-শুমার বস্তা বস্তা মোহর, টাকাকড়ি। এমনিতেই স্বাভাবিক অবস্থাতেই সতেরো-আঠারো হাজাব ফালতো, তায় শ্বেতহস্তীকে পোষবার মত গম-যব ফসল, ভেড়ী মুর্গী কাবুল উপত্যকা ও সেই দূর হিন্দুকুশ এলাকা পর্যন্ত জনপদ উৎপাদন করে না। মুদ্রাস্ফীতি ছাড়াই, অর্থনীতির সনাতন আইনের দ্রব্যাভাববশত বাজারে লাগল আগুন। ইতিমধ্যে আসছে, দিনেব পর দিন হিন্দুস্থানের ভাণ্ডার উজাড় কবে, সেখানকার তীব্র প্রতিবাদ, করুণ আর্তনাদ উপেক্ষা কবে টাকার ঘি কাবুলে ইনফ্লেশন আগুনে ঢালবার তরে। গোরাদের ছাউনি শহব থেকে বেশ কিছুটা দূরে। শহরগামী গ্রামবাসী আন্ডাওলা মুর্গীওলাকে গোবা সেপাইবা কবে চোটপাট এবং লুটপাট। ফলে সাপ্লাই গেল আবো কমে—যোগানদার সুদূর গ্রাম থেকে বেরুতেই রাজী হয় না।

গোরা মার্কা আজব ইনফ্লেশন

কাবুল শহরের কাছে ইনফ্লেশনে হুমা জাতীয় আজব চিড়িয়া নয়। মাহমুদ, তীমুর, নাদিব বিস্তর লোক, বিস্তর না হোক, অল্প-বিস্তর ইনফ্লেশন ঘটিয়েছেন কাবুলে, লুটের টাকা ঢেলে। কিন্তু এবারের ইনফ্লেশনে মার গেল কাবুলের ফকির আমীর দুই পক্ষই। সে যা দাম—সে দাম দিয়ে রুটি, আন্ডা, মটন, আঙুর, নাসপাতি, আপেল খেতে পারেন স্রেফ গোরা রায়রাই। ২৫ মার্চের পর টিক্কা গুষ্ঠীরও নিত্যি নিত্যি ছিল হালুয়া। আমীর মোল্লা গেরস্ত সবাই গেল এক সঙ্গে ক্ষেপে।

ওদিকে ভারতের রাজকোষে মারাত্মক অর্থাভাব। রব উঠেছে, সর্বকার মহলেই, "খর্চা কমাও, কড়ি বাঁচাও।" তখন এই পাগলা-অভিযান, ইটারনেল পিকনিকের, "খর্চা না কমিয়ে ইংরেজ করল আরেক গোমূর্খামী। মাসোহারা ঘুষ দিয়ে যে সব আফগান

সর্দার-আমীরদের একদিন কোনো গতিকে ঠেকিয়ে রেখেছিল গণবিক্ষোভের আবর্ত থেকে, তাদের ভাত্তা দিল কমিয়ে আর সঙ্গে সঙ্গে তারা আর তাদের পুষ্যির পাল গেল ক্ষেপে। কোথায় না একদিকে গোরাদের বে-এক্তেয়ার খর্চা কমিয়ে, অন্যদিকে সর্দারদের ভাত্তা বাড়িয়ে এবং তাদের মাধ্যমে গেরস্তদের হাতের টাকার একাংশ পৌঁছিয়ে বাজারদরে ভারসাম্য আনা হবে, তা না উল্টে দাঁড়ি-পাল্লার যে দিকটা হাল্কা হয়ে হিন্দুকুশের চূড়ো ছুঁই-ছুঁই করছিল তার থেকে আচমকা থাবা মেরে সরিয়ে দেওয়া হল তিন খাবলা। ভারি দিকটা এক ঝটকায় ঠাং করে ঠেকলো কাবুলের পাথরে।

জাহান্নমের পথে

উন্মত্ত জনতা তিনজন ইংরেজ অফিসারকে বাড়ি থেকে টেনে বের করে খুন করলো কাবুলের রাজপথোপরি—চীৎকারে চীৎকাবে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে।

এর পরের কাহিনী সবাই জানেন। অশেষ লাঞ্ছনা অবমাননার পর প্রায় সাড়ে ষোল হাজার গোরা, নেটিভ—নেটিভ যৎসামান্যেরও কম—কাবুল থেকে বেরুলো ভারতের পথে। সেই ভয়াবহ জগ্‌দলক্-গিরিপথ, যেটাকে বাবুর পর্যন্ত সমঝে চলতেন, তারই ভিতর কচুকাটা হল শেষ লোকটি পর্যন্ত—না, মাত্র একজন ডাক্তার যখন কোনো গতিকে ছন্নেব মত টলতে টলতে জলালাবাদের ইংরেজ ছাউনিতে পৌঁছল তখন সে অর্ধোন্মাদ। এটা আমাকে আব নতুন কবে বলতে হবে না, এমন কি আমি স্বয়ং, মোটর ভেঙে যাওয়ার দরুন, জগ্‌দলকে যে-এক রাত্রি কাটাই সে কাহিনী উপস্থিত মুলতবী থাক।

সর্বজনীন সর্বদেশের প্রশ্নমালা

কাবুল শহরে আজও যদি অকস্মাৎ এক গাদা টাকা ফেলা হয় তবে ফল কি হবে? আফগানিস্তানে চিবকালই খাদ্যাভাব। বহির্বিশ্ব থেকে যে গম ডাল আসবে—মার্কিন রিপর্টাবেব শৌখীন চাল মাথায় থাকুন—সেটা আসবে কোন দেশ থেকে, কোন পথ বেয়ে, সেই হঠাৎ-পাওয়া টাকার জোরে? (সে কড়ি কাবুলে ছেড়ে ইনফ্লেশন ডাকাব কোনো অর্থ হয় না।) যে দুটো পথ দিয়ে প্রধান শহর কাবুল, গজনী, কান্দাহাব, জলালাবাদ বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত, সেগুলোর উপর দিয়ে একদা চলাচল করতো উট গাধা ইত্যাদি ভারবাহী পশু। এখনো বেশীর ভাগ তাই। তবে হ্যাঁ, এখন ট্রাকও চলে। এস্থলে মনে রাখা ভালো, ট্রাকের ইসকুরু বল্টু থেকে আরম্ভ করে পেট্রলের শেষ ফোঁটা পর্যন্ত কিনতে হয় বিদেশ থেকে। এবং দুটি রাস্তার একটা জগ্‌দলক জলালাবাদ হয়ে পৌঁছয় পাকিস্তানের পেশাওয়াবে, অন্যটিও পাকিস্তানের চমনকুয়েটাতে।

পাকিস্তানের খুব একটা ফালতো গম ডাল আছে বলে শুনি নি। তদুপরি দুই দেশে খুব একটা দিল-জানের দোস্তী আছে এ-কথা আরো কম শুনেছি। তবু পাকিস্তান হঠাৎ খামোখা দাউদ খানকে ভারতে কেনা বা মার্কিনদত্ত গম তার দেশের ভিতর দিয়ে পাস করতে দেবে না, এটা চট করে বিশ্বাস করা যায় না। পাকিস্তান খুব-একটা টাকার কুমীর তালেবর মুল্লুক নয়। মধ্যবর্তী ব্যক্তি হামেশাই দুপয়সা কামায়।

কিন্তু প্রশ্ন, আজ যদি দাউদ খান রুশের সঙ্গে বড্ড বেশী ঢলাঢলি আরম্ভ করেন এবং

মার্কিন চটে যায়, ফলে মার্কিন পাকিস্তান ইরান এক জোট হয়ে পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিমের পথ সীল করে দেয় তবে শুধুমাত্র উত্তরের পথ দিয়ে রুশ তাবৎ আফগানকে খানা-দানা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে কি, চাইবে কি? আমার জানা নেই, পাঠক বলতে পারবেন, এযাবৎ রুশ কটা দেশকে খানা-দানা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে।

তাই আফগানিস্থানকে আপন পায়ে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু তার পূর্বে প্রশ্ন, না হয় মেনে নিলুম জহীর আর তাঁর ইয়ার-বখশীরা ছিলেন করাপ্‌ট্‌। কিন্তু আমান উল্লা? লোকটা তো তখ্‌ৎ হারালো প্রগতিশীল ছিল বলে। হবীব উল্লা ছিলেন অলস, কিন্তু তিনিও কি চেষ্টা দেন নি দেশটাকে সচ্ছল করার? তাঁর পূর্বের বাঘা বাঘা আবদুর রহমান, দোস্ত মুহম্মদ? এঁদের বলবুদ্ধির তারিফ বিস্তর বিচক্ষণ বিদেশী করেছেন। এঁদের মূলধন ছিল না? দাউদ খান যদি পান, তবে পাবেন, একা রুশের কাছ থেকে। হবীব, রহমান, দোস্ত পেতেন দুপক্ষ থেকেই। সে সোনা-দানা তো তাঁরা চিবিয়ে খান নি। সে সব গেল কোথায়? যদি বলেন, আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা অনেক কিছু করা যায়, তবে শুধোই, ভারত যে ছাব্বিশ বছর ধরে কুল্লে টেকনিক্যাল কল এস্তেমাল করলো তার ফলে জনগণের দরিদ্রতা ঘুচলো কতখানি? তবু তো ভারত অনেক কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ ধরে, উৎপাদন করে। নেই নেই করে বাংলাদেশেরও গরীবানা-সুরৎ দু-একটা খুদাদাদ দৌলত আছে, শিক্ষিত লোক আছেন, "নো-হাউ" গুণী আছেন। আমরাই কি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুখ স্বপ্ন দেখার খুব একটা সাহস পাই? আমি হাড়ে-মিষ্টি অপটিমিস্ট—আমাব কথা বাদ দিন।

আফগানিস্থানেব আছেটা কি?

হাজার বছর পূর্বে একজন চৌকশ বাদশা আটঘাট বেঁধে আফগানিস্থানকে আপন পায়ে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর কথা আরেক দিন হবে।

*

* *

সাধারণজনের বিশ্বাস, বিজ্ঞানেব দৈনন্দিন ব্যবহার দুনিয়াটাকে ন্যাজ-মুড়ো বদলে দিয়েছে। টেলিগ্রাফ, বেতার, বিজ্ঞান-বদৌলত নিত্যি নিত্যি নয়া নযা দাওয়াই ইন্‌জেকশন, খুদায় মালুম আরো কত কি। কিন্তু বিজ্ঞান যে আমাদের এই বাংলাদেশের কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশ করেছে মানুষ সেদিকে নজর ফেলে না। এবং সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি বলে মনে হয়, এই মুখ-পোড়া বিজ্ঞানের সাহায্যেই আমাদের সে সর্বনাশের অগ্রগতি ঠেকাতে হবে। এ ব্যাপারটা শুধু যে আমাদের বেলাই প্রযোজ্য তা নয়, কি আফগানিস্থান, কি ইরান এমন কি পূর্ব ইউরোপের একাধিক অনুন্নত দেশও বিজ্ঞানের প্রকৃতির স্বরূপটা সঠিক ধরে উঠতে পারছে না। সবাই ভাবছে, একবার কোনো গতিকে গাদা গাদা টাকা পেয়ে গেলে তাই দিয়ে কিনে নেব লেটেস্ট মডেলের যন্ত্রপাতি, তৈরী কববো হুদো হুদো মাল—ইংলন্ড, জর্মানি, আমেরিকা যে বকম করেছে আর সম্বৎসরে দুধে-ভাতে থাকে,—আমাদের বেলাও হবে তাই।

এই বাংলাদেশের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন, এ-দেশ বহু শতাব্দী ধরে অসাধারণ বিত্তশালী ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে ভূপর্যটক ইবনবতুতা বাংলাদেশ দেখার পর

বলেছিলেন, এত সস্তায় (এত বিচিত্র) জিনিস তিনি আর কোথাও দেখেন নি। চীনের মত বিশাল ধনবান রাষ্ট্র, নানা রকমের দ্রব্য নির্মাণে সিদ্ধহস্ত বহু শত বৎসর ধরে পৃথিবীতে অন্য কোনো রাষ্ট্র ছিল না। সেই চীন দেশের লোক বহু শত বৎসর ধরে বাংলাদেশে নিত্য-নিয়ত এসেছে নিপুণ হস্তে নির্মিত বহু বিচিত্র পণ্যসম্ভারের জন্য। সে সব বস্তুর ফিরিস্তি, এ দেশের সমৃদ্ধি সাচ্ছল্যের বিবরণ চীনা ভাষা থেকে অনুবাদিত হয়ে এ দেশে যখন প্রকাশিত হয় তখন আমাদের মত অজ্ঞ লোক বিশ্বাসই করতে পারি নি, এত সব অদ্ভুত অদ্ভুত প্রয়োজনীয় তথা বিলাসবস্তু এই দেশেরই লোক একদা নির্মাণ করেছে। কিন্তু সে-দিনের ঐশ্বর্য নিয়ে আলোচনা আজ আমার বিষয়বস্তু নয়। আমার উদ্দেশ্য, ভিন্ন ভিন্ন দরিদ্রদেশ কি প্রকারে একদা ধনবান হয় এবং আবার সেই দরিদ্রতায় ফিরে যায়। পাঠক যদি বাংলাদেশের কথা মনে রেখে তাদের সঙ্গে সে-দেশ মিলিয়ে তুলনা করে নেন, তবেই আমার উদ্দেশ্য সফল হয়। বহু দেশের বহু বিচিত্র উত্থান-পতনেব বহুরূপী ঘটনা, তাদের ধনোপার্জন শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টা ইত্যাদির প্রত্যেকটি অঙ্গ নিয়ে তার সঙ্গে এ দেশের একই প্রচেষ্টা, সাফল্যলাভ, অধঃপতন তুলনা করতে গেলে এ রচনার নির্ধারিত তনু বে-সামাল কলেবরে পরিবর্ধিত হবে? রহমান রক্ষতু!

অসামান্য মাত্র একটি বিষয়ের প্রতি এস্থলে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। একাধিক গুণীজন দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন, ইংরেজ আগমনের প্রাক্কাল পর্যন্ত এ দেশ দরিদ্র ছিল না। মাত্র শতকরা ষাটজন লোক চাষবাস কবতো শতকরা চল্লিশজন শিল্পদ্রব্য নির্মাণে নিযুক্ত থাকতো। ইংরেজ যেমন যেমন কলে তৈরী সস্তা মাল এ দেশে ছাড়তে আরম্ভ কবলো— নানা কৌশলে দেশের ধনদৌলত লুণ্ঠন করে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে আনার কর্মটা অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন বেড়েই চলছিল—তেমন তেমন এ দেশের কুটির-শিল্প লোপ পেতে লাগলো। শিল্পীদের ধনোপার্জনের পন্থা বন্ধ হয়ে যাওয়াব ফলে তাদের সামনে রইল শুধু চাষের কাজ। পূর্বে যে জমি এ দেশের ষাটজনকে কাজ যোগাত, ক্রমে ক্রমে সেটা নব্বুই-পঁচানব্বুইয়ে গিযে দাঁড়ালো। জমি সে-ভার, তদুপবি জনসংখ্যাবৃদ্ধিব চাপ সইতে পারবে কেন? দেশেব দাবিদ্র্য চরমে গিয়ে পৌঁছল।

রাজার এক্সপেরিমেন্ট এক্সপেরিমেন্টের রাজা

গজনীর মাহমুদ বাদশা উত্মেধরূপেই লক্ষ্য করেছিলেন ভারতের উৎপাদন ক্ষমতা, শিল্পনৈপুণ্য, শিল্পদ্রব্য-বৈচিত্র্য এবং প্রাচুর্য। এসব রফতানী করে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয়েছিল ভারতের অতুল ধনসম্পদ। কথিত আছে, সর্বসুদ্ধ অষ্টাদশবাব তিনি ভারতলক্ষ্মী ভাণ্ডার লুণ্ঠন করেন। এই অষ্টাদশ অভিযানের চেয়ে অল্প লোমহর্ষক একটি মাত্র সংগ্রাম নিয়ে অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত লেখা হযেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধান্তে শূন্য শ্মশান, মাহমুদের প্রতি অভিযানান্তে গজনীতে বৃহত্তর স্বর্ণোদ্যান! পাঠান্তরে সপ্তদশ অভিযানেব উল্লেখ আছে। এ পাঠও গ্রহণযোগ্য। মহাভারতেব মুষলপর্ব মূল মহাকাব্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অবান্তর, সে তত্ত্ব অনস্বীকার্য। অতএব সপ্তদশ পর্বে সম্পন্ন মহাভাবত অনাসৃষ্টি নয়।

সর্ব ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ একমত যে, মাহমুদের লুণ্ঠনের ফলে এ দেশের ধনদৌলত সর্বনাশা রক্তক্ষরণের মত বেরিয়ে গিয়ে (এপোলিং ড্রেন অব ওয়েলথ) সম্পূর্ণ দেশটাকে হীনবল অসাড় করে দিয়েছিল। এ লুণ্ঠনের খতিয়ান, দফে দফে বয়ান দিয়ে এর পরিমাণ

ও মূল্য নিরূপণ সম্পূর্ণ অসম্ভব! একমাত্র নাগরকোট-এর মত দ্বিতীয় বা ইন্টার ক্লাস নগরিকা থেকে তিনি পান, সাতলক্ষ সোনার মোহর, সাতশ' মণ সোনা এবং রূপার পাত, দুমণ খাঁটি সোনার তাল, দুহাজার মণ খাঁটি রূপার তাল এবং কুড়ি মণ হীরে, পান্না, মুক্তো ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এ ইনভেনট্রিতে হস্তী অশ্ব কামধেনু, অস্ত্রশস্ত্র, বহুবিধ ধাতু, বিচিত্র কারুকার্যময় পট্টবস্ত্র, কাষ্ঠদ্রব্যাদি—শতাধিক আইটেম ধরা হয় নি! একটা অভিযানে, মাত্র একটা নগরিকা থেকে যদি এতখানি সম্পদ লুণ্ঠিত হতে পারে তবে সপ্তদশ অষ্টাদশ অভিযানে অগণ্য নগরে কতখানি পাওয়া যায় তার কল্পনাও অসম্ভব। মাত্র এই 'পরশুদিন' ১৯৪৫-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে মিত্রপক্ষ ইয়োরোপে কি পরিমাণ, কত বিচিত্র বস্তু, মায় গণ্ডায় গণ্ডায় সমুচা কারখানা আপন আপন দেশে বাজেয়াপ্ত-জাহাজে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারই কি লেখাজোখা হয়?

বস্তুত মাহমুদ কি পবিমাণ সম্পদ স্বদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন সেইটেই এস্থলে প্রধান বক্তব্য নয়। কত রাজা কত লুটই না করছেন, সে-সব নিয়ে আলোচনা বৃথা। এই 'শান্তি'-কালেই যা-লুট পৃথিবীর সর্বত্র "ন্যায়ত ধর্মত" মায ওয়াটারগেট হচ্ছে তারই খবর রাখে কজন? এবং সবচেয়ে সর্বনেশে লুণ্ঠন—দেশের ভিতর যখন "রাজার হস্ত, করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি!"

আমার বক্তব্য এব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বটে কিন্তু ঈষৎ ভিন্ন প্রকৃতির।

এক বাক্যে সর্বজন স্বীকার কবেছেন, সুলতান মাহমুদ ছিলেন অসাধারণ গুণগ্রাহী, সর্বমুখী-সম্পন্ন বিদগ্ধ পুরুষ। কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, পণ্ডিত, জ্ঞানবিজ্ঞানের গুণীজনকে তিনি এমনই অকাতরে অর্থসম্পদ দান কবতেন যে দেশ-দেশান্তব থেকে প্রতিভাবান অসংখ্য গুণীজ্ঞানী তত্ত্ববিদ সেই শুষ্ক কঠিন সৌন্দর্যহীন, প্রাকৃতিক সর্বসম্পদে নিরঙ্কুশ বিবর্জিত গজনী শহরে জমায়েত হয়েছেন, সমস্ত জীবন সেখানে কাটিয়েছেন। আজ থেকে বছব বিশ-ত্রিশ পূর্বে রাজা মাহমুদের সভাকবি ফিবদৌসী, সভাপণ্ডিত অল-বীরুনীর সহস্র বার্ষিকী প্রাচী-প্রতীচ্যের বিদ্বজ্জন সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন কবেছেন। অল-বিরুনী সংস্কৃত জানতেন। ভারতের অপর্যাপ্ত জ্ঞানবিজ্ঞানেব পুস্তকাদি অধ্যয়ন কবা সত্ত্বেও তিনি বা অন্য কোনো সভাপণ্ডিত অর্থনীতি নিয়ে বাদশাব সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন নি, এটা অবিশ্বাস্য।

তদুপরি মাহমুদ তো মাত্র একবাব ভারতবর্ষ লুট করে সে-ধন গজনীতে ছড়িয়ে দিয়ে তার কুফল সুফল দেখেন নি। অধিকাংশ লুণ্ঠনকারীরা মাহমুদের মত, পববর্তীকালে বাবুবের মত পর্যবেক্ষণশীল ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানকর্মে নিয়োজিত করাব মত জ্ঞানী ছিলেন না; তদুপরি তাবা বার বার পুনর্বার লুণ্ঠন কবাব মত সুযোগ-কুযোগ পান নি যে আপন অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু দু-একবার লুঠ করার পর সুলতান মাহমুদ নিশ্চয়ই অর্থ কি, ব্যবসাবাণিজ্যে অর্থেব গুরুত্ব কি, অর্থেব সফল ও নিষ্ফল প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেকখানি গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন, এই আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস।

লুট করা ধনদৌলত সুদ্দুমাত্র সঞ্চয় করা বা নিছক উড়িয়ে দেওয়াই যদি তাঁর উদ্দেশ্য হত, তবে তিনি প্রতিবারে প্রধানত বন্দী করে অথবা অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে সর্বপ্রকারে আর্টিজান, ছুতোর, তাঁতী, স্থপতি, প্রস্তর কর্তনকারী, স্বর্ণকাব, তাম্রকার, বস্তুত হেন শিল্প নেই যার দক্ষ হুনুরী—পালে পালে তিনি সুদূর গজনীতে নিয়ে যান নি। অতি অবশ্যই

তিনি প্রতিমা-নির্মাণকারীদের সন্ধানে কস্মিনকালেও বেরোন নি, ঐ যা একমাত্র ব্যত্যয়। তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। কোথায় সে শীতল মলয় আর শস্যশ্যামলা ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদল শোভিনী মাতা? সেই নির্জলা, নিষ্ফলা, সেই পোড়ারমুখো দেশটাকে তিনি চেয়েছিলেন ফলপ্রসূ করতে, কিন্তু কী সে দেশ! তবে কি না, আমি কোন দেশ সম্বন্ধে কি বলি না বলি, কোন দেশের কি বয়ান দিই না দিই, তারই উপর যদি সুচতুর জন আস্থা রাখতেন তবে তো আমি এ্যাদ্দিনে বিলেত, নিদেন কাবুলের ফরেন মিনিস্টার হয়ে যেতুম! তা হলে শুনুন, সর্বশাস্ত্রবিচারদক্ষ পর্যবেক্ষণ শক্তিতে শার্লক হোমস মসুদবানা যাঁব কাছে নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য-শিশুর মত 'আবুদিয়া', সেই বাবুর বাদশা গজনী সম্বন্ধে কি বলেছেন,—অনুবাদ প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁব।

গজনীর স্বরূপ

"গজনী একটা দরিদ্র নগণ্য স্থান। আমি ভেবে হামেশাই তাজ্জব বোধ করেছি যে, হিন্দুস্থান খুবাসানের যাঁরা অধীশ্বর ছিলেন তাঁবা খুরাসানকে বাদ দিযে এমন একটা নগণ্য স্থানকে কি করে রাজধানী কবেছিলেন।. .গজনী ছোট দেশ। এখানে কৃষিকাজ অতি কঠিন। যে-জমি এক বছব আবাদ হয, পর বছব সে জমি ফের ভাঙতে হয়।" অথচ বাবুবই বলছেন, গজনী অঞ্চলে পানির অভাব নেই। তদুপরি মাহমুদ এখানে কৃষির জন্য তিনটে বাঁধ তৈবী কবেছিলেন। "তার একটাব উচ্চতা প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ!" বাবুব যখন গজনী যান তখন তার একটি বাঁধ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, অন্যটি মেরামতির জন্য বাবুর কিছু টাকা পাঠিযে বলছেন, "আমি আশা কবি আল্লাব বহমে বাঁধটি নিশ্চযই আবাব নির্মিত হবে।" তৃতীয়টি তখনও কার্যক্ষম। তাবৎ গজনী জেলা ঘুরে বাবুব বলবাব মত যা পেলেন সে "গজনীব আঙ্গুব কাবুলের আঙ্গুবেব চেয়েও ভালো, এখানে তরমুজের উৎপাদনও অনেক বেশী, আপেলও খুব ভাল।" এবং আরো তাজ্জব লাগার কথা যে "গজনীব প্রধান চাষ লাল বং উৎপাদক এক প্রকাব লতা। এটি বেশ লাভজনক কৃষি। এ লতা প্রচুব পবিমাণে হিন্দুস্থানে চালান হয়।"

একাই এক লক্ষ

খুঁটিযে খুঁটিযে যতই পড়ি ততই সন্দেহ দৃঢ়তর হয়, যে কটি দ্রব্য বাবুরের আমলেও গজনীতে উত্তম, সেগুলো কাবো না কারো চেষ্টার ফলে উৎকৃষ্ট পর্যায়ে তোলা হয়েছে। আমার পক্ষে প্রমাণ করা কঠিন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, মাহমুদ ভালো কবেই বুঝেছিলেন, বিদেশ থেকে যত সোনা এনেই গজনীতে ছড়াও না কেন, বিদেশীরা সেই টাকার লোভে যতই উৎকৃষ্ট বিলাসব্যসনের জিনিস এমন কি খাদ্যদ্রব্যাদিও গজনীতে এনে বিক্রী করুক না কেন, লুটেব টাকাও একদিন নিঃশেষ হযে যাবে—যদি না কৃষি এবং শিল্পজাত দ্রব্য দেশ উৎপাদন কবতে পারে। এই যে লতাব কথা বাবুর বলছেন, এর থেকেও সন্দেহ হয়, মাহমুদ বফতানীর জন্য এটার চাষ প্রবর্তন করিয়েছিলেন। হুনুরী এনেছিলেন সর্বপ্রকারের—পোড়ার দেশের লোক যদি কোনো একটা শিল্প শিখে নিতে পাবে! কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যায়, তিনি ঘি ঢালছিলেন ভস্মে। ভারতের অর্বাচীন ঐতিহাসিকরা

বলেন, মাহমুদের স্বর্ণতৃষা ছিল অস্বাভাবিক। আমার মনে হয়, প্রতি প্রচেষ্টাতে নিষ্ফল হয়ে, লোকটা আবার বেরুতো নয়া ক্যাপিটালের সন্ধানে। আমরা যে রকম এক-একটা ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান শেষে নিরাশ হয়ে ফের বেরুই ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে। এ কথা সত্য, গজনী শহরটাকে মাহমুদের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পর ঘোরঅধিপতিরা পুড়িয়ে ভস্মে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু এ রকম কত শহর কতবার লুট করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে—কোনো প্রকারের উৎপাদন ক্ষমতা থাকলে সে-নগর পুনর্জন্ম লাভ করে। গজনী এক ধাক্কাতেই খতম।

হিন্দুস্তানের বিরাট স্বর্ণভাণ্ডার বার বার লুট করে, সে দেশটাকে প্রায় ফতুর করে দিয়ে, কুল্লে দৌলত পাঁড় দেশপ্রেমী একগুঁয়ে সুলতান মাহমুদ অকাতরে ঢাললেন ঐটুকু এক চিলতে গজনী অঞ্চলে। আজকের দিনে একশ' জর্মন বা রুশ "নো-হাউ" শ্বেতহস্তীকে পুষতে গেলে আমাদের বেল্টখানা তিন ফুটো টাইট করতে হয়! মাহমুদ এনেছিলেন হাজার হাজার "নো-হাউ" হুনুরী জলের দরে। পুরোপাক্কা প্ল্যানিংয়ের জন্য তাঁর সভায় বিজ্ঞজনের অভাব ছিল না।

সেই দোস্ত মুহম্মদের আমল থেকে আজকের প্রেসিডেন্ট দাউদ। অপরিবর্তনীয়তে কি এমন পরিবর্তন ঘটলো, কি এমন সোনাদানা জুটলো—তাও ধাবকর্জায়—যে "রিপাবলিক্" নামক নযা নাম দিতেই কুল্লে আফগান মল্লুকে মধুদুগ্ধেব ছয়লাপ লেগে গেল?

তা হলে আর ভাবনা কি? কাল থেকে ঢাকার নাম পালটে বলবো লণ্ডন, "পূর্বদেশেব" নাম পালটে বলবো "দি টাইমস", আর, হে পাঠক, তোমাবও আযের অঙ্ক হুশ কবে উঠে যাবে লন্ডনবাসীর কাঁধ মিলিয়ে। ঘরে ঘরে টি-ভি, গারাজে গারাজে মোটর। বছবে দেড় মাস ছুটি মন্টিকার্লোতে!!

সাধারণ আচরণ

কাবুল থেকে ১৮ আগস্ট প্রেবিত, কলকাতায় ১৯ আগস্ট প্রকাশিত খববে প্রকাশ, পাকিস্তান জাতীয় আওয়ামী দলের নেতা গাউস বখর বিজেনজো এবং আতা উল্লা খান মেংগলের গ্রেফতারীতে আফগান সবকার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ফলে আফগান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাবুলে অবস্থিত পাক রাষ্ট্রদূতকে এত্তেলা পাঠিয়েছেন এবং গ্রেফতারীর বয়ান দিতে বলেছেন।

ধবে নেওয়া যেতে পারে, আফগান পররাষ্ট্র বিভাগ শুধু যে জনসাধারণকে তাঁদের প্রাগুক্ত উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন তাই নয়, পাক রাষ্ট্রদূতকে সর্বপ্রথম এই চিত্তবৈকল্যের দুঃসংবাদ জানিয়েই তাঁকে "অভ্যর্থনা" জানাবেন। কাগজে বেরিয়েছে "ডেকে পাঠান" অতএব হয়তো অভ্যর্থনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

শুনেছি, এদেশে নাকি ইংরেজ আমলে হোম মিনিস্টার বা স্টেট সেক্রেটারি ফাঁসীর আসামীর করুণাভিক্ষার আবেদন না-মঞ্জুর করলেও পত্রশেষে পাদনামায় লিখতেন, "মহাশয় আপনার একান্ত বশীভূত ভৃত্য হওয়ার গৌরব প্রাপ্ত" অমুক "—আই হ্যাভ দি অনার টু বী, স্যার, ইওর মোস্ট অবিডিয়েন্ট" সারভেন্ট লেখার পর নাম সই করতেন। প্রকৃত সত্য নিরূপণার্থে দু-চারজন ইয়ারবখশীকে এই সাতিশয় সিভিল প্রশ্নটি

শুধোলে তাঁরা রীতিমত মিলিটারি হাঁক ছেড়ে গাঁক গাঁক করে যে-সব অশ্রাব্য উত্তর দিলেন তার থেকে অনুমান করলুম, তাঁদের প্রতি কখনো সরকার এমন অনুগ্রহ করেন নি যে, জনৈক সবৈতনিক রাষ্ট্রীয় কর্মচারী স্বহস্তে স-ম্মানে একটি প্রয়োজনাতীত সুদীর্ঘ নেকটাই তাঁদের গলায় পরিয়ে পায়ের নিচের টুলটি এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে, কবিবরের ভাষায় "দোদুল দোলায়" দোদুল্যমান করবে। তথাপি আমার মনে ধোঁকা রয়ে গেল, সদাশয় সরকার এবম্প্রকার দুর্লভ গৌরব দেখালে তাঁরা মহারাণীর জন্মদিনে প্রদত্ত খেতাবের মত সে নেকটাই গ্রীবাদেশে পরিধান করতেন কি না। আমার প্রশ্ন, আদব-কায়দার প্রটোকল সংক্রান্ত।

সচরাচর কাবুলে এগানা-বেগানা কেউ এলেই উচ্চকণ্ঠে সম্বর্ধনা জানানো হয়, "আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক—ব-ফরমাইদ তশরীফ আনয়ন করুন—তশরীফ বিয়ারিদ, আপনার কদম মবারক হোক—কদম তান মবারক, আপনার চশম রৌশন হোক—চশমে তান রওশন।" সম্পূর্ণ পাঠটি বেহদ দরাজ পত্রিকায় গুনজাইশ নেহাযেত তঙ্গ। আমি মজবুর হয়ে মুখ তসবে কাবুলের সিভিল প্রটোকলটি সেরে নিলুম।

কিন্তু এস্থলে কার্যকরী হবে, ডিপ্লোমিটিক অর্থাৎ কূটনৈতিক কিংবা, রাজদূত সমাগম-সুলভ রাজসিক প্রটোকল। সে প্রটোকল বহুরূপী। যেমন ধরুন একটি সুপরিচিত নজীর : বার্লিনস্থ ফরাসী রাজদূত কুলোঁদ্র পূর্বাহ্নে এত্তেলা দিয়ে গিয়েছেন জর্মন ফরেন অফিসে —জর্মন পররাষ্ট্র মন্ত্রী যোখিম ফন রিবেন্ট্রপকে স্বহস্তে একটি মহামূল্যবান রাজপত্র সমর্পণ করতে। রিবেন্ট্রপ কেন, ফরেন অফিসের নগণ্য ফুট-ফরমাইশের ছ্যামড়াডা তক জানে সে দলিলটি কি।

বিঘোষিত দৌবারিক দ্বার উন্মোচন করে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিবে, "হিজ একসেলেনসি সম্মানিত ফরাসী রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ অধিকারাধার (প্লেনিপোটেনশিয়ারি) রাষ্ট্রদূত সর্বোচ্চ সম্মানাধিপতি মসিয়ো কুলোঁদ্রা!" গৃহমধ্যে উচ্চাসনে বসে আছেন এক দিকে ফন রিবেন্ট্রপ। সম্মুখে বী-টীম ফুটবল খেলার মত বৃহৎ টেবিল। অন্যদিকে অভ্যাগতের জন্য একখানা নাতি উচ্চাসন। কুলোঁদ্র অন্যদিনের মত ফরাসী ভাষায় বুজুর বা জর্মনে গুটন টাখ বলবেন না। যে-চেয়ারে বসার কথা, সেটাকে উপেক্ষা করে ঋজু কঠিন মেরুদণ্ড টান টান করে খাড়া দাঁড়িয়ে সুদ্ধমাত্র গ্রীবাটি ক্ষণতরে পোয়াটাক ইঞ্চি নিচু করে বাও করবেন। রিবেন্ট্রপও উঠে দাঁড়িয়ে সম-মেরুদাবে বাও করবেন, মেহমানকে অন্যদিনের মত আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাবেন না বা হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়াবেন না। বলা বাহুল্য, দুজনারই মুখমণ্ডল দেখে মনে হবে দুজনারই দারুণ কোষ্ঠকাঠিন্য।

আমি একটি প্রকৃত ঘটনারই বিবরণ দিচ্ছি। এটা ঘটেছিল ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এ। তার আগে আরেকটা ঘটনার উল্লেখ করে নিই। আজ ২২ আগস্ট। চৌত্রিশ বৎসর পূর্বে ঠিক গতকাল আমাদের প্রাগুক্ত রিবেন্ট্রপ গিয়েছিলেন মস্কো। সেখানে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল এমনই সম্মান, যেটা বাজার বাজার কপালেও কালেকস্মিনে লেখা থাকে। রিবেন্ট্রপ তাঁর প্রভু হিটলারের হয়ে স্তালিনের সঙ্গে বিশ্বসংসারের অপ্রত্যাশিত অকল্পনীয় এক মৈত্রীচুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর স্তালিন চেঁচিয়ে উঠলেন, "প গালে, প গালে—গেলাশ গেলাশ।" সঙ্গে সঙ্গে জনা ছয় কমরেড হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। সমবেত কমরেডদের জন্য সেই জার-আমলের ফেনসি গেলাস, আর ইহলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্যামপেন। ফটাফট বোতলের কর্ক লম্ফ মেরে ঠোক্কর দেয় ছাতে। শ্যামপেন বইতে

লাগল যেন, জাহ্নবী-যমুনা, বিগলিত করুণা, নাহি তার তুলনা। স্তালিন মদ খেতে পারতেন জালা জালা! আর-সব কমরেড টেবিলের তলায় বেহেড মাতাল হয়ে অচৈতন্য হওয়ার পরও স্তালিন একা একা চালিয়ে যেতে পারতেন আরেক পাল শুষ্ক-কণ্ঠ নয়া কমরেড না আসা পর্যন্ত। তাদের অবস্থাও হতো তদ্বৎ। হিটলার ছিলেন নিরামিষ-ভোজী, মদ্যে বিরাগ। অথচ তাঁর দোস্ত ছিলেন পাঁড় পীনেওলা, ফোটোগ্রাফার হফমান। তাঁকে রিবেনট্রপের সঙ্গে পাঠিয়েছেন, মৈত্রী পরবের ছবি তুলতে, আর স্তালিনের সঙ্গে সুধাপানে পাল্লা দিতে। হফমানই সে জলসার রসময়—উভয়ার্থে—সরেস বর্ণনা দিয়েছেন, হিটলার গত হওয়ার পর তাঁর কেতাবে "হিটলার ছিলেন আমার দোস্ত"। এটা হল সৌজন্যের প্রটোকল সুধাপান ম্যাচ ও সেই প্রটোকল অনুযায়ী ড্র যায়।

সে সন্ধ্যায় হিটলার তাঁব সাঙ্গপাঙ্গসহ জর্মনিতে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আকাশে "উত্তরের আলো" দেখছিলেন। নৈসর্গিক এই সূর্যরশ্মি মাঝেসাঝে দেখা যায়। হিটলারের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের মন্ত্রী স্পের (যুদ্ধ চালনার অপরাধে কুড়ি বৎসব জেল খেটে বেরবার পর) তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ "স্মৃতিচাবণ" গ্রন্থে লিখেছেন, সমস্ত আকাশ টকটকে লালে লাল হয়ে গিয়েছে, আমাদের হাত মুখ যেন সে লালের ছোপে লাল হয়ে গিয়েছে। লালের সেই লীলা-খেলায় আমাদের মন যেন অদ্ভুত এক চিন্তায় নিমজ্জিত। হঠাৎ হিটলার তাঁর অন্যতম মিলিটারি এ্যাডজুটেন্টের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "গাদা গাদা রক্তের মত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, এবারে বিনা রক্তপাতে আমরা সফল হব না।"

আমার এক বোন এবং সিলেটেব আরো কে একজন বলছিলেন, তাঁবা ১৯৭১-এব ২৫ মার্চ রক্তে রাঙা অস্বাভাবিক টকটকে লাল সূর্যাস্ত দেখেছিলেন। এঁদের দুজনাই অতিশয় ধর্মনিষ্ঠ, সর্ব কুসংস্কারবর্জিত। তবু নাকি তাঁদেব মনে এক অজানা অস্বস্তি অনেকক্ষণ ধবে জেগে রযেছিল।

হিটলারি হেকমত

যাক সে-কথা। খুব একটা দূরে চলে আসি নি। আর সামনেই ৩রা সেপ্টেম্বর। কুলোঁদ্র রিবেনট্রপ দুজনাই যেন আজন্ম মূক বধির—এতক্ষণ অবধি। অতঃপর কুলোঁদ্র প্রতিটি শব্দ যেন হরফ গুনে গুনে পড়ে গেলেন জর্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের যুদ্ধ-ঘোষণা। ঘোষণান্তে এস্থলে রিবেনট্রপ ত্রিবিধ পন্থার যে কোনো একটা বেছে নিতে পারেন। নীববে ঘোষণাপত্র গ্রহণ করতে পারেন, কিংবা বলতে পারেন তিনি এ ঘোষণা আন্তর্জাতিক বিধিবিধান বিরোধী বে-আইনীরূপে গণ্য করে ঘোষণাটা রিজেক্ট করছেন, কিংবা ঘোষণা সম্বন্ধে আপন মন্তব্য প্রকাশ করতে পারেন। রিবেনট্রপ কষায় বদনে, প্রকৃতিদত্ত তাঁর বেতমীজ কণ্ঠে অতি দীর্ঘ এক বিবৃতি পড়ে যেতে লাগলেন—অবশ্য দুই পালোয়ানই তখনো ঝাণ্ডার ডাণ্ডার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে, নড়নচড়ন-নট-কিচ্ছু—দফে দফে বয়ান করলেন ফ্রান্সের অগুণতি অপবাধ, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য নীরন্ধ্র নিরবচ্ছিন্ন গুণাগার হাবামী একমাত্র ফ্রান্সই, জর্মান গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসী পাতাটি। সর্বশেষে কণ্ঠস্বর এক পর্দা চড়িয়ে বললেন, যুদ্ধ যদি লাগে তবে ফ্রান্সই সর্বাংশে দায়ী।

মসিয়ো কুলোঁদ্র স্থিরদৃষ্টিতে রিবেনট্রপের দিকে তাকিয়ে দুটি মাত্র শব্দ বললেন, "লিস্তোয়ার জ্যুজরা"—"বিচারিবে ইতিহাস।" বৃথা বাক্য। ইতিহাসই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ বিচারক।

প্রথম দর্শনের মাথা নিচু করে বাও করা থেকে মাষা পরিমাণ কমিয়ে পুনরায় বাও করার আভাসটুকু ছুঁইয়ে কুলৌদ্র ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান করলেন। ব্যস। ইরানী জবানে বলে, "অতঃপর আলোচনার গালিচাখানি গুটিয়ে গুটিয়ে রোল করে বোন্দা পাকিয়ে ঘরের এককোণে দাঁড় করিয়ে রাখা হল।"

এ-ধরনের ঘোষণার শেষে প্রথম পাঠেই, উভয় দেশের ইলচির স্বদেশ প্রত্যাগমন ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে দু-একটি নিতান্তই প্রতি পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় ফরমুলা থাকে। আমার টায়-টায় মনে নেই। এ দুনিয়ায় নাতিহ্রস্ব জিন্দেগীর চন্দ রোজের মুফাফিরীতে এ-তাবৎ "তোকে আমি দেখে নেবো" চারটি মাত্র শব্দ বলে কাউকে নিরস্ত্র কথা-কাটাকাটির নির্জলা যোঝাযুঝিতেও দাওয়াত জানাতে এ ভীরু আদার ব্যাপারী ধারকর্জ করেও হিম্মৎটুকু যোগাড় করতে পারে নি—সে রাখবে মানওয়ারী জাহাজের খবর!

কাবুলী কায়দা

বেলুচিস্তানে কয়েকজন হোমরাচোমরাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তা তাঁবা যতই গেরেমভারী হন না কেন, তাই নিয়ে আফগানিস্তান হিটলারি হেকমতে তুলকালাম কাণ্ড করবে অর্থাৎ সেটাকে আন্তর্জাতিক আইনে যাকে বলে 'কাজুস বেল্লি', 'ওয়ার কজ', 'যুদ্ধ ঘোষণার জন্য যথেষ্ট কারণ' এ কথা বলবে না। অবশ্য আমাদের সকলেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে খুন জখমের মত মারাত্মক ব্যাপারের মূল কারণ খুঁজতে গিযে প্রায়ই শেষটায় দেখি, অতি তুচ্ছ "কারণে" বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল। বড় বড় যুদ্ধের পিছনে আকছারই দেখা গেছে, যে কারণে আখেরে লড়াই শুরু হয় সেটা কোনো কারণই নয় ইতিহাস বার বার সে সাক্ষ্য দেয়। উপস্থিত আফগান পক্ষ কি ভাবে তাঁদের বক্তব্য, আপত্তি, প্রতিবাদ, শাসানো যেটাই হোক পেশ করবেন বা চোখ রাঙ্গাবেন তার উপর আখেরী নতীজা অনেকখানি নির্ভর করছে। আমরা তাই একাধিক কাল্পনিক ছবি আঁকতে পারি মাত্র :

আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বয়ং সরদার দাউদ বা তাঁর প্রতিনিধি : বেলুচিস্তানে এ-সব কি হচ্ছে?

মিঃ ভুট্টোর নির্দেশ অনুযায়ী পাক রাষ্ট্রদূত (যদি মোলায়েম হওয়ার নির্দেশ থাকে) "হেঁ হেঁ হেঁ! কিছু না, কিচ্ছুটি না।" (যদি গরম নির্দেশ থাকে) "তোমার তাতে কি ভেটকি-লোচন?"

আফগান পক্ষ : "বটে! আমার তাকে কি? এ-সব জুলুম চলবে না। দেশ শান্ত করো।"

পাক পক্ষ : "ওটা আমার ঘরোয়া ব্যাপার।" এই ঘরোয়া-ব্যাপারের জিগির গেয়ে গেয়ে পাকিস্তানের গলায় কড়া পড়ে গেছে।

আ প : "নিতান্তই আন্তর্জাতিক, দ্বি-রাষ্ট্রীয় ব্যাপার এটা। দেশের লোককে বেধড়ক ঠ্যাঙ্গাবে, তারা শুধু বেলুচ নয়, পাঠানও বিস্তর, তারা সীমান্ত পেরিয়ে আমার দেশে ঝামেলা লাগাচ্ছে, এদেশে পাঠানকে তোমার দেশের পাঠান দিবারাত্রির তাতাচ্ছে, তোমার সঙ্গে লড়াই দিতে।"

পা প : "তোমার দেশ তুমি সামলাও।"

আ প : "ইন্ডিয়ার ঘাড়ে একবার লক্ষ লক্ষ বাঙালি চাপিয়ে যে আক্কেল-সেলামীটা দিলে তার পরও তোমার হুঁশ হল না?"

পা প : "কেন, খারাপটা কি হল? ইয়াহিয়া গেছে, বেশ হয়েছে। আমরা 'নরুন দিয়ে হাঁড়ি পেলুম তাক ডুমাডুম ডুম' আমরা ইয়াহিয়া দিয়ে ভুট্টো পেলুম, তাক ডুমাডুম ডুম। জ্ঞানে লুকমান, বিচারে সুলেমান, বুদ্ধিতে—"

আ প : (বাধা দিয়ে) "সুলেমান শব্দের সঙ্গে মিল একটা বিশেষ জনের আছে, কিন্তু—"

পা প : (বাধা না মেনে)

"সুধা পানে এজিদ শা।
জঙ্গী লড়ায়ে কামাল পাশা॥
ফলসফাতে আফলাতুন—"

অকস্মাৎ দৌবারিকের প্রবেশ। হন্তদন্ত হয়ে বললে, "বাঙ্গালা দেশে, না কি যেন নাম, সেখান থেকে কিছু লোক সোঁদরী, না কি যেন লকড়ি, না লাঠি—নিয়ে এসেছে।"

আ প : "কি তাজ্জব! পাকিস্তানের লোকটা গেল কোথায়?"

ঘরে বাইরে, জেলে বাইরে

বিংশ শতাব্দীর যে একটি সম্পূর্ণ নূতন পরিবর্তন দেশের শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে একদা চিন্তিত করে তোলে এবং আজ যেটা নিতান্ত বুড়ো-হাবড়া ছাড়া আর-সবাই অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়, সেটা ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগ দেওয়া নিয়ে। আজ যদি ঢাকাতে কোনো একটা ঘটনা সর্বসাধারণের মনে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং পর দিন তারই ফলে দেখা যায়, আপিস-আদালত-দোকানপাট বন্ধ, বেতার কথা কয় না, কাগজওয়ালা কাগজ দেয় নি আর রাস্তায় রাস্তায় বিরাট বিরাট মিছিল কুম্ভে শহরটাকে গিলে ফেললে, শুধু—শুধু কোনো মিছিলে একটি মাত্র ছাত্র—সরি—ছাত্রীছাত্র নেই, তবে আপনার-আমার মন কি ধরনের ঝাঁকুনি, বরঞ্চ বলা উচিত, কি ধরনের বিজলির শক্ খাবে সেটা কল্পনা করতে পারেন কি? কারণ শুধিযে যদি শুনতে পান, ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়িতে হোস্টেলে দোরে খিল দিয়ে পাঠ্য বই পড়ছে এবং বলছে, "প্রশাসনে যোগ দিলে লেখা-পড়া করবো কখন? তোমরা মিছিল করে গণতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, জুন্তাতন্ত্র, যে ঢপের গবরনমেন্টই কায়েম করো না কেন, দু'দিন বাদে সেটা চালাবার জন্য আমরাই তো হব মন্ত্রী, সেক্রেটারি, পার্লামেন্টের মেম্বার, ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনীয়ার। এখন যদি রাজনীতি, অর্থনীতি, এডমিনিসট্রেশন, গয়রহ ভালো করে না শিখি, তবে সরকারের রূপটা পাল্টে কিই বা এমন পাকা ধান ঘরে তুলবে তোমরা?"

সত্যিই তো। ৪৭-এ যখন ভারত সরকার তৈরী হল, তখন দেখা গেল যেসব আত্মোৎসর্গকারী নেতারা মন্ত্রী হলেন, যাঁরা পার্লামেন্টের মেম্বার হলেন, তাঁদের বেশীর ভাগই কলেজজীবন থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত কাটিয়েছেন জেলে জেলে। মাঝে-মিশেলে আম-কাঁঠালের ছুটিটা-আসটা পেয়েছেন বটে, কিংবা অতীব অকারণে হঠাৎ করে গাঁধী বড়লাটে একটা ফয়সালা হয়ে যাওয়ার বরকতে এবং ঐ সুবাদে জেলগুলোর

চুনকাম-মেরামতী, তদুপরি জেল-সাম্রাজ্যের ইনসপেক্টর জেনারেল গোরা রায়দের বহুদিনের প্রাপ্য "হোম" যাওয়ার মুলতুবী ফার্লো ছুটি যখন আর কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যায় না, এহেন ত্র্যহস্পর্শ উপলক্ষে তাঁদেরও কিছুদিনের তরে নেটিভ হোম দেখার জন্য মহামান্য সম্রাটের রাজসিক অতিথিশালা থেকে ঝেঁটিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে—এ সত্যটাও অস্বীকার করা যায় না। ততোধিক অস্বীকার যায় না, কেউ বেরিয়েছেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, কেউ ডিগ্রীহীন জ্বর-যক্ষ্মা নিয়ে, কেউ বা স্ট্রেচারে শুয়ে শুয়ে বাড়ি এসেছেন, যাতে করে তাঁর হাড্ডিগুলো বাপ-পিতেমোর হাড্ডির সঙ্গে সম্মিলিত হয় : সরকারী ইংরিজিতে বলা হয় যাতে করে "হিজ বোনস আর গ্যাদার্ড আনটু হিজ ফোর-ফাদার্স", অথবা একই শ্মশানে পিতৃপুরুষের ভস্মের সঙ্গে তাঁর ভস্ম মিলিত হবে বলে।

সুস্থই হোন আর নিম-মরাই হোন, ঐ চন্দ্ররোজের ফুরসতে তাঁরা যে মার্শাল মার্কস কেইনস লাসকি পড়ে বিদ্যাদিগ্‌গজ পণ্ডিত হয়ে যাবেন কিংবা দেশের বাজেট কিভাবে চৌকশ ব্যালানস করে বানাতে হয়, অথবা নামকে-ওয়াস্তে যে সব এসেমব্লির তখনো সেসন হচ্ছে, সেগুলো নিত্যদিন এটেন্ড করে তর্কাতর্কি, নন-কনফিডেনসের ঘোল খাওয়ানোর কায়দা-কেতা রপ্ত করে নেবেন এমনতবো দুরাশা কবা যায় না।

আমার পাপ মন থেকে কেমন যেন একটা বেয়াদব সন্দেহ কিছুতেই দূর হতে চায় না, মহাত্মা গান্ধী তাই বোধ হয়, স্বরাজ লাভের পর সভযে পার্লামেন্টের ছাযাটি পর্যন্ত মাড়ান নি। হিন্দু মহাসভার হামলাতে কুপোকাৎ হয়ে যেতেন না তিনি? আপনারা বলবেন, "ক্যান? বারিসডরিডা তেনাব পাস করা আছিল না?" হঃ! খুব আছিল! কলকাতা পার্কে বিলিতি কাপড় পোড়ানোর জন্য যখন একদিন আসামী হয়ে দাঁড়ালেন, ততদিনে বেবাক ব্যারিস্টাবি বিদ্যে কর্পূব হয়ে উপে গিয়েছে—হাওয়ায় হাওয়ায়! সঠিক মনে নেই, কাকে উকিল পাকড়ে ছিলেন। আমাদের চাটগাঁযেব সেনগুপ্তকে? তিনি তখন জেলে না বাইরে, তাও ভুলে গিয়েছি। বাইরে থাকলে তাঁকেই ধরা উচিত ছিল। তাই বলছিলুম, আইনের এলেম যদি তাঁর পেটে এক দানাও থাকতো তবে কি তিনি নিদেন একটা ডেপুটি মিনিস্টারও হতে পারতেন না! পক্ষান্তবে স্মবণে আনুন, গাঁধী যে রকম পার্লিমেন্টের মুখদর্শন করেন নি, লেট ব্যারিস্টাব জিন্নাও হুবহু তেমনি জেলের মুখ দর্শন করেন নি। তিনি কাইদ-ই-আজম, সদব-ই-পাকিস্তান হবেন না তো হবে কে? গাঁধী?

এই জেলের কথা যখন নিতান্ত উঠলোই তখন রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়লো। তিনি তো কোনো প্রকারেব দেশ-সেবা করেন নি, কোনো প্রকারের "বাণী" রেখে যান নি, তাই বলছি। রবীন্দ্রনাথ যখনই খবর পেতেন তাঁর কোনো প্রাক্তন ছাত্র, কোনো ছাত্র বা শিক্ষকের আত্মীয় ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে জেল থেকে বেবিয়েছে বা তাঁর কোনো পরিচিত রুগ্ন যুবার পিছনে পুলিশ বড্ডবেশী তাড়া লাগাচ্ছে, সে ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে, তখন তাকে ডেকে পাঠিয়ে বলতেন, "এখানে থাক। শরীরটা সারিয়ে নে। লাইব্রেরি রয়েছে। পড়াশোনা কর।" যদি তাঁর মনে হতো, পুলিশ নাছোড়বান্দা, তাহলে টেগার্টকে জানিয়ে দিতেন, "আমার এখানে অমুক এসেছে, রুগ্ন শরীর সারাতে। আমি কথা দিচ্ছি, সে যতদিন এখানে আছে, এ্যাকটিভ পলিটিকস করবে না।" কেন জানিনে, টেগার্ট কবির কথা শুনতেন এবং আরেকটি ঘটনার কথা আমি ভালো করে জানি। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ এক যুবা, এ-দেশে কম্যুনিজমের উদয়-কালে সে-মতবাদের

অত্যুৎসাহী সমর্থক ও প্রচারক হয়ে যায়। টেগার্ট যে-কোনো কারণেই হোক, তাকে ধরতে চাননি। কবিকে জানান, "অমুককে বলুন না, সে মস্কো চলে যাক। কম্যুনিজম স্বচক্ষে দেখে আসুক। আমি তাকে পাসপোর্ট দেব।" হয়তো টেগার্ট ভেবেছিলেন, দূর থেকে অনেক জিনিসই সুন্দর দেখায়, কবি বায়রণের ভাষায়,—

"সে যেন জীর্ণ প্রাসাদ ঘেরিয়া
শ্যামা লতিকার শোভা,
নিকটে ধূসর জর্জর অতি
. দূর হতে মনোলোভা।"

যুবার সঙ্গে আমার বার্লিনে দেখা হয়। টেগার্টের আশা আধাআধি সফল হয়েছিল। ভদ্রলোক তখন স্তালিনের নাম শুনলে ক্ষেপে যেতেন। মস্কো থেকে সদ্য ফিরে এসেছেন। তাঁর মতবাদ হয় স্তালিনের পছন্দ হয় নি কিংবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, তাঁকে রাশা ছেড়ে বার্লিনে চলে আসতে হয়। কিন্তু মার্কসিজমে দৃঢ়তর বিশ্বাস এবং আস্থা নিয়ে তিনি কম্যুনিজমের জন্মভূমি ত্যাগ করেছিলেন।

পলিটিক্স্-হীন ছাত্রসমাজ?

কল্পনাও করা যায় না, কি গুমোট গরমে এই ঢাকায়, কি কাবুলের মোলায়েম ঠাণ্ডায়—আজকের দিনে।

গুন গুন করছি,

রজনী নিদ্রাহীন
দীর্ঘদগ্ধ দিন,
আরাম নাহি যে জানে।
ভয় নাহি ভয় নাহি,
গগনে রয়েছি চাহি
জানি ঝঞ্ঝার বেশে
দিবে দেখা তুমি এসে।
একদা তাপিত প্রাণে॥

রাত দুটো বাজতে চললো। আল্লা মেহেরবান। ঝঞ্ঝা থাক মাথায়। ঝঞ্ঝার গুরু সাইক্লোনের কৃপায় এ-দেশটা যায়-যায়। মোলায়েম ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। বুড়ীগঙ্গা ছাড়িয়ে, বাংলাদেশ রাইফেলসের বিরাট মাঠ পেরিয়ে, চাঁদমারি টিলাটার বেণুবনের ভিতর দিয়ে। কিন্তু হায়, কোথায় সে বেণুবন—দেড় বছর আগেও যা ছিল? টিলাটার নিচ দিয়ে বারো মাস বয়ে যায় ক্ষীণ জলধারা, কচুরিপানা ঠেলে ঠেলে এগোয়, ছোট্ট নালা বেয়ে সাত-মসজিদ-রাস্তার দিকে। আর বর্ষায় তার কি দাপট! এই এখন মৃদু পবনে আকাশ-ছোঁয়া বাঁশ দুলে দুলে এ ওর গায়ে পড়ে মৃদু মর্মর গানে মর্মের বাণী শোনাতো, কানে কানে, কত গোপন গানে গানে। আর বর্ষার আকাশ-বাতাসের দাপটের সময় দেখেছি, অরণ্য হতাশ প্রাণে, আকাশে ললাট হানে—শহীদের মাতারা যেন আকাশে মাথা কুটছে, বিরাম না মেনে চলছে তাদের ক্রন্দন!

সে বেণুবন দেড় বছরে আজ প্রায় নিঃশেষ। যে পারে, যার ইচ্ছে কেটে নিয়ে গেল

প্রথম দীর্ঘাঙ্গীদের। এখন কচি বাঁশগুলো যখন কাটে, তখন আমি দুকানে আঙ্গুল গুঁজে দাঁতে দাঁত কাটি। হাউসমানের কবিতায় পড়েছিলুম, হতভাগার ফাঁসী হবে পরের দিন ভোরে। নিরেট অন্ধকারে চোখ মেলে সমস্ত রাত ধরে শুনছে, খট খট শব্দ। বাইরে ফাঁসীকাঠ তৈরী করছে মিস্ত্রিরা—তারই পেরেক ঠোকার খট-খট আওয়াজ রাতভর। ঐ কাঠেই সে ঝুলবে; ঘাড়ে দড়ি বেঁধে দেবে ফাঁসুড়ে। হাউসমান কবিতা শেষ করেছেন এই বলে, যে-ঘাড় খুদাতালা তৈরী করেছিলেন অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে...মট করে মটকাবার জন্য না।

শেষ বাঁশ কাটা হয়ে গেলে আমিও শান্তি পাবো। কিন্তু মরবে আরেক জন।

যে-টিলাটার উপর চাঁদমারির পাঁচিল, সেটা নালার সম্বৎসর বয়ে যাওয়া পানিতে, বিশেষ করে বর্ষার প্রবল আঘাতে যেন ক্ষয়ে গিয়ে ধস নেমে পাঁচিলটা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে না পড়ে, তাই টিলাটার সানুদেশ, নালার কিনারা অবধি সমস্তটা ছেয়ে বাঁশ লাগিয়েছিলেন সেই দূরদর্শী গুণী যিনি চাঁদমারির পুরো প্ল্যানটা তৈরী করেছিলেন—তিনি বাঙ্গালী। আমার মত মূর্খও বাঁশবনের তত্ত্বটা বুঝতে পারে। এখন অন্ধকার—কৃষ্ণা দশমী; বলতে পারবো না, আর ক'টা কচি বাচ্চা বাঁশ অবশিষ্ট আছে। দিনের আলোতে গুনতে দেড় আঙ্গুলের বেশী লাগবে না।...লোকে বলে, "যাক্ না কেন জোয়ার জলে। খাক্ না কেন বাঘে। কোন অভাগা জাগে।" আমার তাতে কি! ভাঙবে ব্যাটা পাঁচিলটা।

ছাত্ররা বলেন, "পেশাদারী পলিটিশিয়ান দেশের কথা যত না ভাবে, নিজের স্বার্থের কথা ভাবে ঢের ঢেব বেশী (নিউগেটের পর কে অস্বীকার করবে এ তত্ত্বটা?)। আমরা এখনো সংসারে জড়িয়ে পড়ি নি। আমরা করাপট হব না, চট করে। পারলে দু-চার জন করাপট প্রফেশনালদেব ঠ্যাঙ্গাতেও আমাদের বাধবে না।" কথাটার মধ্যে ও বাইরে গভীব জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস স্বপ্রকাশ। প্রাচ্যের পলিটিকসে করাপশন বেশী বলেই এ-ভূখণ্ডে প্রথম ছাত্র আন্দোলন আরম্ভ হয়। কাবুল পর্যন্ত পৌঁছতে একটুখানি সময় লেগেছে। বছর দশেক পূর্বে কাবুল পার্লিমেন্টে বোর্কাহীন, অনবগুণ্ঠিতা একজন মহিলা সদস্যা লেকচার দিতে উঠলে, প্রাচীন-পন্থী কট্টর আরেক সদস্য ছুটে গিয়ে, তাঁকে আক্রমণ করে, তাঁর জামা-কাপড় ছিঁড়তে আরম্ভ করে। নিরুপায় হয়ে তিনি পার্লিমেন্টগৃহ ত্যাগ করে প্রাণপণে ছুটে গিয়ে একটা হস্টেলে ঢোকেন।

ছাত্ররা তাঁকে আশ্রয় দেয়। খবর পেলুম এবারে তারা খোলা ময়দানে নেমেছে। তাদের ভিতর মাও, মস্কো, র‍্যাডিকাল তিন দলই আছে। ভাবছি, সিরীজের শিরোনামাটা পাল্টাবো কি না।

*

*　　*

মোন-জো দড়োর বংশধর দড় বেলুচ

'মৃত', ইংরিজি 'মর্টেল' 'মার্ডার', ফরাসী 'মর', জর্মন 'মর্ড', ফরাসী 'মুর (দন)', গ্রীক 'ব্রতস'—ইন্ডো-ইয়োরোপীয়ান সর্ব ভাষাতেই 'মরা' অর্থে সংস্কৃত 'মৃ'='মরা' পাওয়া যায়। বর্তমান দিনে উত্তর ভারতের সব ভাষাতেই ঐ 'মৃ' পাওয়া যায়, বাংলায় 'মরা', হিন্দীতে 'মরণা' ইত্যাদি ইত্যাদি।

সিন্ধীতেও ঐ 'মো' দিয়েই 'মর' মানুষের সর্বশেষ ইচ্ছা-অনিচ্ছাকৃত কর্মটি প্রকাশ করা হয়। সেই 'মো'-এর সঙ্গে 'ন' যোগ দিয়ে 'মৃত' শব্দের বহুবচন নির্মাণ করা হয় : ফলে সিন্ধীতে 'মোন' শব্দের অর্থ 'মৃতরা'। উচ্চারণ করার সময় সিন্ধীরা আমাদের মত 'মোন' বা 'মন'-এর মত করেন না। আমরা, পূর্ব বাংলায়, যে রকম মেঠাই 'মোহনভোগ' উচ্চারণ করার সময় 'মোহন' শব্দের 'হ'টি 'অ'-এ পরিণত করে 'মো'টা আরেকটু লম্বা করে দি, সিন্ধীরাও ঠিক তেমনি উচ্চারণ করেন, যেন শব্দটা 'মোঅন'। বাংলায় আমরা যে রকম 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ' বাক্যটিতে বড়লোকদের সঙ্গে তাঁদের পীরিতির সম্পর্ক বোঝাবার জন্য 'র' অক্ষর যোগ দি, কিংবা ইংরিজিতে 'ফুলস প্যারাডাইজ'—'আহাম্মুকেব স্বর্গ', 'ডগস টেল'—কুকুরের ল্যাজ বাক্যে এপসট্রফি এবং 'এস' অক্ষর যোগ করি, হিন্দুস্তানীতে 'রহমতকা বেটা'—রহমতের ছেলে বাক্যে 'ক' জুড়ি, সিন্ধীরা তেমনি 'মৃতদের টিলা' আপন ভাষাতে লেখেন 'মোন-জো-দড়ো', উচ্চারণ করেন প্রাগুক্ত পদ্ধতিতে—'মোঅন' (কিন্তু 'মো' আর 'অ'-এর মাঝখানে আরবীর হামজার মত সামান্য আমরা একটুখানি থেমে যাই, সেটা করা হবে না, 'মো'-র ও-কারটা শুধু দীর্ঘতর কবতে হবে) 'জো দড়ো'।

প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার ভগ্নস্তূপ যে স্থলে আছে, তার আশপাশের আধুনিক জনগণেব মধ্যে একটা বহুদিনকার কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল, ঐ টিলার নিচে বিস্তর মৃতজন রয়েছে। সঠিক কিন্তু তড়িঘড়ি অনুমান করে বসবেন না যে ঐ (লারকানা) অঞ্চলেব জনপদবাসী —সিন্ধুর চার-পাঁচ হাজাব বৎসরেব মৃত, পৃথিবীব অন্যতম প্রাচীনতম সভ্যতার স্মরণে টিলা অঞ্চলের নাম দিয়েছিল মোন-জো দড়ো। বস্তুত তাদের ধারণা ছিল, একদা ওখানে প্রাচীন বৌদ্ধদের বিহার-ভূমি ছিল।

আমি লোকমুখে যা শুনেছি সে অনুযায়ী পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এই টিলাটি প্রথম দেখেন, তখন এটাকে কোনো বৌদ্ধস্তূপেব ভগ্নাবশেষ বলেই ধরে নিয়েছিলেন, কাবণ হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর সময়ে সিন্ধু দেশের বাজা যদিও হিন্দু ছিলেন, তবু সে দেশে যথেষ্ট বৌদ্ধ বিহাব সঙ্ঘাবাম আছে। যতদূব মনে পড়ে, রাখালদাস টিলা খোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম পান বৌদ্ধ-নিদর্শন, আরো গভীরে যাওয়ার পর বেরুলো এমন সব বস্তু, যা বাখালদাসেব মত সুপণ্ডিত প্রত্নতাত্ত্বিক পৃথিবীব কোনো যাদুঘরে বা তার দর্শনীয় বস্তুর ছবিতে দেখেন নি। অর্বাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক হলে হয়তো এগুলো অবহেলা কবতো, এবং চিরতরে না হলেও বিশ্বজন হয়তো বহু শতাব্দী অপেক্ষা করার পব এ সভ্যতার সন্ধান পেত। রাখালদাস প্রথম দর্শনেই বুঝতে পেরেছিলেন এব অনন্যতা ও নিশ্চয়ই 'ইউরেকা' হুঙ্কার রব ছেড়েছিলেন।

গোড়াতে বহু পণ্ডিতই ধাবণা করেছিলেন, সিন্ধু সভ্যতা উত্তর সিন্ধু থেকে পাঞ্জাব (হাবাপ্পা) অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরে দেখা গেল, সুদূর প্রসারিত ছিল এ-সভ্যতা। তাহলে সমস্যা দাঁড়ায়, এত বড় বৃহৎ সভ্যতাকে সম্পূর্ণ নির্মূল-নিশ্চিহ্ন করাটা তো খুব একটা সম্ভাব্য সাধাবণ ব্যাপাব নয়। আমি কোনো সদুত্তর পাই নি, এটা না বললেও চলবে।

এ-সভ্যতা অন্তত বেলুচিস্তান অবধি যে সম্প্রসারিত ছিল সেটা পরে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু অদ্যকার মোন-জো দড়ো অঞ্চলের সিন্ধীদেব কোনো কিছুতেই যে-রকম প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না (ঐ লারকানা অঞ্চলের অধিবাসী মিঃ

ভুট্টো আজ সেই বিদগ্ধ অতিপ্রাচীন সভ্যতার বংশধররূপে বড়ফাট্টাই করেন কি না, সেটা দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের রাজনৈতিকরা বলতে পারবেন না) ঠিক তেমনি অদ্যকার বেলুচদের কি চিন্তা, কি জীবনধারায় সিন্ধু সভ্যতাব চিহ্নমাত্র নেই। বস্তুত (ভবিষ্যতের) পখতুনিস্তান, বর্তমান আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, তুর্কমানিস্তান প্রভৃতি ভূখণ্ডে যেখানে পর পর বৌদ্ধ সভ্যতা হিন্দু সভ্যতা, সর্বশেষে হিন্দু-বৌদ্ধ মিলিত সভ্যতা প্রচলিত ছিল সেখানে এগুলোর সন্ধান আজ আর পাওয়া যায় না, অর্থাৎ এদের জীবনের উপর ওরা কোনো প্রভাবই বেখে যায় নি। এমন কি ইউরোপের শিক্ষিত খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উপর হীদেন গ্রীক, রোমান এমন কি বর্বর টিউটন যে গভীর দাগ কেটে গেছে তার শতাংশের একাংশও না। পরবর্তীকালে এই বাংলাদেশ যেভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে, এ দেশের চাষা জেলে যতখানি ইসলাম মেনে চলে, পাঠান বেলুচ উজবেক, কিজিলবাশ (ইয়েহিয়ার কওম) তাব দুআনা পরিমাণও না। এবং আমার পক্ষে অট্টহাস্য সংবরণ করা বড়ই মুশকিল মালুম হয়, যখন পাঞ্জাবী সেপাই, এমন কি তথাকথিত শিক্ষিত পাঞ্জাবী মুসলমান আপন ইসলাম নিয়ে দম্ভ প্রকাশ করে,—ডান হাতে গেলাশ বাঁ হাত সাদরে সম-রতি-সখার কাঁধে রেখে। ব্যত্যয় অবশ্যই আছে; উপস্থিত সে আলোচনা থাক।

বেলুচ পাঠানদের মনোবৃত্তি বুঝতে হলে উজান গাঙে আমাদের চলে যেতে হবে হাজাব চাবেক বছব পূর্বে। পণ্ডিতরা বলেন, মোটামুটি ঐ সময়েই আর্যেরা ইরান হয়ে এ-দেশে আসে। এদেব এক অংশ ইবানে বসতি স্থাপন করে। গোড়াব দিকে জীবিকা নির্বাহের জন্য এদের প্রধান পন্থা ছিল, গবাদি পশুপালন এবং পরসম্পদ লুণ্ঠন। এবং আর্যদেব দেশ-দেশান্তরে অভিযানের সময যারা যে অঞ্চলে রয়ে গেল তারা স্থায়ী বসবাস নির্মাণ না কবে যাযাবর বৃত্তিই প্রচলিত রাখল। .এ-স্থলে স্মরণে রাখা উচিত, যৎসামান্য কৃষিকর্ম দ্বারা মানুষ জীবনধাবণ করতে পারে না। উন্নত কৃষিকর্ম শিখতে মানুষের হাজাব হাজাব বৎসর সময লেগেছে।

খৃ পূ ছযশত বৎসর পূর্বে ইরানের কিছু লোক কৃষিকর্ম ও কৃষিব প্রকৃত মূল্য বুঝতে পেরে গিয়েছে। এদের নেতা ছিলেন জবথুস্ত্র (ইংরিজিতে জেরোআস্তব চলিত ফার্সিতে জরতুস জবথুস—জর্মন দার্শনিক নীৎশে কিন্তু জর্মন জরথুস্ত্রই লিখেছেন)। ইনি ইরানের বল্‌খ অঞ্চলেব রাজা গুশতাসপকে তাঁর ধর্মে দীক্ষিত করতে সমর্থ হন—ভারতেব পার্সী সম্প্রদায এই জবথুস্ত্রী ধর্মাশ্রয়ী। কিন্তু এহ বাহ্য। প্রত্যেক ধর্মেব একটা নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থাকে। জবথুস্ত্র রাজা গুশতাসপকে বোঝাতে সক্ষম হলেন, যাযাববৃত্তি লুণ্ঠন ও শুধুমাত্র গোপালন দ্বারা কোনো সমাজ চিবতরে আপন খাদ্যসমস্যা সমাধান করতে পারে না, এবং যারা প্রতি বৎসর পালিত পশুর খাদ্য ঘাস-পাতা-ভরা উর্বরা জমির সন্ধানে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য, অর্থাৎ যারা চিরদিনের যাযাবর, তাদের দ্বারা আপাতদৃষ্টিতেই কোনো সভ্য সমাজ নির্মাণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তখন আরম্ভ হল সংগ্রাম দু দলে—যারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে উন্নতমানের কৃষিকার্যে সক্ষম হয়ে স্থায়ী বসবাস নির্মাণ করে সভ্যতার গোড়াপত্তন করতে যাচ্ছে, অর্থাৎ জরথুস্ত্র-গুশতাসপেব অর্থনীতিতে বিশ্বাসী—এবং যাদের বক্তে নিত্য নিত্য স্থান পরিবর্তনের, ঘুরে ঘুরে মরার নেশা, যে নেশা পরিপূর্ণ সভ্য মানুষের শরীর থেকেও কখনো সম্পূর্ণ লোপ পায় না, যে নেশাব আবেশে বিদগ্ধ নাগরিক কবি গেয়ে ওঠে,

"ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুইন।
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।
বর্শা হাতে, ভরসা প্রাণে
সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল বাধাহীন।"

গৃহী এবং যাযাবরে এ-দ্বন্দ্ব চির পুরাতন তথা অতি সনাতন, নিত্য পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়। কথিত আছে চেঙ্গিসের মঙ্গোলরা বিস্তর রাজ্য জয় করার পরও যখন যাযাবর বৃত্তি ছাড়তে বিমুখ, তাঁবু ছেড়ে প্রাসাদে থাকতে নারাজ তখন চেঙ্গিসের প্রধান মন্ত্রী বলেছিলেন, "ঘোড়ায় চড়ে রাজ্য জয় করা যায়, কিন্তু ঘোড়ার পিঠে বসে রাজত্ব করা যায় না" (অত্যল্প ভিন্নার্থে বলা চলে "ইয়াহিয়া ট্যাংকে চড়ে বঙ্গ রাজ্য জয় করতে পারেন, কিন্তু ট্যাংকে চড়ে রাজত্ব করতে পারবেন না)।" ইয়োরোপে এখনো বিস্তর বেদে ঘুরে বেড়ায়—হিপি তাদেরই ভেজাল সয়াবীন তেল—কোনো সরকারই বিস্তর প্রলোভন দেখিয়েও ওদের কোথাও বসাতে পারেন নি।...কথিত আছে, জরথুস্ত্র যখন যাযাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত গৃহীদের জন্য পরম প্রভু আহুরমজদার পূজা করছেন (জরথুস্ত্রীরা অগ্নির উপাসনা করে না, অগ্নিকে সর্বাধিক পাক সৃষ্টিরূপে গভীর শ্রদ্ধা জানায়) তখন শত্রুপক্ষ কর্তৃক নিহত হন।

বেলুচী ভাষা ও পাঠানের পশতো ভাষা দুইই প্রাচীন জেন্দে (জরথুস্ত্রীয় ইরানী ভাষা, ঐ ভাষায় ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা রচিত বলে একে আবেস্তান বা আবেস্তাও বলা হয়) থেকে উৎপন্ন, বা বিবর্তিত, বলা যেতে পারে। প্রাগুক্ত সংগ্রামে বেলুচ ও পাঠান হেরে গিয়েও সম্পূর্ণ হারে নি। আড়াই হাজার বছব পরও তাবা গৃহী বটে, যাযাবরও বটে। গৃহস্থরূপী পাঠান বেলুচ অতিশয় অনুর্বর জমিতে কিছুটা চাষবাস করে বটে, কিন্তু প্রতিবৎসর তাদের বৃহৎ অংশ উর্বর চারণভূমিব সন্ধানে জরু-গরু, ভেড়া-খচ্চর নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, চীন কোনো দেশের কোনো সীমান্তের বত্তিভব পরোয়া তারা করে না। কারো ধড়ে দুটো মুণ্ডু নেই,—দাউদ, ভুট্টো, শাহ, কারোরই—যে, ওদের কাছ থেকে পাসপোর্ট চাইবার হিম্মৎ-হেকমতী দেখাবেন। ঐ অতি পুরাতন যাযাবর বৃত্তির সঙ্গে অতি অবশ্যই তারা বহু সনাতন লুণ্ঠন-ধর্মটি ন'সিকে তোয়াজ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। বস্তুত ঐটেই তাদের প্রফেশন, চাষবাস নিতান্তই একটা নগণ্য "হবী"—স্ট্যাম্প কালেক্ট করার মত। পাকিস্তানের শহরে পাঠান বেলুচ অটোনমি চায় না স্বাধীন হতে চায়—অতটা খবর নেবার মত ফুরসৎ আমার নেই, অত এলেম আমার পেটেও ধরে না কিন্তু প্রশ্ন, শহরের বাইরে যারা থাকে তাবা কবে কোন রাজাকে খাজনা-ট্যাকসো দিয়েছে, শুনি। উল্টে তারা সাবসিডি পায়। খাইবার পাসেব দু-পাশের পাঠানদের কারো বাচ্চা হলে প্রথম ছুট দেয় পেশাওয়ার বাগে। সেখানে নামটা "পত্রপাঠ" রেজিস্ট্রি করিয়ে নিয়ে তবে যায় ধীরে-সুস্থে মোল্লার বাড়িতে। তিনি ততোধিক আস্তে আস্তে একটি তোলা নাম ঠিক করে দেন—কি যেন একখানা কেতাব থেকে, যদিও সুবে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বেলুচিস্তান, পাঠানিস্তান জানে, তিনি একবর্ণও পড়তে পারেন না, আলিফের নামে ঠ্যাঙা!

এরা আরো স্বাধীন হবে কি করে? গোল মার্বেল কি গোলতর করা যায়? স্বয়ং যীশুখৃষ্ট বলেন নি, লিলি ফুলটিকে রঙ মাখিয়ে আরো রঙিন করতে যায় কে?

আর যদি নিতান্তই কোনো পাঠানকে শুধোন, "হে ইয়ার। পাকিস্তান হিন্দুস্তান যদি তোমাদের নিয়ে লড়াই লাগায়, তবে তোমরা কোন পক্ষ নিয়ে লড়বে?" তবে সে-পাঠান অনেকক্ষণ ধরে তার পাগড়ির ন্যাজটা দড়ি দলার মত পাকাতে পাকাতে বলবে, "আগা জান! দুটো কুকুর যদি একটা হাড্ডি নিয়ে লড়ালড়ি লাগায়, হাড্ডিটা কি কোনো পক্ষ নিয়ে লড়ে?"

ওয়াটার গেটের পানি সিন্ধুজল

ফার্সীতে বলে, "দের আয়েদ, দুরুস্ত আয়েদ" "দেরিতে যা আসে, দুরস্ত হয়ে আসে।" "দের"—তেহরানের ফার্সীতে "দীর"—শব্দটা, "ধীরে ধীরে" অর্থও ধরে। ওয়াটার-গেটের নোনাজল পিণ্ডিতে পৌঁছেছে ধীরে ধীরে। এমনিতেই বাংলায় বলে "দেখি না, শ্রাদ্ধের জল কদ্দূর অবধি গড়ায়"—তাতে এসে জুটলো গেট ভেঙে হুড়মুড়িয়ে ওয়াটার গেটের পানি, ওদিকে সিন্ধুতে বান জেগেছে। এক্কেবারে খাজা তেরোস্পশ্‌শ্‌ (ত্র্যহস্পর্শ), মাইরি! বলবে 'সামবাজাবী' খাস কলকাত্তাই। সিন্ধুর এই বান বার বার সাত বার মোন-জো দড়োকে নাকানি-চুবুনি খাওয়ালে পর ওখানকার লোক তিতিবিরক্ত হয়ে জরু-গরু নিয়ে কেটে পড়লো, কিংবা হয়তো সাত বারের বার সাত হাত পানির্মে ঘায়েল হল। কিন্তু এ আন্দাজটা বোধ হয় ধোপের পানিতে টেকে না। চল্লিশ-তেতাল্লিশ বছর আগে মার্শাল সাহেব যখন বিরাট ডবল ইটের থান মার্কা ঢাউস তিন-ভলুমী মোন-জো দড়ো প্রকাশ করলেন তখন আর পাঁচজনের মত আমিও পাণ্ডিত্য ফলাবার তরে তার উপর হুদ্দমুদ্দ হযে আছড়ে পড়েছিলুম। মোন-জো আখেরে বানের জলে খতম হয়েছিল কি না, এ প্রশ্নটা তখন শুধোলে ভালোমন্দ, অন্তত এ-বাবদে লেটেসট্‌ থিয়োরি কি সেটা বলতে পারতুম; লেটেসট্‌ বললুম এই কারণে যে, কেতাব বেরুবার আগে পত্র-পত্রিকায় সিন্ধু সভ্যতা নিযে এন্তের আলোচনা বাদ-প্রতিবাদ তো হয়েই ছিল, বেরবাব পর দুনিয়ার কুল্লে গুণী-জ্ঞানী তত্ত্ববিদ মাথায় গামছা বেঁধে লেগে গেলেন, হয় মার্শালকে ঘায়েল করতে, নয় তাঁকে আসমানে চড়াতে। সুচতুর পাঠককে বলে দেবার কোন দরকার নেই, দুসরা দলের বেশিব ভাগই ছিল ইংরেজ। সে সময় আমার এক আইরিশ গুরু বলেছিলেন, সীলগুলোর উপর যে লিপি খোদাই করা আছে সেটা পড়তে না পারা পর্যন্ত চিত্তিরবিচিত্তির থিয়োরি গড়া বিলকুল বেকার—হাওয়ায় কোমরে রশি বাঁধার মত। এরপর বৃদ্ধ গুরু তাঁর জীবনের শেষ দশ বৎসর কাটান লিপি পাঠের নিষ্ফল প্রচেষ্টাতে। সে কাহিনী আর কোন সুবাদে না হয় বলবো। কিন্তু সিন্ধু লিপির চেয়ে ঢের রগরগে লিপি ওয়াটার-গেট মামলা নিয়ে—মিঃ নিক্সন যে টেপ-লিপি যখের ধনের মত জাবড়ে ধরে বসে আছেন। প্রকাশ পেলে সে লিপি কিন্তু অনায়াসে পড়তে পাববে, মার্কিন স্কুল বয় তক্‌। উহুঁ, হলো না। সন্দেহপিচেশ মার্কিন অমার্কিন দুশমনজন বলছে, পড়তে পারবে বটে, কিন্তু কত লিপি কত পাষণ্ডই না ভেজাল ঢুকিয়ে মূল লিপি পয়মাল করেছে—যাকে শাস্ত্রীয় ভাষায় বলা হয়, প্রক্ষিপ্ত, ইন্টারপলেশন। নিক্সনই লিপিটি নিয়ে যে ছিনি-মিনি খেলবেন না, এমনতরো সাধু মহাশয় তো তিনি নাও হতে পারেন। বস্তুত

আখেরে যখন নিঃসন্দেহে ধরা পড়লো নিক্সনের সাঙ্গোপাঙ্গোর প্রায় সব কটাই ফোর টুয়েনটির ফেরেব্বাজ, তথাপি, তখনও যারা তাঁর ব্যক্তিগত সততার কেত্তন গেয়েই চলেছে তাদের উদ্দেশে এক বিদগ্ধ ঠোঁটকাটা মার্কিন নাগরী বলেন, 'একটা ঘাপটি মারা ব্রথেল-বাড়ি কাল যদি ধরা পড়ে তবে বাড়িউলী অক্ষতযোনি কুমারী কন্যা হবে—এ হেন দুরাশা করো না।' তাই আফসোস, হে মুশকিলপানা মসুদরানা, এ গজব-মুসিবতের ওক্তে তুমি কোথায় ছিলিমে দম মেরে শিবনেত্র হয়ে হুরিপরীর খোওয়াব দেখছো?

সে অদেখা লিপির অজানা বাণী কিন্তু সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছে বিশেষ করে ইরান আর তার সাকী পাকিস্তানে। নইলে মিস্টার আজীজ আহম্মদ অকস্মাৎ তাঁর পূর্ব নীতি ত্যাগ করে বঙ্গ-প্রীতি দেখাতে আরম্ভ করলেন কেন? আমি তো শুনেছি, দুই পাকিস্তান যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল তার জন্য কার্যত মিঃ আহমদই দায়ী। করাচী-পিণ্ডির নেতারা গোড়ার দিকে মরহুম পূব পাকে কি পলিসি নেবেন স্বভাবতই সে সম্বন্ধে পাকাপাকি মন-স্থির করতে পারছিলেন না। তাই কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত সর্বাধিকারী আজীজই অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকারকে নীতি বাবদেও সদুপদেশ দিতেন—সে নীতি লৌহ-গোলক-নীতি। অবশ্য বর্তমান মিঃ আজীজ যদি প্রাক্তন চীপ সেক্রেটারী সেই আজিজই হন?—তবু ভালো, যার মারফতই একটা সমঝোতা হোক না কেন। দিল্লীর এক বাদশা নাকি খারাপ জায়গা থেকে একটি সুন্দরী আনালে পব, উজীর বিরক্তি প্রকাশ করেন। বাদশা বললেন, 'হালুয়া ভাল জিনিস, তা সে যে দোকান থেকেই আসুক না কেন—হালওযা নীকু অস্ত্, কে আজ হ্‌র দুকান বাশদ।' এ স্থলে বলতে হবে, যেই নিয়ে আসুক না কেন।

লাইন অব রিট্রীট খোলা রাখো

তাই বলছিলুম "সেই ভাল, সেই ভাল।" আমরা চিরকালই শান্তি কামনা করেছি। তদুপরি ডানা-কাটা পরী কে না ভালোবাসে? ডানা-কাটা পরী পাকিস্তানকে কিয়ামততক দুশমনের নজবে দেখবো, লায়লীকে মজনুর চোখে দেখবো না, এমন কিরে কসম আমি কখনো গিলিনি—সাক্ষী এন্টালির মৌলা-আলী। তবে কি না, অতীতের জাবর কেটে মনে ধোঁকা লেগে রয়, "মুসলিম বেঙ্গল" বুলি কপচানো আগাপাস্তলা পালটে "বাংলাদেশ" নামক ঢেঁকি গিলতে পিণ্ডির ইয়ার-আজীজানের কতখানি সময় লাগবে? আপনারা যা ভাবতে চান ভাবুন, আমার সন্দেহ-পিচেশ মন জানে, পিণ্ডির ইয়াররা অবশ্যই আরো বিস্তর ন্যাজ খেলাবেন। এতক্ষণে আলবৎ তেনাদের এডভোকেট জেনারেল, লীগের একসপারটগুষ্টি বসে গেছেন, চুক্তিটির ফস্কে গেরো, লুপ হোল, কোন শব্দে, কোন ফুলস্টপ সেমিকলোনে আছে, চুক্তিটির সাদা কালিতে এমন কি সব লেখা আছে যাদের বদৌলতে তেনাবা চটসে বেরিয়ে যাবেন খোলা মাঠে, আব আমাদের বেলা দেখবো, ফস্কে গেরো বজ্র বাঁধন, ফাঁসির গিঁটে টাইট হতে হতে কণ্ঠশ্বাস রুদ্ধপ্রায়। (এবং আমাদেরও উচিত, এই একই কর্মে লিপ্ত হওয়া। কোনো কোনো দেশ গোপনে বিদেশেও পাঠায়) তুলনায় এনে স্মরণ করাই, ইতিমধ্যে নিকসন কবার দিব্যি দিয়েছেন, আমার মনে নেই, সুপ্রীম কোর্ট "ডেফিনিট" রায না দেওয়া পর্যন্ত তিনি টেপ-এর দলিল হাতছাড়া করবেন না, না, না। কিন্তু কুল্লে দুনিয়ার চেল্লাচেল্লি সত্ত্বেও "ডেফিনিট" বলতে

তিনি কি বোঝেন, সে প্রশ্নটা সাফ ইনকার করে তিনি খামুশ! অথচ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ঐ "ডেফিনিট" কথাটা এ-প্রসঙ্গে বিলকুল ফজুল, বেকার। সুপ্রীম কোর্ট কেন, আমাদের মহল্লার বেকুব ছোঁড়াটা ঐ যে সেদিন তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিসম্পন্ন হাকিম হল, সেও তো কখনো 'ইনডেফিনিট' এমন কোনো রায় দেয় নি, যার তেত্রিশটা অর্থ করা যায়। হয় জেলে যাও, নয় বাড়ি যাও—মাত্র দুটো অর্থওয়ালা ইনডেফিনিট রায়ও সে কখনো দেয়নি। ছোকরাকে শুধান গিয়ে, সে যখন ট্রেনিঙে ছিল, তখন তার গুরু তাকে বলেছেন কি, "রায় দেবে ডেফিনিট, সে রায়ের বিসমিল্লাতে লাল কালি দিয়ে লিখবে, 'ডেফিনিট' জাজমেন্ট অব হাকিম অমুক।" সেটা হবে "ভেজা জল" বলার মত। শুকনো জল আমি কখনো দেখি নি। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে নিষ্কর্মা 'ডেফিনিট' শব্দটা এস্তেমাল করা হয়েছে, রায়টা আখেরে বিপক্ষে গেলে "নিষ্কর্মাটা" কর্মে লাগাবার জন্য। একেই বলে আইনের ফাঁক, ল-এর লুপ-হোল। গুরু নিকসন যে ভেল্কি দেখালেন, পিণ্ডির চেলারা কি গুরুমারা বিদ্যে দেখাতে কম যাবেন? এবং আমাদেরও ওটা রপ্ত করা অতিশয় উচিত। চুক্তি ভাঙাবার জন্য নয়, যে ভাঙাতে চায়, তার মোকাবিলা করার তরে।

কিন্তু সরল পাঠক, এই পোড়াগুরুর ভ্যাঁ-ভ্যাঁতে কান দিয়ো না। বরঞ্চ গান ধরো,

"নিশিদিন ভরসা রাখিস
ওরে মন হবেই হবে।"

পৌষ মাস কেবা কার
পাঠানের হাহাকার

অবতরণিকাটি হয়তো মেকদারমাফিক হল না।

কারণ, চিন্তাশীল পাঠক হয়তো ভাবছেন. নিরক্ষর পাঠান বেলুচ এ-সব কথার মারপ্যাঁচ, আইনেব ফাঁকি ফক্কিকারির কি আব বোঝে? এমনতরো মারাত্মক ভুল করবেন না। পাঠানেব বাচ্চা মায়ের গর্ভ থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পায়, "করারনামা, করারদাদ।" ওদের কওমে কওমে হর-হামেশা লড়াইফসাদ এবং নিত্যি নিত্যে সলা-সুলেহ্‌ লেগেই আছে—করার-নামা, কবার-দাদ দিয়ে হয় তার অতিশয় সাময়িক তৎকালীন এবং ক্ষণভঙ্গুর অস্ত্র-সংবরণ, আর্মিস্টস্‌। পীস ট্রিটি চিরন্তনী শান্তি এহেন আজগবি সমাস তার কখনো শোনে নি। করার ভাঙতে চেম্পিয়ন হিটলার রিবেনট্রপ পাঠানের কাছে হেসে-খেলে দু-দশ বছর তালিম নিতে পারেন—করার-দাদে দফে দফে চুক্তি নির্মাণ, লুপহোল রক্ষণ, এবং তার বদৌলত চুক্তিপত্র থেকে মান-ইজ্জত বাঁচিয়ে, সসম্ভ্রমে, একতরফা নিষ্ক্রমণ, এ-সব বাবদে যাবতীয় ফন্দি-ফিকির, সন্ধি-সুড়ুকেব সম্রাট পাঠান। খাস কাবুলে কেউ কখনো এপয়েন্টমেন্ট লেটাব পায় না। পায় চুক্তি-পত্র (করাব-দাদ)। বেশুমার কপি সই কবতে হবে আপনাকে—আপনি পাবেন কুল্লে একখানা। সরকার চাপ দিতে চাইলে দশ খানা কপি বেরিয়ে আসবে এক লহমায়। আপনি চাপ দিতে চাইলে সবকারেব তাবৎ কপি গায়েব—গম্ভীর কণ্ঠে বলবে "গুমা শুদ", গুম হয়ে গিয়েছে। তারো বড়ো, হয়তো বলবে কোনো করার-দাদ "নেই, ছিলও না" "নীস্ত-ন-বুদ"—যার থেকে বাংলা "নাস্তা-নাবুদ" কথাটা এসেছে। বিশ্বেস না হয় চলন্তিকা খুলে দেখুন।

পাঠান বেলুচ নিরক্ষর। কিন্তু প্রত্যেকটি করার-নামা তারা জের-জবর তক মনে গেঁথে রাখে। কিন্তু এহ্ বাহ্য।

বললে পেত্যয় যাবেন না, শতাধিক বৎসর ধরে ব্রিটিশ, শিখ, রুশ, আফগান, ইরান, পাকিস্তান, হিন্দুস্থান—এঁদের ভিতর আপোসে কি সব চুক্তিনামা তৈরি হল, কালি শুকোবার আগেই সেগুলোকে এক পক্ষ টুকরো টুকরো করলো ('তিক্কা তিক্কা করদনদা'), এ-সব সাকুল্যে সংবাদ তাদের নখের ডগায়। এরই উপর নির্ভর করছে তাঁর প্রধান আমদানী—লুটতরাজ। পূর্বেই বলেছি, চাষ-আবাদ তার কাছে অনেকটা আমরা যেরকম পুরনো খবরের কাগজ বিক্রি করে এক খেপ রিক্সভাড়া তুলি-কি-না-তুলি গোছ। বিশেষ করে তার শ্যেনদৃষ্টি পূর্বে ছিল ব্রিটিশের প্রতি, এখন "নেকনজর" ফেলে পাক-সরকারের দিকে। যখনই যে-সরকার, কি আফগান, কি পাকসরকার দুশমনের হামলা বা সে-ভয়ে বেকাবু, তখনই পাঠান বেলুচের মোকা। আর আল্লার কুদরতে আজকাল পাঠানের বারোয়ারি ড্রইংরুম, ছোটাসে ছোটা চায়ের দোকানেও বেতার। এখন হাওয়ায় যায় তাজাসে তাজা খবর। অন্তত পাঁচটা দেশ পশতু জবানে পরস্পরবিরোধী খবর দেয় প্রতিদিন। আর আফগান চালিত কাবুল-বেতার এবং পাঞ্জাবী চালিত পাক-বেতারে বাক-যুদ্ধ—জংগে জবান—লেগে যায় তখন সে বেহদ আরাম বোধ করে—তার দিল খুশ, জান-ত-র-র-র!

এই যে পাক, হিন্দ, বাঙ্গালায় ত্রিভুজাকৃতি করার-দাদ হতে চললো এই বে-মুবারক আখবার সুবে পাঠানিস্তানের দিল-জান কলিজা-গুর্দা "তিক্কা তিক্কা" করে দেবে। এতে করে পাক তার পূর্ব সীমান্ত সামলে নিলো। সান্ত্বনা এইটুকু, পাক সবকাবের প্রতি অপ্রসন্ন কয়েক হাজার জাতভাই পাঠান সেপাই দেশে ফিরে এলে তাদের তাড়িয়ে যদি কিছু-একটা করা যায়। সদর দাউদও সেটা হিসেবে নিচ্ছেন। স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, আপন খুশিতে দাউদের হুঙ্কারে বিব্রত, পিণ্ডি সরকার যুদ্ধ-বন্দীদের ফেরত নিচ্ছেন এই দুর্দিনে, বিশেষ কবে নিক্সনের দুর্দিন যাদের আপন দুর্দিন—এটা বিশ্বাস করা কঠিন।

পাক-পক্ষ দিল্লীতে প্রায় এক পক্ষ ধরে কেন গাঁইগুঁই, টালবাহানা করলেন, সেটা এখানে বসে আমি বলতে পারি, পাঠান জানে, তার প্রতিবেশী আফগান জানে, বেলুচ অবশ্য অতখানি ওয়াকিফ-হাল নয়। সে কাহিনী দীর্ঘ। বারান্তরে।

সেকাল একাল

ছেলেটা ডান হাত পেতে দিচ্ছে আর তার উপর পড়ছে সপাং করে লম্বা লিকলিকে কাঁটাওলা চাবুকের বাড়ি। অস্ফুট কণ্ঠে সে বলছে, "বরায়ে খুদা" আর এগিয়ে দিচ্ছে বাঁ হাত। ফের চাবুকের ঘা। এবারে ছেলেটা বললে "বরায়ে রসুল", এগিয়ে দিচ্ছে ডান হাত। করে করে চলতো ইস্কুল-বয়কে চাবুক মারা—খাস কাবুল শহরে—একদা। ছেলেটা তসবী জপার মত এক বার বলে "বরায়ে খুদা" পরের বার বলে "বরায়ে রসুল" "বরায়ে খুদা" "বরয়ে রসুল" "বরায়ে—।" অর্থাৎ "আল্লার ওয়াস্তে (মাফ করে দিন)" "রসুলের ওয়াস্তে (মাফ করে দিন।)" কিন্তু আমাদের মত "আর করবো না, পণ্ডিতমশাই কিংবা কসম খাচ্ছি মৌলবী সাহেব, আমি তামাক খাই নি। আমি ঘুমচ্ছিলাম, কে জানি নে হুজুর আমার হাত দিয়ে তামাক খেয়ে গিয়েছে" এসব চেল্লাচেল্লি, বেকসুরীর

ফরিয়াদ, রেহাই পাওয়ার জন্য অনুনয়-বিনয় আমাদের মত আমাদের বাপ দাদার মত কাবুলী ছাত্র করে না। আমাদের বেকসুরীর ফরিয়াদ আমরা করেছি আমাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী—ছেলেবেলায়। কাবুলের ইস্কুল বয় তিফল-ই-মকতব করে তার ঐতিহ্যানুযায়ী। "বরায়ে খুদা, বরায়ে রসুল" ভিন্ন অন্য রা-টি কেড়েছো কি মরেছো। বেতের রেশন আরো দশ ঘা বেড়ে যাবে তৎক্ষণাতের দু-লহমা আগেই—আজ ফৌরন দো লহমা পেশতর। কিন্তু হায়, ইতিমধ্যে "ব্যাকরণে" ভুল করে ফেলেছি, ধরতে পারেন নি তো? তাইতেই তো আগা-ই-আগা সম্পাদক-চক্রের চক্রবর্তী আমার বেশুমার ভুলে ভর্তি লেখা বেদম ছাপিয়ে দিয়ে আমাকে নাচান, আপনাদেরও নাচান। বলুন, বুকে হাত রেখে বলুন, আপনারা কজন সম্পাদক সাবের চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমার অগুনতি গলৎ দেখিয়ে খাট্টা জবানে শাসিয়েছেন, আমার ধারাবাহিকের ধারা বন্ধ করতে? তা সে যাক গে। না করে ভালোই করেছেন।...হ্যাঁ, ভুলটা কি করলুম, সেই কথাই হচ্ছিল। বলে ফেলেছি "রেশন বেড়ে যাবে"। তা কখনো হয়? কি হিন্দুস্থান, কি পাকিস্তান, কি এই সোনার বাংলা—কবে মশাই, কোন্ মুল্লুকে রেশন বাড়ে? রেশন কমতে দেখেছি, বাড়তে দেখেছে কে, কবে, কোন রাঙ্গা শুক্কুবারে, কোন হীরের বাংলায়? সে তা হলে সাপের ঠ্যাং দেখেছে, অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র দেখেছে।

বাস্তিনাদো

কিন্তু এ ধরনের বেত্রাঘাত কাবুলে ডাল ভাত। দেখতেই যদি হয়, তবে দেখে নেবেন, বাস্তিনাদো। আমি কখনো দেখি নি, তবে হতভাগার গোংরানোটা শুনেছি, অতি অনিচ্ছায়।

আমাদেব হস্টেলে একজন আরেকজনের তলপেটের এক পাশে মাঝারি সাইজের একটা ছোরা ফাঁসিয়ে দেয। প্রিন্সিপাল গয়রহ্ কোয়ার্টারে ছিলেন না। আমাকেই যেতে হল। যতদূর মনে পড়ছে, চিৎকাব চেঁচামেচি কিছুই হয় নি। বাগানে গাছতলায় ছেলেটাকে শুইয়ে রেখে তাকে ঘিবে রয়েছে কয়েকজন। তার মুখ হুবহু পচা মাছের পেটের মত ঘিনঘিনে পাঙ্গাশ। একটা ছেলে কামিজ তুলে দেখালে পেটপিঠ পেঁচিয়ে লালে লাল চওড়া ব্যান্ডেজ, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতুম না, কী জঘন্য নোংরা কাপড় ছিঁড়ে পট্টি বাঁধা হযেছে। আরেকটা ছেলে বললে, নাড়িভুঁড়ি হড়হড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, সে আর তার দোস্ত দুজনাতে চেপেচুপে কোনো-গতিকে ঢুকিয়ে দিয়ে পট্টি বেঁধেছে—বুঝলুম, এক গাদা মাল যেরকম ছোট সুটকেসে যেখানে যা খুশি ঢুকিয়ে ডালার উপর দাঁড়িয়ে একজন লাফায়, অন্যজন কব্জা বন্ধ করার চেষ্টা দেয়, তারই অনুকরণে কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। পট্টির উপর নিচ দিয়ে ক্রমাগত রক্ত চুইয়ে চুইয়ে বেরুচ্ছে। আততায়ীকে একটা গাছের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে।

ছেলেটা ভির্মি যায নি, তবুও। বিড় বিড় করে কি যেন বলছে। ভাবলুম, ভুল বকছে। না, একটা ছেলে বললে, আমাকে সে কি যেন বলতে চায়, আমি যেন কাছে গিয়ে কান পেতে শুনি। কাছে যেতে আধ-মরা গলায় বলল, আমি যেন তার সব অপরাধ মাফ করে দি। আমি বললুম, "তুমি আবার কি অপরাধ করলে? সেরে ওঠো, সব ঠিক হয়ে যাবে।" ছেলেটা 'আহ' বলে চোখ বন্ধ করলো।

এর পরে কাহিনী দীর্ঘ। উপস্থিত সুখবরটা জানাই। দেড় মাস পর সে হাসপাতাল ছেড়ে ফের ক্লাসে ফিরে এল। কিন্তু এহ বাহ্য।

আমাদের ফরাসী অধ্যক্ষটি ছিলেন চৌকশ লোক, পুলিশকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিদায় দিয়ে, দফতরের কাবুলি হেড ক্লার্ক, খাজাঞ্চী; অনুবাদককে বললেন এ-দেশের প্রথানুযায়ী বিচার করে আততায়ীকে যেন সাজা দেওয়া হয়।

তাঁরা স্থির করলেন পূর্ব কথিত বাস্তিনাদো। আমাব কিন্তু শোনা কথা। ছেলেটাকে মাটিতে বুক রেখে টান টান করে শোয়ানো হল। হাত দুটো সামনের দিকে প্রসারিত। দুহাতের উপর মাটির সঙ্গে জোরসে চেপে ধরে দাঁড়ালো মিলিটারী বুট পরা দুই চাপরাসী, দুপায়ের গোছা সবুট চেপে দাঁড়ালো আরো দুজন চাপরাসী। আরো জনা চারেক বুট দিয়ে পিঠ-কাঁধ সর্বাঙ্গ চেপে ধরে দাঁড়ালো চতুর্দিকে। তাব পর পায়ের তলাতে—জানি নে কি ধরনের—চাবুক দিয়ে বেতের পর বেতের বেদম গুনে গুনে মার। বার দশেক পর পায়ের তলা দুটোতে আর এক রত্তি চামড়া অবশিষ্ট রইল না। লালে লাল ক্ষতবিক্ষত জখমের উপর আরো কত ঘা মারা হয়েছিল সেটা আমি আর শুনতে চাই নি।...দিন দশেক পরে একদিন দেখি, কুষ্ঠরোগীর মত পট্টি দিয়ে পা দুটো সর্বাঙ্গে মোড়া অবস্থায় দুটো লাঠিতে ভর দিয়ে পা দুটো মাটি ছোঁয়-কি-না-ছোঁয় অবস্থায় প্রাতঃকৃত্য সাবতে যাচ্ছে। মাস দুই পর ফের ক্লাসে এল।

আব সব সহপাঠীবা মন্তব্য করেছিল, "ছেলেটাব দারুণ বরাত জোর। বিদেশী অধ্যক্ষ মধ্যস্থ না হলে, নির্ঘাত জেলে পাথর ভাঙ্গতে হত নিদেন পাঁচটি বৎসব।" অন্য অত্যাচারের কথাটা সবাই জানতো—আসলে যে কারণে অধ্যক্ষ মধ্যস্থ হয়েছিলেন। জেলের সম-রতি-প্রবণ গার্ড সেপাইদের হাত থেকে ছোকবার নিস্তার থাকতো না।.. এতদিনে এ-সব পাশবিক দণ্ডদান মকুব হয়ে যাওয়ারই কথা।

রণাঙ্গনে নব-নায়ক ছাত্রসমাজ

আফগানিস্তানে যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খুব যে একটা আদ্যন্ত পবিবর্তন হয়েছে এমত বিশ্বাস করার কারণ নেই। তবে একটা সত্য স্বীকার করতেই হবে প্রাচ্যপ্রতীচ্যের আর-পাঁচটা দেশের মত দু-তিনটে নগরে, বিশেষ করে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এদানি নানা বিষয়ে সচেতন হয়ে গিয়েছে। এটা অতিশয় স্বাভাবিক যুগধর্ম। বছরেব পর বছব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, নানা পাঠ্যপুস্তক মারফৎ বিশ্ব সংবাদ পড়ানো হবে, আর ছাত্রেরা সেই প্রাচীন সর্বাধিকারী রাজশক্তি তখনো মেনে নেবে—তা রাজা যতই মেহেরবান হন না কেন—ফল ভালো হোক, মন্দ হোক—সে-বিদ্যা প্রয়োগ কবার প্রলোভন তার অতি অবশ্যই হবে। যেমন, দশ-বিশ বছর ধরে সেপাই অফিসাবকে কুচকাওয়াজ, সমববিদ্যা শেখানো হবে, আব তাবা জল-জ্যান্ত লড়াইয়ে নেমে সেটা কখনো কাজে লাগিয়ে পরখ করে দেখতে চাইবে না, এটা নিতান্তই দুরাশা মাত্র। এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাদশা জহীর যে যৌবনের সাম্য ঐক্য স্বাধীনতার কথা ভুলে গিয়ে রাজশক্তিকে দৃঢ়তর এবং ব্যাপকতব করতে চেয়েছিলেন সেটা ন্যায়সঙ্গত না হলেও স্বাভাবিক, এমন কি আংশিক গণতন্ত্রমূলক সংবিধান মঞ্জুর

করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পলিটিকসে একটা "রাজার দল" 'কিংস পার্টি' স্থাপনা করতে চেয়েছিলেন, হুবহু যে-কাজটি সিংহাসন ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ড্যুক অব উইনজর করতে রাজী হন নি। পক্ষান্তরে ছাত্ররাও সেকুলার শিক্ষার ফল স্বরূপ এবং মক্তবের ভিতরে বাইরে মোল্লাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার দরুন রাজনীতিতে ঢলে পড়লো পেন্ডুলামের অন্য প্রান্তে :—বাইরের থেকে সাহায্য পেয়ে তারা হয়ে দাঁড়ালো মার্কস, মাও এবং এককাট্টা চরমপন্থীতে। তারই ফলে ১৯৬৯ সালে তাদের বিক্ষোভ, দাবী, স্ট্রাইক—গোটা আন্দোলনটা সর্বাংশে রাজনৈতিক ছিল না, ছাত্রসমাজের নিছক সুখ-সুবিধা কল্যাণকল্পে একাধিক স্ট্রাইকের আয়োজনও হয়েছিল—পুলিশের সঙ্গে ভীষণ সংঘর্ষে আন্দোলন এমনই মারাত্মক আকার ধারণ কবলো যে, কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হয়ে ছয় মাস কাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখতে হল।

এর ফলে কিন্তু একটা তত্ত্ব জনসাধারণ, বিশেষ করে মোল্লাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল : সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনে বর্তমানে সর্বক্ষেত্রে সর্বপ্রধান শক্তিমান ছাত্ররাই। পক্ষান্তরে এ কথাও সত্য যে, জনপদ অঞ্চলে কওমদের ভিতর যেমন অশিক্ষিতের সংখ্যা অধিকতর ঠিক তারই সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে তাদের ধর্মোন্মাদনা মারাত্মক এবং সর্ব প্রগতিশীল সংস্কার তারা ঘৃণা করে।

তৎসত্ত্বেও ছাত্রসমাজ তাদের মাও মার্কস আন্দোলন আরো জোরদার করে তুলতে লাগল এবং তার বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল ১৯৭০-এ। লেনিনের বাৎসবিক জন্মদিনে একখানা কম্যুনিস্ট পত্রিকা তাঁব স্মরণে রচিত একটি কবিতাতে এমন সব প্রশস্তিসূচক হামদ ও নাৎ দোওয়াদরুনের শব্দ ব্যবহার করলো, যেগুলো সচরাচর আল্লা রসুলের স্মরণেই উচ্চারিত হয়।

তীব্র প্রতিবাদ, বিস্তীর্ণ জনপদব্যাপী প্রচণ্ড আন্দোলন আরম্ভ কবলেন মোল্লারা। যে-সব কওম তাঁদের সহাযতা করলো তাদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। এবং সেই কুখ্যাত শিনওয়াবী কওম, যারা সর্বপ্রথম বাদশা আমানউল্লার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে, এবারেও তারা এমনই খাণ্ডারের মত রুদ্ররূপ ধারণ করলো যে অবশেষে ট্যাঙ্কসহ শাহী ফৌজ তাদের আক্রমণ কবে ঐ অঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিযে আনলো।

লেনিনের প্রতি এই সব উচ্ছ্বাসময়ী প্রশস্তি এবং মোল্লা সম্প্রদাযেব প্রবল প্রতিক্রিয়ার শেষ ফল এই দাঁড়ালো যে, কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে "ধর্ম সম্বন্ধীয়" একটা নূতন শাখা প্রবর্তন করা হল। এ-শাখার চালকগণ অহরহ সজাগ দৃষ্টি রাখেন, 'ইসলামের স্বার্থ রক্ষার্থে' অর্থাৎ সাধারণ ছাত্রসমাজেব সামান্যতম মতবাদ, কার্যকলাপ তাঁদের মনঃপূত না হলে 'কুফর বিদা'ৎ হুঙ্কাররবসহ তীব্র প্রতিবাদ তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করেন।

দাউদ খান নাকি প্রথম দিন থেকেই ছাত্রসমাজের সমর্থন পেয়েছেন। তাহলে স্বতই স্বীকার করতে হয়, ছাত্রকুলবৈরী মোল্লা সম্প্রদায় তাঁবও বৈবী! কিন্তু আমাব ব্যক্তিগত বিশ্বাস, দাউদ মোল্লাদের এক বৃহৎ অংশের স্বীকৃতি পেয়েছেন। দাউদ দিবান্ধ নন। তিনি জানেন, মোল্লা ও তাঁদের চেলা কওমরা ছাত্রদেব চেয়ে সংখ্যায় ঢের বেশী।

ছাত্ররূপ একটা ঝুড়িতে দাউদ তাঁর কুল্লে আন্ডা রেখে আরব্যরজনীর অননশশারের খোওযাব দেখবেন না।

নামে কি করে!
গোলাপে যে নামে ডাকো, গন্ধ বিতরে

এক নিক্সন-বৈরী মার্কিনই হতাশ সুরে বলছিল, "ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি ভালো করে বুঝতে হলে সক্কলের পয়লা এক ঝুড়ি নাম সঁড়গড় মুখস্থ করতে হয়। কটা লোকের সে সময়, সে উৎসাহ আছে? তারপর মুখস্থ করতে হবে তাঁদের পূর্ব-কীর্তি কেরামতীর ইতিহাস। কে রিপাবলিকান, কে ডেমোক্রেট; কে রিপাবলিকান বটেন কিন্তু ওয়াটার-গেটের কেলেঙ্কারির ঘেন্নাতে হয়ে গেছেন রিপাবলিকানদলের চাঁই নিক্সন-বিরোধী, কারা পয়লা-নম্বরী রিপাবলিকান এবং নিক্সনের অকারণ মেহেরবাণীতে কনট্রাক্ট পারমিট গয়রহ পেয়ে তাঁর প্রতি এখনো নেমকহালাল, বিপদে পড়ে নিক্সন কাকে কাকে জল্লাদের হাতে না-হক সঁপে দিয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি দফে দফে নাম কাম মুখস্থ করতে পারেন— খুদ মার্কিন-ইয়াংকি পাঠকই কজন? তবু যারা টি-ভিতে ওয়াটারগেট তদন্তেব জলসা আন্ডাবাচ্চাসহ গুষ্টিসুখ অনুভব করতে করতে নিত্যি নিত্যি দেখেছেন তাঁদের পক্ষে মামলাটার গভীর ঢোকা খানিকটে সহজ হয়েছে। কিন্তু প্রাচ্যে এত-সব বায়নাক্কা আবদার বরদাস্ত করে আপন বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে শেষ রায় দিতে পারেন কজন স্পেশালিস্ট?"

আমি সায় দিয়ে বললুম, "আমরা ববঞ্চ বৃটিশেব তরো-বেতরো নামের কিছুটা হদীস পাই, কিন্তু তোমাদের মার্কিন জাতটা ইংবেজ, জর্মন, ডাচ, ফরাসি, আরো কত বেশুমার জাত-উপজাত দিয়ে গড়া আস্ত একটা জগাখিচুড়ির লাবড়া-ঘ্যাঁট। ঐ ধরো মামলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-আলিঙ্গনে বিজড়িত, নিক্সনের ঘরোয়া, হুয়াইট হাউসের চাঁই চাঁই সচিব, কর্মকর্তাদের ইসমে মবারকের ফিরিস্তি : সক্কলের পয়লা যে দুই মহাপ্রভু এ ফিরিস্তি ধন্য করেন, তাঁদের নাম খাঁটি জর্মন এরলিষমান, হালডেমান। অবশ্যই সাদামাটা মার্কিন নাগরিক কুল্লে ভিন জাতেব নাম উচ্চারণ করে মাতৃভাষা ইংবিজি কায়দায়। এই সোনার বাংলাতেই উন্নাসিক পণ্ডিত মশাই মুকুলেশ্বর রহমান লেখেন মুখলেসুর বহমান-এর পবিবর্তে। তারপর ধরুন, রুমসফেলট, ক্লাইন, কের্লি, ৎিস্‌গলার এগুলো নিঃসন্দেহে জর্মন নাম। ফরাসী নাম অপেক্ষাকৃত কম। কিণ্ড জাতে ভাবি। খুদ ভাইস প্রেসিডেন্টের নাম এ্যাগনো ফরাসী উচ্চারণ আইন্নো। এনার বিরুদ্ধেও ফৌজদারী তদন্ত চলছে, নানাবিধ "নজরানা" নিয়ে। এবং হাসি পায়, যখন "আইন্নোব" মূল অর্থ স্মরণে আসে। প্রথম অর্থ মেষশাবক, পরেব অর্থ সাধু-সরল-পবিত্র! হুবহু ঐ অর্থ ধরেন এরলিষমান। এ-নামের সরল অর্থ "সরল"! "সাধু, অনারেবল!" অধিকাংশ ঘড়েল জনের বিশ্বাস, ইনি ওয়াটারগেট তদন্ত কমিশনে যে সাক্ষ্য দেন তাব চোদ্দ আনা ঝুট। ঐ সময় জর্মনিবাসী এক জর্মন, সুদূর স্বদেশ থেকে, বিখ্যাত এক মার্কিন সাপ্তাহিকে এরলিষমানের 'সরলার্থের' প্রতি সাদা-মাটা মার্কিন নাগরিকেব দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদেব তরে ব্যঙ্গ-রসের খোরাক যোগান।

কিন্তু এহ বাহ্য।

ভুট্টো সাহেবের যে রকম আজীজ, হিটলারের বরমান, হুবহু ঠিক তেমনি মিঃ নিক্সনের মহামান্য মিঃ হেনরি এ কিসিংগার। আমি জানি, একমাত্র খাস জর্মন ভিন্ন তামাম দুনিয়া উচ্চারণ করে কিসিঞ্জার। এস্তেক বিবিসি। পাঠক, একটু ধৈর্য ধরুন, পরে তাবত গুহ্য তথ্যতত্ত্ব স্বপ্রকাশ হয়ে যাবে। এস্থলে বলা প্রয়োজনীয় যে আজীজ বরমান কিসিংগার চরিত্রে অতি অবশ্যই তফাৎ আছে; মিঃ ভুট্টোর দোষগুণ যাই থাক, তিনি কখনো আজীজের ম্যাড়া বনবেন না। বাকিদের কথা ক্রমশ প্রকাশ্য। কিন্তু এস্থলে সাতিশয় প্রয়োজনীয়, পাঠক যেন এই কিসিংগার প্রভুর প্রতি একটু নজর রাখেন। কিন্তু এঁর প্রেম বাংলাদেশ কখনোই পাবে না। কারণ এই ধর্মে, কর্মে সর্ববিষয়ে কট্টর ইহুদি। ইহুদিজনসুলভ তাঁর বিরাট নাসারন্ধ্র, তথা ঘন-কুঞ্চিত প্রায় নীগ্রোসম কেশ যেন পাঠক তার ফোটোতে লক্ষ্য করেন। বিস্তর নৃতত্ত্ববিদের অভিমত, ফেরাউনের দাসত্বকালে, মিসরস্থ নীগ্রোদের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে ইহুদিদের মস্তকে এই কুঞ্চিত কেশের উদ্ভব। ...স্বভাবতই ইহুদি কিসিংগার তথাকথিত ইজরায়েলকে জানপ্রাণ দিয়ে মহব্বৎ করেন; পক্ষান্তরে আমরা ফলস্তীনের গৃহহারা আরবদের মঙ্গল কামনা করি। তাঁরা যেন একদিন স্বদেশে সসম্মানে ফিরে যেতে পারে আমরা সেই প্রার্থনা করি—শরণার্থী হয়ে ভিন দেশে বাস করার পীড়া আমরা জানিনে, তা জানেন নিক্সন? তিন দিন আগে তিনি এক প্রেস কনফারেন্সে বলেন, "আরব-ইজরায়েলের মোকাবেলায় আমি নিবপেক্ষ (পাঠক বিশ্বাস কবতে চান তো করুন, সেটা আপনাব মর্জি)। আমি চাই শান্তি।" পাঠক লক্ষ্য করবেন, "আমি চাই বিচার, আমি চাই জাস্টিস, ইনসাফ" এ কথা হুজুর বলেননি, কস্মিনকালেও তাঁব মুখ থেকে শুনি নি। কিন্তু শান্তি তো অতি সহজেই হুয। মিশর, লেবানন, জর্ডান, লিবিয়াকে অন্তত একশ বছরেব তরে শান্ত করার জন্য যথেষ্ট এটম বম নিকসনের ভাণ্ডাবে আছে। শান্তি ভঙ্গ তো এই "পাষণ্ডই" করছে। ইজরায়েল তো শব্দার্থে নিষ্পাপ—এরলিষমান এ্যাগনোর মত! নিকসন তো এই মতই পোষণ করেন। তাঁর পিছনের ছায়াটি—কিসিংগার—তিনি তো টুইয়ে দেবার তাতিয়ে দেবার তরে আছেনই। তবে কিনা, সে শান্তিটা হবে গোরস্তানের শান্তি।

এই সুবাদে আরেকটি তত্ত্ব-কথার উল্লেখ করি। কিছুদিন পূর্বে আমি চিন্তাশীল পাঠককে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলুম, তাঁরা যেন নিকসনের চেলা ইরানের বাদশার প্রতি একটু নজর বাখেন। উপস্থিত সে-নজবটাকে কিছুদিনের জন্য ছুটি দিতে পারেন। কারণ শাহ ইতিমধ্যে বিকল-ইনজিনওয়ালা নিকসন জাহাজটি ত্যাগ করে আরেকটা উত্তম জাহাজে চড়েছেন। তিনি দেখলেন, নিকসনের ইঞ্জিন বিকল করে দিয়েছে ওয়াটারগেটের বেনো-পানি হড়হড়িয়ে তার সর্বাঙ্গে প্রবেশ করে। ওদিকে সর্দার দাউদ গদিতে বসতে না বসতেই রুশ তাঁকে ঈদের (আনন্দের) আলিঙ্গন জানিয়েছে। এদিকে শুধু ওয়াটারগেট না, কুচক্রীরা নিক্সন আধা-আইনী বে-আইনীভাবে তাঁর প্রাইভেট বাড়ি দুটো কতখানি সরকারী পযসায় খাড়া করেছেন সেটা ক্রমশঃ উপন্যাসের মত প্রকাশ করছে। এবং কিছু কিছু অনুসন্ধান আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, ভিয়েট-নাম গয়রহ ছাড়াও তিনি কারণে-অকারণে পরিপূর্ণ শান্তিময় দেশেও গোপনে টাকা, অস্ত্রশস্ত্র ঢেলেছেন কি পরিমাণ? শাহ স্পষ্ট দেখতে পেলেন, শ্রাদ্ধ আখেরে যতদূরই গড়াক, না-গড়াক—প্রভু নিক্সন দুম করে আর

কোম্পানির মাল বেশ কিছুকাল ধরে ইরানের দরিয়াতে ঢালবার হিম্মৎ পাবেন না। অর্থাৎ কি না, কিসিংগার মুনিব নিক্সনকে সে "পরামিশ" দেবেন না। মার্কিনীরা বলছে, দেশের স্বার্থের তরে তুমি যত চাও টাকা ঢালো, কিন্তু আপন প্রভুত্ব বাড়াবার জন্য নয়।

ইতিমধ্যে আরেকটা কাণ্ড ঘটলো। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, নিকসনের দ্বিতীয় ইলেকশনের সুপ্রীম কর্ণধার মিঃ মিচেলকে বাধ্য হয়ে সাক্ষ্য দিতে হয় ওয়াটারগেট তদন্তে। এক সিনেটর কিংবা ফরিয়াদী উকিল প্রশ্ন করেন, "তা হলে বলুন, আপনি দেশের স্বার্থকে নিকসনের স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখেন কিনা?" উত্তরে তিনি সগর্বে বলেন, "নিকসনের প্রেসিডেন্টরূপে জয়লাভকে আমি বৃহত্তর বলে মনে করি।" (!!) এই পরশু-দিনতক বিবিসির বিশ্বালোচনার সদস্যগণ এই বিকট নীতির উল্লেখ করে বেকুবের মত বার বার তাজ্জব মেনেছেন। অতএব যদিস্যাৎ সরল পথচারী মার্কিন প্রশ্ন শুধোয়, "হুজুর তা হলে ইরানে এবং ১৯৭১-এ ইরানের মারফত (তৎকালীন) পশ্চিম পাকিস্তানের যে টাকা বন্দুক কামানটা ঢাললেন সেটা কি আপন লেজ মোটা করার জন্যে, না মার্কিন মুল্লুকের স্বার্থে?"—এ প্রশ্নটা তো ছিদ্রান্বেষীর না-হক প্রশ্ন নয়। অতএব শাহও তড়িঘড়ি তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে পাঠালেন মস্কো বাগে—দাউদের গদি দখলের তিন সপ্তাহ যেতে না যেতে। খুদায় মালুম দফে দফে কত দফেই না নযা জাহাজে চড়ে প্রধানমন্ত্রী করার-দাদ করার-নামা সই কবলেন। শাহ ওদিকে পিন্ডিকে পবামর্শ দিলেন, উপস্থিত জো-সো প্রকারের একটা সমঝোতা ইন্ডিয়া বাংলাদেশেব সঙ্গে করে নাও। আমাদেব রাশি এখন বেহদ বদ-বখৎ কম-বখৎ! আর পাবো যদি, ঝটপট রুশ-কিশতীতে সওয়ার হও—না হয়, গলুইটাতেই দুদিকে পা ঝুলিযে খোওযাব দেখ, 'ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল' হাঁকিয়া নয, হাঁটিয়া। কিন্তু পিন্ডি যে চীনা-কানুর সঙ্গে বড্ড বেশী পীরিতির লেটপেট করে বসে আছেন! এখন শ্যাম না কূল? তবে—আজীজ যার নাম, রুশের সঙ্গে আজীজী করতে কতক্ষণ! কুল্লে দুনিয়া তাঁব খেশ-কুটুম "—বসুধৈব কুটুম্বকং"—বলেছেন স্বয়ং চাণক্য! তবে কি না চন্দ্রাবতী কুঞ্জে যেতে হবে চীনা বঁধুযার আঙ্গিনা দিয়া।

সংক্ষিপ্ত কিসিংগার কাহিনী

বিশেষ করে বাংলাদেশের লোকের স্মরণে থাকার কথা শ্রীযুক্ত কিসিংগারের (ডাক নাম 'কিস্!') মূর্তিটি। ইনি খাঁটি ইহুদি। জন্ম জর্মানির ফ্যুর্ট শহরে। নাৎসিবা তাঁর কোনো ক্ষয়ক্ষতি করার পূর্বেই পিতা-মাতা তাঁর পনরো বছর বয়সে তাঁকে নিয়ে আমেরিকায পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। কি করে তিনি শেষটায় নিকসনের একমাত্র উপদেষ্টার আসন পেলেন সে কাহিনী দীর্ঘ, অতএব বারান্তরে।....'৭১ ডিসেম্ববের যুদ্ধ লাগার আগে এবং পরে এবং এখনো (যদিও ঠিক এখখুনি বড়ই বেকায়দায) ইনি পাকিস্তানের মিলিটারি জুন্টাকে যে কোনো উপাযেই হোক খোদার খাসির মত পোস্টাই খোরাক দিয়ে দিয়ে তাগড়া কবে রাখতে চান। কেন? এইটে তাঁর সর্ববিশ্ব সম্বন্ধে যে পূর্ণাঙ্গ দর্শন তারই একটি ক্ষুদ্র অংশ—ইরান-আফগান পাক-ভারত-বাংলাদেশ নিয়ে তার বড় একটা অধ্যায়। নিকসনকে তিনি এই মন্ত্রে দীক্ষিত করেন ধীবে ধীবে। সে-কাহিনীও দীর্ঘ, আলোচনা বারান্তরে। এই দর্শনানুযায়ী নমাস ধরে নিকসন বাইরে নিরপেক্ষতার ভড়ং

করতেন—যদিও সেটা এতই ঠুনকো ছিল যে, সামান্য ঠোনা মারতেই চৌচির হয়েছে একাধিক বার। অন্দর মহলে কিসিংগারের নেতৃত্ব আখেরী "ত্রাহি ত্রাহি" যে গোপনস্য গোপন সভা ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ ডিসেম্বরে ৭১-এ হয়েছিল, সেগুলোকে চিচিং ফাঁক করে দেন প্রাতঃস্মরণীয় প্রখ্যাত কলাম-লেখক জ্যাক এন্ডারসন মার্কিন সংবাদপত্রে, ৫ জানুয়ারী ১৯৭২-এ। কি নিদারুণ বেহায়া ভণ্ডামী চালিয়েছিলেন মুনিব চাকর দুজনাতে। হন্যে হয়ে কিসিংগার সব্বাইকে শুধোচ্ছেন, কি কৌশলে গোপনে পাক সরকারকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ্ করা যায়? বিশেষজ্ঞরা মাথা নেড়ে বলছেন ইরান, তুর্কীর মারফত ও হয় না। (পাঠানো হয়েছিল, আমরা জানি—লেখক)। শেষটায় কিসিংগার অতিষ্ঠ হয়ে বলছেন, "আমরা একটা স্টেটমেন্ট দেব বই কি। আমরা, এই যেন অনেকটা সাধারণভাবে (ইন জেনরেল টার্মশ)—অর্থাৎ ধরি মাছ না ছুঁই পানি ধরনের বলবো, পুব-পাকে একটা পলিটিকাল গুনজাইশ 'একোমডেশন'—অর্থাৎ সন্ধি না, চুক্তি না, (ছয় পয়েন্ট মাথায় থাকুন।—লেখক) করে নেওয়ার পক্ষপাতী—আমরা। কিন্তু কোনো ধরা-বাঁধার মত (স্পেসিফিকস) অবশ্যই কিছু বলবো না, ইঙ্গিতও দেব না—যেমন ধরো মুজীবকে মুক্তি দেওয়ার মত।" এটা অন্দর মহলে।

বৈঠকখানায় নিকসনেব পরিত্রাহি চীৎকার "অস্ত্র সম্বরণ করো, অস্ত্র সম্বরণ করো।"

ধন্য, সেই সিলেটী কবি, যিনি নিচের অমূল্য সুভাষিতটি রচেছিলেন। আমি শুধু "হতীন মাব" (সৎমা-'ব) বদলে "কিসিংগার" ব্যবহাব করেছি ঃ—

"কিসিংগারেব কথাগুলিন
মধু-রসর বাণী
তলা দিয়া গুড়ি কাটইন
উপবে ঢালইন পানী॥"

ছায়ার কায়ারূপ

বহু দিন ধরে হের হাইনরিষ এ. কিসিংগার কলকাঠি নেড়েছেন। কোনো রকমের সরকারী দাযিত্ব গ্রহণ না করে মিঃ নিকসনের হয়ে ভিয়েতনাম বাবদ আলোচনা সভায় নেতৃত্ব করেছেন, বাব বার। কূটনৈতিক "অসুস্থতায়" তিনি ভুগেছেন অর্থাৎ যেখানে কোনো অসুস্থতা প্রকৃতপক্ষে নেই, অথচ ডিপ্লোমেটকে যে কোনো কারণেই হোক কিছুদিন গা-ঢাকা দিতে হবে, তখন তিনি যে ব্যামোব ভান বা ভণ্ডামী করেন সেটাকে বছব পঞ্চাশ ধরে ডিপ্লোমেটিক ইলনেস বলা হয। ছেলেবেলায় আমরা অনেকেই "ক্লাসিক ইলনেসে" ভুগেছি, অর্থাৎ ক্লাসে না যাবার জন্য "পেটকামড়ানো" "দাস্ত" ইত্যাদির শরণ নিয়েছি এবং দ্বিতীয়টার উভয়ার্থে বাহ্যিক প্রমাণ স্বরূপ বদনা-হস্তে ঘন ঘন, কখনো বা দ্রুতপদে, কখনো বা কাৎরাতে কাৎরতে, বিশেবস্থলে গমনাগমন করেছি। হের কিসিংগার কূটনৈতিক অসুস্থতায় অকস্মাৎ ইসলামাবাদে কাতর হয়ে মারী পাহাড়ে যান, এবং তাবপর তেমনি অকস্মাৎ উদয় হলেন চীন দেশে, যেন ডুব-সাঁতার কেটে, বুড়ীগঙ্গা পেরিয়ে হুশ করে কোঁকড়ানো চুলসুদ্ধ মাথা তুলে বিশ্বজনের বিস্ময় লাগালেন। দুনিয়ার লোক তাঁকে চিনে ফেলার পরও তিনি যতদূর সম্ভব পর্দার আড়ালে থাকাটা দানিশমন্দের সর্বোত্তম সিফৎ বলে মনে করেন। এ কর্মে তাঁর গুরু বরমান—হিটলারের

ছায়া। ইহুদীজ কিসিংগার নাৎসি বৈরী জর্মনরূপে জন্ম নিয়েছিলেন ফ্যুর্ট শহরে। কুখ্যাত ন্যুরনবের্গ শহরের গা-ঘেঁষে এ শহর। নাৎসিবৈরী কিসিংগার পাঁড় নাৎসি বরমানের ঠিক উল্টোটা করবেন এই তো আমরা প্রত্যাশা করবো, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয় না। ইংরেজ ফৌজী আপিসাররা নেটিভ পাঞ্জাবী আপিসারদের উপর যে চোটপাট করতো, তাই নিয়ে পাঞ্জাবীদের মনস্তাপের অন্ত ছিল না—যদিও তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ তারা বড় একটা করতো না। তার কারণ অন্যত্র সবিস্তর বলেছি, পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আবার এই পাঞ্জাবীরাই যখন একদিন বৃটিশ-রাহু-মুক্ত হল তখন তারা এদেশে যা করলো সে তো বৃটিশকে সব দিক দিয়ে লজ্জা দিতে পারে।

আমার মনে তাই নিত্য একটা আশঙ্কা জেগে আছে, পাঞ্জাবী ফৌজ এবং তাদেব চেলা-চামুণ্ডারা যে সব নিষ্ঠুরতা এ দেশে করেছে আমরা যেন তারই পুনরাবৃত্তি করে না বসি। আমাদের মধ্যে যাদের চিত্ত দুর্বল, যারা একমাত্র অনুকরণ ছাড়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করে আপন কর্মপন্থা বেছে নিতে পারে না, তাদের কিছু লোক কিছুটা নিষ্ঠুরতা করবেই, কিন্তু আল্লার কাছে বার বার করুণ আবেদন জানাই, ওটা যেন আমাদের রক্ত মাংসে প্রবেশ না করতে পারে, আমাদের ইমান যেন আচ্ছন্ন না করে তোলে। এইটেই আমার এ জীবনে আমি সবচেয়ে বেশী ডরিয়েছি। অকারণে নয়। যুগে যুগে গুণীজ্ঞানীরা সাবধান বাণী শুনিয়েছেন, "পাপাচার নির্মূল করো, কিন্তু সে পাপেব কালিমা যেন তোমার গাত্র স্পর্শ না করতে পাবে। তার চেয়ে পাপাচারীর হাতে শহীদ হওয়া ঢের ঢের ভালো।"...আমি জানি, এ প্রস্তাবনাটি এখানে সম্পূর্ণ অবাস্তব না হলেও এতখানি সবিস্তার বলাটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, কিন্তু যে ভয় আমাকে আজীবন নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশী শঙ্কাতুর করে রেখেছে সেটা এ-জীবনে অন্তত একবার সংক্ষেপে উল্লেখ না করে থাকতে পারলুম না। বহু পরিবর্তনের ভিতর দিয়েও যুগ-যুগ ধাবিত নিষ্ঠুরতা অপরিবর্তনীয় রয়ে গেছে—এই তো সর্বনাশ!

কিসিংগার দেশত্যাগী হন পনেরো বৎসর বয়সে। নাৎসিরা ক্ষমতা লাভের প্রায় চার বৎসর আগের থেকে, দেশময় না হলেও ফ্যুট-ন্যুরনবের্গ অঞ্চলে যে নিষ্ঠুরতা দিয়ে জনগণের—বিশেষ করে ইহুদীদের—মনে ত্রাসের সঞ্চার করে, তার লক্ষণ যেন আমি কিসিংগাবেব্র কার্যকলাপে মাঝে মাঝে দেখতে পাই। খাঁটি নিষ্ঠুরতাটার কথা হচ্ছে না। মানুষ যে নিষ্ঠুর হয় সেটা সর্বাগ্রে বোঝাবার জন্য যে তার শক্তি অসীম, তোমার একমাত্র কাজ তার বশ্যতা স্বীকার করা। কবির ভাষায়,

"পালোয়ানের চেলারা সব
ওঠে সেদিন খেপে,
ফোঁসে সর্প হিংসা দর্প
সকল পৃথ্বী ব্যেপে,
বীভৎস তার ক্ষুধার জ্বালায়
জাগে দানব ভায়া,
গর্জি বলে আমিই সত্য,
দেবতা মিথ্যা মায়া'।"

ব্রাউন-শার্ট, এস এস, হিমলার হিটলারের গর্জন—তারাই সত্য। তাদের পশুবলেই সত্য শেষটায় একদিন লোপ পেল। কিন্তু হায়, এখনো আজো তাদের দর্প দম্ভ শুনতে

পাই বহু জর্মন পলিটিসিয়ানের জলজ্যান্ত কণ্ঠে, কন্টিনেন্ট, মার্কিন মুল্লুকে। হ্যাঁ, দেশকালপাত্র ভেদে অবশ্যই কখনো নিষ্ঠুর রূপে কখনো বা মৃদু কণ্ঠে সে স্বৈরতন্ত্র—ডিকটেটরি—আত্মপ্রকাশ করে। তার ক্রূরতম নীতিধর্মহীন স্বপ্রকাশ ইজরায়েলের গোড়াপত্তনের দিন থেকে। এই ইহুদীরাই সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত হয়েছিল হিটলারের হাতে। হিটলার অবশেষে আইন পাস করলেন ইহুদিদের কোন রাষ্ট্রাধিকার নেই, জার্মানি তাদের মাতৃভূমি নয়। এবং সবচেয়ে বড় বিস্ময়, রূঢ়তম ট্র্যাজেডি—এই সব বাস্তুহারা ইহুদীরাই ফলস্তীনে গিয়ে লেগে গেল সঙ্গীন দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নর-নারী আবাল-বৃদ্ধ-শিশুকে আরবদের আপন মাতৃভূমি থেকে বাস্তুহারা করতে। কিসিংগার পরিবার বাস্তুহারা হয়ে পেয়ে গেলেন, বিপুলতর রাষ্ট্র আমেরিকা—যেন বিশ্বভুবন দুবিঘার পরিবর্তে।

ভিন দেশে আশ্রয় নেওয়ার পর কট্টর আত্মাভিমানী জন তার ঐতিহ্যগত আচার-ব্যবহার জোরসে পাকড়ে ধরে থাকে, সাধারণ জন সে দেশের জনস্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়, আর ভাগ্যান্বেষী সুবিধাবাদী জন সর্ব ঐতিহ্য, সর্ব বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেয়, শুদ্দুমাত্র সাফল্য লাভের তরে। পিতা কিসিংগার কোন পন্থী ছিলেন, বলা কঠিন। পুত্র ওসব পুরনো কাসুন্দী ঘাঁটতে চান না, তিনি যে নিজকে এক্কেবারে আগা-পাস্তলা খাঁটির খাঁটি বনেদী খান্দানী মার্কিন রূপে পরিচিত করতে চান সে বিষয়ে মার্কিন-অমার্কিন সবাই নিঃসন্দেহ।

নামটা নিয়েই শুরু করি। প্রথম নাম, হেনরি। জর্মনে বলে হাইনরিষ, ফরাসীতে বলে, আঁরি। ছেলেবেলায় নিশ্চয়ই তাঁকে সবাই হাইনরিষ নামে ডেকেছে, তিনিও তাই লিখেছেন। ইহুদি কবি হাইনরিষ হাইনে অধিকাংশ জীবন কাটান প্যারিসে নির্বাসনে। কিন্তু তাঁর ছিল গভীর দেশপ্রীতি তথা আত্মাভিমান। তিনি হাইনরিষকে পাল্টে তার ফরাসীরূপ "আঁরি" লেখার প্রয়োজন কখনো বোধ কবেননি। রোজোভেল্ট পরিবার গোড়ার থেকেই সব্বাইকে উত্তমরূপে বুঝিযে দিয়েছিলেন, তাঁরা জাতে ডাচ এবং ইংবেজী কায়দায় রুজভেল্ট উচ্চারণ তাঁরা পছন্দ করেন না। কিসিংগার উচ্চারণের বেলাও তাই। প্রাক্তন জর্মন প্রধানমন্ত্রী কিসিংগারের শেষাংশের উচ্চারণ যে '—গার', এবং 'জার' নয় সে তথ্য সবাই জানে। বক্ষ্যমান হাইনরিষ কিসিংগার ইচ্ছে কবলেই পাঁচজনের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করে নির্দেশ দিতে পারেন 'জার' না করে যেন 'গার' উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু তিনি আমাদের পাড়ার হরিশচন্দ্র সান্যালের লিখিত হরস সি স্যান্ডল এবং কালিপদ মিত্রের পরিবর্তে ব্ল্যাক ফুটেড ফ্রেন্ডই পছন্দ কবেছেন। এনারা খাস সায়েব হতে চেয়েছিলেন, উনি চেয়েছিলেন নির্ভেজাল মার্কিন হতে। হেনরি আর কিসিংগারের মাঝখানে একটা ইংরিজি অক্ষর "এ" আছে। অক্ষরটা কোন নামেব আদ্যক্ষব সেটা আবিষ্কার করতে সক্ষম হইনি। বিবেচনা করি, খুনীয়া লোকটা বদবোওয়ালা টিপিকাল ইহুদী নামই হবে, যার অস্নাত, অধৌত ইহুদী খুসবাইটি দূর-দরাজতক ভরপুর ম ম করে। অতএব ও নামটা চেপে যাও বিচক্ষণ ঘড়িযালের মত, শুদ্দুমাত্র 'এ' দিয়ে বাকিটা রাখো।

এতখানি ছড়িয়ে ছিটিয়ে কেবলমাত্র কিসিংগারের নামটি নিয়ে লোফালুফি করার মাধ্যমে আমি শুধু মাফ চেয়ে বলতে চাই, তুমি যে ইহুদী তুমি যে জাত-মার্কিন নও, সেটা চেপে গিয়ে মার্কিনদের হনুকরণ করো কেন? (টু ইমিটেট-এব অনুবাদ 'অনুকরণ'; টু

এপ-এর অনুবাদ 'হনুকরণ')। ইহুদিদের ভিতর বেশুমার সজ্জন আছেন, মার্কিনদের চেয়ে অমার্কিনদের ভিতর ভদ্রজন বে-এন্তহা বেশী।

এ সব স্নবারি অতিশয় সাধারণ। কিন্তু অসাধারণ নাকি কিসিংগারের প্রতিভা এবং মানবিক গুণরাজির সংমিশ্রণ।—এ সত্য মার্কিন মুল্লুকের উত্তম উত্তম রাজনীতিবিদরা স্বীকার করেছেন। রবার্ট মেকনামারার মতামতের মূল্য নিশ্চয়ই বহুগুণ-গ্রাহ্য। তিনি বলেন, কিসিংগারের ভিতর তিনটি অসাধারণ গুণের সমন্বয় হয়েছে; জর্মনদের কর্ম করার সুবিন্যস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতি (সিসটেমাটিক রীতিবদ্ধতা), ফরাসীদের স্পর্শকাতরতা এবং মার্কিনদের উদ্যম (কাজকর্মে অফুরন্ত উৎসাহ, অদম্য নিষ্ঠা)। তাঁর ডক্টরেট থিসিস ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, নাম "এটম বম এবং পরবাষ্ট্র নীতি"—"কের্ণাফেন উনট আউসভের্টিগে অলিটিক।" এই পুস্তক। ঐ বৎসবই পরিবর্ধিত আকারে "এ ওয়ার্লড রিস্টোর্ড" নামে প্রকাশিত হয়।

ইউনিভার্সিটিতে কিসিংগার অতি সহজেই অধ্যাপক পদ পান। পরবর্তী কালে তিনি প্রেসিডেন্ট নিকসনের উপদেষ্টারূপে নিযুক্ত হলে এক সুরসিক গুণী তাঁকে 'প্রফেসর' এবং 'প্রেসিডেন্ট' দুই শব্দের সমন্বয় করে সম্বোধন করেন "মিঃ প্রফাসিডেন্ট" বলে। নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও কিসিংগারের কেমন যেন জনসমাজে নিজের ব্যক্তিত্ব ও উপস্থিতি অযথা দৃঢ়তাসহ প্রকাশ করার একটা সচেতন প্রচেষ্টা লেগে থাকে এবং আপন বুদ্ধিবৃত্তি (ইনটেলেকট) সম্বন্ধে প্রকাশ পায় তার সীমাহীন ঔদ্ধত্য। এ মন্তব্যটা আমার কাছে বড় অদ্ভুত ঠেকে। নাৎসিরা যখন ইহুদিদের উপর চোটপাট করছে সে সময়টা কিসিংগাবেব বারো থেকে পনরো আয়ুষ্কাল—আমি ঠিক সেই ক বৎসরেই বন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমাব সহপাঠী ইহুদিরা যে তখন কতখানি মানসিক দুশ্চিন্তায় পীড়িত এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কান্বিত ছিলেন সে স্মৃতি আমার কখনো ম্লান হবে না। এঁরা যে তখন হীনমন্যতার (ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেকসের) সহজ শিকার হবেন, সেটা অনায়াসেই বোঝা যায়। তাই মনে আসে আবার সেই নীতিবাক্য ঃ জালিম তার জুলুমের অনেকখানি রেখে যায় তার শিকারের (মজলুমের) চরিত্রসত্তায়। এরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দেখা যায়, তাব চিন্তাধারা কার্যকলাপে অহেতুক দম্ভ, অকাবণ অপমানজনক আচরণ।

নিক্সনের কর্ণধার, "প্রাইভেট নয় নম্বর" ডিটেকটিভি উপন্যাসের হী-ম্যান হীরো "ওয়াশিংটন ০০৯"; এবং সর্বশেষে "প্রভুর বিবেক স্পন্দন" এই হর-ফন-মৌলা কিসিংগার। ইনি নিজের কার্যভার কমাবার তরে কখনো কোন ডেপুটি বাখেন নি—বরমানও রাখতেন না—অধঃস্তন কর্মচারীদের কড়া মানা, তাঁরা যেন কখনো সরাসরি নিক্সনের সম্মুখীন না হয়। তদুপরি তিনি কংগ্রেস, ব্যুরোক্রাটি এমন কি গণশক্তিব আধার ভোটারদের অতিশয় তাচ্ছিল্যের চোখে দেখেন। তাঁর মতে, সুষ্ঠু পররাষ্ট্র নীতি চালাবার পথে এরা নুইসেনস, বেকার ঝামেলাময় বাধা মাত্র।

ইনি হতে চলেছেন, কিংবা ইতিমধ্যে হয়ে গেছেন পররাষ্ট্র-মন্ত্রী। এবারে লাগাবে ভানুমতীর খেল—অবশ্য ওয়াটারগেট-ফাঁড়াটা কাটাতে পারলে। পাঠক সেদিকে নজর রাখবেন। নইলে আমি এতখানি লিখতে যাবো কেন? অথচ তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন সম্বন্ধে এখনো কিছু বলা হয় নি। হবে। ধীরে রজনী, ধীরে।

সাধু সাবধান!

প্রথম লেখাতেই যদি লেখক লম্বা-চৌড়া আত্মপরিচয় দিতে আরম্ভ করেন, তবে পাঠকমাত্রই বিরক্ত হয়। সে-পরিচয় দিতে হয় ধীরে ধীরে, টাপেটৌপে, মোকামাফিক। এই বেলা তারই একটি ক্ষুদ্র অংশ নিতান্তই বাধ্য হয়ে দিতে হচ্ছে।

অস্বীকার করবো না, একদা টুকলি করেই হোক, এগজামিনারকে প্রলোভন দেখিয়েই হোক, দুএকটা আজেবাজে পরীক্ষা পাস করেছিলুম। তারপর মাঝেমধ্যে দুএকখানা বই, পত্র-পত্রিকাও পড়েছি। কিন্তু স্বরাজ পাওয়ার বছর দশেক পর থেকে দেখতে পেলুম, কি ভারত কি (মরহুম) পূর্ব-পাক সরকার উঠে পড়ে লেগে গেছেন, অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করতে এবং যেটা আপনাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে,—শিক্ষিতকে অশিক্ষিত করতে। খবর এল, সরকাব হার্ড-কাবেনসি বাঁচাতে চান। ইংরেজ আমলে এবং স্বাধীনতার গোড়ার দিকে থ্যাকার দাশগুপ্ত কোম্পানীকে নেটিভ-টাকা মেড়ে দিলেই তারা ইংরেজি, ফরাসী, জর্মন যে-ভাষার যে-বই চান, আনিযে দিত। এখন আর সেটি চলবে না। সরকার বাছাই বাছাই কোম্পানিকে বিদেশী মুদ্রার ‘কোটা’ দেবেন। আপনি কি বই চান, তাদের জানাবেন। তাঁরা ব্যবস্থা করবেন। সবল পাঠক, উল্লাসে নৃত্য জুড়েছেন তো? আমারও চিত্ত জুড়ালো! উল্লাসভরে বইয়েব অর্ডার দি। নো রিপ্লাই। কেন? খবর নিয়ে জানলুম, পুস্তকবিক্রেতারা যে ‘কোটা’ পান তাই দিযে জাহাজ জাহাজ টিকটিকি নভেল আব খাবসুরৎ সেকসেব বই আনান ৪০ থেকে ৬০ পার্সেন্ট কমিশন! আর আমি চেয়েছি, হের ডক্টর কিসিংগারের জর্মন ভাষায় লেখা কেতাব—“এটম বমেব ভয় দেখিয়ে কি প্রকারে বিশ্বশান্তি স্থাপন করা যায়”, মোটামুটি কেতাবের নাম ঐ। সে-বই একখানা আনালে পুস্তকবিক্রেতা কোনো কমিশনই পাবেন না, কিংবা পাঁচ পার্সেন্ট! আমার এক ক্যাপিটালিস্টি পয়সাদার কম্যুনিস্টি ইয়ার অনেক ঝুলোঝুলি করাব পর পুস্তকবিক্রেতা, সত্য সত্যই মোটা কমিশনের লোভ কাটিয়ে তাঁকে বললেন, আমি যদি একই কেতাবের—আবার বলছি একই কেতাব, পাঁচখানা ভিন্ন ভিন্ন বই নয়—একই কেতাবের পাঁচ কপি এক অর্ডারেই কিনি, তবে তাঁরা বিষয়টি মেহেরবাণীসহ বিবেচনা করে দেখবেন। শুনুন পাঠক, একই বইয়ের পাঁচ কপি! আচ্ছা বলুন তো, খুদ দ্রৌপদীকে যদি একই রং-চঙ্গের, হুবহু একই ধরণের, পাঁচখানা কার্বন কপির মত পাঁচটা স্বামী দেওয়া হতো তাহলে তিনি কি চাঁদ-পানা মুখ করে পাঁচ দফে কবুল পড়তেন?...এবং ভুলবেন না, তাঁকে রোক্কা টাকা ঢালতে হয় নি। তা সে যাক গে। কিন্তু এস্থলে বলে রাখি, আমি সরকারের সমালোচনা কস্মিনকালেও করি নে। বরঞ্চ না খেয়ে মরবো, তবু হাঙ্গার-স্ট্রাইক করতে আমি রাজি নই। সরকার বইয়ের বদলে গোবর কিনে যদি দেশের খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে নিরন্নকে অন্ন দিতে পারেন, তবে আপত্তি করার মত অত বড় পাষণ্ড আমি নই। আর ব্যক্তিগতভাবে আমার কীই বা লাভ-লোকসান? আমি ছিলুম অশিক্ষিত, থাকবো অশিক্ষিত। পূর্বোক্ত জর্মন বই পেলে আমি কি রাতারাতি শহীদুল্লা হয়ে যেতুম? লাইব্রেরীর চাপরাসী দিন-ভর হাজাব হাজার বইয়ের মধ্যিখানে বাস করে শেষটায় কি শিক্ষামন্ত্রীর পদে প্রমোশন পায়? তবে প্রসঙ্গটা তুললুম কেন? বলেই ফেলি। আজ আবার শব-ই-বরাৎ! মাঝে মাঝে এ-বই সে-বইয়ের রেফারেন্স দিয়ে সরল পাঠককে তাক লাগাবার কুমতলব আমার হয়। তখন যেন আমার কথা বিশ্বাস করে ফাঁদে পা দেবেন না।

শক্তির ভারসাম্য

হের ডক্টর ফিল হাইনরিষ কিসিংগারের চিত্তজগতের গুরু প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, তৎকালীন অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর ফরেন মিনিস্টার (১৮০৯—১৮২১) ক্লেমেনসে মেটারনিষ। নেপোলিয়নের পতনের পর লণ্ডভণ্ড ইয়োরোপে যখন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সুবো-শাম কামড়াকামড়ি চলছে, তখন মেটারনিষ প্রধান রাষ্ট্রগুলিকে ভিয়েনাতে নিমন্ত্রণ করে একত্র করতে সক্ষম হন। শুধু তাই নয়, তাঁরই যুক্তিতর্ক অসাধারণ মেলামেশা করার ক্ষমতা ইয়োরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সীমা-নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়। আজকের দিনে যারা ইউনাইটেড নেশনসের কার্যকলাপ চোখ মেলে দেখেন তারা এ কর্মটি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে করবেন। মেটারনিষ ভাগ-বাঁটোয়ারা করার সময় যে নীতি অবলম্বন করেন সেটা আজও 'মেটারনিষ সিসটেম' নামে প্রখ্যাত। এ নীতির মূলে ছিল ভারসাম্য। অর্থাৎ ইয়োরোপকে এমনভাবে বিভক্ত করতে হবে, যাতে করে কোনো রাষ্ট্রই যেন বড্ড বেশী বলবান না হতে পারে, এবং শেষটায় গুণ্ডার মত দুবলা রাষ্ট্রের কান পাকড়ে আপন স্বার্থ গুছিয়ে না দিতে পারে। অপকর্মের ভিতর ঐ ভিয়েনা কংগ্রেস সিংহলকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইংরেজের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই—পাঠক, ঠিকই ধরেছো—ইংরেজই সক্কলের পয়লা কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনের ডাঙ্গা ত্যাগ করে আপন চর-এ ঘাপটি মেরে বসে রইল। নীতিটার কিস্মৎ কিন্তু ইংরেজই মালুম করতে পেরেছিল সবচেয়ে বেশী। এ সব দলাদলির একশ' বছর পরও প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন ইয়োরোপের ভারসাম্য রাখবার জন্য হিটলারকে খাইয়ে-দাইয়ে পোস্টাই করেছিলেন স্তালিনের সঙ্গে আখেরে লড়বে বলে।

বাংলাদেশ পাকিস্তান
....গুলি খান—খান খান

পাঠক অধৈর্য হবেন না। কারণ এ ছাড়া অন্য গতি নেই। কে বিশ্বাস করবে বলুন, সুদূর মার্কিন মুল্লুকের ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির সঙ্গে এই গরীব বেচারী বাংলাদেশের— বাংলাদেশ কেন, কুল্লে বিশ্বের বরাৎ বিজড়িত। 'বরাৎ' শব্দটি ইচ্ছে করেই বললুম। কারণ শবেবরাতের রাত্রেই বেতারে শুনতে পেলুম (পরের দিন খবরের কাগজ ছুটিতে ছিলেন বলে সে খবর পাকাপাকিভাবে জানতে পারলুম না, পাঠক আমার তরে আধেক ইঞ্চি মার্জিন বা গুঞ্জাইশ রাখবেন) যে হের ডক্টর কিসিংগার তাঁর মিত্র, পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্সকে ঠেলা মেরে সরিয়ে, আপন ছায়ারূপ পরিত্যাগ করে কায়ারূপ ধারণ করতে যাচ্ছেন, অর্থাৎ তাঁর গদিতে বসবেন, তিনি সিনেট সদস্যদের এক প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "নাটকীয় তেমন কিছু একটা পরিবর্তন ঘটে নি, তবে গত ছমাস ধরে ভারত এবং বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক উন্নতি লাভ করেছে।" কাষ্ঠরসিক ফোড়ন দেবে, ওয়ার্স থেকে ব্যাড-এ এসেছে, নিকৃষ্টতর থেকে নিকৃষ্টে পৌঁছেছে। এর পরমুহূর্তেই বলবেন, "কিন্তু পাকিস্তানের বড্ড বেশী ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গিয়েছে, তাকে সাহায্য করতে হবে।" আহা বাছা রে, পূব-পাককে পেঁদিয়ে পেঁদিয়ে তোমার হাতে বড্ড ব্যথা ধরেছে।

এসো, যাদু, একটা গোল্ড ইনজেকশন দি। পরে, চাই কি, এক খালুই এটম-আন্ডা পাঠিয়ে দেবখন।

স্মরণে আসছে না, বলেছি কি না, কিসিংগার-নিক্সন গলাডা কাড্যা ফালা-ইলেও মিঃ ভুট্টোকে ফৌজী জুন্তার "ফী নারী—" পড়তে দেবেন না। হ্যাঁ, জুন্তার খুঁটি এ-দিক ও-দিক সরাও, দু-চারটেকে রাজসিক পেনসন দাও—কিন্তু হাঁক দিলে যেন পুকুরের ওপার থেকে লাঠি হাতে তড়িঘড়ি অকুস্থলে হাজির হয়। আর ঐ বস্তা-পচা সিস্টেমে জুন্তার বেশী লোককে ইলচির পাগড়ি পরিয়ে ভিনদেশ পাঠিয়ো না। কে জানে, কবে লেগে যাবে ভারত, আফগান, রুশ-চীন কার সঙ্গে। এস্তেক বেলুচ পাঠানকে ঠ্যাঙ্গাবার তরে টিক্কা খানের তো কুইনটুপ্লেট ভাই নেই! জুন্তা ভাঙলে ওদের ঠেকাবে কে?

হঠাৎ কিসিংগার এ-হিম্মৎ যোগাড় করলেন কোথা থেকে? এ্যাদ্দিন তো প্রভু-ভৃত্য—অথবা ভৃত্যেব বেশে প্রভু—দুজনাই তো গোরস্তানী খামুশী এখতেয়ার করেছিলেন। ঝপাঝপ স্টেটমেন্ট, দেমাতি, এস্তেক প্রেস-কনফারেন্স দিতে শুরু করেছেন হুজুর, আর ইয়ার বুক ফুলিয়ে সিনেটেব সামনে বলছেন, "পাকিস্তানকে মদদ দিয়েছিলুম—বেশ করেছিলুম। ফের দেবো" ছুঁচো জ্যাক এন্ডারসনকো মারো গুলি—সেটা বলেছেন মনে মনে। আর স্বয়ং নিক্সন ওয়াটারগেট তদন্তের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, সিনেটবদের খেতাব দিয়েছেন, কিচিরমিচির করনেওলা সব কথাতেই 'না-মনজুর! না-মনজুর!' 'চিল্লি মারার নবাব সায়েবের পাল'—ইংরেজিতে "ন্যাটারিং নবাবস অব নিগেটিভজম"। কবি নিক্সনের তাহলে এই নঅক্ষরের অনুপ্রাসের প্রতি বিলক্ষণ দিল-চসপী আছে। আমার বাংলা তর্জমাটা বড্ড কুশাদা হয়ে গেল, কিন্তু পাঠক লক্ষ্য করবেন, মূল ইংরেজিতে 'নবাব' শব্দটি আছে, সায়েবী উচ্চারণ "নইবব"। নিক্সন এখানেই ক্ষান্ত দেন নি। স্বয়ং কটু বাক্যের জহাঁবাজ 'নইবব' নিক্সন মেহমান জাপানী প্রধানমন্ত্রীর 'স্বাস্থ্য পান' করার সময় বলেছেন, "ওরা সব সামলাক তাদের গম-পেরেশানী, ফালতো হাবি-জাবির আক্রোশ"—ভাবখানা এই, "আমি যাবো ড্যাং ড্যাং করে"। ইংরেজ সচরাচর এ ধরনের বিদেশীয় বড়ফাট্টাইয়ে ভর্তি বগল-বাজানোর উপর নজর দেয় না। কিন্তু এস্থলে তাঁদেরই এক পয়লা নম্বরী সম্পাদক বলেছেন, "উঁহু! এবার থেকে হুজুরকেই ঐ গমপেরেশানী দিয়ে নিত্যি নিত্যি লাঞ্চ ডিনার খেতে হবে।" হয়তো হবে, কিন্তু আমাব মনে হয, হাওয়া যেন হঠাৎ করে উল্টোদিকে ভর করেছে।

রত্তি-বল-বর্ধক কিসিংগারী সালসা

মেটারনিষ নীতিতে—শক্তিব ভারসাম্যে—কিসিংগারের অচল বিশ্বাস। কিন্তু এই নীতিটা হালফিল কাজে খাটাতে হবে অন্য পন্থায়। মার্কিনের হাতে আছে এটম বমের ডাণ্ডা। সেই ডাণ্ডার ভয় দেখিয়ে দুনিয়াব কুল্লে রাষ্ট্রকে বলে দেব, কে কতখানি শক্তিবান হবার অনুমতি পেল। এইটেই ছিল ডঃ কিসিংগার-থীসিসের মূল বক্তব্য। বইখানা পড়ে নিক্সন তদ্দণ্ডেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। ক্ষমতা লাভের পর নিক্সন ডেকে পাঠালেন কিসিংগারকে ঐ "শক্তির ভারসাম্য" কাজে লাগাতে। এখানে দুটি তথ্য বলে নেওয়া ভালো। কিসিংগারের মতে, "শক্তির ভাবসাম্য" তো বটেই, কিন্তু সেটা এখন আসবে এটম বমের "ভীতির

ভারসাম্য" রূপে, কিন্তু নিজেকে থাকতে হবে শক্তিমান। এবং তাঁর আপন মাতৃভাষা জর্মনে কিসিংগার ঝেড়েছেন একটি লাখ কথার এক কথা : "'মাখট' ইসট ডের গ্রোসটে আফ্রডিসিয়াকুম"—অর্থাৎ "পলিটিকাল শক্তিই ('মাখট' ইংরিজি 'মাইট') সর্বোৎকৃষ্ট আফ্রডিসিয়াক"—যে ঔষধ রতিশক্তি বাড়িয়ে দেয়, পঞ্জিকার যে-সব মলম-বড়ির চটকদার বিজ্ঞাপন অন্ধেরও চোখ এড়াতে পারে না, তার ভদ্র নাম এফ্রডিসিয়াক। দ্বিতীয় তথ্য, দুশমন পরাজিত হলেও মজলুমের উপর তার প্রভাব রেখে যায়—এটা পূর্বেই বলেছি। শক্তির উপাসক হিটলার দেখিয়েছেন, শক্তিতে ভাটার টান লাগার সম্ভাবনা দেখলেই শক্তির ভড়ং দেখাবে মাসল ফুলিয়ে, উরু থাবড়ে। এটা তো ভালো করে রপ্ত করেছেনই কিসিংগার, তদুপরি হিটলারের গুরু শক্তির মূর্তিমান প্রতীক বিসমার্ক (ইনি মেটারনিষের সদুপদেশ নিতেন আখছারই) সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রামাণিক প্রবন্ধ লিখে তাঁরই পন্থায় শক্তি সাধনায় নিজেকে বহুপূর্বে চালিত করেছেন।

আকস্মিক না প্ল্যান-মাফিক

এইবার কিসিংগার নেমেছেন মল্লভূমিতে। তাঁর অন্তরঙ্গ সখা পররাষ্ট্র সচিব রজার্স, যাঁর সাহায্যে তিনি নিয়েছেন রাজনীতিতে ছায়ারূপে পদার্পণ-কালে, অকৃপণভাবে, তাঁকে সরিয়ে তিনি সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করেছেন প্রখর দিবালোকে। ভিয়েনা কংগ্রেসের শক্তিসাম্য নির্মাণকালে তার মানস-গুরু মেটারনিষও ছিলেন প্রচণ্ড শক্তিমান অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্র-মন্ত্রী। রণাঙ্গনে নেমে কিসিংগার কোন ইন্দ্রিয়াতীত শঙ্খধ্বনি বাজিয়েছেন, জানি নে, কোন অদৃশ্য ইঙ্গিত দিয়েছেন বুঝি নি কিন্তু ফলস্বরূপ এ কদিনে কি কি ঘটলো লক্ষ্য করুন। সব কটাই কিসিংগার নীতি অনুযায়ী।

১। ইজরায়েল অকস্মাৎ আক্রমণ দ্বারা সীরিয়ার বিমান বাহিনীর এক বৃহৎ অংশ পঙ্গু করেছে পরশুদিন। সীরিয়া রীতিমত ধরাশায়ী।

২। জনাব আজীজ আহমদ আকুণ্ঠ তর্কাতীত ভাষায় বলেছেন, সর্বশেষ যুদ্ধবন্দীকে পাকিস্তানে পাঠাও। তাদের বিরুদ্ধে কোনো মোকদ্দমা চালাতে পারবে না। ইউনাইটেড নেশনে ঢোকার প্রস্তাব তার পর। চীন আছে সেখানে পুরো মদত দিতে—আমাকে। কোথায় গেল উভয়পক্ষের সমাসনে বসে আলোচনার সমঝোতাটা? এই সুর-পরিবর্তন বিশ্বরাজনীতিতে ভয়ঙ্কর কিছু নয়, কিন্তু বাংলাদেশ এবং পরোক্ষভাবে আফগানিস্থানের পক্ষে জব্বর গুরুত্ব ধরে।

৩। সদর দাউদ মার্কিনের চেলা না হয়েও কিসিংগারের অদৃশ্য ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছেন। তাড়াতাড়ি পাঠিয়েছেন আগা মুহম্মদ নঈমকে কমরেড ব্রেজনেভের কাছে। কি বৃত্তান্ত কিছুই জানা যায় নি। দাউদ যে আজীজের কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন তাই নয়, কিসিংগার যে পাকিস্তানকে সাহায্য করবেন (দাউদ জানেন, সে সাহায্য গোপনে সেরা সেরা অস্ত্রশস্ত্রের রূপ নেবে), সেটা কিসিংগার সিনেটের সামনে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন। নিক্সনাদির দৃঢ় বিশ্বাস রুশের সাহায্য নিয়ে দাউদ কু' সমাপন করেছেন, ব্রিটিশ বলে অসম্ভব নয়, তবে রুশ যে আগের থেকেই কুর খবর জানতো সেটা সন্দেহাতীত।

৪। সবচেয়ে মারাত্মক চিলি রাষ্ট্রের কু। নিউইয়ার্ক টাইমস বলেছে, চিলির কুর

আগের দিনই যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনাটির খবর জানতো। মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র-মন্ত্রী সিনেটের সামনে এই সাক্ষ্যই দিয়েছেন। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ঝটপট তার দেমাঁতি (প্রতিবাদ) প্রকাশ করেছেন ও মৃতের স্মরণে সরকারী ব্লটিং পেপার দিয়ে আড়াই ফোঁটা কুম্ভীরাশ্রু শুষিয়ে দিয়েছেন। তিনি স্বয়ংক্রিয় গোপন টেপ-রেকর্ডের জন্য ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে থাকলে সে টেপ মহাফিজখানায় সযত্নে রাখা হয়েছে কি না, সুপ্রীম কোর্ট গোঁ ধরে সেটা চেয়ে বসলে সদর নিক্সন সেটা দেবেন কিনা, তা প্রকাশ পায়নি।

এতগুলো দিগ্বিজয় কি দৈবযোগে, গ্রহ-নক্ষত্রের কেরামতিতে ঘটলো? এর সঙ্গে বিজড়িত আছে আরো তিনটি ঘটনা। (১) যে আদালতে ওয়াটার-গেট কমিটির পক্ষ থেকে নিক্সনের উপর হুকুমজারি চাইছে, তিনি যেন তদন্ত সম্পর্কিত টেপগুলো কমিটিকে দিয়ে দেন, সে আদালত সরাসরি রায় না দিয়ে একটি সুলেহ্ প্রস্তাব করেছেন। অনেকে মনে করে, নিক্সন-বৈরী-ভাব যেভাবে দ্রুত কমে যাচ্ছে তাতে করে আদালত দেশের বিরাটতর স্বার্থের খাতিরে এটা করেছেন। কিন্তু নিক্সন গরম। পূর্বেই একাধিকবার শুনিয়াছি, কি কেরামতির বদৌলত এ সব ঘটছে? এখন শুধোই হুজুরের আকস্মিক এ গরমাইয়ের অর্থটা কি? তিনি আদালতকে পালটা প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু এতে করে আমাব "প্রশাসনিক স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধিকার"—খুদ-মুখ্তারী—ক্ষুণ্ণ হবে না তো? অর্থাৎ ভবিষ্যতে ফের অন্য কিছু চেয়ে বসলে আমাকে বিনা ওজর-আপত্যে সুড়-সুড় করে কুল্লে চীজ ঢেলে দিতে হবে না তো? আদালত সঙ্গে সঙ্গে অভয় দিয়ে বলেছেন, "আরে না, না, না।" এ সব প্রশ্ন, হঠাৎ এই মধুর মধুব মোলায়েমীটা আদালতের খাসলতে এল কোত্থেকে? আদালতেব এহেন গুঞ্জাইশ প্রচেষ্টা যে বড্ডই অভিনব ঠেকছে! আমরাও সুলেহ চাই, কিন্তু এতখানি আক্রা দবে?

(২) আরভিন তদন্ত কমিটি নিয়েছিলেন ছুটি—১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত। হঠাৎ খবর এল, আরভিন মেম্বাবদের জানিয়েছেন, ছুটি বাতিল, কমিটি বসবে ২৪শে সেপ্টেম্বর। কেন? অনেকেই বলছেন, যেভাবে ঝড়ের বেগে হাওয়া পালটাচ্ছে, তার থেকে অনুমান কবা সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়, যে মোতাবেক ১৫ই অক্টোবরতক আরভিন কমিটি ছুটি উপভোগ করে ঐদিন কমিটি ঘবে এলে হয তো দেখবেন, দরওয়াজা বন্ধ, পাইক-বরকন্দাজ হাওয়া, আসামী-ফরিয়াদি গায়েব।

(৩)·অবস্থার অধঃপতন দেখে স্বয়ং কেনেডী আসরে নেমেছেন।

মানতেই হবে, বাবাজীবন কিসিংগারের পেটে এস্তের এলেম গিজ গিজ করছে।

কি ভয় দেখালেন তিনি? তাব সারাংশ এইমাত্র শুনলুম, বেতারে। অবশ্য তিনি জিভ কেটে বলবেন, তওবা, তওবা। খাকসার ইহুদীব পোলাডা দেখাবে ভয়—মহাপরাক্রান্ত আরভিন কমিটি, কংগ্রেস সিনেটকে! তওবা, তওবা!..অতএব বারান্তরে।

প্রেমালাপ বনাম বৈদ্য-বিমান

পাড়া-পড়শী কারো কাছ থেকে এক খণ্ড মার্কিন সংবিধান লিপি যোগাড় করতে পারবো এমনতরো বাতুলাশা আমরা করি না। আর, যোগাড় হলে লাভটাই বা কি? ওয়াটারগেটের টেপরেকর্ড প্রেসিডেন্ট নিক্সন আদালতের হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য কি না, সংবিধান অ-সমস্যায় কি নির্দেশ দেয়, এই নিয়েই তো যত মাথা ফাটাফাটি। তদন্ত

কমিটি বলছেন, দিতে বাধ্য। নিক্সন বলছেন, না। তুলনামূলক যুক্তি দিয়ে বলছেন, প্রেসিডেন্ট তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারীদের সঙ্গে যে সলা-পরামর্শ করেন সেগুলো পূতপবিত্র মুকদ্দস। যেমন মক্কেল এবং উকীলে যেসব অন্তরঙ্গ আলোচনা হয়, স্বামী-স্ত্রীতে নিভৃতে যে গুফতো-গো হয় সেগুলো পবিত্র। অর্থাৎ কোনো আদালতই সেগুলো মোক্কম হুকুম দ্বারা সংগ্রহ করতে পারেন না, জজ এগুলো একা একা গোপনে পড়তেও পারেন না, প্রকাশ্য আদালতে সর্বজনসমক্ষে ফাঁস করে দেওয়ার তো কথাই ওঠে না। জনৈক টীকাকার উত্তরে বলেন, যে-দুটো উদাহরণ নিক্সন পেশ করলেন সে-দুটো যদি আইনত মেনে নেওয়া হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি উদাহরণ অতি অবশ্যই মানতে হবে, এবং ঘড়িয়াল নিক্সন সে উদাহরণটা চেপে গেলেন কেন?—ডাক্তারে রোগীতে যে গোপন আলাপ হয় সেটাও সেক্রেড। প্লাতোর চেয়ে বয়সে বড়, ইয়োরোপে যিনি "চিকিৎসা-শাস্ত্রের জনক" রূপে পরিচিত সেই গ্রীক বৈদ্যরাজ হিপপো-ক্রাতেস তাঁর শিষ্যদের দিযে শপথ করিয়ে নিতেন "আমি যা কিছু সর্বাপেক্ষা পূত-পবিত্র (সেক্রেড) বলে স্বীকার করি, তাদের নামে শ্রদ্ধাভক্তি সহ (সলেমলি) শপথ করছি, আমি চিকিৎসাকর্ম নিষ্ঠাসহ সমাপন করবো, ইত্যাদি ইত্যাদি".......এস্থলে একের পর এক ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্য সম্বন্ধে শপথ নেওয়ার পর সর্বশেষে শপথ করতে হত—"রোগী এবং তার সংশ্লিষ্ট জন সম্বন্ধে আমি যা-কিছু দেখতে পাবো, শুনতে পাবো, যেগুলো সম্বন্ধে কোনো কিছু বলা অনুচিত সেগুলো আমি অলঙ্ঘ্য গোপন রূপে রক্ষা করবো (ইনভায়োলেবলি সীক্রেট)।" ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমাদের উপমহাদেশেও ডাক্তারদের সনদ নেওয়ার সময় এই কসম নিতে হত। এখনো কোনো কোনো বৃদ্ধ চিকিৎসকের চেম্বারে এই শপথলিপি ফ্রেমে বাঁধানো অবস্থায় দেখা যায়। আজকেব দিনে. . .যাক, অপ্রিয় কথা।

নিক্সনের উত্তবে যে টীকাকার রোগীর গোপন কথার পবিত্রতা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন তিনি খুব সম্ভব আড়াই হাজার বছরের পুরনো সর্ববিশ্ব-সম্মানিত এ শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দিযে তার দোহাই দেবার কোনো প্রয়োজন অনুভব করেন নি। আসল কথা, নিক্সনের দুশমন জনৈক সিনেটরকে ঘায়েল করার জন্য হোযাইট হাউস কর্তৃক সেই সিনেটরের চিকিৎসকেব দফতর থেকে রোগীর সঙ্গে চিকিৎসকের গোপন আলাপচাবির রেকর্ড চুবি করানো হয়—হুবহু যে-কায়দায় ওয়াটারগেট থেকে দলিল-দস্তাবেজ পেশাদাবী চোর মারফৎ চুবি করানো হয়।

নিক্সনের বিবৃতি যিনি তৈরী করে দেন তিনি নিশ্চয়ই আস্ত একটি গর্দভ। উকিল-মক্কেল, স্বামী-স্ত্রীতে কথাবার্তার পবিত্রতা নিয়ে উদাহরণ দেবার কীই বা ছিল প্রয়োজন? করলেই যে রোগী-বৈদ্যের পবিত্রতর কথোপকথন উদাহরণ আপনার থেকেই এসে যাবে, সেটা এক লহমার তরেও তার মাথায় খেলে নি? তাজ্জব! এবং সেই পবিত্রতা ভঙ্গ করেছেন নিক্সনেব আপন খাস কর্মচারিগণ!

স্কুল-বয় কিসিংগারের ভাইভা

আমি কিন্তু ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে মার্কিন সংবিধান-লিপির তামাশা করছিলুম। কয়েকদিন ধরে ডঃ কিসিংগারকে মার্কিন সিনেটের একটি বিশেষ কমিটির সামনে সশরীরে উপস্থিত হয়ে মার্কিন ফরেন-পলিসি নিয়ে হরেক রকম প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে। যেন ভাইভা

পরীক্ষা। ইতিমধ্যে এক মার্কিন বেতারকেন্দ্র বললে, দুজন মেম্বর নাকি বলেছেন, তাঁরা কিসিংগারকে ফরেন মিনিস্টারের নোকরিটি দিতে চান না। ব্যাপারটা তবে কি? আমরা তো জানতুম, গণতন্ত্রশাসিত রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী বা সক্রিয় প্রেসিডেন্ট তাঁর পছন্দসই মন্ত্রী নিয়োগ করেন, খুশীমত ডিসমিস করেন গণ-পরিষদ, এমন কি আপন মন্ত্রীমণ্ডলী-কেবিনেটের কোনো তোয়াক্কা না করে। তাই ধরে নিচ্ছি, প্রাগুক্ত কমিটি যদি কিসিংগারকে গোল্লা দিয়ে না পাস করে দেন, তবে নিক্সন ভেটো মেরে না-পাসটা বাতিল করে দিতে পারেন। কিংবা এটাও সম্ভব যে, কিসিংগার যেহেতু জাত-মার্কিন (এমেরিকান সিটিজেন বাই বার্থ) নন, ষোল বছর বয়সে স্টেটসে এসে ডমিসাইল্ড নাগরিকত্ব পান, তাই সুদ্ধমাত্র এ ধরনের উমেদারকেই হয়তো তাদেব নির্ভেজাল "মার্কিনত্ব" প্রমাণ করতে হয়। শুনেছি, জাত-ইতালিয়ান ভিন্ন অন্য কেউ হোলি পোপ হতে পারেন না, তথা ভিন্ন-ধর্ম থেকে দীক্ষিত খৃষ্টান পাদ্রী সমাজে বিশেষ একটা পদের (যেমন বিশপের) উপরে যেতে পারেন না। আমার এ-খবব যদি ভুল হয়, ক্যাথলিক সমাজ দয়া করে অপরাধ নেবেন না। তা সে যাই হোক, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত দেশের মুরুব্বী-স্থানীয় ফরেন মিনিস্টার একটা স্কুল-বয়ের মত ভাইভা দিচ্ছেন এ তসবীরটা আমার কাছে কেমন যেন খাপছাড়া বদখৎ মনে হয।

তাজহীন আগ্রা?

এই সঙ্গে সম্পর্কিত আরেকটা খবব আমাকে আরো বেকুব বানিয়ে দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মিঃ ভুট্টো স্টেটসে মিঃ নিক্সনের সঙ্গে দুবাব দেখা করবেন, উনোতে বক্তৃতা দেবেন, নেশনাল প্রেস ক্লাবেও তাই—এবং অবশ্যই সেখানে নানাবিধ প্রশ্নেব উত্তর দেবেন, এমন কি নিক্সনের বিরুদ্ধবাদী নেতাগণ যথা হামফ্রি, ফুলব্রাইট এবং কেনেডীব সঙ্গে মোলাকাত করবেন। সিনেটের ফরেন রিলেশন কমিটির মেম্বর এঁদের দুজন। কিন্তু হবু ফরেন মিনিস্টার, কার্যত সে পদে বহাল—ডঃ কিসিংগারের নাম কই? মিঃ ভুট্টো নিশ্চয়ই তাঁর নমাস ধবে কপচানো বুলি ভুলে গিয়ে ওয়াটারগেটের মত ঘরোয়া ব্যাপাব নিয়ে নিক্সনের সঙ্গে দুদিন ধরে বসালাপ করবেন না। এস্তেক সিনেটের ফরেন কমিটির সঙ্গে দেখা কবরেন, কিন্তু খুদে ফরেন মিনিস্টার কিসিংগারের সঙ্গে দেখা করবেন বলে কোনো উল্লেখ নেই, এটা কি কবে সম্ভবপর হয়? ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ইয়েহিয়াকে মদদ দেবার জন্য প্রতিদিন জরুরী মিটিং-এ সভাপতিত্ব করেছেন যে কিসিংগার! চীনে যে লোমহর্ষক মূলাকাত হল মাও এবং নিক্সনে, সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান আলোচনার সময় আব দুজন মাত্র লোক—চীনের প্রধানমন্ত্রী চু এবং কিসিংগার। মার্কিন ফরেন মিনিস্টার রজার্স নিতান্তই বাহাবরূপে দলের সঙ্গে ছিলেন বটে কিন্তু সে সভায় তাঁকে ডাকা হয নি। মাও যখন নিক্সনকে তাঁর আপন বাড়িতে দাওযাত করলেন তখন দাওয়াত পেলেন কিসিংগার—কোথায রজার্স? চীনের প্রাচীর দেখবাব জন্য নিক্সন গেলেন সদলবলে; পিকিং-এ রয়ে গেলেন কিসিংগার, চুর সঙ্গে ফাইনাল কথাবার্তায় (হয়তো গোপন চুক্তির!) রূপ-বেখা দেবার জন্য! চু বলেছেন, "ঐ একটা লোক যার সঙ্গে তর্কাতর্কি করা যায়।" সর্বপ্রথম মোলাকাতের সময় পাছে কোন ফজুল প্রটোকলবশতঃ কিসিংগার উপস্থিত না থাকেন, তাই মাও আগে-ভাগেই নিক্সনকে

জানিয়ে রেখেছিলেন কিসিংগার অতি অবশ্যই যেন সে মোলাকাতে হাজির থাকেন। বিশ্বজন সে সময়েই একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে, চীন-মার্কিন আঁতাতের একমাত্র ঘটক শ্রীযুক্ত কিসিংগার। অনেকেরই বিশ্বাস, তাঁর সম্মতি ছাড়া নিক্সন নিশ্চয়ই ভুট্টোকে গদিতে বসাতেন না। এবং একটা তেতো হক বাৎ যদি মেনে নেওয়া হয় যে, ইয়েহিয়াকে ব্যাক করে নিক্সন মার খান নি, কিল হজম করেছেন কিসিংগার, তবে এটাও খুবই স্বাভাবিক যে, কিসিংগার পুরো মদদ দেবেন মিঃ ভুট্টোকে, সে পরাজয়ের কালিমা যতখানি পারেন তাঁকে দিয়ে মোছাবার জন্য। একটু শঙ্কাও যে নেই, বলবে কে?—ইহুদী সন্তান কিসিংগার দাদ নেবার তালে থাকবে না, এ ভরসাই বা কে দেবে?...সেই কিসিংগারের নাম নেই, ভুট্টো যাঁদের দর্শন করতে যাচ্ছেন ওয়াশিংটনে, তার ফিরিস্তিতে? তার চেয়ে পাঠক বললেই পারেন, "আগ্রা যাবো নামজাদা সব এমারত দেখতে"— ফিরিস্তিতে দেখি, তাজমহলের নাম নেই। হল না। বরঞ্চ বলি, সর্ব ফিল্ম বাবদে জউরী গুনিন 'ঘটি' বললে, "চললুম, ঢাকা, দেখবো সরেস সরেস ফিল্ম।" তার নোট-বুকে তাকিয়ে দেখি, চিত্তহারিণী "তারকা" কবরী দেবী যে সব ফিল্ম ধন্য করেছেন তার একটারও নাম নেই বেকুবের ফিরিস্তিতে!...ভুট্টো কিসিংগারে দেখা হবে নিশ্চযই, কিন্তু তার উল্লেখ নেই, কেন? তবে কি কিসিংগারের এখন কোনো ধরনের রাজনৈতিক ইদ্দত পিরিয়ড যাচ্ছে?

অসাধারণ মেটারনিষ বিরাট কংগ্রেসে যে রকম আপন ব্যক্তিত্বের ম্যাজিক বাঁশী বাজিয়ে দশটা নেশনকে নাচাতে পারতেন, ঠিক তেমনি বল-রুমে নিজে নাচতে পারতেন অপূর্ব লাস্য-লালিত্যসহ সমস্ত রাত। তাঁর স্মরণে গদগদ কণ্ঠে কিসিংগাব বলেছেন, "কি কেবিনেটে, কি লেডিজদেব অন্তরঙ্গ অভ্যর্থনা কক্ষে—সাঁলোতে—তাঁর চলন-বৈঠন, অনায়াস আচরণ ছিল প্রকৃত রোম্যাণ্টিকের মত। কেবিনেট সাঁলোব সম্মেলন করতে পেরেছিলেন তিনিই। অধ্যাপক কিসিংগার আজকের দিনে গুমড়োমুখো পলিটিশিযানদের দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবতেন, কত না দূরে অন্তহীন সুদূবে চলে এসেছে এবা, সেই গৌরব এবং মাধুর্যময যুগ থেকে—রাজনীতিকলা আজ জীবনচালনা-কলা দুটোর সমন্বয় করতে জানে না এরা। আজ সবাই বলছে কিসিংগার এ সমন্বয় করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছে। আবার মেটারনিষেব মতই কিসিংগার বিশ্বাস করেন, রাজনীতি একটা আর্ট— কলা-বিশেয। সে আর্ট জ্ঞানবিজ্ঞানের উপর নির্মিত হয়েছে অবশ্যই, কিন্তু আদর্শবাদের সঙ্গে তার কানাকড়িরও সম্পর্ক নেই। পৃথিবী দূরে থাক, মানুষেব ভিতবও কোনো পরিবর্তন আনার সংকল্প কিসিংগারের পরিকল্পনাতে নেই। তাঁব কাছে ন্যায়-অন্যায় বলেও কিছুই নেই। তিনি চান, উপস্থিত পৃথিবীতে যে সব রাষ্ট্রবল আছে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ দ্বারা এমন একটা সামঞ্জস্যে নিয়ে আসা (সে নিয়ন্ত্রণ করার সময় কোনো আদর্শবাদেরই প্রশ্ন ওঠে না; নিয়ন্ত্রণটা সাধু নেবে, না অসাধু সে নির্বাচনে সম্পূর্ণ সে নিরপেক্ষ) যাতে করে রাষ্ট্রবলগুলো এমনভাবে গ্রুপে গ্রুপে বিভক্ত হয় যে যুদ্ধজনিত অশান্তির সৃষ্টি না হতে পাবে।

কে জানে, তবে কিসিংগার কখনো মুখ ফুটে বলেন নি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে তিনি হয়তো আখেরী বিশ্বশান্তির প্রতিবন্ধকরূপে ধরে নিয়েছিলেন এবং সেটাকে ইযেহিয়ার দমনপ্রচেষ্টা বলে তিনি নেকনজরে দেখেছিলেন। ঠিক ঐ কারণেই, বিশ্বের ছোট বড় সব শক্তিকে গ্রুপে গ্রুপে ফেলার জন্য বেলুচ-পাঠানের অটোনমি তিনি

পছন্দ করবেন না। তাঁর শখের ভারসাম্যের জন্য তাঁর হাতে মেলা অস্ত্রশস্ত্র আছে।
কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রই কি শেষ সত্য?

গুজোরব তথা তুলনাত্মক শব্দতত্ত্ব

গুজোরব প্রতিষ্ঠানটির রাজধানী কোথায়? ঐয্—যা! বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম বিশাধিক বৎসর ধরে দুই বাংলায় পুস্তক পত্র-পত্রিকার আদান-প্রদান প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে দুই বাংলার লেখার ধরন, বিশেষ করে বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ, বাংলাতে একদা সুপ্রচলিত কিন্তু বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অব্যহৃত 'যাবনিক' শব্দের পুনর্জীবন লাভ, নতুন নতুন শব্দনির্মাণ ইত্যাদি দুই বাংলায়, স্বভাবতই, এক পথ ধরে চলে নি। যে গুজোরব শব্দ দিয়ে লেখাটি আরম্ভ করেছি সেটা খুব বেশী দিনের পুরনো নয়। গুজোব-এর 'গুজো' আর জনরবের 'রব'—একুনে গুজোরব।...ইংরেজিতেও এ ধরনের বেশ কিছু শব্দ ইদানীং তৈরী হয়েছে। স্মগ শব্দটি এক্কেবারে চ্যাংড়া না হলেও খানদানীত্ব পেতে অর্থাৎ মোলায়েম প্রেমের কবিতায়, ফুল-ডোরে বাঁধা ঝুলনায়, আসন পেতে এখনো তার সময় লাগবে। লন্ডনের কুয়াশায় পথহারা খাস লন্ডনবাসীই ল্যাম্প-পোস্টটাকে পুলিশম্যান ভেবে তার কাছে পথের সন্ধান নেয়, খুদ পুলিশম্যান আপন বীট-এ পথ হারিয়ে কারো বাড়ির ঘণ্টা বাজিয়ে গৃহস্থকে শুধোয়, সুমুখের রাস্তাটার নাম কি? কোনো দিন যদি বেলা তিনটে থেকে প্রায সাতটা-আটটা অবধি কুয়াশা না কাটে তবে যাট হাজারের কাছাকাছি ডেলি-প্যাসেঞ্জার ইয়ার-দোস্তের (যদি বরাত জোরে তাদের বাড়ি খুঁজে পায়) বাড়িতে রাত কাটায়, বেশীর ভাগ হোটেলে আশ্রয় নেয়। তদুপরি লক্ষ লক্ষ চিমনি থেকে যে ধুঁয়ো ওঠে সেটা কুয়াশা ফুটো করে উপরের দিকে উধাও হতে পারে না বলে তার সঙ্গে মিশে গিয়ে তৈবী হয় স্মগ। "স্মোকের" স্ম আর 'ফগের' গ নিয়ে তৈরী হল স্মগ। কলকাতায়ও স্মগ হয়, কিন্তু লন্ডনের তুলনায় একদম রদ্দী—পানসে। ঢাকার ভেজাল বে-আইনী বিয়ারের মত। নির্জলা জল। তা সে যাক গে। কলকাতাব স্মগকে বলে ধূঁয়াশা-ধূঁয়া প্লাস কুয়াশার শা মতান্তরে ধূঁয়াব ধূঁ প্লাস কুয়াশার য়াশা। হবেদবে হাঁটু পানি। এককালে মর্ডান কবিতায় দারুণ চালু ছিল ধূসর কথাটা—জীবনটা ধূসর, প্রেমটা ধূসর, ডাস্টবিনের পচা ইঁদুরটা ধূসর, রিকশায় চীনা গনিকাটা ধূসর, মর্ডান কবিতার বিক্রিটা ধূসর—গয়রহ। এখন ধূসর শব্দটাই ধূসব হয়ে উপে গিয়েছে। এদানির জোর কাটতি ধূঁয়াশার। মন্ত্রীর চাকুরি দেবার ওয়াদাটা ধূঁয়াশা, মিলির প্রেম-নিবেদনটা ধূঁয়াশা, তার জিল্‌টিংটাও ধূঁযাশা, বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টাও ধূঁয়াশা—কাবণ জিঞ্জিরায় তৈরী বিষটা ছিল ভেজালের ধূঁয়াশায় ভর্তি।

পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় গুজোরব

গুজোরব জিনিসটা ধূঁয়াশা, তা সে 'মার্কিন টাইম' বা 'নিউজ উইক' পত্রিকায় ধোপদুরুস্ত কেতা-মাফিকই বেরুক, কিংবা কাবুলের বাজারে, চা-খানাতে "গপ" রূপে দুই পাগড়ি পাশাপাশি এসে ফিসফিসিয়েই বেরুক। এই দেখুন না, নিদেন দিন পাঁচ হবে, সম্ভ্রান্ত মার্কিনী একখানা দৈনিক একটা চিড়িয়া উড়িয়ে দিল, ভাইস-প্রেসিডেন্ট এ্যাগনো হপ্তা

খানেকের ভিতর নোকরি ইস্তিফা দেবেন; তাঁর বিরুদ্ধে ঘুষ রিশওয়াদ খাওয়ার মোকদ্দমা উঠবে বলে তিনি খবর পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই লেগে গেল ধুন্দুমার। দক্ষিণ আমেরিকার কুইটো বেতার থেকে শুরু করে দুনিয়ার হেন কেন্দ্র নেই যে সেটা নিয়ে লুফোলুফি করছে না। রাত দুটার সময় স্টকহলম (মাফ করবেন, আমি কিসিংগারি কায়দায় ইংরেজের অনুকরণে স্টকহোম লিখতে পারবো না!) খুললাম, তাদের ইলেকশনের শেষ ফলাফল জানবার তরে,—তারাও গেণ্ডেরী খেলছে ঐ এ্যাগনোকে নিয়ে। বৃন্দাবনে গোপীরা একদা যেরকম বলতেন, "কানু বিনে গীত নেই।" ওদিকে খুদ এ্যাগনো চুপ, নিষ্পন খামুশ। যেন "পাড়াপড়শীর ঘুম নেই, বরের খোঁজ নেই।"

কাবুলি কায়দা

কাবুল-বাজার যে "গপ"-এর চিড়িয়া ছাড়ে সেটা পাকড়ানো সহজ কর্ম নয়। কারণ, সেটা সরকারের কানে পৌঁছলে তার ডিরেক্টর চিড়িয়া ওড়ানেওলার সন্ধানে চর লাগান। অতএব কাবুলের "বাজার-গপ" শোনাবার তরে শাস্ত্রাধিকাব চাই। মার্কিন তো পাত্তাই পাবে না, আর আজকের দিনের ইংরেজ সাংবাদিক অর্থাভাবে ডকে উঠি উঠি করছেন! রুশ পায় সরকারী সংবাদ, খাদ প্যারা দোস্তই আউওয়াল হিসাবে সক্কলের পয়লা। তাই বাজার-গপের হিস্যেও সে খানিকটে পায়। তদুপরি তার আরেকটা দোসরা জবিযাও আছে। সরদার দাউদের যে একটা গোপন মন্ত্রণাসভা থাকবে, সেটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সে সভার সভ্য, যোল থেকে আঠাশ, কজন—সে বাবদে কাবুল বাজারও দাড়ি চুলকোয়, পাগড়ির ন্যাজ নিয়ে দড়ি পাকায়, কিন্তু মুখে রা-টি কাড়ে না। তবে কি না, একটা সত্য কেউ বড়-একটা অস্বীকার করে না। দাউদ কু-টা যে করতে সক্ষম হয়েছেন, তাব পিছনে ছিলেন বেশ এক পাল মস্কোতে ফৌজী তালিমপ্রাপ্ত আফগান অফিসার।

তাঁদের যে কজন মন্ত্রণাসভায় হক্কত আসন পেয়েছেন, তাঁরা যে আফগানিস্তানকে আখেরে কম্যুনিস্ট বাষ্ট্ররূপে তৈরী হবার জন্য সংস্কাব বিধিবিধান প্রবর্তন কবতে চাইবেন সেটাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

ছাত্র বনাম মোল্লা

প্রাচ্যের অনুন্নত দেশগুলোতে ছাত্র-সমাজ আজ অশেষ শক্তি ধারণ কবে। ছুটিতে তাবা যখন শহব থেকে গ্রামে ফিরে যায় তখন সেখানে সর্বত্র চালায় পলিটিক্স্। মোল্লাদের মল্লভূমি প্রধানত মসজিদের মক্তবে। তাদের সেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবনদর্শন। দাউদ দেশের কুল্লে মক্তব এবং যে দু-পাঁচটা বে-সরকারী নিতান্তই জুনিয়ার মাদ্রাসা আছে সেগুলো সরকারী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হাতে তুলে দিয়েছেন। কাবুল থেকে ধর্মনিবপেক্ষ শিক্ষাবিদরা বেবিয়েছেন ক্ষুদ্র শহর এবং গ্রামাঞ্চলে সে-সব মক্তব মাদ্রাসা পবিদর্শন করতে ও তত্ত্ব-তথ্য সংগ্রহ করতে।

দাউদ যদি সত্যসত্যই তাঁর প্ল্যান পুরোদমে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে চান, তবে যে-সব মোল্লারা এখনো তাঁর বিরোধিতা করেন নি তারাও যে বিগড়ে যাবেন সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। তথ্যান্বেষী যে-সব শিক্ষাবিদ সফরে বেরিয়েছেন

তাঁরা সৃষ্টিছাড়া কোনো নয়া তথ্য আবিষ্কার করবেন কি? মক্তব-মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক নিসাব তো কাবুল শহরে বসে বসেই যোগাড় করা যায়। সেগুলোতে আছে কি? ফার্সী ভাষা শেখার কায়দা-কেতা, কুরান শরীফ পাঠ, শেখ সাদীর অতুলনীয় কবিতা এবং নামাজ শুদ্ধরূপে পড়ার জন্য দোওয়া-দরুদ। আর মাদ্রাসায় এ সবেরই অপেক্ষাকৃত উন্নত পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক এবং সুকঠিন আরবী শেখবার নিষ্ফল প্রচেষ্টা। ইমাম আবু হানীফা সাহেবের ফিকাহ্—অতিসংক্ষিপ্ত রূপে পড়ানোর ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় ইমামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, পরিপূর্ণ বুদ্ধিসম্মত (রেশানাল) যুক্তিতর্ক বোঝবার মত শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ পেয়েছেন ক'জন আফগান মোল্লা-মুদররিস? পড়াবার তো কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু এহ বাহ্য। আসলে শিক্ষাবিদরা তন্ন তন্ন করে খুঁজবেন, ওসব কেতাবে রাষ্ট্রদ্রোহ শেখায় এমন আছে কি সব শিক্ষা, আদেশ, ফৎওয়া। এবং হবেন নসিকে নিরাশ। ইমাম সাহেবের আমল ছিল ইসলামের সুবর্ণ যুগ। সে-আমলে কোন্ ফকীহ বেকার মাথা ঘামিয়েছেন রাষ্ট্রদ্রোহের ফৎওয়া নির্মাণ করার তরে।

বস্তুত মোল্লারা যখন কোনো কওমকে কাবুলের রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন তখন তাঁবা আটঘাট বেঁধে আট গজী ফৎওয়া লিখে সেইটে তাদের সামনে উচ্চকণ্ঠে পাঠ করে ফজলু ওয়াক্ত খর্চা করেন না।.মক্তব মাদ্রাসায় এমনিতেই খামোখা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বা বিদ্রোহ কোনোটাই শেখান না। লুটতরাজের জন্যই হোক, বা অন্য যে কোনো "কারণেই" হোক মোল্লারা যখন আফগানকে কাবুলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন তখন তারা নিতান্ত ফাউ স্বরূপ মক্তবের বাচ্চাদের সামনে হয়তো বা গরম গরম দু-একটি ওয়াজ ঝাড়েন। সেগুলো সম্পূর্ণ অরিজিনাল, তাঁদের আপন মস্তিষ্ক-প্রসূত; পাঠ্য-পুস্তক বা নিসাবের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই—আজকের দিনের শহুরে ভাষায় এগুলো কমপ্লিটলি একস্ট্রা-কারিকুলার।

মোল্লাদের ঘবে বন্দুক-কামান কিছুই নেই। তৎসত্ত্বেও প্রায় দেড়শ' বছর ধরে তারা ইংরেজের পুরো-পাক্কা ফৌজকে কয়েকবার খেদিয়ে ঝেঁটিয়ে পেঁদিয়ে বের করে দিয়েছে আফগানিস্তান থেকে। আমান-উল্লার মত একাধিক বাদশাকেও তারা ঘায়েল করেছে অশিক্ষিত পাঠানকে উস্কে দিয়ে।

সরদার দাউদের পক্ষে আছে ছাত্ররা। কিন্তু দাউদের দেশ বাংলাদেশের মত নয়। কোথায় সন্দ্বীপ, কোথায় বরিশালের অজ পাড়াগাঁ—ওসব জায়গা থেকে ছাত্ররা পড়াশুনা করতে আসে সদরে, চট্টগ্রাম, সিলেট, ঢাকায়। তারাই একদিন ছড়িয়ে দিয়েছিল আপন আপন গ্রামে গ্রামে মুক্তিসংগ্রামের আহ্বান। ধন্য তারা, জয় হোক তাদের।

কিন্তু সদব দাউদের ছাত্রসমাজ তো এখনো কাবুল, জালালাবাদ ইত্যাদি কয়েকটি নগরেব খাঁটি বাসিন্দা। জনপদের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র নেই। সেখানে—?

আমাদের মনে শংকা জেগেছে। কারণ আমরা গরীব। গরীব আফগানিস্তানের তরে আমাদের দরদ আছে। সরদার দাউদের সংস্কার প্রচেষ্টা সফল হোক, এই আমাদের কামনা। কিন্তু এই কি তার পন্থা? অবশ্য তিনি যদি রাজ্যের "রাজ্যির" মোল্লাগণকে তনখা দিয়ে সরকাবী শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন তবে অন্য কথা। কিন্তু তার তরে অত কড়ি কই?

দুস্‌রা বুট দড়াম করে পড়ে নি। বিলকুল ঠাহর করতে পারি নি। আবার গোবলেট করে ফেলেছি। ফিনসে শুরু করি।

জার আমলের খানদানী ঘরের ছেলেরা কলেজ, মিলিটারি আকাদেমির ছোকরারা শেষ পাশ দিয়ে, কিংবা ফেল মারার পর কন্টিনেন্ট যেত আপন শিক্ষা-অশিক্ষার উপর পালিশের জেল্লাই লাগাতে। আন্দ্রেই প্যাদ্রোভিচ জমিতফ যথারীতি বার্লিন-ভিয়েনা সমাপনান্তে পৌঁচেছে ফ্লরেনসে। সেখানে চতুর্দিকে ফুলে ফুলে ছয়লাপ, কিয়াস্তি প্রভৃতি মদ্যাদি বেজায় সস্তা আর ছুঁড়িগুলোর এ্যাসন মাইরি-মাইরি চেহারা যে জানটা তর্‌-র-র তাজা হযে যায়। তোমার সঙ্গে পান করবে, নাচবে, কত গোপন গানে গানে বলবে তোমায় কানে কানে, "সিন্নোর, আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরকাল তোমার হয়েই থাকবো" কিন্তু মুশকিল, একমাত্র তোমাকেই না, আরো পাঁচজনকে ঐ একই দিব্যি দেয়। ওদের বিপদ, ওরা কাউকে কখনো "না" বলতে শেখে নি—পাড়াতে কারো কারো প্যারা নাম "বিশ্ব-তোষক"। আমাদের আন্দ্রেইকে পায় কে? প্রতি রাত্রিই বাসররাত্রি—বিনা পাত্রী। একরাতে তিনটেয় হোটেলে ফিরে দুমদাম করে নেচে নেচে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে দ্রাম করে একখানা বুট ছুঁড়ে মেরেছে কাঠের পার্টিশনের উপর। সঙ্গে সঙ্গে পাশের কামরা থেকে হুঙ্কাব, "হেই জংলী, অত গোলমাল করছিস কেন? ঘুমুতে দিবি না?" আন্দ্রেই বড্ড লজ্জা পেল। চুপসে খাটের উপর বসে বিলকুল আওয়াজমাত্র না করে, দুসরা বুটটি আস্তে আ-স-তে রেখে দিল খাটের উপর। তার পর অঘোর নিদ্রা। ঘণ্টা তিনেক পর তার বেঘোর নিদ্রা ভেঙে গেল, পার্টিশনের উপর জোব খটখটানি শুনে। পাশের কামরার লোকটা চেঁচাচ্ছে, "ওবে মাতাল, দুসরা বুটটা ছুঁড়ে মাববি কখন? আমি অপেক্ষা করছি যে। তারপর ঘুমুতে যাবো।"

আমার হয়েছে তাই। এই, মাত্র গেল রববার দিন, লিখছিলুম, দাউদ যে সব রিফর্ম শুরু করেছেন তাই নিয়ে আমার ডর-ডর করছে। দুসরা বুটটা যে কখন দড়াম কবে পড়বে তারই পিতিক্ষেয় ছিলুম। হঠাৎ কাগজে দেখি, ওমা! দুসবা কূ দে-তা কবে ইতিমধ্যে চুপসে হয়ে গেছে, আমি টেরটি পর্যন্ত পাইনি। রববার দিন ভর-বাত দুনিয়ার কুল্লে বেতার ম ম করছিল, কাবুলে দ্বিতীয় কূ-র বাচ্চাটিকে প্রসবালয় থেকে সরাসরি গোরস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিংবা বলতে পারেন, কাবুলী বউয়েব গর্ভপাত হয়েছে। কাবুল প্রচার করছে, সবদার দাউদকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য কিছু ফৌজী অফিসার এবং কিছু সাধারণ নাগরিক চক্রান্ত করার সময় ধরা পড়ে যান। তাঁদের ফৌজী বিচার হবে।

এ বিষয়ে মন্তব্য করার পূর্বে "দুসরা বুটের" চুটকিলাটিতে ক্ষণতরে ফিরে যাই। গল্পটি আকছারই কাছে আসে। দোস্ত শুধোলেন, "কি হে, চাকরিটা পেলে?"

"দুসরা বুটেব তবে অপেক্ষা করছি।"

"বুঝলে না? চাকরিটা কে পাবে তার ডিসিশন হয়ে গিয়েছে কাল সন্ধ্যায়। এনাউন্‌স্‌মেন্ট হবে আজ সন্ধ্যায়। দুসবা বুট ছোঁড়া হয়ে গিয়েছে কাল সন্ধ্যায়—আমি খবরটা পাব আজ সন্ধ্যায়।" এ ধরনের কারবার আমাদের জীবনে নিত্যিকার।

খাঁটি কূ, না জিঞ্জিরা মার্কা

এ জীবনে একটা তথাকথিত কূকে আমি যেন অকুস্থলে, যেন বকসিংগের রিংসাইডে বসে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম। সে কূ সত্য না ডাহা জোচ্চুরি এ নিয়ে এখনো তর্কাতর্কির অবসান হয়নি। ২০শে জুন ১৯৩৪-এ হিটলারের হুকুমে কয়েকশ লোককে বিনা বিচারে গুলি করে মারা হয়। এদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন র্‌য়োম। হিটলার যে একদিন জর্মনির নিরঙ্কুশ একনায়কত্ব লাভ করেন তার জন্যই এই র্‌য়োমের আপ্রাণ পরিশ্রমকে ক্রেডিট দিতে হয় চৌদ্দ আনা। হিটলারকে যে দু-তিনটি লোক "তুমি" বলে সম্বোধন করতেন, র্‌যোম ছিলেন তাঁদেরই একজন। সেই র্‌য়োম এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী সবহ কজনাকেই খতম করা হয় ২০ জুন, হিটলার সর্বনায়কত্ব পাওয়ার ঠিক দেড় বছর পর। অজুহাত হিসেবে হিটলার ওজস্বিনী বক্তৃতা দিয়ে দেশের লোককে জানালেন, এ সব পিশাচরা কূ দ্বারা তাঁকে ও নাৎসি পার্টিকে সমূলে বিনাশ করতে চেয়েছিল; তিনি পূর্বাহ্নেই ষড়যন্ত্রের সন্ধান পেয়ে আপন দায়িত্বে তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

র্‌য়োম যে কোনো প্রকারের কূ'র ষড়যন্ত্র করেছিলেন, সেটা প্রচুর প্রপাগান্ডা সত্ত্বেও সে সময়ে সপ্রমাণ করা যায়নি; আজ দোষটা চৌদ্দ আনা পড়ে হিটলার, গ্যোরিঙ্গ ও হিমলাবের ঘাড়ে।

এটাকে বলা হয় পার্জ—জোলাপ। আকস্মিক আগাপাস্তলা পালটে দিয়ে যখন স্বৈবতন্ত্রে বিশ্বাসী একটা দল ক্ষমতা লাভ করে তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মধ্যে স্বার্থে স্বার্থে লাগে সংঘাত এবং কত হে হীনতা নীচতা তখন দলের ভিতরে বাইরে বেরিয়ে পড়ে সে বাবদে আমার মত অগা আর নতুন করে বলবে কি? বিশেষত আমার লেখা পড়েন কজন প্রাণী! এবং একমাত্র আমার মহামূল্যবান তত্ত্বকথা ছাড়া তাঁরা অন্য কারো লেখা—এস্তেক গোপালভাঁড় তক—পড়েন না, এ হেন মিথ্যা স্বীকৃত হলে আমি এই লহমায় আমার সাদা কলমটি কালো বাজারে বিক্রি করে দেব।

চক্রান্তে চক্রান্তে যখন দলপতিকে বাধ্য হয়ে এক পক্ষ নিতে হয়, তখন বহু ক্ষেত্রেই অপর পক্ষকে খতম করা ভিন্ন ফ্যুরারের গত্যন্তর থাকে না। এ তত্ত্বকথাটা আমার নয়। যাঁরা শক্তিব উপাসনা করেন, তাঁদের অনেকেই এ নীতিতে বিশ্বাসী। সর্ব ফ্যুরারকেই তখন স্বভাবতই বলতে হয়, ওরা দেশের দুশমন, ওদের মতলব ছিল নয়া একটা কূ করে দেশের সর্বনাশ করা।...এটা বহু বৎসর ধরে একটা প্যাটার্নে পরিণত হয়েছে। স্তালিন, মুসসোলীনি সব্বাই এটার এস্তেমাল করেছেন। কেউ বেশী কেউ কম।

তাই প্রথম প্রশ্ন, সত্যই কি আফগান জঙ্গী বিমান বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ জেনরেল আবদুর রজ্জাক, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মেইওয়ান্দওয়ালা, গবর্নর খান মুহম্মদ একটা বিপ্লব ঘটাবার তালে ছিলেন, না দাউদ তাঁর নবপ্রবর্তিত মোল্লা-বিরোধী আইন প্রবর্তন করার ফলে নিজেই বুঝতে পারলেন যে তাঁর জনপ্রিয়তা দ্রুতগতিতে কমে যাচ্ছে, এবং এই তিন ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণ/মোল্লাগণ/"ইসলামী রাষ্ট্র" পাকিস্তান-প্রেমীগণ তাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। অতএব বেলা থাকতেই এদের জেলে পুরে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে দিতে হবে কিংবা অল্প খর্চায় গোটা কয়েক বুলেট দিয়ে।

আসলের চেয়ে ভালো কিসিংগারী ভেজাল

পাঠক, আমার পাক্কা ইয়াদা ছিল, কাবুলী কু—মন-গড়া হোক আর জলজ্যান্তই হোক—তার পিছনে কল-কাঠি নাড়াবার তরে পাকিস্তান, রাশা, শাহের মারফৎ আমেরিকা, কে কতখানি উৎসুক সেই নিয়ে এ লেখাটি শেষ করবো। উপরের অনুচ্ছেদ সম্প্রসারিত করতে যাওয়ার এক ফাঁকে বেতারটির কর্ণমর্দন করতেই শুনি, "মার্কিন কণ্ঠ" মার্কিনী উচ্চারণে বলছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীযুক্ত হেনরি কিসিংজারের বক্তৃতা শুনতে পাবেন। ফরেন মিনিস্টার হওয়ার পর এই তাঁর প্রথম বক্তৃতা। আমি আশা করেছিলুম, আজ সোমবার, আমাদের সময়ানুযায়ী রাত দশটায় ওয়াটারগেটের মুলতুবী যে মোকদ্দমাটা ফের শুরু হওয়ার কথা, শুনবো সেটা। এ মোকদ্দমাটা যে কেন ছ-সপ্তাহের ছুটি না-মঞ্জুর করে তিন সপ্তাহ এগিয়ে আনা হচ্ছে তার অল্প-বিস্তর আলোচনা আমি পূর্ববর্তী সংখ্যায় করেছিলুম। আমার আশা ছিল, সেই মোকদ্দমাটা হয়তো বা "মার্কিন কণ্ঠ" সরাসরি আদালত থেকে বেতারিত করবে, নইলে নিদেন একটা ধারা কাহিনী তো বটেই। পাঠক, বিবেচনা করুন, কোনটা বেশী রগরগে হত!

তবু মন্দের ভালো। আমি এ তাবৎ কিসিংগারী "বক্তিমে" কখনো শুনি নি। আমার প্রধান কৌতূহল : কিসিংগার জীবনের প্রথম পনেরো বছর কাটিয়েছে জর্মনিব ক্ষুদে ফ্যূর্ট শহরে। মাতৃভাষা তাঁব জর্মন এবং ঐ ক্ষুদে শহরে নিত্যি নিত্যি ইংরিজি বলাব সুযোগ সুবিধে নিতান্তই নগণ্য—বস্তুত মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তাঁর ডক্টরেট থিসিস লেখেন জর্মনে।

খলিফে ছেলে মশাই, খলিফে ব্যক্তি। যা ইংরিজি ছাড়লে—কার সাধ্যি বলে তাঁর মাতৃভাষা ইংরিজি নয়। শুধু কি তাই, যদিও এই চৌকশ ঘড়িয়ালটি মার্কিনত্বে খাস জাত-মার্কিনকেও টিট দিতে চান ঝালে-ঝোলে-অম্বলে, তবু ইংরিজি উচ্চারণের বেলা নাকি-সুরে, 'র' অক্ষরকে 'ড়' করে চিবিয়ে চিবিয়ে, টেনে টেনে "বেটাড় অ্যান্ড বিগাড়" মার্কিনী ইংরিজি বললেন না। রপ্ত করেছেন মার্কিন আর খাস ইংরিজির মধ্যিখানের এমন একটি উচ্চারণ যেটা দুই দেশেই কদর পাবে। শুধু লক্ষ্য কবলুম তাঁর 'চ' উচ্চারণে কিঞ্চিত জর্মন আড় রয়ে গেছে। কারণ জর্মন ভাষায় "চ" ধ্বনিটি আদৌ নেই। কিন্তু আমার এই মিহিন নুখতাচুনীতে পাঠক কান দেবেন না। মোদ্দা কথা : আমি অন্য কোন জর্মনকে এ হেন উৎকৃষ্ট ইংরিজি বলতে শুনি নি।

আর বক্তৃতার বিষয়বস্তু? সেটা বারান্তরে হবে। উপস্থিত তাঁর একটি আজব বাৎ শোনাই। তিনি বললেন, ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নতির দিকে। খাস ঢাকায় যদি এই বচনামৃতটি ঝাড়া হত তা হলে ডাইনে বাঁয়ে চটসে তাকিয়ে নিয়ে বলতুম, "আস্তে কয়েন কত্তা, ঘোড়ায় হাসবো।"

পরলোকগত বাদাম প্যাঁচ

বহুকাল গেছে কেটে। প্যাঁচটাও গেছে উঠে। অতএব সে প্যাঁচের টেকনিক্যাল নামটাও যে ঘুড়িয়ালারা ভুলে যাবে তাতে আর তাজ্জব মানার কি আছে? সে আমলে কলকাতায় বসন্তের আকাশ ছেয়ে যেত কত না চিত্র-বিচিত্র ঘুড়িতে। কিন্তু বাচ্চাদের মাঞ্জাহীন

গুড্ডির সঙ্গে প্যাঁচ লাগানোটা আমরা রীতিমত ইতরতা বলে মনে করতুম। উপরের আকাশে চলত এ-পাড়া ও-পাড়ার ঝানুদের ভিতর উপর-প্যাঁচ, নীচের প্যাঁচ, ঢিলের প্যাঁচ, সুতো ফুরিয়ে গেল টানের প্যাঁচ, এ প্যাঁচটা কিন্তু অনেকেই 'ফাউল' বলে বিবেচনা করতেন—চলত অনেক রকমের বিমান-যুদ্ধ। এমন সময় অতিশয় কালে-কস্মিনে ঝানুদের গুরুকুলের কোনো এক ঝাণ্ডু চড় চড় করে চড়াতেন, এ-পাড়া ও-পাড়ার কুল্লে ঘুড়ির উপরের স্তরে, তাঁর অতি গরিবী চেহারার সাদামাটা ঘুড়িখানা। সেখানে খাওয়াতেন ঘুড়িটাকে একটা গুত্তা বা মুণ্ডা। সমুচা দখিনা আসমান ঝেঁটিয়ে তাঁর ঘুড়িটা প্যাঁচে জোড়া ডবল ঘুড়ি, সিঙ্গিল ঘুড়ি সব কটার সুতো জড়িয়ে নিয়ে, দোতলার ছাত ছুঁই ছুঁই করে সোঁ সোঁ করে উঠত ফের স্বর্গপানে "হাগ'র দিগে"। ওঠার সময় একটা একটা করে কুল্লে ঘুড়ি যেত কেটে—যেসব ঘুড়ি আপোস প্যাঁচ খেলছিল তারাও জোড়ায় জোড়ায় হাওয়ায় হাওয়ায় দোল খেতে খেতে হয়ে যেত হাওয়া। যদ্দূর মনে পড়ে এটাকে বলতো "বাদাম প্যাঁচ"—নৌকোর বাদাম পালের সঙ্গে হয়তো কোনো মিল আছে।

আজ কোথায় সে গুনিন, যিনি ভিন্ন বাদাম-এর খেল দেখাবেন? আকাশ বাগে তাকিয়ে দেখুন, বেশুমার কত না চিড়িয়া।

দিশী ঘুড়ি

আমবা "নিকট প্রাচ্যের" নিরীহ প্রাণী। আমাদের কারবার ইরান, আফগান, পাক-ভারত নিয়ে। (১) রাজা দাউদ আপন দেশের জনগণের মন কতখানি পেয়েছেন সেটা বাতলাবে কে? দুসরা কূ আসছেন নাকি? ওদিকে বিদ্রোহী পাক-বেলুচ-পাঠান তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। (২) ভুট্টো গেলেন, অগম অভিসারে—ইয়াংকি সাগর পারে, লাঠি-শড়কি, রামদা-ঝাঁটার সন্ধানে, (৩) শাহ্ যেন পস্তাচ্ছেন, ভাবছেন—মার্কিন না রুশ, রুশ না মার্কিন, শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলী, কারে বাখি কারে ফেলি। (৪) মেঘমল্লারে সারা দিনমান, শুনি ঝর্ণার গান, মাফ কববেন, লারকানাগান—বেচারী গুরুজী (কলকাতা-গামীদের বলে রাখি, হোথায় শিখ মাত্রকেই 'সর্দারজী' না বলে 'গুরুজী' সম্বোধন করলে তাদের মেহেরবাণী পাবেন বেশী) স্বরণ সিং মিঃ ভুট্টোর লাগাতার ভারতের শিকায়েৎ জারী-মর্সীয়ার গান সুবো-শ্যাম শোনেন আর উত্তর প্রতিবাদ দেমাঁতি লিখতে লিখতে তাঁর জানটা পানি। বস্তুত আমি ২১।১২।৭১-এর ডিসেম্বরেই গুরুগম্ভীর প্রস্তাব করেছিলুম যে, শুধুমাত্র ভারত নিয়ে মিঃ ভুট্টোর কটুকাটব্য তেরি-মেরির উত্তর দেবার তরে দিল্লীর ফরেন আপিস যেন একটা আলাদা দফতর খোলে। নইলে বেচারী স্মরণ সিং ফুর্সৎ পাবেন কোথায়, তিনি যে ফরেন মিনিস্টার, কটুকাটব্য, মিথ্যা ভাষণের দেমাতি প্রদান ভিন্ন দু-একটা গঠনমূলক কাজও তিনি করে থাকেন, সেটা হাতে-নাতে দেখিয়ে দেবার? এই পররাষ্ট্র-মন্ত্রী গুরু স্বরণ সিং—ঢাকায় তিনি এসেছেন কবার? তাঁর সম্মানিত ধর্মের একটি মহৎ শিখ-তীর্থও তো এখানে। আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিমত, তিনি তাঁর তীর্থদর্শনে ঢাকায় আরো আরো ঘন ঘন এলে উভয় দেশেরই মঙ্গল হত, ভুল বোঝাবুঝি কমতো। পাঠক, তাই কিন্তু ঠাউরাবেন না, জনাব হাকসর চেষ্টার কোনো ত্রুটি করছেন। সম্ভ্রান্ত হাকসর গোষ্ঠীকে দিল্লী ইলাহাবাদে কে না চেনে—আমার মত নগণ্য ব্যক্তিও সে পরিবারে মোগলাই বহ্বান্ন ভক্ষণকালে বিস্তর ফার্সী, উর্দু কাব্যরস উপভোগ করেছে।

মাননীয় সম্পাদক, পাঠকমণ্ডলী যদি অপরাধ না নেন, তবে বলি, আমার মনে হয় জনাব হাকসরের মত সর্বার্থে ভদ্রলোকের পলিটিকস ত্যাগ করাই ভালো। তা সে যাকগে; ভারত, বাংলাদেশ, গুরুজী, জনাব হাকসরকে 'রিফর্ম' করার ভার আল্লাহ্‌তায়ালা আমার স্কন্ধে সমর্পণ করেন নি—শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

তিন না চার

এই যে চার দফে ইরান থেকে বাংলাদেশের নিত্যদিনের পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় ঘটনার ফিরিস্তি দিলুম, তার সঙ্গে যোগ দিতে হয়, তিন মহাশক্তির বহুরূপী কার্যকলাপ—চীন, রুশ আর মার্কিন দেশের নয়া নয়া খেল। বিশেষ করে তৃতীয়টির। কারণ বহু বৎসর ধরে মার্কিনরা জাপানকে বার বার বলেছে, "আমরা প্রাচ্যের পুলিশম্যান, আর তোমরা স্বভাবতই, অর্থাৎ নৈসর্গিক পদ্ধতিতেই আমাদের পয়লা নম্বরী দোস্ত।" অবশ্য এই মার্কিনী পুলিশম্যানের টহল মারার কায়দা বড়ই আজব। আর পাঁচটা দেশে গেরস্তজন ট্যাকসো দেয়, সে টাকায় লাঠি, সড়কি, দরকার হলে বন্দুক, পিস্তল কিনে পুলিশকে দেওয়া হয়। মার্কিন পুলিশ কিন্তু উলটে গেরস্ত ইরান, পাকিস্তান গয়রহকে হুদো হুদো বন্দুক কামান দেয়, 'বেয়াড়া' পাড়া-পড়শীকে ঠ্যাঙাবার জন্য। নিজের শরীরটা যতখানি পারে বাঁচিয়ে রাখে। তাই-না মৌলানা সাদীর পূর্ববঙ্গীয় ভ্রাতা গেয়েছেন

কত কেরামতি জানোরে বান্দা
কত কেরামতি জানো,
শুকনায় বইস্যারে বান্দা
পানির মাছ টানো।

"সব ইহুদী হো জায়গা"

এই তিন শক্তির বাইরে আরেকটি শক্তি লোকচক্ষুর আড়ালে বহু বহু বৎসর ধরে সবাসরি এবং প্রয়োজন হলে মার্কিন সরকারকে দিয়ে আপন কাজ গুছিয়ে নিয়েছে এবং—জানেন জীহোভা—আরো কত যুগ ধবে তাদের বিচরণভূমিতে দাবড়ে বেড়াবে তারা, কিন্তু অতিশয় সঙ্গোপনে। পাঠকের স্মরণে আসতে পারে, ১৯৭১ বসন্তে যখন শেখ (ইয়েহিয়া) ভুট্টোতে আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল তখন মিঃ ভুট্টো ম্যাজিশিয়নের মত আচানক তাঁর হ্যাট থেকে একটি তিসরা চিড়িয়া বের করেছিলেন। তার পূর্বে তিনি সুবো শাম জপতেন 'আমি আছি ভুট্টো, আর তুমি আছ শেখ।' হঠাৎ বলে বসলেন 'আর আছে ঐ তিসরা চিড়িয়া, দি আর্মি।' যাবা জুন্তার কেচ্ছা জানতো না, তারা তো পড়ল আসমান থেকে।...আমার বক্তব্য—অকস্মাৎ এই যে চতুর্থ শক্তি আমদানী করলুম সেটা কিন্তু ঐ আপস্টার্ট অপদার্থ গুলাম মুহম্মদ ইসকান্দর মির্জার গাফিলীর ছাওয়াল মিলিটারি জুন্টা নয়। এর ইতিহাস অতি দীর্ঘ, ইনি বিশ্ব-ইহুদী শক্তি, কিন্তু আসলে এনার তাগদ বাড়লো যেমন যেমন নিগ্রো দাসদের রক্ত শুষে, রেড-ইন্ডিয়ানদের কতল করে, মার্কিন-ইয়াংকির ন্যাজ মোটা হতে লাগলো, ব্লাংকো খুলিটা বদবো-দার গ্যাসে ভর্তি হতে লাগলো। মার্কিনী ইহুদীদের লুক্কায়িত শক্তির বয়ান দেবার মত শক্তি ইহ-সংসারে কারো

নেই। ইজরায়েল রাষ্ট্র নির্মাণের সময় থেকে দুপাঁচজন লোক এদের সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত নাম-করার মত কোনো আমেরিকান তাদের গোপন বিষ নিয়ে কথা পেড়ে সেটা ফাঁস করে দেবার মত হিম্মত দেখাতে পারেননি । সত্যি মিথ্যে জানিনে, আমাকে এক মার্কিনই বলেন, এ শতাব্দীতে কোনো মহাপ্রভুই ইহুদীদের চটিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে পারেন নি। কিন্তু এ সত্যটা জানি, ক্ষুদ্র মাইনরিটি ইহুদীদের দাপটে যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন রাষ্ট্রে "মার্চেন্ট অব ভেনিস" প্রকাশ্যে মঞ্চস্থ করলে সেটা বে-আইনী কর্ম, ফলং—শ্রীঘরবাস। অবশ্য ইহুদী শাইলক চরিত্র বাদ দিয়ে নাটকটি অভিনয় করলে হয়তো বা আপনি ইহুদী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সুপপ্লেট সাইজের একটি সোনার মেডেল পেয়ে যেতে পারেন। তবে কিনা, সেটা পাকা স্যাকরাকে দিয়ে যাচাই করে নিতে ভুলবেন না।

ইহুদী কিসিংগার এখন পারলোয়ান যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন মিনিস্টার। তিনি কর্মভার গ্রহণ করে সর্বপ্রথম যে কার্যে হস্তক্ষেপ করেছেন, সেটি ইহুদী ও আরবদের মধ্যে দোস্তী স্থাপনা করার। ওয়াহ্! ওয়াহ্!! তবে কি না, আরবরা হয়তো তাদের পক্ষ থেকে আইষমানের যমজ ভাই থাকলে তাকে পাঠাতে পারে! অবশ্য তিনিও কিসিংগারের মত নিরপেক্ষ "মধ্যস্থতা" করবেন মাত্র! তাজ্জব ইহুদী মিনিস্টারের তর সইল না, গদিতে বসতে না বসতেই দেলেন ছুট ইজরেয়েলে জাতভাইয়ের কটা এটম বম দরকার তার তত্ত্বতাবাশ করতে। ইয়া, মালিক!

রুশদেশ কবে কোন আদিমযুগে ১৯১৭-এ কমুনিস্ট হয়ে যায়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সাতিশয় কালে-ভদ্রে কানে এসেছে, কিছু সংখ্যক রুশদেশীয় ইহুদী প্যালেস্টাইন, পরবর্তীকালে ইজরায়েলে, চিরতরে যেতে চায, আর জেদী বলশীরা তাদের যেতে দিচ্ছে না। তাব পব বছর পাঁচ-সাত আর কেউ রা কাড়ত না।

ওমা! হঠাৎ দেখি, মার্কিন কংগ্রেস, না সিনেট, না কি যেন, গোঁ ধরেছেন, রুশ যদি ইহুদীদেব ছেড়ে না দেয় তবে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসা করার ব্যাপারে পয়লা সুযোগ পাবে না। এই ব্ল্যাকমেলের হুমকির পিছনে কে? মার্কিন ইহুদীরা যে অষ্টপ্রহর তওরীৎ তিলাওৎ করে এ দুনিয়ার মুসাফিরী খতম করে, এ-সব নশ্বর ফানী বখেড়া নিয়ে দাড়ি ঘামায় না, এই নবীন তত্ত্বটি আয়ত্ত করে বড়ই উল্লাস বোধ কবলুম। কিন্তু হায়, সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা খবর মনে পড়ে যাওয়াতে আমার উল্লাসটা বরবাদ হয়ে গেল। যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন মিনিস্টার যে এখন এক ইহুদী মহারাজ। যার কাছে একদা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার, আজ রুশদেশের কোথায় কোন গোপন কোণে কগন্ডা ইহুদী বাস করে, তাদের "খাহিস" হয়ে গেল "অকৃত্রিম আন্তর্জাতিক গুরুতর সমস্যা।"

বিশালতর ইজরায়েল?

এদের বের করে আনতে পাবলে আরব-ইজরায়েল ব্যাপাবে নিরঙ্কুশ "নিরপেক্ষ" ইহুদীকুলগৌরব কিসিংগার এদের জমিজমা ঘরবাড়ি দেবেন কোথায়? নিশ্চয়ই মারাত্মক রকমের "অভার-পপুলেটেড" আমেরিকায নয়। সে কি করে হয়, পাগল নাকি?

ভাবছি, কহাজার আরব মুসলমানকে খেদিয়ে এদের জন্যে স্থান করবেন নিরপেক্ষ কিসিংগার কোথায়?—ফলস্তীনে, সীরিয়া লেবানন জয় করে?

গোড়াতেই তাই নিবেদন করেছিলুম, নিকট প্রাচ্যের গোটা চরেক ঘুড়ি, বিশ্বের গোটা চারেক শক্তির ঘুড়ি, কোথায় রুশের ইহুদী ঘুড়ি আর কোথায় মার্কিন ইহুদী ঘুড়ি, আর কাপ্তেন কিসিংগারের রাম-মাঞ্জাওলা অতগুলো ঘুড়ি ঝেঁটিয়ে, একজোট করে, বাদাম প্যাঁচে সব-কটাকে কাটবো, হেন এলেম আল্লা দেননি।

"দূরকে করিলে নিকট বৈরী"

আমাদের বিখ্যাত সাধক কবি লালন ফকির গেয়েছেন,

হাতের কাছে পাইনে খবর
খুঁজতে গেলাম দিল্লী শহর

জার্মান কবি গ্যোটেও বলেছেন,

দূরে দূরে তুমি কেন খুঁজে মরো
সুখ সে তো সদা হেথায় আছে
শিখে নাও শুধু তারে ধরিবারে
সুখ সে রয়েছে হাতের কাছে।

সুখের বেলা হবেও বা। কিন্তু দুঃখটা খুব সম্ভব আসে দূরের থেকে। দুঃখটার উৎপত্তি যদি 'হাতের কাছেই' হত তবে তাকে ধরবার কায়দাটা রপ্ত করে নিয়ে টুঁটিটা চেপে ধবে তাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতুম না?

"নিকট প্রাচ্যের" সর্বনাশ তো তৈরী হয় দূর বিদেশে, আমাদেব ধরাছোঁওয়ার বাইরে। বাংলাদেশ ভারত আফগানিস্তানের দম বন্ধ করার জন্য দড়ি পাকানো হয় দূরে বহু দূরে উজ্জয়িনীপুরে, থুড়ি, দজ্জালিনীপুরে। তদুপরি আমার ব্যক্তিগত অতি গভীর বিশ্বাস সে দুঃখ নিবারণার্থে ভিন দেশের দিকে তাকিয়ে থাকাটার মত আকাট আহাম্মুখি আর কিছুই হতে পারে না। আপনার আমার আপন দেশের লোক আপন ধর্মের ভাই যে ভাবে দুশমনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আপনাকে আমাকে দুঃখ-বেদনা দিল, তার পরও ভরসা রাখব বিদেশীর উপর? কার্ল মার্কসের উপর আমার অসীম শ্রদ্ধা। তিনি বিশ্ব প্রলেতারিয়ার প্রতি ঐক্যবদ্ধ হতে যে আদেশ দিয়েছেন সেটা বাংলাদেশের সর্বজনের উপর খাটে। এ দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে শোচনীয় জীবনধারণ করে তার চেয়ে বিলেতের তথাকথিত প্রলেতারিয়ার জীবন শতগুণে শ্রেয়ঃ। আর এদেশে সত্যকার ধনী যাঁরা, ফুলে উঠেছেন যাঁরা, তাঁদের প্রতি ঐক্যের আহ্বান জানাবার রত্তিভর প্রয়োজন নেই। তাঁরা বাস্তুঘুঘুর পাল। সময় থাকতেই এক লম্ফে আমাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে গোলে হরিবোল দেবেন। আমার শুধু আশঙ্কা আখেরে নেতৃত্বটা না তাঁদের হাতেই চলে যায়। যা হয়েছে শত বার হয়েছে, এদেশে, ভিন দেশে, সর্ব দেশে—অতীতে। তাই থাক এ প্রসঙ্গ উপস্থিত ধামা-চাপা।

বিশ্ব ইহুদী

বলছিলুম, আসমানে বিস্তর চিড়িয়া "বাদাম প্যাঁচের" কম্বকরে মাঞ্জা লটাইয়ে তো নেইই, তার উপর একটা বিরাট বাজপাখী আসমানী রঙের সঙ্গে তার আগাপাস্তলা

এমনই মিলিয়ে দিয়ে আচানক ছোঁ মারে যে তার কোনো কিছুই ধরা-ছোঁওয়ার ভিতর আসে না। নেই নেই করে তবু দুপাঁচজন মার্কিন আছেন যাঁরা বাজটাকে চেনেন—কিন্তু ওর সম্বন্ধে মুখটি খুলেছেন কি তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের ইন্না লিল্লাহী—

বিশ্ব ইহুদী, ইহুদীতন্ত্র জায়োনিজমের কেন্দ্রভূমি আমেরিকায়। একদা ছিল অস্ট্রিয়া ও জার্মানিতে। মেটারনিষের যে ভিয়েনা-কংগ্রেসের কথা কিসিংগার সুবাদে উল্লেখ করেছিলুম সে কংগ্রেসে সর্ব নেশনের উদ্দেশ্যে যে সব অনুরোধ আদেশ জানানো হয়, তারই একটা—ইহুদিদের ব্যাপকতর রাষ্ট্রাধিকার দেবার জন্য, বিশেষ করে জর্মানিতে। সাধে কি আর জর্মন ইহুদি কিসিংগার মেটারনিষকে গুরু বলে মেনে নিয়েছিলেন! সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে মনে প্রশ্ন জাগে শিষ্য কিসিংগার কি একদিন গুরুর মত ইতিহাসে তাঁর নাম রেখে যেতে পারবেন? সে আলোচনা ক্রমশ আলোচ্য ও প্রকাশ্য; উপস্থিত একটি তথ্য পাঠকের স্মরণে এনে দি—জর্মনির মহাকবি হাইনরিখ হাইনের বয়স আঠারো—ভিয়েনা কংগ্রেসের সময়। সে কংগ্রেসের সুপারিশ অনুযায়ী অধিকার লাভের ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই বার্লিনে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ইহুদীরা আপন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন ও যুবা হাইনে সেটিতে সোৎসাহে যোগদান করেন। সদস্যরা আনন্দে আটখানা হয়ে হাইনেকে কোলে তুলে নেন, কারণ তখন হাইনের খ্যাতি জর্মানির ভিতরে বাইরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। শতাধিক বৎসর ধরে যে হাইনের খ্যাতি অদ্যাবধি ক্রমবর্ধমান, নবজাতকসম অম্লান পদদলিত প্রণয় নিবেদনের মর্মদাহ সবলতম ভাষায় প্রকাশ করতে আজো যার সমকক্ষ কেউ নেই, অনুভূতির ভুবনে তাঁকে প্রবঞ্চিত করতে পারবে কোন কৃত্রিম আত্মম্ভরিত্বের প্রতিষ্ঠান! ইহুদিদের এ সব প্রতিষ্ঠানেব মূলনীতি ছিল, তারা জেহোভার নির্বাচিত সর্বশ্রেষ্ঠ মানবসন্তান, তাদের প্রাচীন কীর্তির কাছে কি মিসর কি ব্যাবিলন বিশেষ করে গইম (অ-ইহুদী তুচ্ছার্থে. যে রকম আমাদের ভাষায় অনার্য কাফের প্রভৃতি শব্দ আছে) গ্রীকরোমান ভারতীয় আর্য সভ্যতা দুগ্ধপোষ্য শিশুবৎ—এবং সবচেয়ে মোক্ষমতম তত্ত্ব তাঁদের 'মসীয়া' (আরবীতে মসীহ্ মাহদী অর্থে) একদিন ধরাতলে অবতীর্ণ হয়ে জেহোভার এই নির্বাচিত সন্তানদের চিরকালের তরে ত্রিভুবনেশ্বর করে দেবেন—গইমদের আর কোনো ভরসা থাকবে না। বলা বাহুল্য, এ ধরনের মিথ্যার সাবান দিয়ে তৈরী ভাবালু-ভাপে-ভরা বুদ্বুদ হাইনেকে বিরক্ত, হয়তো বা ক্রুদ্ধ অতিষ্ঠ করে তোলে। কয়েক মাস যেতে না যেতেই তিনি এদের সংস্রব চিরতরে বর্জন করেন। এই হাইনের আশীর্বাদ লাভের জন্য তাঁর চেয়ে একুশ বছরের ছোট কার্ল মার্কস বিলেত থেকে প্যারিসে তীর্থযাত্রা করেন। এই হাইনের নামে স্বয়ং কাইজার পর্যন্ত শঙ্কিত হতেন। প্রতি নববর্ষে হাইনের নির্বাসনদণ্ড মোহকর্কম করতেন স্বহস্তে। গরীব দুঃখীর জন্য তাঁর লড়াই—কাইজারের স্বৈরতন্ত্রেব বিরুদ্ধে তাঁর আজীবন আমৃত্যু সংগ্রাম—প্রথম যৌবন থেকে এই হাইনেকে, অতিশয় মাতৃভক্ত এই পুত্রকে মাকে ছেড়ে—দূর বিদেশের নির্বাসনে সমস্ত জীবন কাটাতে হয়, মৃত্যুবরণ করতে হয় প্যারিসে।

একেই বলি যথার্থ ইহুদী। তিনি আল্লার স্বহস্তে নির্বাচিত মহাত্মা—জেহোভা তাঁকে নির্বাচন করুন আর না-ই করুন। কোথায় লাগেন স্বয়ং মেটারনিষ তাঁর পাশে—মেটারনিষের পরোক্ষ ভাবার্থে শিষ্য কিসিংগার, তিনি তাঁরো কত অতল তলে! অবশ্য এটাও তর্কাতীত নয় সাক্ষাৎ মোলাকাৎ হলে মেটারনিষ তাঁকে গ্রহণ করতেন কি না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে, কাব্যলোকে যখন তিনি প্রথম ভীরু মৃদু পদক্ষেপে

অবতরণ করছেন তখন হাইনে পড়ে তাঁর চারটি কবিতা বাংলাতে অনুবাদ করেন। সেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভূমিতে গোরা রায়দের তাণ্ডব নৃত্যের খবর পেয়ে একদা লিখেছিলেন,

"টুটলো কত বিজয়তোরণ
লুটোলো প্রাসাদ চূড়ো
কত রাজার কত গারদ
ধুলোয় হল গুঁড়ো
আলিপুরের জেলখানাও
মিলিয়ে যাবে যবে
ভাবিস তোরা কিসিংগারী
ধাপ্পা তবু রবে!"

দুকান ছুঁয়ে অপরাধ স্বীকার করছি "কিসিংগারী" অংশটুকুতে ইহুদীবৈরী হিটলারের ভূত আমার হাত দিয়ে তামাক খেয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এই সুবাদে একটি সত্য স্পষ্ট ভাষায় না বললে আমার মত বাঙ্গালী মুসলমানের প্রতি অবিচার করা হবে। আমি ইহুদী-বৈরী নই। ইহুদীদের নবী মুসা, নূহ আমারও নবী। নবী দাউদের বংশে জন্ম হজরৎ ঈসা মসীহকে আমি রূহুল্লা বলে স্বীকার করি। ব্যক্তিগত জীবনে আমি একাধিক সুপণ্ডিত সুহৃদয় ইহুদীর কাছে তওরীৎ—হীব্রুতে তোওরা অধ্যয়ন করেছি, যদিও আমি সম্পূর্ণ সচেতন যে, প্রচুর প্রক্ষিপ্তাংশের দরুন তওরীৎ পরবর্তী যুগের কসূস উল আম্বিয়ারই মত অপ্রামাণিক গ্রন্থ। খৃষ্টানদের মত আমি ইহুদীকুলকে বংশানুক্রমে চিরতরে ইল্লা বিল কিয়ামা—কিয়ামৎ অবধি শয়তানগ্রস্ত অভিশপ্ত—বলে মোটেই স্বীকার করিনি। পক্ষান্তরে আমার দৃঢ়তম বিশ্বাস ইজরায়েল রাষ্ট্র অভিশপ্ত। গৃহহারা আরবদের তারা কস্মিনকালেও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে দেবে না বলে তাবা চিরতরে অভিশপ্ত। বৈজ্ঞানিক হিসবে আলবের্ট আইনস্টাইন ধন্য, কিন্তু মাতৃভূমি থেকে আরব-বিতাড়নকারী, ইজরায়েল রষ্ট্রের সমর্থকরূপে শেষ বিচারের দিনে আল্লার সামনে তাঁকে দাঁড়াতে হবে।

নিকসনরূপী বিরাট রসাল কিংবা ওক অবলম্বন করে অতি অল্পকালের মধ্যেই কিসিংগাররূপী লতা—স্বর্ণ-লতার স্বর্ণটা উপস্থিত বাদ দিলুম, মগডাল অবধি চড়েছেন। লা ফতেনের লতার মত তাঁর আচরণে বড়-ফাট্টাই ধরা পড়বে কিনা, এখনো বলা যায় না। ইতিমধ্যে যদিও, যে কোনো কারণেই হোক (আমার বিশ্বাস, কারণ সন্ধানে বেশি দূর যেতে হবে না; ইহুদী কিসিংগার অভূতপূর্ব পদ্ধতিতে যে বৃক্ষটি জড়িয়ে ধরতে পেরেছেন, সেটা যেন লতাসুদ্ধ মড়মড়িয়ে গুঁড়িয়ে না যায়, তার জন্য কুল্লে দুনিয়ার সাকুল্যে ইহুদী ব্যাঙ্কার প্রতিপক্ষকে খানিকটে মেলায়েম করে তুলে এনেছেন) নিক্সন দুদণ্ডের তরে দম ফেলার ফুরসৎ পেয়েই প্রতিপক্ষকে কটুকাটব্য ঝাড়তে আরম্ভ করেছেন, তবু ভবিষ্যৎবাণী করাতে সিদ্ধ হস্ত এক মার্কিন কাগজ বলছেন, হোয়াইট হাউসের ভিতর নিক্সন যতই হাইজাম্প লংজাম্প মারুন, "বাইরের ভুবনে এখনো বিস্তর মারাত্মক সব মাইন-বাঁধা ফাঁদ পাতা রয়েছে; তার পিঠপিঠ সুপ্রীম কোর্ট যদি শেষ আদেশ দেয় এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট এ্যাগনোকেও যদি অসম্মানে বিদায় নিতে হয়, তবে নিক্সনের অবস্থা হবে পূর্ববৎ"—সেই ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে এক-ঘরে অবস্থায়। পত্রিকাখানি 'আখেরী বিভীষিকা দেখিয়ে বলেছেন, "এবং শেষ পর্যন্ত নিক্সনকে করতে হবে শেষ সর্বনাশা

(লেটফুল) পদক্ষেপ।" তখন কি ইহুদী-নন্দন কিসিংগার প্রাক্তন লাট মালেকের কায়দায় হনুমানী লম্ফে আরেকটা রসাল জাবড়ে ধরতে পারবেন?

কিন্তু আসল প্রশ্ন, অদূর ভবিষ্যতে যাই হোক, যাই-ই থাক, কিসিংগার কোন পথ নেবেন? ইজরায়েল নামক অতল গহ্বরে তাঁর বুদ্ধিতে ভালো করতে গিয়ে ইহুদীকুলকে শেষ ধাক্কা দিয়ে বিনাশ করবেন, না হাইনের সৎদৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শূন্যে আলোক-লতার মত দোদুল্যমান হৃদয়তাপে ভরা ইজরায়েলী রাষ্ট্রের ফানুসটাকে ফাটিয়ে দিয়ে তাঁর স্বজাতি ইহুদী কওমকে বাঁচাতে সক্ষম হবেন? তা যদি না পারেন—বিরাট বসুন্ধরায়, আল্লার কুশাদা দুনিয়ায় নিরীহজনকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ না করেও বিশ্ব ইহুদীর উমদাগুঞ্জাইস হয়—তবে তিনি হাইনের খ্যাতিকেও ছাড়িয়ে যেতে পারবেন। হজরৎ মুসা যে রকম একটা ইহুদী কওমের ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

* * *

একটা মজাদার দিলচসপ সার্কাসের ক্লাউন ঢঙ্গের খবর পাঠককে না জানিয়ে লেখাটা শেষ করতে পারছিনে। যাঁরা জানেন তাঁরা অপরাধ নেবেন না। তেসরা রমজানের সেহরীর সময় বেতার নাড়াতেই হঠাৎ শুনি সিলেটী বাংলা! উচ্চারণ মোটামুটি ভালোই, খবর দিচ্ছে মিঃ ভুট্টোর দিগ্বিজয় বাবদ। তারপর সালঙ্কার সবিস্তর বয়ান দিলে, যে সব বাঙ্গালী পাকিস্তান থেকে শিগগীরই বাংলাদেশ ফিরে যাবেন তাঁদেব কেনাকাটা সম্বন্ধে তাঁরা খবর পেয়েছেন বাংলাদেশে সব মাল বড্ড আক্রা, ইন্ডিয়ার আমদানী মাল বড্ড নিরেস।

ঠিক এই ধরনের ব্রডকাস্ট করা হযেছিল '৭১-এর নবেম্বর-ডিসেম্বরে, বিলাতবাসী সিলেটীদের জন্য। উদ্দেশ্যটা চটসে বোঝা যেত যদিও সেটা কামুফ্লাজের চেষ্টা জোরসে করা হয়েছিল, "ভাই বিলেতবাসী সিলেট্টীগণ, পূর্ব পাকের সর্বত্র পরিপূর্ণ সালামত। তোমরা আত্মীয়স্বজনকে যে টাকা পাঠাও সেটা বন্ধ করো না। সরকারের জরীয়ায় পাঠিয়ো কিন্তু।" এই শেষটাই ছিল আসল মৎলব। আমি অবশ্য স্থানাভাববশত অতি সংক্ষেপে সারছি।

এবারে মৎলব দুটো : যুদ্ধবন্দীদের বিচার করে কি হবে? এই তো বাঙ্গালীরা ফিরে যাচ্ছে দেশে। বউ-বাচ্চার সঙ্গে মিলিত হবে। ঐ বন্দীদেরই বা আটকে রেখেছো কেন, তাদের কি বউ-বাচ্চা নেই? দ্বিতীয ভুট্টো সাব চান, বংলাদেশের সঙ্গে দোস্তী করতে। পুরনো কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। দুই দেশে দোস্তী হলে উপকার উভয়ত : গয়রহ গয়রহ।

তোলা হল না একটি কথা : কূটনৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে স্পীকটি নট, নট কিচ্ছু। ভারী মজার প্রপাগান্ডা। রসে টইটম্বুর। বারান্তরে হবে।

লন্ডনী স্বীকৃত বাংলাদেশ?

রাত পৌনে তিনটে থেকে সোয়া তিনটে অবধি সিলেটী ভাষায় পাক বেতার বিলেতবাসী সিলেটীদের জন্য প্রোগ্রাম দেয়। দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে। নিজেদের নামও বলেছে তারা, আমার মনে নেই। আমি বাড়িয়ে বলছিনে, কিন্তু মনে হল, তাদের কণ্ঠস্বর বড়ই প্রাণহীন। ১৯৭১-এর নবেম্বরে ডিসেম্বরে যারা এই প্রোগ্রামটি আঞ্জাম করতো তাদের

বেশ দুতিনজন গাঁক গাঁক করে হুঙ্কার ছাড়তো, কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাসের স্পষ্ট আভাস থাকতো। বেচারীরা জানতো না, তাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। ঠিক মনে নেই, ষোল-সতেরো ডিসেম্বর সে প্রোগ্রাম উঠে গেল। ওদের সম্বন্ধে একটা কথা কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায়। ওরা প্রতিদিন নিজেদের সিলেটী সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছিল এবং খাঁটি সিলেটীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। যেমন, প্রথম দিন প্রোগ্রাম পরিচিতির সময় শেষ দফায় বললে, সর্বশেষে সিলেট থেকে যাঁরা আপন আপন "আত্মীয়-স্বজনকে" খবর পাঠাবেন, সেগুলো আপনারা শুনতে পাবেন। কিন্তু "আত্মীয়-স্বজন" সমাসটি আমরা বড়ই শাজবাজ ব্যবহার করি। পরের দিন ঘোষক "আত্মীয়-স্বজনের" পরিবর্তে বললে "ভাইবরাদর"। আমি মনে মনে বললুম, "লেড়কার তরক্কী অইছে। মাশা আল্লা।" পরের দিন ছোকরা এক্কেবারে বন্দর-বাজারের চৌকে পৌঁছে গেল। বললে, "খেশ-কুটুমর লগে মাতিবা।" আমি ফাল দিয়ে উঠে বললুম, "সাবাশ! ঔতত বেটার চাক্কু মারি দিছে।" পাঠক হয়তো তপ্ত-গরম হয়ে খাট্টা গেরাবী দেবেন, "তুমি তো বড় বইতল, মশায়! বাংলাদেশের খেলাফে আজেবাজে বকছে, আর তুমি বলছো, সাবাশ!" আহা—আমি ভাষাটার কথা বলছি, তার বক্তব্যের—কিতাবের টেকনিক্যাল পরিভাষায় যাকে বলি "মৎন", সেটার—তারিফ করতে যাবো কেন? সেটা তো গাছে আর মাছে ভুমা বন্দর-বাজারী গফ। তা সে যাকগে, এর পরের প্রস্তাব পাড়ার পূর্বে, ইতিমধ্যে পূর্বোক্ত "গেরাবী" শব্দটি খাস সিলেট-নাগরিক ভিন্ন অন্য সিলেটী এবং আর পাঁচজন আঞ্চলিক ভাষানুসন্ধানীজনকে বুঝিয়ে দি। টিপ্পনী কাটা, গহার বা বাগার দেওয়া, ঘটিদের ফোড়ন দেওয়া আর গেবাবী দেওয়া একই ইডিয়ম। সিলেট শহরের আশেপাশে যখন ইংরেজ ম্যানেজারদের চা-বাগিচা বসলো তখন বাবুর্চী খানসামারা মেমসাহেবদের কাছে মাছ-গোস্তর "মাখো মাখো ঝোল"-এর পরিভাষা "গ্রেভি" শব্দটা শিখল। তার থেকে "গেরাবী"। আমার জানা মতে এ রকম আরো গোটা ছয় ইংরিজি শব্দ সোজাসুজি সিলেটীতে ঢুকেছে। এই ধরণের একটি ভারি মজাদার শব্দেব সঙ্গে সেদিন পরিচয় হল, চাটগাঁয়ের আঞ্চলিক ভাষাতে। "অন্তিম্যান" শব্দটি প্রথম দর্শনে মনে ভীতির সঞ্চার করে। জীবনেব 'অন্তি' অবস্থা—'অন্তিম' 'মান' বুঝি এসে গেল! প্রখ্যাত সাহিত্যিক, আমাদের পথ-প্রদর্শক মহবুবুল আলমের ভ্রাতা ওহীদুল আলম সাহেবের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 'পৃথিবীর পথিক'-এর পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে মমাগ্রজ মূর্তজা সাহেব আমাকে অভয় দিয়ে ছাপার হরফে লিখেছেন, "অন্তিম্যান হ্যান্ডনোটের অন ডিমান্ড" উক্তি থেকে এসেছে।

পাছে বিলাতবাসী সিলেটীদের (এদের সিলেটবাসীরা "লন্ডনী" নাম দিয়েছেন) পূর্বোক্ত শব্দ-সঙ্কটে ত্রাসের সঞ্চার হয়, তাই করাচীর সিলেটী অনুষ্ঠানে ঘোষক, অনুবাদক বিকট বিকট ইংবিজি শব্দ আদৌ অনুবাদ করেন নি। যেমন প্রটোকল, এটমিক এনার্জি কমিশন ইত্যাদি। কিন্তু কারখানা-অর্থে প্লান্ট (মার্কিনী উচ্চারণে প্ল্যান্ট) কেন যে অনুবাদ করলেন না, বোঝা গেল না। ওদিকে জনগণ (আমরা বলি পাঁচজন, পাজ্জন), বন্যা (বান ছয়লাব), "ফসল ক্ষতিগ্রস্ত অইছে" (আমরা বলি ফসলার লুকসান অইছে) এবং সবচেয়ে মজার—সিলেটী "মধ্যাহ্ন ভোজনের" জন্য সংবাদ-পাঠক বলবেন "মাদাউনকুর ভোজ"। মাদাউনকুর খানা দাওৎ বা জিয়াফত আমরা প্রায়ই বলে থাকি, আর এ স্থলে এটা আজীজ আহমদের দেওয়া দাওৎই ছিল—তাই "মাদাউনকুর ভোজ"-এর মত বিজাংগা গুরুচণ্ডালী একমাত্র করাচীতেই সুলভ।...পত্র-লেখকদের আমন্ত্রণ

জানিয়ে ঘোষক ঠিকানা দিলেন "পশ্চিম" পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান তো কবে মরে গিয়েছে। মৃতদেহ নিয়ে সহবাস করার একটা গল্প মোপার্সাঁ লিখেছেন বটে। প্রেতাত্মা নিয়ে লিখে আমি নোবেল প্রাইজ পাবো, নির্ঘাৎ।

রেকর্ড সঙ্গীতে "কাফিরী" কীর্তন-সুরে উর্দুগীত বাজানো হল। সে এক অদ্ভুত ভূতুড়ে রসের অবতারণায় কুল্লে ঘরটা যেন ছিম ছিম, মাথাটা তাজ্জিম-মাজ্জিম করতে লাগলো।

আল্লা জানেন, আমি সিলেটী প্রোগ্রামের এই তিনটি প্রাণীকে নিয়ে মস্করা করছিনে। আমার বার বার মনে হচ্ছিল, এরা যেন অতিশয় অনিচ্ছায় একটা অপ্রিয় কর্ম করে যাচ্ছেন এবং বার বার আমার মনটা বিকল হয়ে যাচ্ছিল। বেচারীরা! এত শত লোক দেশে ফিরে আসছে, এরা চলে আসে না কেন? হয়তো বাধা আছে।

ঢাকায় জনাব ভুট্টোর আসন্ন শুভাগমন

কিন্তু পাঠক, মাত্রাধিক বিষণ্ন হবেন না। আপনাদের জন্য একটি খুশ-খবর কোনো গতিকে জিইয়ে রেখেছি। যাঁরা রীতিমত পাক বেতার শুনে থাকেন, তাঁরাও একই খবর শোনার আনন্দ দুবার করে পাবেন, বড় আয়নাব সামনে দাঁড়িয়ে একখানা বাখিরখানী খেলে যে রকম দুখানি খাওয়া হয়। পাকিস্তান থেকে যখন একদল বাঙ্গালী দেশে ফেরার জন্য প্লেনে উঠছেন তখন মিঃ ভুট্টো তাঁদের উদ্দেশ্যে উর্দুতে একটি ভাষণ দেন। নানাবিধ মূল্যবান তত্ত্বদানেব পর মিঃ ভুট্টো বলেন, আপনাদের সঙ্গে ফের দেখা হবে। করাচীতে, লাহোরে কিংবা ঢাকা বা চাটগাঁয়।

যাদের মস্তিষ্ক উর্বর তারা তো সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ চিন্তাসূত্রের সম্মুখে দিশেহারা হয়ে যাবেন, কোনোটারই খেই ধরতে পারবেন না। আমার সে ভয় নেই। আমি ভাবছি মিঃ ভুট্টো কি বাংলাদেশ জয় করে ঢাকা চাটগাঁয়ে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন, না দুই দেশে রাতারাতি এমনই দহরম-মহরম হয়ে যাবে যে আমরা হরদম পিকনিক উইক-এন্ড করার জন্য খনে লাহোর খনে পিন্ডি যাবো, কনসেশন রেটে গিয়ে হব স্টেট গেস্ট! অবশ্য এটা লক্ষণীয় মিঃ ভুট্টো কুয়েটা বা পেশাওয়ারে মোলাকাৎ হবে এ কথাটা বলেননি। বাংলাদেশ হাতছাড়া হওয়ার পর বেলুচ এবং পাঠান মুল্লুক এখন লাহোরের পাঞ্জাবীদের এবং করাচীর খোজা-বোরা-সিন্ধিদের কলোনি হয়ে গিয়েছে—দুষ্টু লোকে এমন কথাও কয়। বাঙ্গালীকে ওসব দেখানো দুলহাভাইকে তালই সাহেবের বাড়ী দেখানোরই শামিল।

ছি ছি এত্তা জঞ্জাল

(১) সকলেই জানেন ওয়াটারগেটের জল যখন ডেনজার লেভেলে চড়েছিল তখন নিক্সন বলতে গেলে এক রকম পর্দানশীন হারেমবাসী হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি হঠাৎ বেরিয়ে এসে এমনই কর্মকীর্তি আরম্ভ করলেন যে আমেরিকার যেসব তালেবর পত্রিকা গণ্ডায় গণ্ডায় নামে রিপোর্টার কাম ডিটেকটিভ মোটা মোটা তখমা দিয়ে পোষে তারা পর্যন্ত হদীস পায়নি, এখনো পাচ্ছে না। (২) এমন সময় আরো একটা মারাত্মক কেলেঙ্কারির কেচ্ছা বেরিয়ে পড়লো। স্বয়ং নিক্সন কর্তৃক মনোনীত তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট

(সংক্ষেপে ভীপ) এ্যাগনো সরকারী উকিলের নোটিশ পেলেন, তাঁর বিরুদ্ধে ঘুষ মেহেরবাণী করে দেওয়া কন্ট্রাকটের কমিশন গ্রহণ, খাদ্য-মদ্যাদির নিয়মিত ভেট গ্রহণ— এক কথায় দুর্নীতির জন্য মোকদ্দমা দায়ের করা হবে। নিক্সন ভীপকে এক ঘন্টা ধরে ধস্তাধস্তি করলেন, তিনি যেন রিজাইন দেন। নিন্দুক বলে, ভীপকে কাবু করার জন্য নিক্সনের খাসদফতরের নাকি কারসাজি আছে এবং আসলে তিনি নাকি এ্যাগনোকে· খেদিয়ে একজন বড় মানুষকে ভীপ বানিয়ে আনতে চান, যে তাঁর হয়ে—ওয়াটারগেট মামলা যদি নিতান্তই খারাপের দিকে বেয়াড়া গুড্ডির মত মুগু খেতে থাকে তবে— জব্বর লড়াই দেবে। সেই লোভে ইতিমধ্যেই নিক্সনের প্রতিপক্ষ ডেমোক্রাটিক পার্টির এক জাঁদরেল চাঁই শিঙ ভেঙে রিপাবলিকান দলে ভিড়ে যত্রতত্র চেল্লাচেল্লি আরম্ভ করেছেন, টেপ দেওয়া না দেওয়ার পুরো এখতেয়ার একমাত্র প্রেসিডেন্টের। (৩) এতদিন কিসিংগার থাকতেন নেপথ্যে। কিন্তু একদিন কংগ্রেসের সামনে নিক্সনের ফরেন মিনিস্টারকে দিতে হবে সাফাই। অতএব তাঁকে দাঁড় করানো হল কাঠগড়ায়। ওদিকে তিনি যে তাঁর বন্ধু।

অভিশপ্ত ফলস্তীন

চল্লিশ বৎসর পূর্বে মিশরের আলআজহাবে ছাত্রাবস্থায় থাকাকালীন ফলস্তীন দেখতে যাই। তাই বলে নয়, এমনিতেই ভবঘুরে বলে আমার একটা বদনাম আছে। শতাধিকবাব আমি এই অবিচারের বিরুদ্ধে যতবার দেমাতি প্রকাশ করেছি পাঠক সাধাবণ ততই মুচকি হেসে, দ্বিগুণ উৎসাহে, আমাকে ভবঘুরেমী থেকে বাউণ্ডুলে পদে প্রমোশন দিয়েছেন। তবু শেষ বারের মত, আবার বলে নিই, যে-কোনো প্রকাবের স্থান পরিবর্তন শারীরিক নড়ন-চড়ন আমার দুচোখের দুশমন। কট্টর মরণ-বাঁচন সমস্যা দেখা না দিলে আমি বারান্দা থেকে রক-এ পর্যন্ত রোলস-এ চড়েও যেতে রাজী হই না। বিছানা থেকে গোসলখানায় যাবার তরে জনকল্যাণ সরকারকে একটা বাস সার্ভিস খুলতে সকরুণ দরখাস্ত পাঠিয়েছি।

অপিচ, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবো, 'ফলস্তীন' গিয়েছিলাম সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় সোৎসাহে। অবশ্যই, লাঞ্ছিত পদদলিত আরবদের দুরবস্থা দেখবাব জন্য নয়। তখনো সে দুর্দিনের ঝড়-তুফান আরম্ভ হয়নি। কিন্তু তার ইতিহাস আমি পাঠকের উপর এখন চাপাতে চাইনে। ওপার বাংলায় একবার চেষ্টা দিয়েছিলুম—আমি আর প্রুফ-রীডাব ছাড়া সে সীরিজ কেউ পড়েনি।

ফলস্তীনের দুর্দশাব জন্য দায়ী কে?

ইহুদীদেব চেয়ে আববদের—মুসলমানদের—আমি দোষ দি বেশী।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ইংরেজও ইহুদীদের পালে পালে ফলস্তীনে আসতে দেয়নি। বস্তুত হজবত ওমরের আমল থেকে শেষ তুর্কী খলিফার রাজত্ব অবধি সব সময়ই কিছু কিছু ইহুদী, এমন কি জার-আমলে রুশ ইহুদীও পুণ্যভূমিতে এসে বাসা বেঁধেছে। তারা ছিল গরীব বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। আরবদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে, তাদেরই মত দুপয়সা কামিয়ে দুঃখে-সুখে দিন কাটিয়েছে। কালক্রমে তাদের মাতৃভাষাও হয়ে গেল আরবী। সঙ্কীর্ণ হলেও আরবী সাহিত্যে তাদের স্থান আছে।

চাষার সর্বনাশ

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যারা এল তারা সঙ্গে নিয়ে এল অফুরন্ত অর্থভাণ্ডার। যুদ্ধের সময় সারা বিশ্বজুড়ে ইহুদী সম্প্রদায় জেনে গিয়েছিল মিত্রশক্তি পুণ্যভূমি ফলস্তীন তাদের হাতে সঁপে দেবেন, তারা সেখানে পাক্কা দুহাজার বছর নানাদেশে ছড়িয়ে পড়ার পর আবার জেহোভার "জায়নের" নবীন রাষ্ট্র নির্মাণ করবে। প্রকৃতপক্ষে মিত্রশক্তি কিন্তু আদপেই 'ইহুদী রাষ্ট্র" নির্মাণের কোনো ওয়াদা কাউকে দেয়নি। তারা বলেছিল ইহুদীরা গড়ে তুলবে "জুরিখ ন্যাশনাল হোম"—এবং এই "হোম" কথাটার উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছিল বারংবার। কিন্তু ইহুদীরা সেটা জেনে শুনেও প্রচার চালালো সেটাকে রাষ্ট্র নাম দিয়ে। সেই রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য যে কী পরিমাণ অর্থ, পরবর্তীকালে অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো হয়েছিল সেটার চিন্তামাত্র করা ডাঙ্গর ডাঙ্গর ব্যাঙ্কার মহাজনদেরও কল্পনার বাইরে।

ফলস্তীন কাঠ-খোট্টা দেশ বটে কিন্তু সে দেশের নায়েবরা গরীব চাষাভুষোদেব লহু ফোঁটায় ফোঁটায় শুষে নেবার তরে যে কায়দাকেতা জানে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে শাইলকেব চেয়েও ধড়িবাজ ইহুদী সম্প্রদায়। ওদিকে নায়েবদের হাতে সব কিছু সঁপে দিয়ে জমিদাররা ফুর্তি করতেন মধ্যপ্রাচ্যের মন্তে কার্লো, বিলাসব্যসনের হুরীস্তান বেইরুতে। মদ্য মৈথুনের ব্যবস্থা সেখানে অত্যুত্তম এবং জুয়োব কাসিনোতে এক রাতে যুধিষ্ঠিরের চেয়েও বেশী সর্বস্ব হারানো যায়। কাইরো ইস্কন্দরীরাও এ সব বাবদে সে আমলে খুব একটা কম যেতেন না। এসব বিলাসের কেন্দ্রে লেগে গেল জমিদারী বেচার হরিন্নুট। ইহুদীরা ধীরে ধীরে কিনে নিল কখনো সোজাসুজি কখনো বেনামীতে ফলস্তীনের বিস্তর জমিজমা।

সে দেশের একাধিক যুবক আমাকে পই পই করে বোঝালেন,—না, প্রজাস্বত্ব আইনফাইন ওসব দেশে কস্মিনকালেও ছিল না। থাক আর নাই থাক, প্রচুর জমি-জমা চলে গেল ইহুদীদের হাতে। বিস্তর আববদের কবা হল উচ্ছেদ। সেই পরিমাণে বয়তুল মকুদ্দসে (সংক্ষেপে কুদস, চালু উচ্চারণে উদস), অর্থাৎ জেরুজালেমে বাড়তে লাগল ভিখিরীব সংখ্যা।

আরবদের অনৈক্য ইহুদীদের প্রধান অস্ত্র

কিভাবে, কোন্ পদ্ধতিতে একদিন অবস্থা এমন চরমে গিয়ে দাঁড়ালো যে ফলস্তীনকে দুভাগে বিভক্ত করে এক ভাগে ইহুদী ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হল, সেটা সবিস্তর বলার কণামাত্র প্রয়োজন এ স্থলে নেই। ইহুদীর হাতে আছে কড়ি, তদুপরি আছে দুর্নীতিতে পাজীর পা-ঝাড়া ফলস্তীনের ভিতরে-বাইরে আরব "নেতাবা"।

এক নীগ্রো বলেছিল, "গোরারায়রা যখন আমাদের দেশে এল, তখন তাদের হাতে ছিল বাইবেল, আমাদের ছিল জমি। আজ জমি ওদের, বাইবেল আমাদের হাতে।"

ফলস্তীনের মুসলিম চাষা ইহুদীদের কাছ থেকে তৌরীত তালমুদ চায়নি, পায়ওনি। চাইলেও পেত না। কারণ বহুযুগ হল, ইহুদীরা দীক্ষা দিয়ে বিধর্মীকে আর আপন ধর্মে গ্রহণ করে না। আরবদের দীক্ষা দিলে আরেক বিপদ। স্বধর্মে নবদীক্ষিত জনকে তো চট

করে তার বাস্তুভিটে থেকে তাড়ানো যায় না। আফ্রিকার গোরারায়রা ধর্মের বদলে লব্ধ জমির খাজনা নিয়েই ছিল সন্তুষ্ট; নীগ্রোদের উচ্ছেদ করে সেখানে বিলিতী চাষা বসাতে চায়নি। ইহুদীরা কিন্তু চায় জমিটার দখল। ১৯৭১-এ পাঞ্জাবীরাও এ দেশে বলতো "জমীন চাহিয়ে। আদমী মর যায় তো ক্যা?"

তখনো ঠেকানো যেত ইহুদীদের। আরব রাষ্ট্রগুলো যদি গৃহ-কলহ ভুলে গিয়ে এক জোট হত। তারস্বরে প্রতিবাদ করেছে তারা, কিন্তু তার অধিকাংশই ছিল ফাঁপা, মিথ্যা, ভণ্ডামি।

আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, "ওহে ভবঘুরে, এ দুনিয়ায় সবচেয়ে তাজ্জব তিলিসমাৎ কি দেখেছ?" আমি এক লহমার তরেও চিন্তা না করে বলবো, "এই আরব জাতটা! ইরাক থেকে আরম্ভ করে ঐ বহুদূর সুদূর মরক্কো অবধি বাস করে আরব জাত—অবশ্য সর্বত্রই কিছু না কিছু সংমিশ্রণ হয়েছে (পৃথিবীতে অমিশ্র জাত আছে কোথায়?)। এই আরবদের দেহে আরব রক্ত, এদের ভাষা আরবী, এদের ধর্ম ইসলাম। মিলনের জন্য যে তিনটে সর্বপ্রধান গুরুত্ব-ব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন সে তিনটেই তাদের আছে। অথচ খুদায় মালুম, তারা আজ কটা রাষ্ট্রে বিভক্ত। এবং সেইখানেই কি শেষ? মাশাল্লা, সুবানাল্লা—বালাই দূরে যাক! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় তারা এখনো যা প্রাণঘাতী কলহে লিপ্ত হয়, ভবঘুরে আমি—কোথাও দেখিনি,—পুস্তক-কীট আমি, কোথাও পড়িনি।

আর বাইরের শত্রু-মিত্রের কথা যদি তোলেন তবে সক্কলের পয়লা স্মবণে আসেন ইহুদী শ্রেষ্ঠ হের হাইনরিষ আলফ্রেড কিসিংগার। একদা নবী মুসা নিপীড়িত ইহুদীদেব বক্ষা কবেছিলেন, জালিম মিসবীদের হাত থেকে। ইনিও এ যুগে সেই খ্যাতি অর্জন করবেন—তবে কিনা, এবার বাঁচানো হবে জালিমকে মিশরীদের হাত থেকে।

গয়নীতি

ইংবেজ এই উপমহাদেশের ক্ষয়ক্ষতি করছে বিস্তব, একথা বলা যেমন সত্য ঠিক তেমনি এ কথাটাও সত্য যে তারা আমাদের অল্পবিস্তর উপকারও করেছে। কিন্তু অপকারের দফে দফে বয়ান দেবাব সময় একথা কখনো বলা চলবে না, তারা আমাদের চাষাভূষোদের উচ্ছেদ করে সেখানে আপন জাত-ভাই গোরাবায়দের বসাবার চেষ্টা করছে, কিংবা এ রকম কোনো একটা কুমতলব তাদের ছিল। এ দেশে হিন্দু-মুসলমান জমিদারে ঝগড়া-কাজিয়া হয়েছে প্রচুর, কিন্তু মুসলমান চাষাদের পাইকিরি হিসেবে ঝেঁটিয়ে হিন্দু জমিদার তার জাত-ভাই হিন্দু চাষাকে পালে পালে পত্তনি দিয়েছে, এমনতরো বার্তা কখনো শুনেছি বলে মনে পড়ছে না এবং তার উল্টোটাও না। যদিস্যাৎ কালেকস্মিনে হয়ে থাকে তবে সেটা নিতান্তই ব্যত্যয়।

কিন্তু ইহুদীকুল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যেদিন থেকে ফলস্তীনে আসা আরম্ভ কবল সেদিন থেকেই তাদের পুরো পাক্কা প্ল্যান ছিল, এ দেশে তাদের কর্মপদ্ধতিটা হবে কি প্রকারের। এক দিনে না, এক বৎসরে না,—ধীরে ধীরে কিন্তু মোক্ষম ঘা মেরে মেরে, ছুঁচ হয়ে ঢুকবে এবং ফাল হয়ে বেরুবে। না, ফাল হয়ে সেখানে আস্তানা গাড়বে। সেই মর্মে স্থির করা ছিল :

(১) "হোম-ফোম ওসব বাজে কথা নয়। সম্মুখে রাখতে হবে ধ্রুব উদ্দেশ্য—এ দেশে গড়ে তুলতে হবে একটি সর্বাধিকারসম্পন্ন, সর্বার্থে স্বাধীন পরিপূর্ণ রাষ্ট্র। এবং সে রাষ্ট্র হবে "বিশুদ্ধ" ইহুদী রাষ্ট্র। সম্পূর্ণ "গয়"-বর্জিত। পাঠকের উপকারার্থে নিবেদন, ইহুদীদের প্রচলিত ভাষায় ইহুদী ভিন্ন এ দুনিয়ার কুল্লে নরনারীকে 'গয়' শব্দের মারফৎ পরিচয় দেওয়া হয়। কট্টর ধর্মান্ধ ইহুদীর কাছে সব গয় বরাবর। সাধু-পাষণ্ডে, নিষ্ঠুর-সদয়ে, চোর-পুলিশে, ডাকাত-ফাঁসুড়েতে কোন তফাৎ নেই। আমরাও শাজ-বাজ কাফির শব্দ ব্যবহার করি, কিন্তু অমুসলমান মাত্রই কাফির, ওদের ভিতর ভালো-মন্দে কোনো তফাৎ নেই, এ রকম একটা আজগুবী তত্ত্ব কেউ এযাবত প্রচার করেননি। তদুপরি গয় শব্দের সঙ্গে যে পাশবিক ঘৃণ্য মেশানো থাকে, কাফির শব্দের চতুর্দশ পুরুষ তার গা ঘেঁষতে পারবে না।

(২) রাষ্ট্রকে গয়-মুক্ত করার জন্য সর্ব আচরণ বৈধ। জনৈক ইহুদী সজ্জনই একখানি প্রামাণিক পুস্তিকা লিখে ইহুদী তথা বিশ্বজনের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখান, হিটলার যে জর্মানিকে ইহুদী-মুক্ত করতে চেয়েছিলেন সে শিক্ষা তিনি পান ইহুদীদের কেতাব থেকে। গ্যাস-চেম্বার তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

একথা আমি অতি অবশ্যই বলবো না, সে আমলে বা এখনো সব ইহুদীই এসব বিধানে বিশ্বাস করেন। বস্তুত আমার বিস্তর ইহুদী বন্ধু ছিলেন, এখনো আছেন যাঁদের প্রতিবেশীরূপে পেলে যে কোনো মুসলিম নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবে। কিন্তু মানুষের বদ-কিস্মৎ, রাষ্ট্র-নির্মাণ-কর্মে এঁদের ডাক তো পড়েই না, বরং এসব অন্যায় গোঁড়ামি, বিশ্বমানবের প্রতি অশ্রদ্ধাসূচক বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে আপত্তি তুললে তাঁরা হন লাঞ্ছিত বিড়ম্বিত। সভাস্থল থেকে এঁরা বহিষ্কৃত হন নানাবিধ অশ্রাব্য গালাগাল শুনতে শুনতে। এ পরিস্থিতি এমন কোনো সৃষ্টিছাড়া অভিনব ঘটনা নয়। প্রভু খৃষ্টের আমলেও ইহুদীরা চরমপন্থার অনুরক্ত ভক্ত ছিল। প্রতিপক্ষের সঙ্গে আপোষ করতে কিছুতেই সম্মত হত না। তাই প্রভু খৃষ্ট তাঁর সর্বপ্রথম ধর্মোপদেশ দানকালে "মুখ খুলিয়াই" বলেন, "ধন্য যাঁহারা আত্মাতে দীনহীন (অর্থাৎ আপন রূহ-এর গরীবী সম্বন্ধে সবিনয় সচেতন) কারণ তাঁদেরই নসীবে আছে বেহেশত্।"

এরপর তাঁর সপ্তম উপদেশেই প্রভু বলছেন, "তাঁরাই ধন্য, যাঁরা (দুই বৈরী পক্ষের মাঝখানে) শান্তি-সুলেহ্ নির্মাণ করেন।" খৃষ্টের এ উপদেশ গোটা ইহুদী জাত তাদের "মৃত সমুদ্রে" ডুবিয়ে দিয়ে তাঁকে ক্রুশে চড়িয়ে মারে। রোমান গবর্নর তাঁকে বাঁচাবার জন্য কি প্রকারের চেষ্টা দিয়েছিলেন, একটার পর আরেকটা সুলেহ্ পেশ করছিলেন, মথি মার্ক ইত্যাদিতে আছে কিন্তু ইহুদী জনতা শুধু চিৎকারের পর চিৎকার করেই চলেছে—"ক্রুশে মারো। ক্রুশে চড়িয়ে মারো ওকে।" সুলেহ্ মাত্রই তাদের কাছে দুর্বলতার লক্ষণ। সমস্ত ঘটনাটি এমনই নাটকীয় যে এর পুনরাবৃত্তি পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবে না।

শেষটায় গবর্নর পিলাতে যখন দেখলেন তিনি তাঁর প্রচেষ্টাতে এক কদমও এগুতে পারছেন না (হি ওয়াজ নট গেটিং এনিহোয়ার) তিনি একটা ডাবর-ভর্তি পানি আনিয়ে জনতার সামনে দু'হাত ধুয়ে বললেন, "এই নির্দোষ সাধু ব্যক্তির রক্তপাতে আমার কোনো কসুর রইল না।" উন্মত্ত জনতা চেঁচিয়ে উত্তর দিলে, "এর লহুর দায় আমাদের উপর পড়ুক, আমাদের বংশধরদের উপর পড়ুক।"

যুগ যুগ ধরে ধর্মোন্মাদ খৃষ্টান জনতা যখনই ইহুদীদের উপর নির্মমভাবে খুনখারাবি

চালিয়েছে তখনই ব্যঙ্গ করেছে, "তোদের পূর্বপুরুষরা কসম খেয়েছিল না, প্রভুর খুনের দায় তোদের উপর অর্সাবে? এখন 'আমরা বেকসুর, আমরা মাসুম' বলে চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?"

অথচ আইনত, ঈসা মসীহের শিক্ষার কসম খেয়ে অবশ্যই বলতে হবে, পিতার পাপ পুত্রে অর্সায় না। এরা বেকসুর।

বেদরদ প্রাক্তন বাস্তুহারা

১৯৩৪-এ ফলস্তীনে গিয়ে দেখি, বাস্তুহীন, ভিটেহারা, জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত জর্মন ইহুদীরা লেগে গেছে নূতন করে, কিন্তু নীরবে, লক্ষ লক্ষ নয়া ক্রুশ বানাতে। সর্ব প্রকারের আয়োজন চলছে সঙ্গোপনে। উত্তম উত্তম বাস্তু পাওয়ার পরও এরা বিধি-ব্যবস্থা করে যাচ্ছে, লক্ষাধিক বেকসুর আরবদের কি প্রকারে, কত সুলভ পদ্ধতিতে বাস্তুহারা করা যায়।

এই সব মাসুম চাষাভূষোদেব সচরাচর আরব বলা হয়, মুসলিম বলা হয়, কিন্তু আসলে বলা উচিত ফলস্তীনী বা ফলস্তীনবাসী। ইহুদীরা মিসরের দাসত্ব থেকে বেরিয়ে, ফলস্তীনে এসে একে একে যে সব আদিবাসী উপজাতিদেব জয় করতে কবতে ইহুদী-রাজত্ব বসায, সে সব আদিম বাসিন্দারা ইহুদীদের ধর্ম গ্রহণ করেনি। এদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কওমের নাম ছিল ফিলিস্তাইন, তাদের রাজত্বের নাম ছিল ফিলিস্তিয়া। এ রকম আরো ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল অনেক। ফিলিস্তিযা থেকেই পরবর্তীকালে প্যালেস্টাইন নামের উৎপত্তি। ইহুদীদের ছিল দুটি রাষ্ট্র—জুদেয়া ও ইজরায়েল। এবং আজ প্যালেস্টাইন বলতে আমরা যে ভূখণ্ড বুঝি এই দুটি রাষ্ট্র মিলে তার দশ ভাগের এক ভাগও হবে না। সিনাই বা সীনীন কস্মিনকালেও ইহুদী রাষ্ট্রেব অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

মোদ্দা কথা এই . ইহুদীরা ফলস্তীনের আদিমতম বাসিন্দা নয়। আদিম বাসিন্দারা পরবর্তীকালে খৃষ্টান হয়ে যায় এবং জেনারেল খালিদ সিরিয়া ও ফলস্তীন জয় করার পর ইসলাম গ্রহণ করে। আজ যখন ইহুদীবা ফলস্তীনকে আপন আদি বাসভূমি বলে হক্ক বসিয়ে প্রাচীনতম বাসিন্দাদের তাড়াতে চায়, তবে কাল দ্রাবিড়রা উত্তব ভারত দাবী করে আর্যদের খেদিযে দেবার হক্ক ধরে! যে কোনো রেড ইন্ডিয়ান ডক্টর কিসিংগারকে দূর দূর করে আপন দেশ থেকে বের কবে দিতে পারে। তার আছে সত্যকাব হক্ক।

ফি রোজ ঈদ ফি রোজ হালুয়া

জেরুজালেমের সর্বত্র কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। বড় বড় রাস্তার উপর নবাগত ইহুদীরা বসিযেছে বার্লিন প্যাবিস ন্যুইয়র্কী কায়দায় ফেনসি কাফে রেস্তোরাঁ। আরব ওগুলোর দিকে ফিবেও তাকায় না, তাকালে সে দৃষ্টিতে থাকে ঘৃণা আর ক্ষোভ। এ সব ইহুদী রেস্তোরাঁয় খাদ্য পানীয়ের দাম যে খুব একটা আক্রা তা নয়। খদ্দের ইহুদী, মালিক ইহুদী। এবং প্রায় সব কটাই চলে লোকসানে। তাতে কার কি? সব ইহুদী সাকুল্যে খর্চা, ফুর্তির কড়ি পাচ্ছে মার্কিন জাত-ভাইদেব কাছ থেকে। তারা কিন্তু বাস্তুঘুঘু। ধনদৌলতে ভরা নৃত্যগৃহ কাবারে, জুয়োব আড্ডা বেশ্যালয়ে আবজাব করছে যে দেশ, সে দেশ

ফেলে তারা আসবে কেন এই কাঠখোট্টা প্রাচীনপন্থী প্যালেস্টাইনে—'পুণ্যভূমি' 'পিতৃভূমি', 'আব্রাহামের দেশ' বলে মুখে মুখে যতই হাই-জাম্প লং-জাম্প মারুক না কেন।

আরব জাত গরীব। তাদের রেস্তোরাঁও গরীব। আমিও গরীব।

ঢুকলুম একটা শামিয়ানা ঢাকা রেস্তোরাঁতে। সেটা ছিল রোজার মাস। ইফতার আসন্ন। সে যুগে বেতারের খুব একটা প্রচলন হয়নি। তাই রেস্তোরাঁর লাউড স্পীকারে কুরান-পাঠ আসছে, কাইরো বেতার থেকে, মশহুর কারী রেফাতের কণ্ঠে। আমরা আপন দেশে আসর মগরীবের দরমিয়ান ওয়াক্তে সচরাচর কুরান পড়ি না। এরা দেখলুম, চুপ করে বসে বসে আজান না হওয়া পর্যন্ত তিলাওত শোনাটাই পছন্দ করে। দু-চারজন ছোকরা গোছের খদ্দের ফিসফিস করে কথা বলছে। একজন দেখলুম উত্তেজিত মুখে দ্রুতবেগে কি যেন বলে যাচ্ছে আর বার বার খবরের কাগজের উপর আঙ্গুল ঠুকে, খুব সম্ভব তারই বরাত দিচ্ছে। অন্যজনের দৃষ্টি উদাস।

ছেঁড়া, তালি মারা জোব্বা পরা গোটা চারেক বয় টেবিলে ইফতার সাজাচ্ছে। একজন এসে ফিস ফিস করে শুধালো, খাবে কি? ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি, কাইরোর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হোটেলে যা খাওয়া হয়, এখানেও টেবিলে টেবিলে সাজানো হচ্ছে তাই। আমি বললুম, যা ভালো বোঝো তাই।

ইতিমধ্যে একজন জোয়ান গোছের লোক আমার সামনের চেয়ারে খপ করে বসে বয়কে দিল ইশারা। বয় আসতেই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললে, "সব জিনিসের রেট বাড়িয়েছ তো ফের?" বয় ধবধবে সাদা দাঁত দেখিয়ে মুচকি হেসে বলে, "না, এফেন্দম।" লোকটা তেড়ে শুধোলে, "কেন বাড়ালে না? ঠেকাচ্ছে কে? তাই সই। যাবো নাকি ইহুদী রেস্তোরাঁয়?" আমার গলা থেকে বোধ হয় অজানতে অস্ফুট শব্দ বেরিয়েছিল। বোঁ করে চক্কর খেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "বাড়বে না দাম নিত্যি নিত্যি! ঐ ইহুদী ব্যাটারা মুফতের সোনাদানা ওড়াচ্ছে দুহাতে। ওরা পারে আমাদের সর্বনাশ করতে।" আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম, "ওরা সস্তায় দেয় কি করে?"

"কি করে? অবাক করলেন এফেন্দম, ওদের লাভই বা কি, লোকসানই বা কি? দোকানী ইহুদী, খদ্দেরও ইহুদী!" তারপর যা বললেন সেটা বাংলায় হলে প্রকাশ করতেন একটি প্রবাদ-মারফত : কাকে কাকের মাংস খায় না।

ইহুদীর দাপট

একাধিকবার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি ডক্টর হেনরী কিসিংগারের প্রতি। ইনি তখনো যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন মিনিস্টারের পদ লাভ করেননি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও অভাগা বাংলাদেশের লোক তাঁকে চট করে চিনে যায়। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই যখন বিশ্বের সর্ব মিলিটারি ওয়াকিবহাল নিঃসন্দেহে বলতে থাকেন, কয়েকদিনের ভিতরেই নিয়াজী পরাজয় স্বীকার করে ফরমানকে ফরমান লেখবার হুকুম দেবেন, তার পূর্বে এবং পরেও ইসলামাবাদের সর্ব প্রভাবশালী বিদেশী ইলচীরা এক বাক্যে বিশ্বজন তথা জুন্তাকে জানান যে, শেখ মুজীব সাহেবকে মুক্তি না দিলে কোনো প্রকারের স্থায়ী শান্তির সম্ভাবনা নেই, তখনো এই মহাপ্রভু কিসিংগার গোপন বৈঠকে একাধিকবার বিরক্তির সঙ্গে

বলেছেন, "না, না, না। 'শেখকে মুক্তি দাও', ইয়েহিয়াকে এ ধরণের কোনো সুস্পষ্ট স্পেসিফিক নির্দেশ আমরা দিতে পারবো না।"

কোন সুচতুর পদ্ধতিতে এই ইহুদীনন্দন শেষটায় শূন্য-মস্তিষ্কবুদ্দুরাজ মার্কিনের মাথায় সওয়ার হলেন, সে-ইতিহাস দীর্ঘ। উপস্থিত সেটা থাক। কিন্তু একটি কথা এখানে বলে রাখা ভালো। ইহুদীরা টাকা ও বিশ্বের ইতিহাসে অদ্বিতীয় ঐক্য-শক্তি দ্বারা মার্কিনের মাথায় কভু যে ডাণ্ডা বুলোয়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আড়াল থেকে অদৃশ্য সুতো টেনে পুতুল-নাচ নাচায়, সে-তত্ত্বটা দুনিয়ার লোক জানেন না; নিরীহ মার্কিন পদচারীরও কূজনে গুঞ্জনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে, বিশেষ করে বোটকা গন্ধ থেকে, ওটা যেন বড্ড অস্নাত ইহুদী ইহুদী বদবোর মত ঠেকছে। কারণ একটি প্রবাদ অনুযায়ী এ সত্য নির্ধারিত হয়েছে, "ফরাসী ও ইহুদীরা নৌকা-ডুবি ভিন্ন জীবনে কখনো গোসল করে না।" সুয়েজ কানালের পাড়েও ইহুদীরা বড্ডই অস্বস্তি অনুভব করতো—পালাতে পেরে বেঁচেছে।

তা সে যাই হোক, মার্কিন ইহুদীদের তাগত কতখানি প্রচণ্ড সেটা উত্তমরূপে অবগত আছেন মার্কিন রাজনৈতিকরা। এডওয়ার্ড কেনেডির প্রতি বাংলা-ভারতের অনেকেই শ্রদ্ধা পোষণ করেন, কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি অকুণ্ঠ ভাষায় এ দেশের স্বাধীনতা স্পৃহার সমর্থন জানিয়ে নিক্সনের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিলেন। পাঠক শুনে বিস্ময় ও বেদনা বোধ করবেন বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার তিন দিন যেতে না যেতেই সেই কেনেডি, আমার জানা মতে, 'গয়'-দের মধ্যে সর্বপ্রথম, মার্কিন সরকারকে অনুরোধ জানান, তাঁরা যেন ইজরায়েলকে যুদ্ধের এ্যারোপ্লেন দিয়ে সাহায্য করেন। তার প্রথম কারণ, তিনিই ইজরায়েলের প্লেন নাশের অবস্থাটা তড়িঘড়ি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় কারণই আসল এবং মোক্ষম। ১৯৭৬-এ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি উমেদার, এবং আমার জানা মতে, অন্ততঃ এ শতাব্দীতে, ইহুদী-বৈরী কোনো ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি। কেনেডি বেলাবেলিই ইহুদীদের সন্তুষ্ট করে রাখতে চান।

ইজরায়েল! হিসাব দাও!

পাঠক কিন্তু তাই বলে এক লম্ফে হিটলারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে যাবেন না, তামাম মার্কিন মুল্লুক চালাবার কুল্লে কলকাঠি ইহুদীদের হাতে। মোটেই না। ইহুদীকুল শক্তি-উপাসক নয়। তারা করে লক্ষ্মীর উপাসনা। মার্কিন পলিটিকসে তারা শক্তিধর হতে চান না। যদি কখনো তাদের প্রত্যয় হয়, যে অমুক প্রিসিডেন্ট হলে তাদের টাকা কামাবার পথে কাঁটা হবেন, তবেই তারা কুল্লে ধন-দৌলত দিয়ে সাহায্য করে তার দুশমনকে—কিন্তু গোপনে। মাত্র একবার তারা ভুল করে শক্তির পথে নেমেছিল। জাত-ভাইদের জন্য ফলস্তীনে সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র গড়ার কুবুদ্ধি তাদের মাথায় ঢোকে, এবং গত পঞ্চাশটি বছর ধরে তারা যে কি পরিমাণ মাল দরিয়ায় ঢেলেছে সেটা জানে একমাত্র তারা আর জানেন জেহোভা। এইবারে তার হিসেব নেবার পালা এসেছে! ম্যাডাম গোল্ডা মেইর, মশে দায়ান, আবা এবানের টুঁটি চেপে ধরে মার্কিন ইহুদীরা শুধোবে, "হিসাব দেখাও, টাকাটা গেল কোথায়! কে মেরেছে কত? এখন কুল্লে ইহুদী রাষ্ট্রটা যে ডকে উঠতে চললো তার জন্য দায়ী কে?"

কভু গোপনে!

কিন্তু এটা বাহ্য। আসল গরদিশে পড়েছেন বাবাজী কিসিংগার। মার্কিনদের হনুকরণ করে (এপিং করে) নাম পর্যন্ত বদলালেন, হাইনরিষ কিসিংগার থেকে হেনরি কিসিংগারে! আরো কত কি না করলেন, "কেরেস্তান"দের সঙ্গে একদম লাইলি-মজনূনেব মত দুই দেহে এক প্রাণ, হরিহরাত্মা হয়ে যেতে। ওদিকে ধাপ্পা দিলেন বিশ্বসুদ্ধ সবাইকে—ইহুদীদের অবশ্যই বাদ দিয়ে—তিনি প্রভু নিক্সনের উপদেষ্টারূপে চারটি বৃহৎ বিশ্বশক্তির সঙ্গে গুফতো-গো করেন মাত্র : তাঁরা রুশ, চীন, জাপান আর পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রপুঞ্জ (ফ্রান্স ইংল্যান্ড জর্মনি গয়রহ্)। মধ্যপ্রাচ্য? আজ্ঞে না। ওটা ডীল করছেন স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী হিজ একসেলেনসি রজার্স। ভাবখানা এই, "আমি ইহুদীর বেটা। আরব ইজরায়েলের ফ্যাসাদে আমার নাক গলানোটা কি নিরপেক্ষ, সুবিবেচনার কর্ম হবে?"

তাই দেখা গেল, কিসিংগার যখন ক্ষুদ্র-অসাধুতা ("পেটি এ্যান্ড ডিজনেস্ট"—ফরেন আপিসের একাধিক উচ্চ কর্মচারীর মতে) পদ্ধতিতে পররাষ্ট্র-মন্ত্রীত্ব ছিনিয়ে নিলেন (গ্র্যাবড্) তখন মিসরের জনৈক সম্পাদক, অস-সঈদ ইহসান আবদুল কুদ্দুস বললেন, "আশা ছাড়বো কেন? ভেবে দেখুন, ফীল আখির—আফটার অল—বছবের পর বছর ধরে আমরা মিঃ রজার্সের সঙ্গে লেন-দেন করার পর আখেরে আবিষ্কার করলুম, তিনি ক্লীব—শক্তিধর তাঁর পিছনে গদাধর কিসিংগাব!" বিগলিতার্থ তাহলে দাঁড়ালো এই, আরবরা বুদ্দু। কিসিংগারই কলকাঠি নাড়িযেছেন ইজরায়েলের হয়ে, শিখণ্ডী ছিলেন রজার্স। এটাকে যদি ধাপ্পা, প্রতাবনা না বলে তবে বঙ্গজন দয়া কবে শব্দ দুটোর সংজ্ঞা জানাবেন কি?

কভু হাটের মধ্যিখানে!

এই কি তার শেষ? কিসিংগার রুশের সঙ্গে দোস্তী জমালেন স্বয়ং খোলাখুলি ভাবে। হঠাৎ দেখি, ইয়াল্লা, হুড়হুড়িয়ে বানের জলের মত ইজরায়েলের পানে 'রাশ' কযেছে রুশেব ইহুদী-পাল! এরা যে ননী-মাখনে পোষা ইজরায়েলীদের চেয়ে হাজার গুণে সখৎ মোকাবিলা কবতে পারবে আরবদের, সেটা স্বীকার করেছেন ঝাণ্ডু ঝাণ্ডু জাঁদরেলগণ। চীন তো চটে গিয়ে রুশকে করেছে এর জন্য দায়ী। কিসিংগারকে ছেড়ে দিয়ে কথা কইল কেন, সে আমি জানিনে।

সরল প্রশ্ন

কিন্তু আজ যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনাদের সেবক, এ মূর্খ, লোখাটি আরম্ভ করেছে সেটি ভিন্ন, কিন্তু উপরের বক্তব্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি বিজড়িত। আমি নাদান, কিঞ্চিৎ এলেম সঞ্চয় করতে চাই আপনাদের কাছ থেকে।

(১) আশা করি সবাই স্বীকার করবেন, বাংলাদেশ বিশ্ব সংসারে অসাধারণ শক্তিশালী

এমন একটা রাষ্ট্র নয় যেখানে কোনো মার্কিন পররাষ্ট্র-মন্ত্রী নিজেকে এ দেশের প্যারা করতে চাইবেন। আমার প্রশ্নটা পরে আসছে।

(২) কত রাজা, কত প্রেসিডেন্ট, কত প্রধানমন্ত্রী নিজ নিজ পদ গ্রহণ করার সময় নিত্যি নিত্যি শপথ নেন। তার কটা ফোটো এই গরীব ঢাকার দৈনিকে বেরোয়, বুকে হাত দিয়ে বলুন তো।

(৩) তাহলে প্রশ্ন, হঠাৎ করে মিঃ কিসিংগার—রাজা না, প্রেসিডেন্ট না, এমন কি প্রধানমন্ত্রী না—ফরেন মিনিস্টারী নেবার সময় যে-শপথ গ্রহণ করেন তার ছবি ঢাকার কাগজে কাগজে বেরুলো কেন? নিশ্চয়ই ছবিটি মিঃ কিসিংগার যে-ফরেন আপিসের বড় সাহেব হলেন, সে-আপিসের ঢাকাসহ শাখা-প্রশাখা দ্বারা বিতরণ করা হয়েছে। তা হোক, কিন্তু প্রশ্ন, এই ছবিটাই বিশেষ করে কেন?

(৪) উপরের প্রশ্নটি যত না গুরুত্ব-ব্যঞ্জক, তার চেয়ে মোস্ট ইম্পরটেন্ট, মিঃ কিসিংগারের সম্মানিতা মাতা যে বাইবেল হাতে করে শপথের সময য দাঁড়িযে আছেন, সেটা কে, কারা, কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন? কত লোক কত ধর্মগ্রন্থ নিয়ে, বা কোনো ধর্মগ্রন্থ না নিয়ে শপথ করে, কই, সেটা তো আজ অবধি কোনো খবরের এজেন্সি বা ইনফরমেশন সার্ভিস চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়নি। বিশেষ করে বাংলাদেশের লোকই বাইবেলের নামে গদগদ একথাও তো কখনো শুনিনি।

(৫) মিঃ কিসিংগার ইহুদী। বাইবেলের প্রথম অংশ, যার নাম "ওল্ড টেস্টামেন্ট" সেটা ইহুদীদের সম্মানিত ধর্মগ্রন্থ—খৃষ্টানদেরও। কিন্তু তার দ্বিতীয়াংশই আসলে খৃষ্টানদের পরম পূজ্য "নিউ টেস্টামেন্ট"—যাতে আছে প্রভু যীশুর জীবনী, তাঁর খৃষ্টধর্ম প্রচারের বিবরণ, এবং আছে তাঁকে যে ইহুদীরা ক্রুশে চড়িয়ে খুন করে তাব করুণ কাহিনী। মিঃ কিসিংগার (এবং তাঁর মাতা) কি এই কাহিনীব "পবিত্রতায়" বিশ্বাস করেন যে এটিকে স্পর্শ করে তিনি শপথ নিলেন? আমি যতদূব জানি, ইহুদীরা এই "নিউ টেস্টামেন্টে" বিশ্বাস করেন না। অতি অবশ্যই ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তোওরাতে (তওরীতে) "নিউ টেস্টামেন্টে"র স্থান নেই।

(৬) তবে কি ফোটোর বাইবেল খাস ইহুদী-বাইবেল? আমাদের জানা মতে, সে গ্রন্থে থাকে শুধু "ওল্ড টেস্টামেন্ট"। তাই যদি হয়, তবে "বাইবেল, বাইবেল" বলে সেটা অতখানি প্রচার করা হল কেন? ঢাকা কলকাতার জনসাধারণ তো বাইবেল বলতে ওল্ড এবং নিউ, দুইয়ে গড়া বাইবেলই বোঝে, সেই কেতাবদ্বযের সম্মিলিত গ্রন্থই দেখেছে। যাঁবা ফোটোর সঙ্গে ক্যাপশনটি বিতরণ কবেছেন তাঁরা ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললে ভালো হত না? "বাইবেল" শব্দটিও মূলত গ্রীক বলে ইহুদীবা ব্যবহার কবেন বলে শুনিনি। তাঁরা তোওরা, তালমুদ ইত্যাদি বলে থাকেন। হয়তো নিতান্ত 'গয'দের উপকাবার্থে মাঝে মাঝে বাইবেল বলেন।

(৭) ইহুদী কিসিংগারেব পক্ষে কি বাধ্যতামূলক ছিল বাইবেল স্পর্শ করে, শপথ নেবার? কাল যদি মুসল্লী মুহম্মদ আলী (কেসিয়াস ক্লে) আমেরিকায় মন্ত্রী হন, তবে তাঁকেও কি বাইবেল ছুঁয়ে কসম নিতে হবে?

(৮) তবে কি ডঃ কিসিংগার ও সম্মানীয়া মাতা সনাতন ইহুদী ধর্ম ত্যাগ করেছেন? এটা বিশ্বাস কবা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব—কিসিংগার চবিত্র যতখানি বুঝতে

পেরেছি তারপর।...এসব বাবদে কিঞ্চিৎ এলেম হাসেল হলে উত্তম আলোচনা করা যাবে। যাঁরা এতখানি পয়সা খর্চা করে মুফতে ফটো বিতরণ করলেন, তাঁরা দু-পয়সার কালি-কাগজ মারফৎ সত্যজ্ঞান বিতরণ করবেন না, এই কি সম্ভব? মুফতে থোড়া বখশিস দিয়ে বেতটার পয়সা ওনারা দেবেন না?

বার্লিনে

১৯২৯-এ আমি বার্লিন যাই। সে যুগে বার্লিন এবং অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা ছিল ইহুদী জগতের প্রবীণতম দুই কেন্দ্র। ইহুদী বৈরী হিটলার এবং তাঁব গুরুমারা চেলা বৈরি-প্রধান গ্যোবেলস তখনো রাষ্ট্রশক্তি পাননি, এবং তাঁদের শক্তিকেন্দ্র ছিল বাভারিয়া প্রদেশের ম্যুনিকে। তবু মাঝে মাঝে বার্লিনের রাস্তায়, পাবে, মিটিঙে, নাৎসি আর কম্যুনিস্ট পার্টিতে হাতাহাতি মারামারি হত। তাছাড়া মোকায় পেলে মশহুর কোনো নাৎসি-বৈরীকে পেলে তাকেও দু-ঘা বসিয়ে দিত, খুনও করেছে। এস্থলে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দি, ফ্রান্স জর্মনিতে ইহুদীদের এক বৃহৎ অংশ নিজেরা প্রগতিশীল বলে, প্রগতিশীল কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিত। কম্যুনিস্ট প্যাঁদাতে পারলে নাৎসিদের ছিল ডবল আনন্দ। বহুত ক্ষেত্রে ফালতো রিকস না নিয়ে একাধারে কম্যুনিস্ট ইহুদী দুজনকেই ঘায়েল করা যেত। যে কারণে এ দেশের হিন্দুকে খতম করে ইযেহিয়া পেতেন ডবল সুখ—একাধারে হিন্দু এবং বাঙালি, দুই দুশমনের জন্য লাগতো মাত্র একটা বুলেটের খর্চা।

য়ুনিভার্সিটি রেস্তোরাঁর টেবিলে নাৎসিদের কথা বড় একটা উঠত না। ছাত্রদের ভিতর তখন কম্যুনিস্টদের ছিল প্রাধান্য। এবং স্বভাবতই তাঁদের মধ্যে ইহুদীদের ছিল উচ্চাসন। আমি যে ওদের সঙ্গেই গোড়ার থেকে ভিড়ে গিয়েছিলুম তার কারণ কম্যুনিস্টরা আপন "ধর্মে" দীক্ষা দেবার জন্য নবাগতজনকে অভ্যর্থনা জানায় আর ইহুদীরা শত পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রাচ্যদেশীয় মেহমানদারী গুণটি এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। পরবর্তীকালে ইজবায়েল ব্যত্যয়। কিংবা হয়তো যুগ যুগ ধরে খৃষ্টানদেব হাতে নির্যাতিত হওয়ার সময় অখৃষ্টান যাকে পেয়েছে তার সাহায্য পাবার আশায় তার সঙ্গে যেচে গিয়ে কথা বলেছে। অবশ্য এটা স্মরণে রাখতে হবে ইহুদী জাত যেখানে গিয়েছে, সেখানেই কিছু না কিছু মিশ্রণের ফলে এখন বেশীব ভাগ ক্ষেত্রেই বলা প্রায অসম্ভব খৃষ্টান জর্মন বা কে, আর ইহুদী জর্মনই বা কে। এবং নাম থেকেও বলা সুকঠিন কে কোন্ জাত বা ধর্মের।

বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহুদী-শাস্ত্র চর্চা

১৯৩০-এ হিটলার হঠাৎ, কি কারণে কেউ জানে না, পার্লামেন্টে অনেকগুলো সীট পেয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে আমি চলে এসেছি বন শহরে। ছোট শহর বন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ওবিয়েন্টাল সেমিনারটি জর্মনীব ভিতর-বাইবে সর্বত্র সুপরিচিত। সেখানে আরবী, সংস্কৃত ও হীব্রু চর্চা হত প্রচুব। সেই সূত্রে ডজনখানেক ইহুদী ছাত্র ও পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হল তো বটেই, দু-তিন জনার সঙ্গে বীতিমত হৃদ্যতাও হয়ে গেল। এদের একজন ছিলেন সেই সুদূর রুশ দেশেরও দূর প্রান্ত জর্জিযার লোক। ভারি আমুদে, পরিণত বয়স্ক,

ছাত্রসমাজের মুরব্বী। ওদিকে ইহুদী ধর্মতত্ত্বের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে পাশ করেছিলেন বলে (অর্থাৎ তিনি রাব্বী পণ্ডিত পুরোহিতের সমন্বয়) "ওল্ড টেস্টামেন্টের" প্রামাণিক সংস্করণের নতুন প্রকাশ নিয়ে দুনিয়ার যত প্রাচীন পাণ্ডুলিপির মধ্যে দিন-যামিনী আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকতেন। একদিন আরবীতে লেখা "আজব উল-কবর" (মৃতজনকে গোর দিয়ে চলে আসার পর ফিরিস্তা এসে তার ঈমান সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন করেন তার বিবরণী) পড়ে আমার মনে হল, ইহুদীদের "তালমুদ" গ্রন্থে এর উল্লেখ থাকাটা অসম্ভব নয়। আমার হীব্রু বিদ্যে মাইনাস ডডনং। জর্জিয়ার রাব্বীর কাছে গিয়ে প্যাসেজ দেখাতেই তিনি চোখ দুটো বন্ধ করে চেয়ারের হেলানটায় মাথাটা ফেলে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে বিড় বিড় করে হীব্রু শাস্ত্র আবৃত্তি করে যেতে লাগলেন। আমি দাঁড়িয়েই আছি, দাঁড়িয়েই আছি—তালমুদ তিলাওতের পালা আর সাঙ্গ হয় না। কুরান শরীফেব শবীনা খৎম-ই এক ঠায় বসে এ জীন্দেগীত আদ্যন্ত শোনার সওয়াব হাসিল করতে পারেনি এই বদকিস্মৎ গুনাগার। আর এই তালমুদ গ্রন্থটি ইটের থান মার্কা পাক্কা চল্লিশটি ভলুমের নিরেট মাল। সওয়াবভী নদারদ, কারণ তালমুদ কেতাব পাক তওরিতের অংশ নয়।...আখেরে জেহোভার রহমৎ নাজির হল। হঠাৎ থেমে গিয়ে এক লম্ফে পেড়ে আনলেন এক খণ্ড তালমুদ। পাশেব চেয়ারটার দিকে ইঙ্গিত দিয়ে "হিম্বৎ হা করব" (আমার সঠিক নাম আজ আর মনে নেই) অনুচ্ছেদটি পড়তে আবম্ভ করলেন, আমার হাতে আরবী টেকসটটি তুলে দিয়ে। এবং হুবহু এক্কেবারে আমাদেব মক্তবের ছাত্রদের মত ঘন ঘন দুলে দুলে আর সুর করে করে। আব মাঝে মাঝে ঠিক মক্তবের বাচ্চাটার মত মাথা ডাইনে বাঁকে নাড়িযে সুর করেই বলেন "হল না", মেরামত করে ফের এগোন দ্রুততর গতিতে।

আমি তো অবাক! কবে কোন্ যুগে, ছেলেবেলায় আপন গাঁয়ে দেখেছি এই দৃশ্য! আর সেই দৃশ্য জর্জিয়ার তিফলিস থেকে এখানে এসে ফের হাজির! হ্যাঁ, ওখানেও একদা আরবা তুর্কী ও ফার্সীরও প্রচুর চর্চা হত। শুধু একটা অনুষ্ঠান ফারাক ছিল; রাব্বীকে বললুম, " 'হল না' বলার সঙ্গে আমাদের তালিব-ই-ইলম চট করে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখে নেয়, চাবুক হাতে মৌলবী সাহেব শুনতে পেযে তেড়ে আসছেন কিনা।" সদানন্দ পণ্ডিত ঠাট্টা করে হেসে উঠলেন। হাসি আর থামতেই চায না।

গোপন ইহুদী রেস্তোরাঁ

এ কাহিনী এতখানি বাখানিয়া বলার উদ্দেশ্য আমার আছে। ১৯৩২-এ দেশে ফিরে ফের বন শহরে গেলুম '৩৪-এ। রাব্বীর সঙ্গে দেখা হল না। ভাবলুম হয়তো বা হবু ইহুদী রাষ্ট্র ইজরাযেলে চলে গিয়েছেন। এ রকম সুপণ্ডিত রাব্বী পুণ্যভূমিতে যাবেন না তো যাবার হক্ক ধরে কে? তাই ভারী খুশী হলুম, চিন্তিতও হলুম '৩৮-এ তাঁকে ফেব বন শহরের স্টেশনেব কাছে দেখে। হিটলার তখন এমনিই বেধড়ক দাবড়াতে আরম্ভ করেছে যে ইহুদীরা জর্মনী ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করেছে দলে দলে—একদা যে-রকম মিসর ছেড়ে তুরি সীনীনে পৌছেছিল। ঐ সময়েই হের ডক্টর কিসিংগার—যিনি তবস্তু দিন চোখ রাঙ্গিয়ে আরব নেশনকে শাসিয়েছেন, "এখন পাঠাচ্ছি স্রেফ অস্ত্র-শস্ত্র (জাতভাইকে), দরকার হলে পাঠাবো সেপাই জাঁদরেল,"—সেই, তখনকার দিনের চ্যাংড়া হাইনরিষ

ডাকনাম হাইনৎস কিসিংগার পড়ি মরি হয়ে জর্মনী ছেড়ে অদ্যকার মিলিটারি কণ্ঠটি খামুশ রেখে চড় চড় করে বীরগর্বে পালান মার্কিন মুল্লুকে।......রাব্বী আব্রাহাম আমাকে জাবড়ে ধরে নিয়ে উঠলেন একটা বাড়ির দোতলায়। ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখি ইহুদী রেস্তোরাঁ। কারণ সামনেই ছোট্ট একটা টেবিলের উপর গোটা দশেক ছোট কালো কাপড়ের টুপি— নিতান্ত কুণ্ডুলিসুদ্দু মাথার খাপরিটা ঢাকা যায় মাত্র। ইহুদীরা অনাবৃত মস্তকে ভোজন বা ভজনালয়ে প্রবেশ করে না। আম্মো একটা পরে নিলুম। সুন্নৎ।

মাখনে ভাজা মাছ এল। ইহুদী শরিয়তে মাছ তেলে ভাজতে নেই। আমি বললুম, "বিসমিল্লা করুন।" তিনি তাই করলেন। কুশলাদি সমাপনান্তে আমি আশ-কথা পাশ-কথা দু-চারটি বলে শুধালুম, "পুণ্যভূমিতে যাবেন না?"

তাঁর মাথা আমার কানের কাছে এনে অতি চুপেচুপে বললেন, "আমাকে তারা পছন্দ করবে না। কিন্তু এখানে না, রাস্তায় কথা হবে।"

আহ্বাবাদি ছ-বছর আগে ছিল ঢের, ঢের ভালো।

টুপি ফের টেবিলে রেখে রাস্তায়, তারপর সেমিনারে। পূর্ববৎ গুরুশিষ্যের মত মুখোমুখি হয়ে বসার পর নিজেব থেকেই বললেন, "আমি রাব্বী। আমি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি, শাস্ত্র মেনে চলি। ইজবায়েল যারা গড়ে তুলছে তাদের সঙ্গে আমার বিশেষ কোনো মতভেদ নেই। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বব্যঞ্জক সর্বপ্রথম সমস্যাতেই তারা যে পথে চলেছে সেটা ভুল পথ। আমার ব্যক্তিগত মত নয়। খুলে বলছি।

"প্যালেস্টাইন থেকে চিরতবে বিতাড়িত হওযাব পূর্বে ইহুদীরা পুণ্যভূমিতে তিনবার সশস্ত্র সংগ্রাম করে। প্রতিবার তারা নির্মমভাবে পরাজিত হয়। একবার ব্যাবিলনের রাজা তো আক্রোশের চোটে তাদের ছেলে-বুড়ো-কুমারী-সধবাদের বিরাট এক অংশ দাসরূপে টেনে নিয়ে গেলেন প্যালেস্টাইন থেকে সেই দূর ব্যাবিলনে—সমস্ত সিরিয়া মরুভূমির উপর দিয়ে। বার বার জেনে শুনে, কারণে-অকাবণে কখনো বা পরের ওসকানিতে তারা বিদ্রোহ করে শুধু যে নিজেদের পার্থিব সর্বনাশ ডেকে এনেছে তাই নয়, ঐতিহ্যগত ধর্মের মারফৎ তাবা যেটুকু সভ্যতা সংস্কৃতি গড়েছিল সেটারও পূর্ণ বিকাশ কবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। প্রতিবার গোটা জেরুজালেম শহরটাকে পুড়ে খাক করে দিয়েছে, হাজাব হাজার নারী পুত্রহীন, স্বামীহীন করেছে তারা, যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, করার মত শক্তি তাদের আদৌ ছিল না।

তাই ইহুদীদের প্রফেটরা ধর্মগ্রন্থে বার বার সাবধান করে দিয়েছেন, সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া তোমাদের পক্ষে পাপ, মহাপাপ!

'হোম' বানাতে গিয়ে প্যালেস্টাইনে এই নয়া ইহুদীবা আবার ধরেছে অস্ত্র আরবদের বিরুদ্ধে। বার বাব আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাব্বীরা তাদের সম্মুখে শাস্ত্র খুলে তাদের মানা করেছেন; তারা শোনেনি!

এখন বেশীর ভাগ আর মুখ খোলেন না।

আমি রাব্বী। আমি বিশ্বাস কবি শাস্ত্রের বচন। আরবদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা ভিন্ন এদের অন্য কোনো পন্থা নেই। কিন্তু আমার কথা শুনবে কে?"

বিদেশে

॥ ১ ॥

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে রাত দুপুরেই হোক আর দিন দুপুরেই হোক চট করে বলতে পারবেন না, আপনি যে হোটেলে শুয়ে আছেন সেটা কোন শহরে। টোকিও, ব্যাংকক, কলকাতা, কাবুল, রোম, কোপেনহ্যাগেন যে কোন শহর হতে পারে। আসবাবপত্র, জানালার পর্দা, টেবিল ল্যাম্প যাবতীয় বস্তু এমনই এক ছাঁচে ঢালা যে স্বয়ং শার্লক হোমসকে পর্যন্ত তাঁরা সব-কটা পুরু পুরু অতসী কাচ মায়. তার জোরদার মাইক্রোস্কোপটি বের করে, ওয়াটসনকে কার্পেটের উপর ঘোড়া বানিয়ে, নিজে তাঁর পিঠে দাঁড়িয়ে. ছাতের উপর তাঁর স্বহস্তে নির্মিত আ লা হোমস স্প্রে ছড়িয়ে—বাকিটা থাক, ব্যোমকেশ ফেলুদার কল্যাণে আজ 'ইস্কুল বয়'ও সেগুলো জানে—তবে বলবেন, "হয় মন্তে কার্লোর রেজিনা হোটেল নয় য়োহানেসবের্গের অল হোয়াইট হোটেল।" দূর-পাল্লার এ্যারোপ্লেনের বেলাও আজকের দিনে তাই। একবার তার গর্ভে ঢুকলে ঠাহর করতে পারবেন না, এটা সুইস এ্যার, লুফট হানজা, এ্যার ইন্ডিযা না কে এল এম। তিমির পেটে ঢুকে নোয়া কি আর আমেজ-আন্দেশা করতে পেরেছিলেন এটা কোন জাতের কোন মুল্লুকের তিমি?

ইন্ডিয়ান মানেই নেটিভ, মানে রদ্দী। আস্তে আস্তে এ ধারণা কমছে। নইলে জরমানি এ-দেশের সেলাইয়ের কল, রুশ কলকাতার জুতো কিনবে কেন?

অতএব এ্যার ইন্ডিয়া কোম্পানির এ্যারোপ্লেনকে একটা চানস দিতেই বা আপত্তিটা কি? অন্য কোম্পানিগুলো তো প্রায় সব চেনা হয়ে গিয়েছে। অবশ্য আবেকটা কথা আছে। ঐ কোম্পানির এক ভদ্রলোক বুদ্ধি খাটিযে, তদ্বির-তদারক করে আমার সুখ-সুবিধার যাবতীয় ব্যবস্থা না করে দিলে হযতো আমাব যাওয়াই হত না। তাঁর নাম বলবো না। উপরওলা খবর পেলে হয়তো কৈফিযৎ তলব করে বসবেন, কোনো একজন ভি আই পি-কে সাহায্য না করে একটা থাড্ডো কেলাস "নেটিভ" রাইটারেব পিছনে তিনি আপিসের মহামূল্যবান সময় নষ্ট কবলেন কেন? তবে কি না তাঁর এক ভি আই পি মিত্রও আমাকে প্রচুরতম সাহায্য করেছিলেন। তাঁকে না হয় শিখণ্ডীরূপে খাড়া করবেন।

ভেবেছিলুম চুঙ্গী ঘরের (কাস্টমসের) উৎপাত থেকে এই দুই দোস্তো কতখানি বাঁচাতে পারবেন। ইতিমধ্যে এক কাস্টমিযা আমার কাগজপত্র পড়ে আমার দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়ে শুধোলে, "আপনিই তো আপনার বইয়ে চুঙ্গীঘরের কর্মচারীদের এক হাত নিয়েছেন, না?"

খাইছে। এ যাত্রায় আমি হাজতে বাস না করে মানে মানে কলকাতা ফিবতে পারলে নিতান্তই পঞ্চপিতাব আশীর্বাদেই সম্ভবে। কে জানে, এই কাস্টমিয়াই হয়তো হালে কয়েকজন ডাঙর ডাঙর ভি আই পি-কাম-সরকাবী কর্মচারীকে বেআইনীতে মাল আনার জন্য নাজেহাল করেছিলেন।...একদিন জলের কল খুললে যে-রকম জল না বেরিযে শব্দ বেরতো সেই সময় আমার ব্লটিং পেপারের লাইনিংওলা গলা দিয়ে কথা না বেরিয়ে বেবল ঘস ঘস খস খস চোঁ ধরনের কি যেন একটা।

নাঃ। এ-লোকটির রসবোধ আছে কিংবা এঁর বাড়িতে মাসে একদিন জল আসে বলে

ঐ ভাষা বোঝাতে তিনি সুনীতি চাটুয্যে মশাইকে তাক লাগিয়ে উত্তম ধ্বনিতত্ত্ববাবদে কেতাব লিখতে পারবেন। বললেন, "নিশ্চিন্তমনে ঐ আরাম চেয়ারটায় বসুন। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।" তারপর ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে কী এক অশ্রুত টরে টক্কার সংকেত করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ডনচারেক বাঙালি কাস্টমিয়া আমাকে ঘিরে যা আদর আপ্যায়ন আরম্ভ করলেন যে, হৃদয়ঙ্গম করলুম, দেবীর প্রসাদে মূক যে-রকম বাচাল হয়, আমি কেন, হরবোলাও মূক হতে পারে।

প্রতিজ্ঞা করলুম, চুঙ্গীঘর লেখাটা আমি ব্যান করে দেব। কার যেন দুশ টাকা ফাইন হয়েছে।

কিন্তু এত সব বাখানিয়া বলছি কেন?

শুনুন। জীবনে ঐ একদিন উপলব্ধি করলুম, সাহিত্যিক—তা সে আমার আটপৌরে সাহিত্যিক হওয়ার মধ্যেও একটা মর্যাদা আছে।

এসব যে বাখানিয়া বলছি তার আরো একটা কারণ আছে।

আমার নিজের বিশ্বাস, প্লেনের পেটের ভিতরকার তুলনায় এ্যারপোর্টে আজব আজব তাজ্জব চিড়িয়া দেখতে পাওয়া যায় ঢের বেশী। পাসপর্ট, কাস্টমস, হেলথ অফিসে, রেস্তরাঁয় তাদের আচরণ কেউ বা সংকোচের বিহ্বলতায় অতীব ম্রিয়মাণ, কেউ বা গড্ ড্যাম্ ডোন্টো কেয়ার ভাব—ওদিকে একটি বিগতযৌবনা মার্কিন মহিলা, এ্যারোপ্লেনে অর্ধনিদ্রা যামিনী কাটিয়ে আলুথালু-বেশ, হৃত-পাউডার-রুজ,—এঞ্জিনের পিস্টন বেগে পলস্তরা পলস্তরা ক্রীম-পাউডার-রুজ মাখছেন, এদিকে তাঁর কর্তা প্লেনে সস্তায় কেনা স্কচ স্যাঁট স্যাঁট করছেন; আর ঐ সুদূরতম প্রান্তে-দেখুন,—দেখুন বললুম বটে, কিন্তু দেখার উপায় নেই—কালো বোরখাপরা জড়োসড়ো গণ্ডা দুই মক্কাতীর্থে হজ যাত্রিনীর গোঠ। এঁরা নিশ্চয়ই চলতি ফ্যাশানের ধার ধারেন না। বেশীর ভাগ আঁকড়ে ধরে আছেন পুঁটুলি—হ্যাঁ বেনের পুঁটুলি। গোরুর গাড়িতে গয়নার নৌকোয় ওঠার সময় যে-পুঁটুলি সঙ্গে নেন। ওঁরা ভাড়া বাবদ কয়েক হাজার টাকা দিয়েছেন নিশ্চয়ই! অনায়াসে হাল্কা স্যুটকেস কিনতে পারতেন। দু-একজনের ছিলও বটে। কিন্তু ওঁদের কাছে গোরুর গাড়ি যা, হাওয়াই জাহাজও তা—এঁদের মক্কা পৌছলেই হল। হায়, এঁরা জানেন না, প্লেনে ভ্রমণ—তা সে যে-কোনো কোম্‌পানিই হোক না কেন—গরুর গাড়িতে মুসাফিরী করার তুলনায় ঢের বেশী তকলীফ দেয়। এমন কি প্লেনে এঁদের পক্ষে হায়া-শরম বাঁচিয়ে চলাও কঠিন। কলকাতার বস্তিতে কি হয় জানিনে, কিন্তু এঁদের যখন প্লেনে করে যাবার রেস্ত আছে তখন এঁরা সেখানকার নন। আর গ্রামাঞ্চলে কেউ কখনো প্রাতঃকৃত্যের জন্য কিউ দেয় না। অথচ প্লেনে প্রাতঃকৃত্যের জন্য এঁদের কিউয়ে দাঁড়াতে হবে—মেয়েমদ্দে লাইন বেঁধে। সে-কথা পরে হবে। তবে হজ যাত্রীদের জন্য স্পেশাল প্লেনে যদি স্পেশাল ব্যবস্থা থাকে তবে তার তথ্য জানিনে; কোনো কোম্পানি অপরাধ নেবেন না।

"শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি প্লেন দিল ছাড়ি
দাঁড়ায়ে রহিল পোর্টে সব বেরাদরি শুষ্ক চোখে।"

পূর্বেই নিবেদন করেছি, প্লেনের ভিতরে দেখবার কিচ্ছুটি নেই। থার্ডক্লাস ট্রেনে যা দেখতে পাওয়া যায় তার চেয়েও কম। আর সর্বক্ষণ আপনার চোখের তিন ফুট সামনে, সমুখের দুটো সীটে দুটো লোকের ঘাড়। তারো সামনে সারি সারি ঘাড়। দোস্ত আমার এ-প্লেনের 'মালিক'। অতএব আমার জন্য উইন্ডো সীটের ব্যবস্থা করেছেন—অর্থাৎ

বাঁদিকে তাকালে বাইরের আকাশ দেখা যায়। বলতে গেলে পৃথিবীর কিছুই না। একে রাত্রি, তদুপরি আল্লায় মালুম, বিশ হাজার না পঁচিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে প্লেনে যাচ্ছেন, কিছু দেখতে চাইলে ত্রিনয়নের প্রয়োজন। উপরেরটা হয়তো কিছু বা দেখতে পায়। তবে ভারতীয় প্লেনে একটা বড় আরাম আছে। যদিও অধিকাংশ যাত্রী ভারতীয় নয়। বিদেশী এবং প্রধানত ইয়োরোপীয়। তারা জানে, ইন্ডিয়ানরা বেলেল্লাপনা পছন্দ করে না। কাজেই অতিরিক্ত কলরোল, এবং মাঝে মধ্যে তদতিরিক্ত কলহরোল থেকে নিশ্চিন্ত মনে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

এ-বাবদে এখানেই থাক। কারণ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত তারাশঙ্কর, সম্মানীয় শ্রীযুত বুদ্ধদেব, ভদ্র প্রবোধ ও অন্যান্য অনেকেই প্লেনের ভিতরকার হাল সবিস্তর লিখেছেন।

জাগরণ, তন্দ্রা, ঘুম সবই ভালো। কিন্তু তিনটেতে যখন গুবলেট পাকিয়ে যায় তখনই চিত্তির। এ-যেন জ্বরের ঘোরে দুদিন না তিনদিন কেটে গেল বোঝবার কোনো উপায় নেই।

চিৎকার চেঁচামেচি। রোম! রোম!! রোম!!!

ক্যাথলিকদের তো কথাই নেই। প্রটেসটানদের ঈষৎ সংযত কৌতূহল। বিশেষ করে মার্কিনদের। দেশে ফিরে বড়ফাট্টাই করতে হবে, "হ্যাঁ, তেমন কিছু না, তবে কি না, হ্যাঁ, দেয়ালের আর গম্বুজের ছবিগুলো ভালো। কী যেন নাম (ভামিনীর দিকে তাকিয়ে) মাইকেল-রাফাএল, না, হল না। লেওনার্দো দা বত্তিচেল্লি। ও! সেটা বুঝি মোনালিসার লীনিং টাওয়ার।"

বললে পেত্যয় যাবেন না, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তাজমহলের সামনে বসে একই বেঞ্চে-বসা এক মার্কিনকে তার মিসিসের উদ্দেশ্যে শুধোতে শুনেছি, "কিন্তু আশ্চর্য, এই ইন্ডিযানরা এ-সব তৈরী করলো কি করে—ফরেন সাহায্য বিনা, অর্থাৎ, আমাদের সাহায্য না নিয়ে।"

রোমে নামতেই হল। সেখানে আমার এক বন্ধু বাস করেন। কিন্তু তার কোনো নাম্বার জানা ছিল না বলে যোগসূত্র স্থাপনা করা গেল না। একখানা পত্রাঘাত, তদ্দরুণ স্ট্যাম্প যোগাড় করতে না করতেই এ্যার কোম্পানির লোক রাখাল ছেলে যে-রকম গোরু খেদিয়ে খেদিয়ে জড়ো করে গোয়ালে তোলে সেই কায়দায় প্যাসেঞ্জারদের প্লেনের গর্ভে ঢোকালে। প্যাসেঞ্জারদের গরুর সঙ্গে তুলনা করাটা কিছুমাত্র বেয়াদবী নয়। মোটা, পালটা ঠিক বয়স্ক গরুরই মত লাউঞ্জের মধ্যিখানে একজোট হয়ে বসেছে বটে কিন্তু বাছুরের পাল, অর্থাৎ চ্যাংড়া চিংড়িরা যে কে কোনদিকে ছিটকে পড়েছে তার জন্য হুলিয়া শমন বের করেও রত্তিভর ফায়দা নেই। কেউ গেছেন কিওরিওর দোকানে। কাইরোর মত এখানেও খাঁটি ভেজাল দুই বস্তুই সুলভ—এন্তের পড়ে আছে—কিন্তু দুর্লভ, কলকাতার মাছের বাজারকেও হার মানায় গাহকের কান কাটতে। কেউ বা গেছেন বিনমাশূলের (ট্যাক্স ফ্রী) দোকানে। হয়তো ইতালির নামকরা একখানা আস্ত ফিয়াৎ (মোটামুটি ফ্রা বিকেশন ইতালিয়ান Automobile Turino- এই আদ্যাক্ষর নিয়ে Fiat। টুরিনো সেই শহরের নাম যেখানে এ-গাড়ি তৈরী হয়) গাড়ি কিনে নিয়ে আসেন। একটি হাফাহাফি, আধা-আধি, অর্থাৎ পাতে দেওয়া চলে মার্কিন চিংড়ি ঐ হোথা বহু দূরে বার-এ বসে চুটিয়ে প্রেম করছেন একটি খাবসুরৎ ইতালিয়ন চ্যাংড়ার সঙ্গে। খাবসুরৎ বলতেই হবে—এই রোম শহরে ছবি এঁকে, মূর্তি গড়ে যিনি নাম করেছেন সেই মাইকেল

এঞ্জেলো যেন এই সদ্য একে গড়ে "চরে খাওগে, বাছা" বলে ছেড়ে দিয়েছেন। আর ইতালিয়ান যুবক-যুবতীর প্রতি মার্কিনিংরেজের যে-পীরিতি সেটা প্রায় বেহায়ামীর শামিল। চলে খাবে না কেন? সর্বশেষে বলতে হয়, ইতালির কিয়ান্তি মদ্য দুনিয়ার কুল্লে সুধার সঙ্গে পাল্লা দেয়। সেটাও পাওয়া যাচ্ছে ফ্রী, গ্রেটিস অ্যান্ড ফর নাথিং। মুফৎমে।

প্লেনে ঢুকে দেখি, সত্যি সেটা গোয়ালঘর। মশা খেদাবার তরে গাঁয়ের চাচার বাড়িতে যে-রকম স্যাঁৎসেঁতে খড়ে আগুন ধরানো হত এখানেও সেই প্রতিষ্ঠান। তবে হ্যাঁ, এটা বিজ্ঞানের যুগ। নানা প্রকারের ডিসিনফেকটেনট, ডিঅডরেনট স্প্রে করা হয়েছে প্রেমসে। সায়েবদের যা বী ও—বডি ওডার—গায়ের বোটকা দুর্গন্ধ।

সকাল বেলায় আলো দিব্য ফুটে উঠছে। ইতিমধ্যে প্লেনে পাক্কা সাড়ে পনেরো ঘণ্টা কেটেছে। দমদমা ছেড়েছি রাত ন'টায়; এখন সকাল আটটা। হওয়ার কথা তো এগারো ঘণ্টা! কি করে হল? বাড়ির কাচ্চাবাচ্চাদের শুধোন।

॥ ২ ॥

প্লেন যখন ছাড়ল তখন অপ্রশস্ত দিব্যালোক।

দিবালোকের সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক আছে। যে-দেশে যাচ্ছি, সেই জর্মানির বাঘা দার্শনিক কান্ট নাকি বলেছেন কাল এবং স্থান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না। (টাইম অ্যান্ড স্পেস আর আ প্রিয়রি কনসেপশন)।

কাজের বেলা কিন্তু দেখলুম, তত্ত্বটা আদৌ সরল সহজ নয়।

বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, যেন দেশের সকালবেলার সাতটা আটটা। কিন্তু হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে নজব পড়াতে দেখি, সেটি দেখাচ্ছে সাড়ে বাবোটা। কি কবে হয়? আমার ঘড়িটি তো পয়লা নম্বরী এবং অটোমেটিক। অবশ্য এ-কথা আমার অজানা নয়, অটোমেটিক বেশী সময কোন প্রকারের ঝাঁকুনি না খেলে মাঝে মধ্যে থেমে গিয়ে সময় চুরি করে। কিন্তু কাল রাতভর যা এ-পাশ ও-পাশ করেছি তার ফলে ওর তো দম খাওয়া হয়ে গেছে নিদেন দুদিনেব তরে। আমাব পাশের সীটে একটি চার-পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে। তার পরের সীটে এক বর্ষীয়সী—বাচ্চাটার ঠাকুরমা দিদিমার বয়সী। তাঁর দিকে ঝুঁকে শুধালুম, "মাদাম, বেজেছে কটা, প্লীজ?" মাদামেব এলোমেলো চুল, সকালবেলার "ওয়াশ", মুখের চুনকাম, ঠোঁটের উপর ঊষার লালবাতি জ্বালান হয়নি। শুকনো মুখে যতখানি পারেন ম্লান হাসি হেসে বললেন, "পার্‌দোঁ মসিয়ো, জ্‌ ন্‌ পার্ল পা লেদুঁস্থানী।" অর্থাৎ তিনি "হিন্দুস্থানী" বলতে পারেন না। ইয়াল্লা। সরলা ফরাসিনী ভেবেছেন, প্লেনটা যখন হিন্দুস্থানী, আমি হিন্দুস্থানে প্লেনে উঠেছি, চেহারাও তদ্বৎ। অতএব আমি নিশ্চয়ই হিন্দুস্থানীতে কথা বলেছি। আমি অবশ্য প্রশ্নটি শুধিয়ে ছিলুম আমার সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত অতিশয় নিজস্ব "বাঙাল" ইংরিজিতে। ওদিকে এ-তত্ত্বও আমার সবিশেষ বিদিত যে ফরাসীরা নটোরিযাস, একভাষী—ফরাসী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা শিখতে চায় না। তাদের উহ্য বক্তব্য তাবল্লোক যখন হদ্দমুদ্দ হয়ে ফ্রান্সে আসছে, বিশেষ করে কড়ির দেমাক, বন্দুক-কামানের দেমাক, চন্দ্রজয়ের দেমাকে ফাটো ফাটো মার্কিন জাত এস্তেক—ফরাসীর মত লাজুক জবান শেখবার ব্যর্থ চেষ্টায় হরহামেশা খাচ্ছে তখন ওঙ্গের আপন দেশে আপোসে তারা যে কিচির-মিচির করে সেগুলো শেখার জন্য খামোকা উত্তম

ফরাসী ওয়াইনে সুনির্মিত নেশাটি চটাবে কেন? তবু মহিলাটির উক্তি শুনে আমারো ঈষৎ ন্যাজ মোটা হল। দূর-দুনিয়ার ভারতীয় প্লেন সার্ভিস না থাকলে মহিলাটি কি কল্পনা করতে পারতেন যে হিন্দুস্থানীও আন্তর্জাতিক ভাষা হতে চলেছে—মুসাফির যে-রকম অ্যার ফ্রান্সে ফ়রাসী, কে এল এম-এ ডাচ, বি ও এ সি-তে ইংরিজির জন্য তৈরী থাকে।

তখন পুনরপি আপন ঔন অরিজিনাল ফরাসীতে প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করলুম। "আ—আ—! বুঝেছি, বুঝেছি। কিন্তু এই সময় সমস্যাটি ভারী "কঁপ্লিকে" অর্থাৎ কম্‌প্লিকেটেড, জটিল। আমি ওটা নিয়ে মাথা ঘামাইনে।"

"তবু?"

"সব দেশ তো আর এক টাইম মেনে চলে না। "ভোয়ালা"—নয় কি? প্যারিসে যখন বেলা বারোটা তখন রেঙ্গুনে—আমি সেখানে বাস করি—বিকেল পাঁচটা ছটা। কিন্তু আপনাকে ফের বলছি, ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি টাইম কত জেনে যাই আমার অতিশয় বিশ্বাসী মিনিস্‌ৎর্ দ্য লেতেঁরিয়রকে (হোম সেক্রেটারি, অর্থাৎ ভিতরকার "ইন্টেরিয়রের" "এতেরিয়র"-কে) শুধিয়ে। সোজা কথায় পেটটিকে। ওখানে লা-মার্সেইয়েজ সঙ্গীত (বাংলায় পেটে যখন হুলুধ্বনি) বেজে ওঠে তখন সেটা লাঞ্চের বা ডিনারের সময়। উপস্থিত আমার "এঁতেরিয়রেতে" সে-সঙ্গীত ক্রেসেন্ডতে (তার সপ্তকের পঞ্চমে)। তাই এখন রেঙ্গুনে নিশ্চয়ই দেড়টা দুটো।"

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, "তা এখখুনি বোধ হয় লাঞ্চ দেবে।"

মাদাম যদিও বলেছেন তিনি টাইম নিয়ে মাথা ঘামান না কিন্তু দেখলুম, তিনি প্র্যাকটিক্যাল দিকটা খাসা বোঝেন। আপত্তি জানিয়ে বললেন, "রেঙ্গুনে যখন লাঞ্চ তখন এই মিত্রোপাতে (মিৎ=মিড্‌লা,—রোপ; ইযোরোপো-ব শেষাংশ অর্থাৎ মধ্য-ইযোবেপে) ব্রেকফাস্ট। জাপানে যারা এ-প্লেনে উঠেছে, তাদের তো এখন ডিনারের সময় হয়-হয়। সুতরাং কোন্ যাত্রী কোথায় উঠেছে, কার পেট কখন ব্রেকফাস্ট/লাঞ্চ/ডিনারের জন্য কান্নাকাটি শুরু করে সে-হিসেবে তো আর কোম্পানি ঘড়ি ঘড়ি কাউকে লাঞ্চ কাউকে সাপার, কাউকে স্যানউইচসহ বিকেলের চা দিতে পারে না। তবে কি না এরা ব্রেকফাস্টে যে পরিমাণ খেতে দেয় সেটা কলেবরে প্রায় লাঞ্চের সমান।...তাই বলছি, এসব টাইম-ফাইম নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। ট্রেনেও যদি ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িটার দিকে তাকান তবে সে জর্নি দীর্ঘতর মনে হয় না? আমি তো প্যারিসে পৌছতে পারলে বাঁচি। 'বঁদিয়ো' (দয়ালু ঈশ্বর) ঘণ্টা দেড়েকের ভিতর পৌছিয়ে দেবেন। নাতনীটা নেতিয়ে গিযেছে।"

মহিলাটি যে-ভাবে সবিস্তার গুছিয়ে বললেন সেটা ধোপে টেঁকে কিনা বল্‌তে পারবো না, কারণ আমি যত বার এসেছি গিয়েছি, আহারাদি পেয়েছি তখন ঘড়ি মিলিয়ে দেখিনি কোনটা লাঞ্চ কোনটা কি? এবং আজকের দিনে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন টাইমের সালঙ্কার সটীক ফিরিস্তি দেবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনে। রেডিয়ো, ট্রানজিস্টারের কল্যাণে এখন বাড়ির খুকুমণি পর্যন্ত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেয় বুঝিয়ে বলে গ্রীনিচ মীন টাইম ব্রিটিশ সামার টাইম, সেন্ট্রাল ইউরোপীয়ান টাইম কোন্‌টা কি? তবু যে এতখানি লিখলুম, তার কারণ ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন টাইম যে কি ভাবে কসরৎ বিন মেহন্নৎ আয়ত্ত করতে হয় সেটা ফরাসী মহিলাটি আমাকে শিখিয়ে দিলেন অতি প্রাকটিকাল পদ্ধতিতে। সেটা কি? রাজা সলমন যেটা গুরুগম্ভীর ভাবে, ধর্মনীতি হিসেবে আপ্তবাক্য রূপে হাজার তিনেক বছর পূর্বে প্রকাশ করে গিয়েছেন 'নো দাইসেলফ্' 'নিজেকে চেনো

(চিনতে শেখো)'। শ বছর আগে লালন ফকীরও বলেছেন 'আপন চিনলে খুদা চেনা যায়।' ফরাসী মহিলাটিও সেই তত্ত্বটিই, অতিশয় সরল ভাষায় প্রকাশ করলেন, আপন পেটটিকে বিশ্বাস করো। তার থেকেই লোকাল টাইম, স্ট্যান্ডার্ড টাইম জানা হয়ে যাবে। ঐটেই মোক্ষমতম ক্রনোমিটার। বরঞ্চ ক্রনোমিটার মাঝে মধ্যে বিগড়োয়। আলবৎ, পেটও বিগড়োয়। কিন্তু বিগড়ানো অবস্থাতেও সে লাঞ্চ ডিনারের সময়টায় নিগেটিভ খবর জানিয়ে দেয় তার ক্ষিদে নেই।

ইতিমধ্যে ব্রেকফাস্ট না কি যেন এসে গেছে। মাদাম বলেছিলেন, "সেটা কলেবর"। আমি মনে মনে বললুম, "বপু।" এ্যাব্বড়া বড়া ভাজা সসিজ, পর্বত প্রমাণ ম্যাশট পটাটো, টোসট-মাখন, মার্মলেড টমাটো ইত্যাদি কাঁচা জিনিস, আবো যেন কি কি। তখন দেখি, বেশ খাচ্ছি। অতএব পেটের ক্রনোমিটার বলছে, এটা লাঞ্চ, অর্থাৎ বেলা একটা দুটো। ঘড়ি মিথ্যেবাদী বলছে ন'টা।

॥৩॥

অজগাঁইয়া যেরকম ওয়াকিফ হবার চেষ্টা না দিয়েই ধরে নেয় দিল্লী মেলও তার ধেধ্ধেড়ে গোবিন্দপুর ফ্ল্যাগ ইসটিশানে দাঁড়াবে এবং চেপে বসে নিশ্চিন্দি মনে তামুক টানে, আমার বেলাও হয়েছিল তাই। আমার অপরাধ আরো বেশী। আমি জেনেশুনেই অপকর্মটি করেছিলুম। আমি ভালো করেই জানতুম যে প্লেনে যাচ্ছি সেটা যদিও জর্মনির উপর দিয়ে উড়ে যাবে, তবু সে-দেশের কোনো জায়গায় দানাপানির জন্যও নামবে না। অবশ্য এ্যার-ইন্ডিয়ার মুরুব্বী আমার. এক গাল হেসে আমায় বলেছিলেন, "এ প্লেনটা কিন্তু প্যারিসে নামে। আপনি সেখানে চলে যান। দু-চারদিন ফুর্তিফার্তি করে চলে যাবেন জর্মনি। খর্চা একই। আর প্যারিসে—হেঁহেঁহেঁহেঁ—" সঙ্গে যে মিত্রটি ছিলেন তিনিও মৃদু হেসে সায় দিলেন। দুজনাবই বয়স এই তিরিশ পঁয়ত্রিশ। মনে মনে বললুম, এখন কলকাতা দিল্লীর রাস্তাঘাটেই যা দেখতে পাওয়া যায় প্যারিসেব নাইট ক্লাব-কাবারে তার চেয়ে বেশী আর কি ভেল্কিবাজি দেখাবে? তদুপরি বানপ্রস্থে যাবাব বয়সও আমার বহুকাল হল তামাদি হয়ে গিয়েছে। এ বয়সে "নির্বাণদীপে কিমু তৈলদানং?" তাই আখেরে স্থির হল আমি এ্যার-ইন্ডিয়া প্লেন থেকে সুইটজারলেন্ডেব জুরিচে (স্থানীয় ভাষায় ৎস্যুরষি) নামবো। হেথায় চেঞ্জ করে ভিন্ন প্লেনে মৌকামে পৌছব—অর্থাৎ জর্মনির কলোন শহরে। তাই সই।

ফরাসিনীকে বিস্তর বঁ ভোয়াইয়াজ (গুড জর্নি, গুড ফ্লাইট) বলে জুরিচেব এ্যাব পোর্টে নেমে পাসপর্ট দেখালুম। তারপব গেলুম খবর নিতে কলোনে যাবার প্লেন কখন পাবো। উত্তর শুনে আমি স্তব্ধ, জড়। দেশে বলে,

"অল্প শোকে কাতর।
অধিক শোকে পাথর।।"

তখন বেজেছে সকাল নটা। রামপণ্টক বলে কি না, কলোন যাবার প্লেন দ্বিপ্রহরে। বিগলিতার্থ আমাকে নিরেট তিনটি ঘণ্টা এখানে বসে বসে আঙ্গুল চুষতে হবে।

শুনেছি, যে-রুগী দশ বৎসর ধরে পক্ষাঘাতে অসাড় অবশ সে নাকি মৃত্যুর সময় অকস্মাৎ বিকট মুখভঙ্গি করে, তার সর্বাঙ্গ খিঁচোতে থাকে, হঠাৎ দশ বৎসরের টান-টান-

হাঁটু যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে খাড়া হয়ে থুতনির দিকে গোত্তা মারতে চায় এবং মুখ দিয়ে অনর্গল কথা বেরতে থাকে।

আমার হল তাই। আমি হয়ে গিয়েছিলুম অচল অসাড়। "স্তম্ভিত" বললুম না, কারণ আজকের দিনের পয়লা নম্বরী এ্যারপোর্টে স্তম্ভ আদৌ থাকে না। যাই হোক যাই থাক, আমার মুখ দিয়ে বেরুতে লাগল আতশবাজির ঝটকা, তুবড়ির পর তুবড়ির হিংস্র হিস্ হিস্ আর পটকা বোমার দুদ্দাড় বোম্-বাম। আর হবেই না কেন? যে জুরিচের কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কর্ণপটহবিদারক তথা নয়নান্ধকারক আতশবাজি ছাড়ছি সেই আতসবাজিকেই আপন জর্মন ভাষায় বলে "বেঙ্গালিশে বেলোয়েষ্টুঙ" অর্থাৎ "বেঙ্গল রোনানী"; এবং এ-দেশের ফরাসী অংশে বলে "ফ্যদ্য বাঙাল" অর্থাৎ "ফায়ার অব বেঙ্গল"।[১] তদুপরি বিশেষভাবে লক্ষণীয় ফরাসী ভাষায় বঙ্গদেশকে বাঙ্গাল রূপে উচ্চারণ করে। আমি বাঙাল বঙ্গসন্তান। আমি আমার "জন্মনি, জন্মনি" অধিকার অর্থাৎ বার্থরাইট ছাড়বো কেন? ফায়ার ওয়ার্কস চালাবার যদি কারো হক্ক থাকে তবে সে আমার। হুহুঙ্কার ছাড়লুম :

"কি বললে? ঝাড়া তিনটি ঘণ্টা আমাকে এই এ্যাবপর্টে বসে কলোনের প্লেনের জন্য তাজ্জিম মাজ্জিম করতে হবে? আমার দেশ যে ভারতবর্ষকে তোমরা অন্ডর ডিভালাপট কন্ট্রি—সাদামাটা ভাষায় অসভ্য দেশ—বলো সেখানেও তো তিন তিনটি ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় না, কনেকশনের জন্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি রেলগাড়ির কথাই বলছি। আমি যদি আজ ভারতের যে-কোনো ডাকগাড়িতে করে যে-কোনো জংশনে পৌঁছই তবে আধ ঘণ্টার ভিতর কনেকশন পেয়ে যাই। না পেলে—সেটাও সাতিশয় কালেকস্মিনে—খবরের কাগজে জোর চেল্লাচেল্লি করি (মনে মনে বললুম—অস্মদ্দেশীয় রেলের কর্তারা তার থোড়াই কেয়ার করেন!) অ্যারোপ্লেনেব তো কথাই নেই। সে তো আরো তড়িঘড়ি কনেকশন দেয়। আমাকে যত তাড়াহুড়ো করে মোকামে পৌঁছে দিতে পারে, ততই তার লাভ। অন্যত্র অন্য প্যাসেঞ্জাবেব সেবার্থে যেতে পাবলে তার আরো দুপয়সা হয়।...অ! তোমাদের বিস্তর ধনদৌলৎ হয়ে গিয়েছে বলে তোমরা আর পয়সা কামাতে চাও না? আর শোনো ব্রাদার, এ তো হল ট্রেন-প্লেনের কাহিনী, গোরুর গাড়ির নাম শুনেছ? বুলক কার্ট? সেই গোরুর গাড়িতে করে যদি আমি দশ-বিশ মাইল যাই তবে সেখানে পৌঁছেও সঙ্গে সঙ্গে কনেকশন পাই। বোলপুর থেকে ইলামবাজার গিয়ে নদীর ওপারে তদ্দণ্ডে অন্য গোরুর গাড়ির কনেকশন হামেহাল তৈরী। বস্তুত তখন ওপারের গাড়োয়ানরা গাহককে পাকড়াও কবার জন্য যা হৈ-হুল্লোড় লাগায় তাব সামনে আন্তর্জাতিক পাণ্ডা প্রতিষ্ঠানের জেরুজালেম-পাণ্ডারা পর্যন্ত নতমস্তক হন। এ-নিয়ে আমি অষ্টাদশ পর্ব

১। আমার এক সুপণ্ডিত মিত্র বহু গবেষণাব পর স্থির কবেছেন : এদেশে গুড় তৈরী হত বলে এর নাম গৌড় (এবং গুড় থেকে "রাম" মদ তৈরী হত বলে তার নাম গৌড়ী—মহাভারতেও এর উল্লেখ আছে—যেমন মধু থেকে মাধ্বী মদ)। এবং এই গুড় সর্বপ্রথম চীন দেশে রিফাইনড হয়েছিল বলে এব নাম চিনি (পরে মিশরে তৈরী চিনিব নাম হল মিসরি বা মিশ্রী)। তাঁর মতে বারুদ প্রথম আবিষ্কৃত হয বাঙলা দেশে—আতশবাজীর জন্য। চীনদেশে সেটা সর্বপ্রথম আগ্নেয়াস্ত্রে ব্যবহৃত হয় বলে চীনদেশকে বাকদের আবিষ্কাবক বলা হয়—এবং সেটা ভুল।

মহাভারত—থুড়ি, পাঁচখানা ইলিয়াড দশখানা ফাউস্‌ট্‌ লিখতে পারি। কিন্তু উপস্থিত সেটা স্থগিত থাক। আমার শেষ কথা এইবারে শুনে নাও। এই যে আমি কন্টিনেনটে এসেছি তার রিটার্ন টিকিটের জন্য কত ঝেড়েছি জানো? এক একটা টাকা যেন নাক ফুটো করে কুরে কুরে বেরিয়েছে—তোমরা যাকে বলো, পেইং থ্রু দি নোজ। রোক্কা ছ হাজার পাঁচশটি টাকা। তারপর ফরেন এক্সচেঞ্জ গয়রহ্‌ হিসেবে নিলে দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে সাত হাজারের মত। এ ভূখণ্ডে থাকবো মাত্র তিনটি মাস। এইবারে হিসেব করো তো সে বসে বুঝি তোমার পেটে কত এলেম, এই যে কনেকশনের জন্য আমার তিনটি ঘণ্টা বরবাদ করলে তার মূলটা কি? সে না হয় গেল! কিন্তু সে-সময়টা যে বন্ধুবান্ধবীর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করলে তার জন্য তোমার হৃদয়বনে কোনো সন্তাপনল প্রজ্বলিত হচ্ছে না? তারা—"

ইতিমধ্যে আমার চতুর্দিকে একটা মিনি মাক্সির মধ্যিখানের মিডি সাইজের ভিড় জমে গিয়েছে। ফ্রী এন্টারটেনমেন্ট। আমার সোক্রোতেসপারা কিংবা দ্রৌপদী যে-রকম রাজসভায় আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন সেই ধরনের যুক্তিজাল বিস্তার এদের হৃদয়বনে যেন মলয়বাতাসের হিল্লোল, দে দোল দোল খেলিয়ে গেল। এদের বেশীর ভাগই আমাব বেদনাটা সহানুভূতিসহ প্রকাশ করছে। "য়া য়া", "উই উই", "সি সি" যাবতীয় ভাষায় আমাকে মিডি-সমর্থন জানাচ্ছে। আমি ফের তেড়ে এগুতে যাচ্ছি এমন সময়—

এমন সময় সর্বনাশ! একটি কুড়ি একুশ বছরের কিশোরী, আমি যাকে কেছে মুছে ইস্ত্রি মেরে ভাঁজ করে পকেটে ঢোকাতে যাচ্ছি, কাউন্টারের পিছনের কুঠরি থেকে বেরিয়ে এসে তাকে বললে, "আপনার টেলিফোন।" তন্মুহূর্তেই সেই মহাপ্রভু তেলব্যাজ না করে, যেন সসেমিরে দে ছুট দে ছুট। লোকটা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের "আমারে ডাক দিলে কে ভিতর পানে" গানটি জানে।

কিশোরী একগাল হেসে আমাকে শুধোলে, "আপনার জন্য কি কবতে পারি স্যার?"

দুত্তোর ছাই। আধ-ফোঁটা এই চিংড়ির সঙ্গে লড়াই দেব আমি।

"নাথিং বাট্‌ ইয়োর লভ্‌।" বলে দুমদুম করে লাউঞ্জের সুদূরতম প্রান্তে আসন নিলুম।

॥ ৪ ॥

সোফাটা মোলায়েম। সামনে ছোট্ট একটি টেবিল।

বেজার মুখে বসে আছি। এমন সময় দেখি একজন বয়স্ক ভদ্রলোক দুহাতে দুটি ভর্তি ওয়াইনগ্লাস নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঠিক যতখানি নিচু হয়ে অপরিচিতজনকে বাও করাটা কেতাদুরস্ত তাই করে শুধোলেন, "ভু পেরমেতে, মসিয়ো"—অর্থাৎ "আপনার অনুমতি আছে, স্যার?" "নিশ্চয, নিশ্চয়।" যদিও সোফাটির যা সাইজ তাতে পাঁচজন কিংকং অনায়াসে বসতে পারে তবু ভদ্রতা দেখাবার জন্য ইঞ্চিটাক সরে বসলুম। ভদ্রলোক ফের কায়দামাফিক বললেন, "ন ভু দেরাঁজে পা, জ ভু প্রী।" এর বাংলা অনুবাদ ঠিক কি যে হবে, অতখানি ফরাসী জানিনে, বাঙলাও না। মোটামুটি "না, না, ব্যস্ত হবেন না। ঠিক আছে, ঠিক আছে।' উর্দুতে বরঞ্চ খানিকটে বলা যায়, "তকল্লুফ ন্‌ কীজীযে" ঐ ধরনের কিছু একটা। "তকল্লুফ" কথাটা "তকলীফ"

(বাঙলায় কিছুটা চালু) অর্থাৎ "কষ্ট"। মোদ্দা : "আপনাকে কোনো কষ্ট দিতে চাইনে।"
সেই দুটো গ্লাস টেবিলে রেখে একটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আরেকটা নিজে তুলে নিয়ে বললেন, "আপনার স্বাস্থ্যের মঙ্গলের জন্য।"

চেনাশোনা কিছুই নেই। খোদার খামোখা এ-লোকটা একটা ড্রিংক দিচ্ছে কেন? তবে কি লোকটা কনফিডেনস ট্রিকস্টার? আমাদের হাওড়া শ্যালদাতে যার অভাব নেই। ভাবসাব (কনফিডেনস) জমিয়ে বলবে, "দাদা, তা হলে আপনি টিকিট দুটো কিনে আনুন। এই নিন আমার লিলুয়ার পয়সা, আমি মালগুলো সামলাই।" ...টিকিট কেটে ফিরে এসে দেখলেন, ভোঁ ভোঁ। আপনার মালপত্র হাওয়া।

কিন্তু এ লোকটা আমার নেবে কি? সুকুমার রায় (?) একদা একটি ব্যঙ্গচিত্র আঁকেন। বিরাট ভুঁড়িওলা জমিদার টিঙ-টিঙে দারোয়ানকে শাসিয়ে শুধোচ্ছেন, "চোর ভাগা কি'ও?" দারওয়ান বললে, "মেরা এক হাতমে তলওয়ার দুসরেমে ঢাল। পকড়ে কৈসে?"—আমার এক হাতে তলওয়ার, অন্য হাতে ঢাল। ধরি কি করে?

আমার এক পাশে আমার মিত্রের দেওয়া এটাচি, অন্যদিকে এ্যার ইন্ডিয়ার দেওয়া ছোট্ট একটি বাক্‌সো। দুটোই তো বগলদাবা করে বসে আছি। লোকটাকে দেখে তো মনেও হচ্ছে না, ও স্বর্গত পি সি সরকার (এ স্থলে বলে রাখা ভালো সরকার কখনো এহেন অপকর্ম করতেন না) যে আমার দুটি বাক্স সরিয়ে ফেলবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, এ-রকম রুচিসম্মত পোশাক-আশাক আমি একমাত্র ডিউক অব উইনডসরকে (উচ্চারণ নাকি উইনজার) পরতে দেখেছি—জীবনে একবার। ডিউকের জীবনে একবার নয়, আমার জীবনে একবার। সে বেশের বর্ণনা অন্যত্র দেব।

একখানা কার্ড এগিয়ে দিলেন। তাঁর নাম আঁদ্রে দ্যুপোঁ। তারপর এক গাল হেসে শুধোলেন, "যদি অপরাধ না নেন তবে একটি প্রশ্ন শুধোই, আপনি কি কস্‌টিঙে বিশেষজ্ঞ?"

আমি থতমত খেয়ে শুধোলুম, "কস্‌টিঙ? সে আবার কি?"

ভদ্রলোক আরো থতমত খেয়ে কিন্তু চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "সে কি মশাই! এই মাত্র আপনার অনবদ্য লেকচারটি শুনলুম, আপনি ক'হাজার টাকা ঝেড়ে কলকাতা থেকে এ-দেশে আসার রিটরন টিকিট কেটেছেন, এবং কনেকশন না পেয়ে তিন ঘণ্টাতে আপনার কি পরিমাণ অর্থক্ষয় হল তার পুরো-পাক্কা, করেক্‌ট্ টু দি লাস্‌ট্ সাঁতিম, ব্যালানস শীট। একেই তো বলে কস্‌টিঙ। আমি ব্যবসাবাণিজ্য করি। ঐ নিয়ে নিত্যি নিত্যি আমার ভাবনাচিন্তার অন্ত নেই। কিন্তু সে-কথা থাক। আমি আপনার কাছে এসেছি একটি প্রস্তাব নিয়ে। আপনার যখন তিন ঘণ্টা বরবাদ যাচ্ছে তখন এক কাজ করুন না? মিনিট পনেরো পরে এখান থেকে একটা প্লেন যাচ্ছে জিনীভা : আমি সে প্লেনে যাচ্ছি। আপনি চলুন আমার সঙ্গে জিনীভায়। আমার সামান্য একটি বাড়ি আছে সেখানে। আপনার খুব একটা অসুবিধে হবে না। বেড-রুম, বাথ-রুম, ডাইনিং-রুম, স্টাডি সব নিজস্ব পাবেন। (আমি মনে মনে মনকে শুধালুম একেই কি বলে "সামান্য একটি বাড়ি?")। আমাদের সঙ্গে আহারাদি, দুদণ্ড রসালাপ করে জিরিয়ে জুরিয়ে নেবেন। তারপর আপনাকে আপনার মোকাম কলোনগামী প্লেনে তুলে দেব।" তারপর একটু ইতি-উতি করে বললেন, "কিছু মনে করবেন না। আমি এ-প্রস্তাবটা নিজের স্বার্থেই পাড়ছি। আমার একটি ছেলে আর দুটি মেয়ে। ষোল, চোদ্দ, দশ। আপনার সঙ্গে আলাপচারী করে তারা সত্যই উপকৃত হবে। এদেশে চট করে একজন ইন্ডিয়ান পাওয়া

যায় না। পেলেও তিনি ফরাসী জানেন না। আর আমার বীবী খাসা রাঁধতে পারেন—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "কিন্তু এই দশ মিনিটের ভিতর আপনি আমার জন্য জিনীভার টিকিট পাবেন কি করে?"

মসিয়ো দ্যুপোঁ মুচকি হেসে বললেন, "সেই ফরমুলা, 'ন ভু দেরাঁজে পা'—আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। এটা ওটা ম্যানেজ করার কিঞ্চিৎ এলেম আমার পেটে আছে; নইলে ব্যবসা করি কি করে! কাচ্চাবাচ্চারা বড় আনন্দ পাবে। প্লেনের ভাড়াটার কথা আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না—"

আমি ফের বাধা দিয়ে বললুম, "আপনি ও বাবদে চিন্তা করবেন না। এ্যার-ইন্ডিয়ার আমার টিকিটটি অমনিবাস, অর্থাৎ যেখানে খুশী সেখানেই যেতে পারি; তার জন্য আমাকে ফালতো কুড়ি ঢালতে হবে না (পাঠক, এ ধরনের মোটর অমনিবাসকে কবিগুরু নাম দিয়েছেন বিশ্বম্বহ। এবং তদীয় অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ মোটর গাড়ি, অটমবিলকে, যেটা আপন শক্তিতে চলে, তার নাম দিয়েছিলেন স্বতশ্চলশকট। অতএব এ স্থলে আমার যানবাহন প্লেনের টিকিটকে "স্বতশ্চল বিশ্বম্বহ মূল্য পত্রিকা" অনায়াসে বলা যেতে পারে)।"

একটু থেমে বললুম, "আমি এখখুনি আসছি।" অর্থাৎ সে-স্থলে যাচ্ছি, যেখানে রাজাধিরাজও ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারেন না অর্থাৎ শৌচাগার।

সেদিকে যাইনি। যাচ্ছিলুম অন্য পথে। এ্যাটাচি বাক্‌সো সোফাতেই রেখে এসেছি। এ রকম সহৃদয় সজ্জনকে বিশ্বাস করে আমি বরঞ্চ ও দুটো হারাবো, অবিশ্বাস করতে ঘেন্না ধরে। গেলুম 'বার'-এ। সেখানে মসিয়ো যে ওয়াইন এনেছিলেন তারই দুগ্লাস কিনে ফিরে এলুম সোফায়। একটা গ্লাস তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য কামনা করে বললুম, "আপনার আন্তরিক আমন্ত্রণের জন্য আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমার একটা বড়ই অসুবিধে আছে। কলোন এ্যারপর্টে আমার বন্ধুবান্ধবরা অপেক্ষা করছে। তারা খবর নিয়ে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছে, আমি তিন ঘণ্টা পরে কনেকশন পাবো। আমি আপনার সঙ্গে জিনীভা গেলে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। তারা বড় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে।"

আর মনে মনে ভাবছি, ইহ সংসারে, এমন কি ইয়োরোপেও সেই বাগদাদের আবু হোসেনও আছে যারা রাস্তায় অতিথির সন্ধানে দাঁড়িয়ে থাকে। সে একা একা খেতে পারে না।

মসিয়ো বড্ডই দুঃখিত হয়ে প্রথম বললেন, "কিন্তু আপনি আবার আমার জন্য ড্রিংক আনলেন কেন? এ কি দেনা-পাওনা!"

আমি মাথা নিচু করলুম। দ্যুপোঁ বললেন, "তা হলে দেশে ফিরে যাবার সময়ে আমার ওখানে আসবেন?"

তাঁর একটি পকেট-বই বের করে বললেন, "কিছু একটা লিখে দিন। ছেলেমেয়েরা খুশী হবে।" আমি তৎক্ষণাৎ লিখলুম :

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।"

হায়! ফেরার পথেও দ্যুপোঁর বাড়িতে যেতে পারিনি।

জুরিকের মত বিরাট এ্যারপর্টে কী করে মানুষ একে অন্যকে খুঁজে পায় সেটা বোঝবার চেষ্টা করে ফেল মেরেছি। তাহলে নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে এখানকার কর্মচারীদের পেটেপিঠে এলেম আছে। তাদেরই একজন আমার সামনে এসে বললে, "আপনার জন্য একটা মেসেজ আছে, স্যার।" আমি সত্যই বিস্মিত হলুম। আমাকে এই সাহারা ভূমিতে চেনে কে? বললুম, "ভুল করেননি তো"; "এজ্ঞে না। আমি জানি—" সঙ্গে সঙ্গে ছোকরা আমার পুরো নামটি বলে দিল। যদিও সে এদেশেরই লোক তবু আমার মনে হল সে "দেশ" পত্রিকার "পঞ্চতন্ত্র" নিত্য সপ্তাহে পড়ে এবং তারই মারফত আমার তোলা নামটি পুরো পাক্কা রপতো করে নিয়েছে। হয়তো ডাকনামটাও জানে। হয়তো "ভোম্বল" "ক্যাবলা" জাতীয় আমার সেই বিদঘুটে ডাকনামটা সে পাঞ্চজন্যে শঙ্খধ্বনিতে প্রকাশ করতে চায় না। কিন্তু এসব ভাববার চেয়ে ঢের বেশী জানতে চাই, কে আমাকে স্মরণ করলেন।

অ। ফ্রলাইন ফ্রিডি বাওমান্। কিন্তু ইনি জানলেন কি প্রকারে যে আমি আজ সকালে এখানে পৌঁচচ্ছি। তাঁর মেসেজ খুলে জিনিসটে পরিষ্কার হল। কলকাতা ছাড়ার পূর্বে এ্যার ইন্ডিয়ার ইয়াররা শুধিয়েছিলেন, জুরিকে আমার কোন পরিচিতজন আছেন কিনা, কেননা ওখানে আমাকে কনেকশনের জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা কবতে হবে। খবর পাঠালে ওঁরা হয়তো এ্যারপর্টে এসে আমাকে সঙ্গসুখ দেবেন। আমি উত্তরে বলেছিলুম, জুরিকে নেই, তবে সেখান থেকে ত্রিশ চল্লিশ মাইল দূরে লুৎসের্ন শহরে একটি পরিচিতা মহিলা আছেন এবং তাঁর নাম ঠিকানা দিয়েছিলুম। এ কথাটা ভুলে গিয়েছিলুম বেবাক। "দুয়াবে প্রস্তুত গাড়ি" "গুড়ের পাটালি; কিছু ঝুনো নারিকেল; দুই ভাণ্ড সবিষাব তেল; আমসত্ত্ব আমচুর—" এর মাঝখানে কবিগুরু যদি তাঁর প্রিয়া কন্যাকে ভুলে যান তবে সাতান্নটা হাবিজাবির মাঝখানে আমি যে এটা মনে রাখিনি তার জন্য সদয় পাঠক রাগত হবেন না।

কিন্তু এই সুবাদে সেই খাঁটি জাত-সুইস মহিলাটির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দিতে চাই। ফ্রিডি বাওমান। ১৯৪২/৪৩-এ ইনি সেই মহারাজা সয়াজী রাওয়ের বরোদা প্রাসাদে প্রবেশ করেন। আজকের দিনে ক্রিকেট কিংবা/এবং পলিটিকসের সঙ্গে যাঁদেরই সামান্যতম পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন বরোদার শ্রীযুত ফতেহ সিংরাও গায়কোয়াড়কে। এই ফ্রিডিব হাতেই তিনি পৃথিবীতে পদার্পণ করেন। অথবা মস্তকাবতীর্ণ করেন। কিন্তু তার উপর আমি জোর দিচ্ছিনে। রাজা মহারাজা ভিখিরি আতুর পৃথিবীতে সবাই নামেন একই পদ্ধতিতে।

আসল কথা, ফতেহ সিং রাও মানুষ হন ফ্রিডির হাতে। তিনি অসাধারণ শিক্ষিতা রমণী—সেই ছাব্বিশ বছর বয়সেই। জর্মন, ফরাসী, স্প্যানিশ, ইংরিজি সব-কটাই বড় সুন্দর জানতেন। এ-দেশে এসেছিলেন বেকারীর জন্য নয়। রোমান্টিক হৃদয়; ইন্ডিয়াটা দেখতে চেয়েছিলেন। গ্যোটে তাঁর প্রিয় কবি। গ্যোটের ভারতপূজা তাঁর মনে গভীর দাগ কেটেছিল। ওদিকে তাঁর উত্তম উত্তম পুস্তক পড়ার অভ্যেস চিরকালের। রাজপ্রাসাদের কাজকর্মও গুরুভার নয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যে কি কবে তাঁর প্রিয়সাধক

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বাণীর মর্মস্থলে পৌঁছে গেলেন সেটা বুঝলুম যেদিন তিনি আমাকে বললেন যে ছেলেবেলা থেকেই তিনি সেন্ট ফ্রানসিস আসিসির ভক্ত। এবং সকলেই জানেন, এই সন্তটির সঙ্গেই ভারতীয় শ্রমণ সন্ন্যাসী, সাধুসন্তের সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্য। একদিকে যেমন দরিদ্রনারায়ণের সেবা, অন্যদিকে ঠিক তেমনি পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন হয়ে প্রভু খৃষ্টের সঙ্গে একাত্মবোধ করাতে তিনি এ-দেশের মরমীয়া সাধক, ইরান-আরব-ভারতের সুফীদের সঙ্গে এমনই হরিহরাত্মা যে অনেক সময় বোঝা কঠিন কার জীবনবৃত্তান্ত পড়ছি। খৃষ্টানের, ভক্তের না সুফীর?

কিন্তু আমার কী প্রগল্‌ভতা যে আমি তাঁর জীবনীর সংক্ষিপ্ততম ইতিহাসও লিখতে পারি। "দেশ" পত্রিকার প্রিয়তম লেখক শ্রীযুক্ত ফাদার দ্যতিয়েন যদি বাঙলায় তাঁর জীবনী লেখেন তবে গৌড়জন তাহা আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

কুমারী ফ্রিডির কথা পুনরায় লিখব। কন্টিনেন্ট সেরে, দেশে ফেরার পথে, লুৎর্সেন শ্রীমতীর বাড়িতে সপ্তাহাধিককাল ছিলুম—সেই সুবাদে। উপস্থিত ফ্রিডি লিখেছেন, তিনি আমার (এ্যার ইন্ডিয়া মারফৎ) টেলেক্‌স্ পেলেন কাল রাত্রে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জুরিকের এ্যারপর্টে ট্রাঙ্ক-কল করে জানালেন, আমি জুরিকে নেবেই যেন তাঁকে ট্রাঙ্ক-কল করি। বরাবর তিনি বাড়িতেই থাকবেন।

মনে হয় কত সোজা। কিন্তু যাঁরা দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াতে চান তাঁদের উপকারার্থে এ-স্থলে কিঞ্চিৎ নিবেদন করে রাখি।

প্রথমত আমাকে টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করতে হবে। সে বুথ আবার সদ্‌ ব্রাহ্মণ। আপন দেশজ খাদ্য ভিন্ন অন্য খাদ্য খান না। অর্থাৎ তাঁর বাক্সে আপনাকে ছাড়তে হবে এদেশের আপন সুইস মুদ্রা। অতএব গো-খোঁজা করুন, সে সাহারাতে, কোথায় সে পুণ্যভূমি যেখানে আপনার ডলার বা পৌন্ডের বদলে সুইস মুদ্রা দেবে। সবাই তো ইংরিজি বোঝে না। ভুল বুঝে অনেকেই। তারা কেউ বলে ঐ তো হোথায়, কেউ বলবে তার জন্য তো শহরে যেতে হবে। শেষটায় পেলেন সেই কাউন্টার পুণ্যভূমি—আমি অতি, অতি সংক্ষেপে সারছি। পেলেন সুইস বস্তু। তখন আবার ভুল করে যেন শুধু কাগজের নোট না নেন। কারণ ফোন বুথ কাগজার্থযাশী নন; তিনি চান মুদ্রা। সেই মুদ্রা আবার ঐ সাইজের হওয়া চাই। ঠ্যাঙস ঠ্যাঙস্ করে চলুন ফের ঐ পুণ্যভূমিতে। আরো বহুবিধ ফাঁড়াগর্দিশ আছে। বাদ দিচ্ছি।

আহা! কী আনন্দ!! কী আনন্দ!!!

"কে বলছেন? আমি ফ্রিডি।"

"আমি সৈয়দ।"

॥ ৬ ॥

ঐয্-যা! ট্রাঙ্ক লাইন কেটে গেল। পাবলিক বুথ থেকে ট্রাঙ্ক-কল করা এক গব্বযন্তনা, আমি যে দুটি মুদ্রা মেসিনে ফেলে লুৎর্সেন পেয়েছিলুম, তার ম্যাদ ফুরিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আর দুটো না ফেলার দরুণ লাইন কাট অফফ। ফের ঢালো কড়ি।

অতি অবশ্য সত্য, ফোন যন্ত্রের বাকসে সুইটজারল্যান্ডে প্রচলিত তিন-তিনটি

ভাষা—ফরাসী, জর্মন এবং ইতালীয়—লেখা আছে কোন গুহ্য সরল পদ্ধতিতে যন্ত্রটি ব্যবহার করতে হয়। লেখা তো অনেক কিছুই থাকে। ধর্মগ্রন্থে তো অনেক কিছুই লেখা থাকে। সেগুলো পড়লেই বুঝি মোক্ষলাভ হয়! জিমনাস্টিকের কেতাব পড়লেই বুঝি কিঙ্কড় সিঙ-এর মত মাস্‌ল্‌ গজায়! প্র্যাকটিস করতে হয়। এবং তার জন্য খেসারতিও দিতে হয়। উপযুক্ত গুরু বিনা যোগাভ্যাস করতে গিয়ে বিস্তর লোক পাগল হয়ে যায়। ...আমি ইতিমধ্যে প্রায় দেড় টাকার মত খেসারতি দিয়ে "হ্যালো হ্যালো" করছি। আর, এ খেসারতির কোনো আন্তর্জাতিক মূল্য নেই। কারণ জর্মনি, ফ্রান্স, ইংলন্ড প্রায় প্রত্যেক দেশই আপন আপন কায়দায় আপন আপন মেসিন চালায়। আর সেখানেই কি শেষ? তিন মাস পরে যখন ফের সুইটজারল্যান্ডে আসবো, তখন দেখব, বাবুরা এ ব্যবস্থা পালটে দিয়েছেন। নূতন কোন্ এক আবিষ্কারের ফলে যন্ত্রটার ব্যবহার নাকি "সরলতর" করেছেন। "সরলতর" না কচু! তাই যাঁরা এসব ব্যাপারে ওয়াকিফ-হাল নন, যাঁরা এই হয়তো পয়লাবারের মত কন্টিনেন্ট যাচ্ছেন তাঁদের প্রতি আমার "সরলতম" উপদেশ, বিন্‌গুরু এসব যন্ত্রপাতি ঘ্যাঁটাতে যাবেন না। অবশ্য গুরু পাওয়া সর্বত্রই কঠিন; এখানে আরো কঠিন। যে যার ধান্দা নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে হন্তদন্ত। কে আপনাকে নিয়ে যাবে সেই বুথ-গুহায়, শিখিয়ে দেবে সে-গুহায় নিহিতং ধর্মস্য তত্ত্বং!

যাক! ফের পাওয়া গিয়েছে লাইন।

"তুমি লুৎর্সেন কখন আসছো?"

"অপরাধ নিয়ো না। আমি উপস্থিত যাচ্ছি কলোন। তারপর হামবুর্গ ইত্যাদি। তারপব লন্ডন নটিংহাম। সেখান থেকে ফেরার পথে লুৎর্সেন। তুমি খেদিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তোমার বাড়িতে।"

"দ্যৎ। কিন্তু তদ্দিনে এখানে যে বড্ড শীত জমে যাবে। গরম জামা-কাপড় এনেছো তো? মাখ্‌ট্‌ নিষ্‌ট্‌স্‌ (নেভার মাইন্ড—আসে যায় না)। আমার কাছে আছে।"

"তুমি এখনো ফ্রানসিস আসিসীরই শিষ্যা রয়ে গিয়েছ—কী করে কাতর জনকে মদৎ করতে হয়, সে-ই তোমার প্রধান চিন্তা। আমি কি তোমার স্কার্ট ব্লাউজ পরে রাস্তায় বেরবো? সে-কথা থাক। আমাকে এ্যারপর্টে আরো তিন ঘণ্টাটাক বসে থাকতে হবে। চলে এসো না এখানে। আজ তো রববার। তোমাকে আফিস দফতর করতে হবে না।"

"রববার! সেই তো বিপদ। বাড়ি থেকে যেতে হবে লুৎর্সেন স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেনে করে জুরিক। পঁয়ত্রিশ মাইল। সেখান থেকে বাস-এ করে তোমার এ্যারপর্টে। রববার বলে আজ ঢের কম সার্ভিস। সব কটা উঠতি নাবতিতে টায় টায় কোথায় পাবো কনেকশন—" আমি মনে মনে বললুম, "হুঁঃ। ফের সেই কনেকশন। ইলামবাজার রামপুরহাট।" ফ্রিডি বললে, "আচ্ছা দেখি"।

আমি বললুম, "কতকাল তোমাকে দেখিনি।"

ফ্রিডি যদি এখানে আসে-ই তবে তার বাস দাঁড়ায় কোথায়? আমি বসে আমি ট্রানজিট প্যাসেঞ্জারের খোঁয়াড়ে। এখানে তো ফ্রিডির প্রবেশ নিষেধ। অবশ্য সে এদেশের রীতিমত সম্মানিতা নাগরিকা (সংস্কৃত অর্থে নয়) সিট্‌জেন্‌। কাজেই সে স্পেশাল পারমিট যোগাড় করতে পারবে। তবে সেটা যোগাড় করতে করতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে? আম আনতে দুধ না ফুরিয়ে যায়। ততক্ষণে হয়তো আমার কলোন-গামী প্লেনের সময় হয়ে যাবে।

বাসস্ট্যান্ডে যেতে হলে আমাকে খোঁয়াড় থেকে বেরোতে হয়। কিন্তু আমাকে বেরুতে দেবে কি? খোঁয়াড়ের বাইরেই স্বাধীন, মুক্ত সুইটজারল্যান্ড। তার জন্য ভিজার প্রয়োজন। আমার সেটা নেই। তবু চেষ্টা করে দেখাই যাক না, কি হয় না হয়। সুকুমার রায় বলেছেন, "উৎসাহে কি না হয়, কি না হয় চেষ্টায়।" সেইটি পড়ে আমার এক সখা ডাকপিয়নকে বলেছিল, "আমার কোনো চিঠি নেই? কি যে বলছো? ফের খুঁজে দেখো।" "উৎসাহে কি না হয়, কি না হয় চেষ্টায়।"

খোঁয়াড়ের গেটে গিয়ে সেখানকার উর্দীপরা তদারকদারকে অতিশয় সবিনয় নিবেদন করলুম, "স্যর! আমি কি একটু বাইরে ঐ বাসস্ট্যান্ডে যেতে পারি?"

"আপনি তো ট্রানজিট। না?"

আমি সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললুম, "বাস-এ করে লুৎর্সেন থেকে আমার একটি বান্ধবী—" হায় পাঠক, তুমি সেই তদারকদের প্রতিক্রিয়া যদি তখন দেখতে। "বান্ধবী! বান্ধবী!! সেরতেন্‌মাঁ (সার্টনলি) চের্‌ৎমানতে (ইতালিয়ানে, সার্টনলি)" এবং তার পর জর্মনে "জিষার জিষার" (শিওর, শিওর) এবং সর্বশেষে যদি কূল না পায়, মার্কিন ভাষায় "শিঁয়োর শিয়োঁ"।

আমি জানতুম, আমি যদি বলতুম, আমার বন্ধু আসছেন, সে বলতো, "নোঁ'। যদি বলতুম আমার বীবী, উত্তর হত তদ্বৎ। যদি বলতুম, বৃদ্ধা মাতা তখনো হত "না"— হয়তো কিঞ্চিৎ থতমত করে। কিন্তু বান্ধবী! আমার সাতখুন মাপ!

॥ ৭ ॥

কলোনের নাম কে না শুনেছে? বিশেষ করে হেন ফ্যাশনেবল মহিলা আছেন কি যিনি কস্মিনকালেও প্রসাধনার্থে ও-দ্য-কলোন—জর্মনের ক্যলনিশ ভাষায়—কলনের জল ব্যবহার করেননি। বিশ্বজোড়া খ্যাতি এই তরল সুগন্ধটির। '৪৭১১' এবং 'মারিয়া ফারীনা' এই দুটিকেই সবচেয়ে সেরা বলে ধরা হয়। এ-দেশেও কলোন জল তৈরি হয় কিন্তু ওটা বানাতে হলে যে সাত'আট রকমের সুগন্ধি ফুলের প্রয়োজন, তার কয়েকটি এদেশে পাওয়া যায় না—সর্বোপরি 'প্রাকপ্রণালী' তো আছেই। বিলেতেও কলোন জলের এতই আদর যে, হিটলারের সঙ্গে দেখা করার জন্য চেম্বারলেন যখন সপরিষদ কলোন থেকে মাইল বিশেক দূরে গডেসবের্গ-এর মুখোমুখি, রাইন নদীর ওপারে যে বাড়িতে ওঠেন, তার প্রতি ঘরে কলোন জল, কলোন জলের সুগন্ধ দিয়ে নির্মিত গায়ে মাখার সাবান, দাড়ি কামাবার সাবান, ক্রীম, পাউডার—বস্তুত প্রসাধনের তাবৎ জিনিস—রাখা হয়েছিল। হিটলাবের আদেশে। চেম্বারলেন এই সূক্ষ্ম বিদগ্ধ আতিথেয়তা লক্ষ্য করেছিলেন কি না জানিনে। কারণ তখন তাঁর শিরঃপীড়া তাঁর এ-অভিসার তাঁর দেশবাসী কি চোখে দেখবে। তাঁর আপন ফরেন অফিস যে সেটা নেকনজরে দেখছে না, সেটা তিনি জানতেন, কারণ ইতিমধ্যেই তারা একটা প্যারডি নির্মাণ করে ফেলেছে :

"ইফ এট ফার্সট ইউ কানট সাকসীড/ফ্লাই ফ্লাই এগেন।"

বলা বাহুল্য চেম্বারলেন ফ্লাই করে গিয়েছিলেন। আর আমি তো সেই গডেসবের্গ-এর উপর দিয়ে কলোন পানে ফ্লাই করে যাচ্ছিই। সেই সুবাদে প্যারডিটি মনে পড়ল।

জুরিচে ফ্রিডির সঙ্গে মাত্র কুড়ি মিনিট কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলুম। মনটা খারাপ হয়ে গেছে।

কলোন শহরের সঙ্গে আমার চল্লিশ বছরের পরিচয়।

এখান থেকে প্রায় চোদ্দ মাইল দূরে বন। সেখানে যৌবনে পড়াশুনা করেছিলুম। ট্রামে, বাস-এ, ট্রেনে, জাহাজে করে এখানে আসা অতি সহজ। আমার একাধিক সতীর্থ কলোন থেকে বন ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করতো। তাদের সঙ্গে বিস্তর উইকএন্ড করেছি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শহরটাকে দেখেছি।

সে-সব সবিস্তর লিখতে গেলে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হবে। আর লিখতে যাবোই বা কেন? জর্মন ট্যুরিস্ট ব্যুরো যদি আমাকে কিঞ্চিৎ "ব্রাহ্মণ-বিদায়" করতো তবে না হয়—

যদি নিতান্তই কিছু বলতে হয়, তবে প্রথম নম্বর সম্বন্ধে বলি যে, সেটি আপনি চান কি না চান, কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। কলোনের বিরাট গগনস্পর্শী গির্জা। প্যারিসে যে-রকম যেখানেই যান না কেন, এ্যাফ্যাল টাওয়ারটা এড়াতে পারবেন না, কলোনের এই কেথিড্রেলটির বেলাও তাই। তবে এ্যাফ্যাল স্তম্ভ বদখদ, কিন্তু কলোনের গির্জাচূড়ো তন্বঙ্গী সুন্দরী। যেন মা-ধরণী ঊর্ধ্বপানে দুবাহু বাড়ায়ে পরমেশ্বরকে তাঁর অনন্ত অবিচ্ছিন্ন নমস্কার জানাচ্ছেন!

এ গির্জা আবার আমাদেব কাছে নবীন এক গৌরব নিয়ে ধরা দিয়েছে।

বছর দুত্তিন পূর্বে কলোনবাসী প্রায় শ-দুই তুর্কী ও অন্যান্য মুসলমান ঐ গির্জার প্রধান বিশপকে গিয়ে আবেদন জানান, "এ-বছরে ঈদের নামাজ শীতকালে পড়েছে। বাইরে বরফ; সেখানে নামাজ পড়ার উপায় নেই। হুজুর যদি আপনাদের এই গির্জের ভিতরে আমাদের নামাজ পড়তে দেন, তবে আল্লা আপনাকে আশীর্বাদ করবেন।" বিশপের হৃদয়কন্দরে কণামাত্র আপত্তি ছিল না—কিন্তু...? এ শহরের লোক খৃশ্চান। তাদেরই বিত্ত দিয়ে, গরীবেব কড়ি দিযে এ-গির্জা সাতশ বছর আগে গড়া হযেছে। এখনো ওদেরই পয়সাতে এ-মন্দিবের তদাবকী দেখভাল চলে। সেও কিছু কম নয়। এরা যদি আপত্তি করে? কিন্তু এই বিশপটি ছিলেন বড়ই সন্তপ্রকৃতির সজ্জন। এবং তার চেয়েও বড় কথা : সাহসী। তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। মা-মেরী মালিক। তিনি সর্বসন্তানের মাতা।

কিমাশ্চর্যমতঃপরম। তাঁর কাছে কোনো প্রতিবাদপত্র এল না। খবরের কাগজেও এই অভাবনীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ বেরোল না। অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য!! অবিশ্বাস্য!!!

কিন্তু মার্কিন "টাইম" কাগজে বেরিয়েছে ও বিলেতেও বেরিয়েছে। তারপর সন্দ করে কোন্ পিচেশ!

কলোন এ্যারপর্টে নেমে দেখি, দুটো স্যুটকেসের একটা আমার নেই। ছুট ছুট দে ছুট,—সেই ঘরের দিকে যেখানে "হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ" সম্বন্ধে তড়িঘড়ি ফরিয়াদ জানাতে হয়। নইলে চিত্তির। অবশ্য এরা নিজের থেকেই হয়তো দু-পাঁচ দিনের ভিতরেই আমার বেওয়ারিশ জাদুকে খুঁজে পাবেন, কিন্তু আমি কোন্ মোকামে আস্তানা গাড়বো, তার ঠিকানাটা এদের না দিলে মাল হস্তগত হবে কি করে? সেটা তখন তার মালিককে

হারাবে! কোন এক গ্রীক দার্শনিক নাকি বলেছেন, "একই নদীতে তুমি দুবার আঙুল ডোবাতে পারবে না, একই শিখায় দুবার আঙুল পোড়াতে পারবে না। কারণ প্রত্যেকটি বস্তু প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে।" মানলুম। কিন্তু একই স্যুটকেস নিশ্চয়ই দুবার, দুবার কেন দুশবার হারাতে কোনো বাধা নেই। অতি অবশ্য কবিগুরু বলেছেন, "তোমায় নতুন করে পাব বলেই হারাই ক্ষণেক্ষণে/ও মোর ভালবাসার ধন।" কিন্তু প্রশ্ন, এটা কি হারানো বাকসের বেলাও খাটে?

আপিস ঘরটি প্রমাণ সাইজের চেয়েও বৃহদায়তন। ভিতরে একটি ফুটফুটে মেমসাহেব বসে আছেন। আমার লাগেজ টিকিট দেখাতেই তিনি মুচকি হেসে বললেন, "নিশ্চিন্ত থাকুন, ওটা খোওয়া যাবে না। কিন্তু বলুন তো, ওটার ভিতর কি কি আছে?"

সর্বনাশ! সে কি আমি জানি? প্যাকিং করেছে আমার এক তালেবর ভাতিজা মুখুয্যে। তার বাপ প্রতি বৎসর নিদেন তিনবার ইয়রোপ-আমেরিকা যেতেন। সে নিখুঁত প্যাকিং করে দিত। আমার বেলা এ-বারে করেছে—নিখুঁততর। কোন্ বাকসে কি মাল রেখেছে কি করে জানবো!

কিন্তু মিসি বাবা সদয়া। পীড়াপিড়ি করলেন না। আমার ঠিকানাটি টুকে নিলেন। আর ইতিমধ্যে বার বাব বলছেন, "এ্যার ইন্ডিয়া বলুন, লুফট-হানজা বলুন, সুঈস-এ্যাব বলুন কোনো লাইনেই কোনো লাগেজ খোওয়া যায় না। আপনি পেয়ে যাবেনই যাবেন।"

আমি মনে মনে বললুম, "বট্রো!" বেরবার সময় তাকে বিস্তর ধন্যবাদ জানিয়ে সবিনয়ে বললুম, "গ্নেডিগেস ফ্রলাইন (সদয়া কুমারী)! একটি প্রশ্ন শুধোতে পারি কি?"

সুমধুর হাস্যসহ, "নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

আমি বললুম, "তাবৎ হারানো মালই যদি ফিরে পাওয়া যায়, তবে এ-হেন বিবাট আপিস আপনারা করেছেন কেন? আমি তো শুনেছি, কলোন এ্যারপর্টের প্রতিটি ইঞ্চির জন্য দশ বিশ হাজার টাকা ছাড়তে হয়।"

প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করেই একলম্ফে দফতর থেকে বেরিয়ে মালসামান নিয়ে উঠলুম বিরাট এক বাস-এ।

বাঁচলুম বাবা, বাঁচলুম। প্লেনের গর্ভ থেকে বেরিয়ে খোলামেলায় এসে বাঁচলুম। বাসটি যদিও পর্বতপ্রমাণ, সাগর করিবে গ্রাস হয় অনুমান তবু চলছে যেন রোলস রইস—রইস খানদানী গদিতে, মৃদু মধুরে। কবিগুরু গেয়েছিলেন, "কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসাব ঘায়ে"—আমি গাইলুম, "বাঁচালে তুমি মোরে ভালো বাস-এর ছায়ে।"

আহা কী মধুর অপরাহ্নের সূর্যরশ্মি। কখনো মেঘমায়ায় কখনো আলোছায়ায। দুদিকের গাছপাতার উপর সে-রশ্মি কভু বা মেঘের ভিতর দিয়ে আলতো আলতো হাত বুলিয়ে যায়, কভু বা রুদ্রদীপ্ত হয়ে প্রচণ্ড আলিঙ্গন করে। ঐ হোথায় দেখছি, বুড়ো চাষা ঘাসের উপর শুয়ে আছে, চোখের উপর টুপি রেখে। তার সবুজ পাতলুন যেন ঘাসের ঝিলিমিলির সঙ্গে "এক তালে যায় মিলি"। এদেশের নবান্ন হতে এখনো বেশ কিছুদিন বাকি আছে। চতুর্দিকে অল্পবিস্তর ফসল কাটা হচ্ছে। আজ ববিবার। রাইনল্যান্ডের লোক বেশির ভাগই ক্যাথলিক। তাদের অধিকাংশই সেদিন সর্বকর্ম ক্ষান্ত দেয়। তাই ক্ষেত-খামারে তেমন ভিড় নেই। আমিও মোকামে পৌছতে পারলে বাঁচি। ইংরিজিতে প্রবাদ : "এ সিনার হ্যাজ নো সনডে"। "পাপীর রববার নেই"। আমি তো তেমন পাপিষ্ঠ নই।

বাস মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রামের ভিতর দিয়ে যায়। সেখানে রাস্তা নির্জন। বাচ্চাকাচ্চারা কোথায়? তারা তো ক্লাইপে বা সুধালয়ে যায় না—সেখানে অবশ্যই আজ জোর কারবার, বেজায় ভিড়। আমার পাশের সীটে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বললুম, "স্যর, ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে আমি এসব গ্রামের ভিতর দিয়ে গিযেছি। তখন তো ছেলেমেয়েরা রাস্তার উপর রোল-স্কেটিং করতো, দড়ি নিয়ে নাচতো, এমন কি ফুটবলও খেলতো। ওরা সব গেল কোথায়?"

বৃদ্ধ বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "একাধিক উত্তর হয়তো আছে। চট করে যেটা মনে আসছে সেটা বলতে গেলে বলি, বন্ধ ঘরে টেলিভিশন দেখছে।"

আমি একটু ঘাড় চুলকে বললুম, "কিছু যদি অপরাধ না নেন, স্যর, তবে শুধবো, এটা কি সর্বাংশে ভালো? ফার্সীতে একটি দোহা আছে :—

হর্ চে কুনী, ব্ খুদ্ কুনী
খা খুব্ কুনী, খা বদ্ কুনী॥

যা কববে স্বয়ং করবে
ভালো করো কিংবা মন্দই করো॥

এই যে প্যাসিভ ভাবে বসে বসে টেলি দেখা, তার চেয়ে রাস্তায় অ্যাকটিভ ভাবে খেলাধূলো করা কি অনেক বেশী কাম্য নয়?"

গুণী এবারে চিন্তা না করেই বললেন, "নিশ্চয়ই। অবশ্য ব্যত্যয়ও আছে। যেমন মনে করুন, আমরা যখন মোৎসার্ট বা শপাঁ শুনি তখন তো আমরা প্যাসিভ। আর তা-ই বা বলি কি করে? বেটোফেনকে গ্রহণ করা তো প্যাসিভ নয়। ভেরি ভেরি অ্যাকটিভ কর্ম! কী পরিমাণ কনসানট্রেশন তখন কবতে হয়, চিন্তা করুন তো। কিন্তু বাচ্চাদের কথা বাদ দিন—কটা বয়স্ক লোকই সে জিনিস করে?"

বুঝলুম লোকটি চিন্তাশীল। এঁকে খুঁচিয়ে আরো অনেক তত্ত্বকথা জেনে নিই। বললুম, "তা টেলিতে কি ভালো প্রোগ্রাম কিছুই দেয় না?"

"তা হলে শুনুন, আপনাকে পুরো ফিরিস্তি দিচ্ছি। যদিও আমি ঐ যন্ত্রটির পূজোরী নই। পুরনো ফিল্ম, নয়া থিয়েটার, গর্ভপাতের সেমিনার-আলোচনা, পাদ্রিদের বক্তৃতা (এ দুটো তিনি ঠিক পব পর বলেছিলেন সেটা আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে), রাজনৈতিকদের সঙ্গে ইন্টারভ্যু, খেলা, কাবারে, ইটালি ভ্রমণ, চন্দ্রাভিযান, ভিয়েটনাম থেকে প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন, পার্লামেন্টে হ্যার ভিলি ব্রান্ট ও হ্যার শেলের বক্তৃতা—এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ঐ একই কেচ্ছা, একই অন্তহীন খাড়া বড়ি থোড় থোড় বড়ি খাড়া (তিনি জরমনে বলেছিলেন "একই ইতিহাস"—ডী জেলবে গেশিষ্‌টে—)। সর্ববস্তু কুচি কুচি করে পরিবেশন। পরের দিনই ভুলে যাবেন, আগের দিন কি দেখেছিলেন—মনের উপর কোনো দানা কাটে না। পক্ষান্তরে দেখুন, বই পড়ার ব্যাপারে আপনি আপনার রুচিমত বই বেছে নিচ্ছেন।"

ইতিমধ্যে আমাদের বাস কতবার যে কত ট্রাফিক জ্যামে কত মিনিট দাঁড়িয়েছে তার

হিসেব আমি রাখিনি। অথচ এদেশে রিকশা, ঠ্যালা, গোরুর গাড়ি এমন কোনো কিছুই নেই যে-সব হযবরল আমাদের কলকাতাতে নিত্যি নিত্যি ট্রাফিক জ্যাম জমাতে কখনো স্বেচ্ছায় কখনো অনিচ্ছায়—বিশ্ববিজয়ী প্রতিষ্ঠান।

ভদ্রলোক বাইরের দিকে আঙ্গুল তুলে বললেন, "ঐ দেখুন, আরেক উৎকট নেশা। মোটর, মোটর, মোটর। প্রত্যেক জরমনের একখানা মোটর গাড়ি চাই। জরমন মাত্রই মোটরের পূজারী।"

আমার কেমন যেন মনে হল, আমরা বোধ হয় বন শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে গিয়েছি। কিছুটা চেনা-চেনা ঠেকছে, আবার অচেনাও বটে। অথচ একদা এ শহর আমি আমার হাতের তেলোর চেয়ে বেশী চিনতুম। আমি ভদ্রলোককে আমার সমস্যা সমাধান করতে অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, "এটা বনই বটে। তবে এ অঞ্চলটা গত যুদ্ধে এমনই বোমারু-মার খেয়েছিল যে এটাকে নতুন করে গড়া হয়েছে। তবে শহরের মধ্যিখানটা প্রায় পূর্বেরই মত মেরামৎ করে বানানো। আসল কথা কি জানেন, বমিঙের ফলে ঘিঞ্জি পাড়াগুলো যে নষ্ট হয়ে গেল সেগুলোকে ভালো করে নতুন করে, প্ল্যান মাফিক বানাবার চান্সটা আমরা মিস করেছি। তবে এই যে বললুম, শহরেব মাঝখানটা মোটামুটি আগেরই মত—হার্ট অব দি সিটি—আর জানেন তো, পুরানো হার্টের জায়গায় নতুন হার্ট বসানো মুশকিল। এই ধরুন লুটভিষ্ ফান বেটোফেন—"

আমি বললুম, "ওই নামটার ঠিক উচ্চারণটা কি আমি আজো জানিনে।"

হেসে বললেন, "ঐ তো ফেললেন বিপদে। মাঝখানের Vanটা যে খাঁটি জর্মন নয় তা তো বুঝতেই পারছেন। ওঁরা প্রাচীন দিনের ফ্ল্যামিশ। তখন তারা "ভান" না "ফান" উচ্চারণ করতো কে জানে—অন্তত আমি জানিনে—"

আমি বললুম, "থাক, থাক। এবারে যা বলছিলেন তাই বলুন।"

"সেই বেটোফেনের বাড়ি যদি বোমাতে চুরমার হয়ে যেত তবে সেখানে তো একটা পিরামিড গড়া যেত না।"

"এমন কি তাজমহলও না।"

দুম্ করে গাড়ি থেমে গেল। এ কি? ও। মোকামে পৌঁছে গিয়েছি। অর্থাৎ বন শহরে। এবং সবচেয়ে প্রাণাভিবাম নয়নানন্দদান দৃশ্য—যে পরিবারে উঠবো তারই একটি জোয়ান ছেলে ডীটরিষ্ উলানোফস্কি প্রবলবেগে হাত নাড়াচ্ছে। মুখে তিনগাল হাসি। পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর ফুটফুটে বউ। সে রুমাল দুলোচ্ছে।

॥ ৯ ॥

লক্ষ্মী ছেলে ডীটরিষ্। তার মাঝারি সাইজের মোটরখানা এনেছে। আমার কোনো আপত্তি না শুনে বললে, "আমি মালপত্রগুলো তুলে নিচ্ছি। তুমি ততক্ষণ বউয়ের সঙ্গে দুটি কথা কয়ে নাও। ও তো তোমাকে চেনে না।" মেয়েটিকে বাড়ির কুশলাদি শুধোলুম। কিন্তু বড় লাজুক মেয়ে—কয়েকদিন আগে "দেশ" পত্রিকায় যে সিগারেট-মুখী "মর্ডান মেয়ের" ছবি বেরিয়েছে তার ঠিক উল্টোটি। কোনো প্রশ্ন শুধোয় না। শুধু উত্তর দেয়। শেষটায় বোধ হয় সেটা আবছা-আবছা অনুভব করে একটিমাত্র প্রশ্ন শুধোলে, "বন কি খুব বদলে গেছে? আমি অবশ্য প্রাচীন দিনের বন চিনিনে। আমার বাড়ি ছিল ক্যোনিষবের্গে।"

সর্বনাশ! এবং পাঠক সাবধান!

ক্যোনিষবের্গ শহরটি এখন বোধ হয় পোলাণ্ডের অধীনে। ঐসব অঞ্চল থেকে লক্ষ লক্ষ নরনারী বাস্তুহারা সর্বহারা হয়ে পশ্চিম জর্মনিতে এসেছে। তাদের বেশীর ভাগই সে-সব দুঃখের কাহিনী ভুলে যেতে চায়। কাজেই সাবধান! ও-সব বাবদে ওদের কিছু জিজ্ঞেস করো না।

তবে এ তত্ত্বও অতিশয় সত্য যে মোকা-মাফিক দরদ-দিলে যদি আপনি কিছু শুনতে চান তখন অনেক লোকই, বিশেষ করে রমণীরা অনর্গল অবাধ গতিতে সবকিছু বলে ফেলে যেন মনের বোঝা নামাতে চায়। বিশেষ করে বিদেশীর সামনে। সে দুদিন বাদেই আপন দেশে চলে যাবে। ও যা বলেছিল সেটা নিয়ে খামোখা কোনো ঘোটালার সৃষ্টি হবে না। আমি তাই বেমালুম চেপে গিয়ে বললুম, "ও ক্যোনিষবের্গ!" যেখানে এ-যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কান্‌ট্ জন্মেছিলেন! এবং শুনেছি তিনি নাকি ঐ শহরের বারো না চোদ্দ মাইলেব বাইরে কখনো বেরোন নি। শহরটাকে এতই ভালোবাসতেন।".. ইতিমধ্যে ডীটরিষ্ স্টিয়ারিঙে বসে গেছে এবং আমার শেষ মন্তব্যটা শুনেছে। বললে, "ভালোবাসতেন না কচু। আসলে সব দার্শনিকই হাড়-আলসে।" আমি বললুম, "সে-কথা থাক। তোর বউ শুধোচ্ছিল, বন শহরটা কি খুব বদলে গেছে? তারই উত্তরটা দি। বদলেছে, বদলায়ও নি—"

"তুমি মামা, চিরকালই হেঁয়ালিতে কথা কও—"

আমি বললুম, "থাক, বাবা, থাক। বাস এ এক বৃদ্ধ বিষয়টিব অবতারণা কবতে না কবতেই মোকামে পৌঁছে গেলাম। আর এ-তাবৎ দেখেছিই বা কি?"

বন শহবেব নাম করলেই দেশী-বিদেশী সবাই বেটোফেনের নাম সঙ্গে সঙ্গে স্মবণ কবে বটে, কিন্তু এ বৎসরে বিশেষ কবে। কাবণ তাঁব দ্বিশতজন্মশতবার্ষিকী সম্মুখেই। ডিসেম্বব ১৯৭০-এ। এ শহর তাঁকে এতই সম্মান করে যে তাঁর সুন্দর প্রতিমূর্তিটি তুলেছে তাদেব বিবাটতম চত্ববে, তাদের বৃহত্তম এবং প্রাচীনতম না হলেও তারই কাছাকাছি প্রাচীন ম্যুনসটার গির্জাব পাশে। হয়তো তার অন্যতম কারণ, বেটোফেন ছিলেন সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরবিশ্বাসী। শুধু তাঁর সংগীতে নয়, তাঁর বাক্যালাপে চিঠিপত্রে সর্বত্রই তাঁব ঈশ্বরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস, প্রভুর পদপ্রান্তে তাঁব ঐকান্তিক আত্ম-নিবেদন বার বার স্বপ্রকাশ।

সেখান থেকে কয়েক মিনিটের রাস্তা—ছোট্ট গলির ছোট্ট একটি বাড়িব ছোট্ট একটি কামরায় যেখানে তাঁর জন্ম হয়। বাড়ির নিচের তলায় বেটোফেন মিউজিয়ম। সেখানে তাঁর ব্যবহৃত অনেক কিছুই আছে, যেমন ইয়াসনা পলিযানাতে তল্‌স্তয়েব—বৃহত্তর, সম্পূর্ণতর, কারণ সেটা দেড়শ বছব পবের কথা এবং অসম্পূর্ণতম রবীন্দ্রনাথের উত্তবায়ণে যদ্যপি সেটা তলস্তয়ের প্রায অর্ধশতাব্দী পবে।.

কিন্তু সেখানে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী বেটোফোনের কানের চোঙাগুলো। বত্রিশ বৎসর বয়স থেকেই তিনি ক্রমে ক্রমে কালা হতে আবম্ভ কবলেন। বিধাতার এ কী লীলা! বীণাপাণির এই অংশাবতার আর তাঁর বীণা শুনতে পান না। তখন তিনি আরম্ভ করলেন ঐ-সব কানের চোঙা ব্যবহাব করতে। পাঠক, দেখতে পাবে, তাঁর বধিরতা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন যেমন বাড়তে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোঙাব সাইজও বাড়তে লাগলো। তাতে করে তাঁর কোনো লাভ হয়েছিল কি না বলা কঠিন। তবে এটা জানি, তার

কিছুকাল পরে, যখন তাঁর সঙ্গীতপ্রেমী কোনো সহচর বলতেন, "বাঃ! কী মধুর সুরেলা বাঁশী বাজিয়ে যাচ্ছে রাখাল ছেলেটি", আর তিনি কিছুই শুনতে পেতেন না তখন বেটোফেন বলতেন, তিনি তন্মুহূর্তেই আত্মহত্যা করতেন যদি না তাঁর বিশ্বাস থাকতো যে সঙ্গীতে এখনো তাঁর বহু কিছু দেবার আছে। আমাদের শ্রীরাধা যেরকম উদ্ধবকে বলেছিলেন, "যদি না আমার 'বিশ্বাস' থাকতো, প্রভু একদিন আমার কাছে ফিরে আসবেন, তাহলে বহু পূর্বেই আমার মৃত্যু হয়ে যেতো।" এবং সকলেই জানেন, বদ্ধ কালা হয়ে যাওয়ার পরও বেটোফেন মনে মনে সঙ্গীতের রূপটি ধারণা করে বহুবিধ স্বর্গীয় রচনা করে গেছেন যেগুলো তিনি স্বকর্ণে শুনে যেতে পাননি। আমি যেন কোথায় পড়েছি, তিনি সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে করুণ আবেদন জানাচ্ছেন, প্রভু যেন তাঁকে একবারের মত তাঁর শ্রুতিশক্তি ফিরিয়ে দেন যাতে করে তিনি মাত্র একবারের তবে আপন সৃষ্ট সঙ্গীত শুনে যেতে পান। তারপর তিনি সধন্যান্তকবণে পরলোকে যেতে প্রস্তুত।

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো। ডীটরিষ্ শুধলো, "মামা, কথা কইছ না যে!"

বললুম, "আমি ভাবছিলুম বেটোফেনের কানেব চোঙাগুলোর কথা। ওগুলো সত্যি কি তাঁর কোনো কাজে লেগেছিল?"

ডীটরিষ্ বললে, "বলা শক্ত। কোনো কোনো আধাকালা একখানা কাগজের টুকরো দুপাটি দাঁত দিয়ে চেপে ধরে কাগজের বেশীর ভাগটা মুখেব বাইরে রাখে। ভাবে, ধ্বনিতরঙ্গ ঐ কাগজকে ভাইব্রেট করে দাঁত হয়ে মগজে পৌঁছোয়, কিংবা কান হয়ে। কেউ বা সামনের দুপাটিব চারটে দাঁত দিয়ে লম্বা একটা পেনসিল কামড়ে ধরে থাকে। কি ফল হয় না হয় কে বলবে?...আচ্ছা মামু, তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য কবেছ, কী রকম অদ্ভুত, প্রিমিটিভ মিনি সাইজেব যন্ত্র দিয়ে তিনি তাঁর বিচিত্র সঙ্গীত রচনা করেছিলেন? আমার কাছে ভাবি আশ্চর্য লাগে!"

আমি বললুম, "কেন বৎস, ঐ যে তোমাব ছোট পিসি, যাব সঙ্গে আমার চল্লিশ বছরেব বন্ধুত্ব, লীজেল—দেখেছো, ঝড়তি পড়তি কযেক টুকবো লেটিসেব পাতা, আড়াই ফোঁটা নেবুর বস আব তিন ফোঁটা তেল দিয়ে কি বকম সরেস স্যালাড তৈবি করতে পারে? মুখে দিলে যেন মাখম!!...আর তোর আমাব মত আনাড়ীকে যাবতীয় মশলা সহ একটা মোলায়েম মুর্গী দিলেও আমরা যা রাঁধবো সেটা তুইও খেতে পাববিনি, আমিও না। পিসি লীজেল কি বলবে, জানিনে। অথচ জানিস, ঐ অদ্ভুত মুর্গীটি তাঁকে তখন দিয়ে দে। তিনি সেটাকে ছোট ছোট টুকরো করে যাকে ফরাসীরা বলে রাগু ফ্যাঁ, রা ফ্রিকাস, অর্থাৎ লম্বা লম্বা ফালি-ফালি করে কেটে, মুর্গীটাতে আমরা যে-সব বদ-রান্নার ব্যামো চাপিয়েছিলুম সেগুলো রাইনের ওপারে পাঠিয়ে এ্যামন একটি রান্না করে দেবেন যে, প্যারিসের শ্যাফতক আমরি আমবি বলতে বলতে তারিয়ে তারিয়ে খাবে।...প্রকৃত গুণীজন যা-কিছুর মাধ্যমে যা-কিছু সৃষ্টি করতে পারেন। আমাদের দেশে একরকম বাদ্যযন্ত্র আছে। "একতারা" তার নাম। তাতে একটি মাত্র তার। তাব দুদিকে দুটি ফ্লেকসিবল বাঁশের কৌশল আছে। সে দুটোতে কখনো জোর কখনো হাল্কা চাপ দিয়ে, আর মাঝখানের তারটাকে প্লাক করে নাকি বিয়াল্লিশ না বাহান্নোটা নোট বেব করা যায়। তবেই দ্যাখ্। বেটোফেনের মত কটা লোক পৃথিবীতে আসে—আমাদের দেশেও গণ্ডায় গণ্ডায় তানসেন জন্মায় না। যদিও আমাদের দেশ তোদের দেশের চেয়ে বিস্তর বিরাটতর,

এবং সেখানে কলাচর্যা আরম্ভ হয়েছিল অন্তত চার হাজার বছর পূর্বে। এবং আমাদের কলা-জগতে আমরা এখন সাহারাতে। এবং—"

ডীটরিষ্ বললে, "তুমি আমাদের পার্লামেন্ট হাউসটা দেখবে না। রাইনের পারে। আমি একটু ঘোরপথে যাচ্ছি। সোজা পথে গেলে দু-পাঁচ মিনিট আগে বাড়ি পৌঁছতুম।"

"দ্যাখ ডীটরিষ্, তোর পিসি নিশ্চয়ই বিস্তর কেক, পেসট্রি আমাদের জ॰ । ч।িয়ে বসে আছে—"

ডীটরিষের বউ বললে,"মামা, শুধু কেক পেসট্রি বললেন। ওদিকে পিসি কি কি বানিয়ে বসে আছেন, জানেন? ক্যানিঙসবের্গের ক্লপসে (ক্যানিঙসগবের্গ শহরের একরকম কোফ্‌তা), ফ্রাঙ্কফুর্টের সসিজ, হানোফারের ষাঁড়ের ন্যাজের শুরুয়া—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "সে তো জানি। কিন্তু লীজেল পিসি আমার জন্যে কি কাঙারু ন্যাজের শুরুয়া তৈরি করেছে?"

দুজনাই তাজ্জব। আমি বললুম, "ষাঁড়ের ন্যাজের ভিতরে থাকে চর্বি এবং মাংস। তার একটা বিশেষ স্বাদ থাকে। কিন্তু ষাঁড়ের ন্যাজ আর কতটুকু লম্বা? তার চেয়ে ক্যাঙারুর ন্যাজ ঢের ঢের বেশী। ওটা যদি পাঁচজনকে খাওযানো যায় তবে বিস্তর কড়ি সাশ্রয় হয়।"

ঘ্যাঁচ করে গাড়ি থামলো।

"এটা কি রে? মনে হয়, গোটা আষ্টেক বিরাট বিস্কুটেব টিন একটার উপর আরেকটা বসিয়ে দিয়েছে।" বললুম আমি।

ডীটরিষ্ বললে, "এটাই আমাদের পার্লামেন্ট।"

॥ ১০ ॥

যাকে বলে মর্ডান আর্ট, পিকাস্‌সো উপস্থিত যার পোপস্য পোপ সেই পদ্ধতিটি জর্মনবা কখনো খুব পছন্দ করেনি। কাইজার দ্বিতীয় ভিলহেলম, যাঁকে এখনো মার্কিনিংরেজ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী করে তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আর্ট এবং আর্টের আদর্শ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তব্য ছিল · আর্ট হবে সুন্দর, আর্ট হবে সমাজসেবক, বাষ্ট্রসেবক, আর্ট মানুষের দুঃখদৈন্যের ছবি না এঁকে আঁকবে এমন ছবি, কম্পোজ করবে এমন সঙ্গীত, রচনা করবে এমন সাহিত্য যাতে মানুষ আপন পীড়াদায়ক পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে আনন্দসায়বে নিমজ্জিত হবে। আজকের দিনে আমরা এটাকে নাম দিয়েছি এসকেপিজম—পলায়ন মনোবৃত্তি। বলা বাহুল্য জর্মন আর্টিস্ট—সাহিত্যিক সঙ্গীতস্রষ্টা—কাইজারেব এই পথনির্দেশ খবরের কাগজে পড়ে স্তম্ভিত হন। তা হলে আর্টিস্টের কোনো স্বাধীন সত্তা নেই! সে তার আপন সুখ-দুঃখ, আপন বিচিত্র অভিজ্ঞতা আপন হৃদয়ে উপলব্ধ ভবিষ্যতের আশাবাদী চিত্র অঙ্কন করতে পারবে না! সে তা হলে রাষ্ট্রের ভাঁড়, ক্লাউন। তার একমাত্র কর্তব্য হল জনসাধারণকে কাতুকুতো দিয়ে হাসানো।

কিন্তু জর্মন জনসাধারণ কাইজাবেব কথাই মেনে নিল। এটা আমার ব্যক্তিগত মত নয়। এই পরিস্থিতিটা বোঝাতে গিয়ে প্রখ্যাত জর্মন সাংবাদিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক শ্রীযুত য়োখিম বেসার বলেছেন, জর্মন মাত্রই উপরের দিকে তাকায়; রাজা কি হুকুম দিলেন সেই অনুযায়ী কাব্যে চিত্রে সঙ্গীতে আপন রুচি নির্মাণ করে।

১৯১৮-এ কাইজার যুদ্ধে হেরে হল্যান্ডে পলায়ন করলেন।

তখন সত্য সত্য আবম্ভ হল "মর্ডান আর্টেব" যুগ। যেন কাইজাবকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন কবাব জন্য আর্টিস্টবা আবম্ভ কবলেন বঙ নিযে নিত্য নব উন্মাদ নৃত্য, ধ্বনি নিযে সঙ্গীতে তাণ্ডব একসপেবিমেন্ট, ভাস্কর্যে বিকট বিকট মূর্তি যাব প্রত্যেকটাতেই থাকত একটা ফুটো (তাব অর্থ বোঝাতে গেলে পুলিস আমাকে জেলে পুববে)। আমি ঐ সমযে জর্মনিতে ছিলুম। মর্ডানদেব পাল্লায পডে একদিন একটা চারুকলা প্রদর্শনী দেখতে গিযে একলম্ফে পুনবপি বেবিযে এসেছিলুম। একদা যে-বকম কোন্ এক জু-তে বোকা পাঁঠাব খাঁচাব সামনে থেকে বিদ্যুৎগতিতে পলাযন কবেছিলুম। বোটকা গন্ধে।

তাব অর্থ অবশ্য এ নয যে সেখানে উত্তম দ্রষ্টব্য কিছুই ছিল না। নিশ্চযই ছিল। বাস্তাব ডাস্টবিন খুঁজলে কি আব খান দুই লুচি, একটা আলুব চপ পাওযা যায না? কিন্তু আমাব এমন কি দায পডেছে।

এবপব ১৯৩৩-এ এলেন হিটলাব। তাঁব কাহিনী সবাই জানেন। কিন্তু আর্ট সম্বন্ধে তাঁব অভিমত সবাই হযতো জানেন না, তাই সংক্ষেপে নিবেদন কবছি। হিটলাব সর্বক্ষণ কাউজাবকে অভিসম্পাৎ দিতেন। তাঁব বক্তব্য ছিল, কাইজাব যদি কাপুরুষেব মত হাব না মেনে লডে যেতেন তবে জর্মনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জযলাভ কবতোই কবতো। অথচ আর্ট সম্বন্ধে দেখা গেল, হিটলাব কাইজাব সম্পূর্ণ একমত পোষণ কবেন। তিনি কঠিনতব কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বাবংবাব বলে যেতে লাগলেন, "আর্ট হবে সমাজেব দাস অর্থাৎ নাৎসিদেব দাস। সূর্যনিম্নে এই পৃথ্বীতলে তাবা যে ন্যাযসম্মত আসন খুঁজছে, তাবই সেবা কববে আর্টিস্টবা '

কাইজাবেব চবম শত্রুও বলবে না, তিনি অসহিষ্ণু লোক ছিলেন। তাব আমলে তাব নির্দেশ সত্ত্বেও যাঁবা মর্ডান ছবি আঁকতো তাঁদেব বিরুদ্ধে তিনি কোনো প্রকাবেবই কোনো কিছু কবেননি।

কিন্তু হিটলাব চ্যানসেলাব হওযাব পব আবম্ভ হল এদেব উপব নিযাতন। উত্তম উত্তম ছবি, নব নব সঙ্গীত ব্যান কবা হল। সেবা সেবা পুস্তক পোডানো হল—কাবণ এগুলো নাৎসি সঙ্গীতেব সঙ্গে এক সুবে এক গান গায না। আমি দূব থেকে এবকম একটা অগ্নিযজ্ঞ দেখেছিলুম। কাছে যাইনি। পাছে প্রভুবা আমাব বঙ দেখে, আমাকে ইহুদী ঠাউবে আমাব নাকটা না কেটে দেন। যদিও আমাব নাকটি খাঁটি মঙ্গোলাযান। খাটো বেটে হ্রস্ব কিন্তু বলা তো যায না।

হিটলাব তাব সাবনোচিত ধামে গেছেন। এখন জর্মনবা উঠে পডে লেগেছেন "মডার্ন" -তে। চোদ্দতলা বাডি ভিন্ন অন্য কথা কয না।

তাই এই বিদ্‌ঘুটেনপাবা পার্লিমেন্ট।

উন্টবিব ‑ব ব্ঃ ন্ম 'জানো, ভাগিনা, আমাদেব দেশেও এ ধবনেব স্থাপত্য হুশ হুশ কবে আকাশপানে উঠছে। তাবই এক আর্কিটেকট এসেছেন আমাদেব সঙ্গে তাস খেলতে। ভদ্রলোক সি ‌ ব ব‌্। ব্যাকাল। সিগাব গেছে মিইযে। ঘন ঘন নিভে যায। ভদ্রলোক দেশলাই খোঁজেন। খেলা শেষ হল। তখন কেন জানিনে তিনি তাঁব দেশলাই আব খুঁজে পান না। আমাদেব এক বসিক বন্ধু বসে বসে খেলা দেখছিল। সে দবদী কণ্ঠে বললে, 'দাদাদেব কাছে আমাব অনুবোধ, আর্কিটেকট মশযেব মডেলটি তোমবা কেউ গাপ মেবো না। ঐ দেশলাইটিব মডেল থেকেই তো তিনি হেথাহোথা সর্বত্র বিযাল্লিশতলাব বাডি হাঁকাচ্ছেন। ওটা গাযেব হলে ওঁযাব রুটি মাবা যাবে যে'।"

ডীটরিষ্ বলেন, "জানো মামু, আমাদের বিশ্বাস প্রাচ্যদেশীয়রা বড্ডই সীরিয়স। সর্বক্ষণ গুমড়ো মুখ করে, লর্ড বুদ্ধের মত আসন নিয়ে শুধু আত্মচিন্তা মোক্ষানুসন্ধান করে। তারাও যে রসিকতা করে এ কথা ৯৯.৯% জর্মন কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। অথচ তোমার এই বন্ধুটির রসিকতাটি শুধু যে রসিকতা তাই নয়, ওতে গভীর দর্শনও রয়েছে। মর্ডান আর্কিটেকচর সম্বন্ধে মাত্র ঐ একটি দেশলাই দিয়ে তিনি তাঁর তাচ্ছিল্য সিনিসিজম-সহ প্রকাশ করলেন কী সাতিশয় সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে। ভদ্রলোক কি তোমার মত লেখেন-টেখেন—লিতেরাত্যোর?"

আমি বললুম, "তওবা, তওবা! ভদ্রলোক ছিলেন আমাদেব ফরেন অফিসের ডেপুটি মিনিস্টার; পণ্ডিত নেহরুর সহকর্মী। খুব বেশী দিন কাজ করেননি। ঐ সব দার্শনিক সিনিক রসিকতা তিনি সর্বজন-সমক্ষে প্রকাশ করতেন তাঁব ভিন্ন ভিন্ন সহকর্মী মন্ত্রীদের সম্বন্ধে। ঠিক পপুলার হওয়ার পন্থা এটা নয়—কি বলো? কাজেই তিনি যখন ফরেন অফিস থেকে বিদায় নিলেন তখন আমি বলেছিলুম, তিনি মন্ত্রিমণ্ডলী থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বিদায় নেবার সময় উল্লাসে নৃত্য করলেন এবং মন্ত্রিমণ্ডলীও তাঁর থেকে নিষ্কৃতি পেযে উল্লাসে নৃত্য করলেন।"

ডীটবিষ্ চুপ। আমি একটু অবাক হলুম। সে তো সব সময়ই জুৎমাফিক উত্তব দিতে পারে।

সে বললে, "আমার অবস্থাও তাই। যে আফিসে আমি কাজ করি সেটা থেকে বেরুতে পারলে আমিও খুশী হই; ওরা খুশী হয।"

॥ ১১ ॥

ঐ তো সামনে গোডেসবের্গ। ডীটবিষ্ শুধোলে, "মামু, পিসি বলছিল তুমি নাকি এই টাউনটাকে জর্মনিব সর্ব জাযগার চেযে বেশী ভালোবাসো? কেন বলো তো?"

আমি মুচকি হেসে কইলুম, "যদি বলি তোর পিসির সঙ্গে হেথায় আমাব প্রথম প্রণয় হযেছিল বলে?"

ডী। "ধ্যত! আমি ছেলেবেলা থেকেই লক্ষ্য কবেছি, লীজেল পিসিব ধ্যানধর্ম শুধু কাজ আর কাজ। ফাঁকে ফাঁকে বই পড়া। এবং সে বইগুলোও দারুণ সিরিয়স। বড় পিসি বরঞ্চ মাঝে মাঝে হাল্কা জিনিস পড়তো। কিন্তু ছোট পিসি ওসবেব ধাব ধারতো না। সে যেতো প্রতি প্রভাতে ট্রামে চড়ে বন শহরে—যেখানে সে চাকরী করতো—"

আমি। "সেই সূত্রেই তো আমাদের পরিচয়। আম্মো ঐ সকাল আটটা পনেরোর ট্রামে বন যেতুম। আমরা আর সবাই দু-তিনটে সিঁড়ি বেয়ে ট্রামে উঠতুম। আর লীজেল পিসি ডান হাতে একখানা বই আব বাঁ হাতে ট্রামেব গায়ে সামান্যতম ভর করে সিঁড়িগুলোকে "তাচ্ছিলি" কবে এক লাফে উঠতো ট্রামেব পাটাতনে। উঠেই এক গাল হেসে ডাইনে বাঁয়ে সমুখ পানে তাকিয়ে বলতো, "গুটেন মরগেন" "সুপ্রভাত"। ওর লম্ফ মেরে ওঠার কৌশল দেখে আমি মনে মনে বলতুম, "একদম 'টম্ বয়'!" ওর উচিত ছিল, মার্কিন মুল্লুকে 'কাউ বয়' হয়ে জন্ম নেবার। অথবা 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুঈন'—গুরুদেবের ভাষায়।

গোডেসবের্গ তখন অতি ক্ষুদে শহর। সবাই সবাইকে চেনে। কিন্তু আসল কথা, ঐ

আটটা পনেরোর ট্রামে থাকতো পোনেরো আনা কাচ্চাবাচ্চা। ইস্কুলে যাচ্ছে বন শহরে। এরা সবাই জানতো যে লীজেল পিসির, অবশ্য তখনো তিনি "পিসি" খেতাব পাননি, কাছে আছে লেবেনচুস, দু-একটা আপেল, হয়তো নবাগত মার্কিন চুঙ্গিং গাম, মাঝে মধ্যে চকলেট। কাজেই বাচ্চারা সমস্বরে, কোরাস কণ্ঠে বলতো অন্তত বার তিনেক "সুপ্রভাত, সুপ্রভাত—"। তার পর সবাই তার চার পাশ ঘিরে দাঁড়াতো। সবাই বলতো, "প্লীজ প্লীজ, এজ্ঞে এজ্ঞে, এই এখানে বসুন।"

আমি বললুম, 'বুঝলি ডীটরিষ্, তোর পিসি লীজেল ছিল আমাদের হীরইন অব দ্য প্লে। তবে তুই ঠিকই বলেছিস ও কখনো প্রেম-ফ্রেমের ধার ধারতো না। আমি দু-একবার তার সঙ্গে হাফাহাফি ফ্লার্ট করতে গিয়ে চড় খেয়েছি। অথচ আমাদের মধ্যে প্রীতিবন্ধুত্ব ছিল গভীর। আমাকে কত কী না খাইয়েছে—ঐ অল্প বয়সেই বেশ দুপয়সা কামাতো বলে। তখনকার দিনে ছিল—এখনো নিশ্চয়ই আছে—একরকমের বেশ মোটা সাইজের চকলেট—ভিতরে কন্যাক্। বড্ড আক্রা। কিন্তু খেতে—ওঃ কী বলবো—মুখে ফেলে সামান্য একটু চাপ দাও। ব্যস, হয়ে গেল। ভিজে ভিজে চকলেট আর তরল কন্যা-কে মিশে গিয়ে, দ্যাখ তো না দ্যাখ, চলে গেল একদম পেটৈব পাতালে। কিন্তু যাবার সময় ঐ যে কন্যাক—তোরা যাকে বলিস ব্র্যানটভাইন, ইংরিজিতে ব্র্যান্ডি, নাড়িভুঁড়ির প্রতিটি মিলিমিটার মধুর মধুর চুলবুলিযে বুঝিয়ে দিতো, যাচ্ছেন কোন মহারাজ।. .আব মনের মিলের কথা যদি তুলিস তবে বলবো, লীজেল ছিল বড্ডই লিবরেল। তাই যদিও নাৎসিরা তখনো ক্ষমতা পায়নি। কিন্তু রাস্তাঘাটে দাবড়াতে আরম্ভ করেছে—পিসি সেটা আদৌ পছন্দ করতো না। আমিও না। কিন্তু সত্যি বলতে কি, ইংরেজ যে ইতিমধ্যেই হিটলার বাবদে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে সেটা আমার চিত্তে পুলক জাগাতো। পিসিও সেটা জানতো। ভারতবর্ষের পরাধীনতার কথা উঠলেই সে ব্যথা পেত। বলতো, 'ও কথা থাক না।' ওরকম দরদী মেয়ে চিনতে পারার সৌভাগ্য আমি ইহসংসারে অতি অল্পই পেয়েছি।"

হঠাৎ লক্ষ্য করলুম, ভাগিনা ডীটরিষ্ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছে। শুধোলুম, "কি হল রে? তুই কি পরশুদিনের হাওয়া খেতে চলে গিয়েছিস?"

কেমন যেন বিষণ্ণ কণ্ঠে ভেজা-ভেজা গলায় বললে, "মামা, তুমি বোধ হয় জানো না, আমার বাবা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ওপারে চলে গেল কি করে।"

ডীটরিষের এখন যৌবনকাল। তার বাপ কেন, ঠাকুদ্দাও বেঁচে থাকলে আশ্চর্য হবার মত কিছু ছিল না। বললুম, "আমি তো জানিনে, ভাই। কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, আবার হচ্ছেও না। কারণ তোর গলাটা কি রকম যেন ভারী ভারী শোনাচ্ছে—"

"তুমি এইমাত্র বললে না, তুমি, পিসি দুজনাই নাৎসিদের পছন্দ করতে না। বস্তুত পিসি-পরিবারের কেউই নাৎসি ছিল না। যদিও আমি তোমার বান্ধবীকে পিসি বলে পরিচয় দিয়েছি, আসলে তিনি আমার মাসি। তাঁরা তিন বোন। আমার মা সক্কলের ছোট। তিনি বিয়ে করলেন এক নাৎসিকে—কট্টর নাৎসিকে। কেন করলেন জানিনে। প্রেমের ব্যাপার। তবে হ্যাঁ. চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিল। বাড়ি গিয়ে তোমাকে তার ডাইরিটি দেখাবো। আর চেহারাটি ছিল সুন্দর—"

বাধা দিয়ে বললুম, "সে তো তোর চেহারা থেকেই বোঝা যায়।"

"থ্যাঙ্কউ। আর বাবা ছিল বড্ডই সদয়-হৃদয়—"

"ভাগনা, কিছু মনে কোরো না। আমি মোটেই অবিশ্বাস করি না যে তোর পিতা অতিশয় করুণহৃদয় শান্তস্বভাব ধরতেন—তোর দুই মাসিই সে-কথা আমাকে বারংবার বলেছে। কিন্তু, আবার বলছি, কিছু মনে কোরো না, তাহলে তিনি নাৎসিদের কনসানট্রেশন ক্যামপ সয়ে নিলেন কি করে?"

ডীটরিষ্ চুপ মেরে গেল। কোনো উত্তর দেয় না। আমি এবার, বহুবারের পর আবার বুঝলুম যে আমি একটা আস্ত গাড়োল। এ-বকম একটা প্রশ্ন করাটা আমার মোটেই উচিত হয়নি। বললুম, "ভাগিনা, আমি মাফ চাইছি। আমি আমার প্রশ্নটার কোনো জবাব চাইনে। ওটা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি।"

ডীটরিষ্ বললে, "না, মামু। তুমি যা ভেবেছো তা নয়। আমি ভাবছিলুম, সত্যিই তো, বাবা এগুলো বরদাস্ত করতো কি করে? এবং আরো লক্ষ লক্ষ জর্মন? এই নিয়ে আমি অনেকবার বহু চিন্তা করেছি। তুমি জানো, মার্কিনিংরেজ রুশ-ফরাসী ন্যুরেনবের্গ মোকদ্দমায় বার বার নাৎসিদের প্রশ্ন করেছে, 'তোমরা কি জানতে না যে হিটলারের কনসানট্রেশন ক্যামপে লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে খুন করেছে?' উত্তরে সবাই গাঁইগুঁই করেছে। সোজা উত্তর কেউই দেয়নি। জানো তো, যুদ্ধের সময় কত সেনসর কত কড়াকড়ি। কে জানবে, কি হচ্ছে, না হচ্ছে। আমার মনে হয়, আবার বলছি জানিনে, বাবার কানে কিছু কিছু পৌঁচেছিল। কিন্তু বাবা তখন উন্মত্ত। তিনি চান জর্মনির সর্বাধিকাব। তাঁর ডাইরিতে বার বার বহুবাব লেখা আছে, 'ইংরেজ কে? সে যে বিরাট বিশ্ব শুষে খেতে চায় তাতে তাব হক্কো কি? হ্যাঁ. নিশ্চয়ই মানি, তারা যদি আমাদের কিংবা ফরাসীদের মত কলচরড জাত হত তবে আমবা এ-নিয়ে কলহ কবতুম না। কিন্তু ইংবেজ জাতটাই তো বেনের জাত। তাবা কলচরের কি বোঝে।' ওদের না আছে মাইকেল এঞ্জেলো, না আছে বেটোফেন। আছে মাত্র শেকসপীয়ব। ওদের না আছে স্থাপত্য, না আছে ভাস্কর্য, না আছে—" হঠাৎ বললো, "ঐ তো বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি॥"

॥ ১২ ॥

"ভু, হালুঙ্কে"

সোল্লাসে হুহুঙ্কাবে রব ছাড়লো শ্রীমতী লীজেল। "তুই গুণ্ডা—"

আমবা যেবকম কোনো দুরন্ত ছোট বাচ্চাকে আদর কবে "গুণ্ডা" বলে থাকি "হালুঙ্কে" তাই। শব্দটা চেক ভাষাতে জর্মনে প্রবেশ লাভ কবেছে। গত চল্লিশ বছর ধরে দেখা হলেই লীজেল এইভাবেই আমাকে "অভ্যর্থনা" জানিয়েছে।

তারপর আমাকে জাবড়ে ধরে দুগালে দুটো চুমো খেল।

ডীটরিষ্ মারফত পাঠককে পূর্বেই বলেছি, লীজেল ছিল ন-সিকে "টম-বয়", এবং দু-একবার তার সঙ্গে হাফাহাফি ফ্লার্ট কবতে গিয়ে চড খেয়েছি। তবে এটা হল কি প্রকাবে? শুচিবায়ুগ্রস্ত পদী পিসীরা ক্ষণতরে ধৈর্য ধরুন। বুঝিয়ে বলছি। এই ষাট বছর বয়সে তার কি আর "টমবয়ত্ব" আছে? এখন আমাকে জাবড়ে ধরে আলিঙ্গন করাতে সে শুধু তার অন্তরতম অভ্যর্থনা জানালো।

আমি মনে মনে বললুম চল্লিশ বছর ল্যাটে, চল্লিশ বছব ল্যাটে। এই আলিঙ্গন-চুম্বন চল্লিশ বছর পূর্বে দিলেই পারতে, সুন্দরী। পরে তাকে খুলেও বলেছিলুম।

ইতিমধ্যে ডীটরিষ্ আমতা আমতা করে বললে, "আমরা তা হলে আসি। রাত্রের পার্টিতে দেখা হবে।" ওরা পাশেই থাকে। তিন মিনিটের রাস্তা। ওদের ভাব থেকে বুঝলুম, ওরা মনে করছে বিদ্যা ও সুন্দর যখন বহু বৎসর পর সম্মিলিত হয়ে গেছেন তখন ওদের কেটে পড়াই ভালো। আমাদের প্রেমটি যে চিরকালই নির্জলা জল ছিল সেটি হয়তো তার গলা দিয়ে নাবাতে পারেনি—হজম করা তো দূরের কথা।

লীজেল আমাকে হাতে ধরে ড্রইংরুমের দিকে নিয়ে চললো। আমি বললুম, "এ কি আদিখ্যেত্তা! চল্লিশ বছর ধরে যখনই এ-বাড়িতে এসেছি তখনই আমরা বসেছি বাবা, মা, বড়দি, তুমি, ছোড়দি রান্নাঘরে। অবিশ্যি মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আজ কেন এ ব্যত্যয়? তদুপরি ঐ বিরাট ড্রইংরুম! বাপ্‌স্। তুই যদি এক কোণে বসিস আর আমি অন্য কোণে, তা হলে একে অন্যকে দেখবার তরে জোরদার প্রাশান মিলিটারী দুরবীনের দরকার হবে; কথা কইতে হলে আমাদের দেশের ডাক-হরকরা, নিদেন একটি ট্রাঙ্ক-কল-ফোন ব্যবস্থা, আর—"

লীজেল সেই প্রাচীন দিনের মত বললে, "চোক্‌কোর চোক্‌কোর। তুই চিরকালই বড্ড বেশী বকর বকর করিস।"

গতি পরিবর্তন হল। আমরা শেষ পর্যন্ত রান্নাঘরেই গেলুম।

কিচেনের এক প্রান্তে টেবিল, চতুর্দিকে খান ছয় চেযার। অন্য প্রান্তে দুটো গ্যাস উনুন, তৃতীয়টা কয়লার (সেটা খুব সম্ভব প্রাচীন দিনের ঐতিহ্য রক্ষার্থে)। দুই প্রান্তেব মাঝখানে অন্তত দশ কদম ফাঁকা। অর্থাৎ কিচেনটি তৈরি করা হয়েছে দরাজ হাতে। বস্তুত লীজেলের মা যখন রাঁধতেন তখন এ-প্রান্ত থেকে আমাকে কিছু বলতে হলে বেশ গলা উঁচিয়ে কথা কইতে হত।

লীজেল একটা চেয়ার দেখিয়ে বললে, "এটায় বস।"

সত্যি বলছি, আমাব চোখে জল এল। কি করে লীজেল মনে রেখেছে যে, চল্লিশ বৎসর পূর্বে (তিনি গত হযেছেন বছর আটত্রিশেক হবে) তার পিতা আমাকে ঐ চেয়াবটায় বসতে বলতেন। আমি জানতুম, কেন। জানলা দিয়ে, ঐ চেয়ারটার থেকে দূব-দূরান্তরের দৃশ্য সবচেয়ে ভালো দেখা যায়। পরে জানতে পেরেছিলুম, তিনি স্বযং ঐ চেযারটিতে বসে আপন ক্ষেত-খামারের দিকে এবং বিশেষ করে তাঁর বিরাট আপেল-বাগানের দিকে নজর রাখতেন (মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে আমাদের যেরকম আমবাগান)। অবশ্যই তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে ভালোবাসতেন। নইলে আমাকে তাঁর আপন আসন ত্যাগ করে, আপন অভ্যস্ত আসন ছেড়ে দিয়ে ওখানে বসতে বলবেন কেন? আমি তো সেখান থেকে তাঁর ক্ষেতখামার, আপেলবাগান তদারকি করতে পারবো না—যারা ঘোরাঘুরি করছে, তারা তাঁর আপন "মুনিষ" না ভিন-জন আমি ঠাহর করবো কি প্রকারে? আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ? সে দিকে আমার কোনো চিত্তাকর্ষণ নেই। একদিন ঐ শেষ কথাটি তাঁকে আস্তে আস্তে ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে—যাতে অন্যেরা শুনতে না পায়—তিনি বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে অতিশয় সুন্দর স্মিতহাস্যে বললেন, "তোমবা ইন্ডিয়ান। তোমাদের দেশে এখনো কল-কারখানা হয়নি। তোমরা এখনো আছো প্রকৃতির শিশু। শিশু কি মায়ের সৌন্দর্য বোঝে? না। সে শুধু তার মায়ের স্তনরস চায়—সেই স্তনদ্বয়ের সৌন্দর্য কি সে বোঝে? যেমন তাব বাপ বোঝে? ঠিক ঐরকম তোমবা তোমাদের মা-জননী জন্মভূমিতে ক্ষেত-খামার করে খাদ্যরস আহাবাদি সংগ্রহ কবো।

তোমরা এখনো কী করে বুঝবে, নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বলতে কি বোঝায়? সেটা শুরু হয় যখন মানুষ কলকারখানার গোলাম হয়ে যায়। অর্থাৎ মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর, বড় হয়ে সে মাতৃদুগ্ধের মূল্য বুঝতে শেখে—"

আমি বললুম, "মানছি, কিন্তু দেখুন, গ্রীস, রোম এবং আমার দেশ ভারতবর্ষেও তো কলকারখানা নির্মিত হওয়ার বহু পূর্বে উত্তমোত্তম কাব্য রচিত হয়েছিল এবং সেগুলোতেও বিস্তর প্রাকৃতিক নৈসর্গিক বর্ণনা আছে। তবে কেন—?"

ঐসব কথাবার্তা যেন ঐ চেয়ারে বসে কানে শুনতে পাচ্ছি। কত বৎসব হয়ে গেছে। এমন সময় লীজেল আমার মাথায় মারলো একটা গাঁট্টা। আমার স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। বিশেষ করে তার ঠাকুরমার ছবিটি।

"কি খাবে বলছিলে?"

আমি আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিলুম, "আমি তো কিছুই বলিনি।"

"তবে চলো, তুমি যে সুপ পছন্দ করতে সেই সুপই করেছি—অর্থাৎ পী সুপ (কলাইশুঁটির সুপ)—এবারে বলো তুমি কি খাবে? তুমি যা খেতে চাও তার জন্য মাছ, মাংস, ক্রীম আছে।"

আমি বললুম, "দিদি, সুপ ছাড়া আমার অন্য কোনো জিনিসের প্রয়োজন নেই। আর এই জর্নিতে আমার সর্বাঙ্গ অসাড়।..তবে কিনা আমি বঙ্গসন্তান। হেথায় ডান পাশে রাইন নদী। সে নদীর উত্তম উত্তম মাছ খেয়েছি কত বৎসর ধবে। তারই যদি একটা কিছু—"

বেচারী লীজেল।

শুকনো মুখে বললে, "বাইনে তো আজকাল আব সে-মাছ নেই।"

আমি শুধোলাম. "কেন?"

বললে, "রাইন নদের জাহাজের সংখ্যা বড্ড বেশী বেড়ে গিয়েছে। তাদের পোড়ানো তেল তারা ঐ নদীতে ছাড়ে। ফলে নদীর জল এমনই বিষে মেশা হয়ে গিয়েছে যে, মাছগুলো প্রায় আব নেই। আমার কাছে যেসব মাছ আছে সেগুলো টিনেব মাছ।"

আমি বললুম, "তা হলে থাক।"

॥ ১৩ ॥

বিনু যখন সোয়ামীর সঙ্গে ট্রেনে করে যাচ্ছিল তখন বললে, "আহা ওরা কেমন সুখে আছে।" আমরাও ভাবি ইংরেজ ফরাসী জর্মন জাত কি রকম সুখে আছে। কিন্তু ওদেরও দুঃখ আছে। তবে আমাদের মতো ওদের দুঃখ ঠিক একই প্রকারের নয়। ওরা খেতে পায়, আশ্রয় আছে। তৎসত্ত্বেও ওদের দুঃখ আছে।

লীজেলদের বাড়ি প্রায় দুশো বছরের পুরোনো। সে আমলে স্টীল সিমেন্টের ব্যাপার ছিল না। বাড়িটা মোটামুটি কাঠের তৈরী। দুশো বছর পরে ছাদটা নেমে আসছে। এটাকে খাড়া রাখা যায় কি প্রকারে!

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "লীজেল, এটাকে কি মেরামত করা যায় না?"

লীজেল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, "শুধু ছাদ নয়, দেয়ালগুলো ঝুরঝুরে হয়ে এসেছে। এ বাড়ি মেরামত করতে হলে কুড়ি হাজার মার্ক (আমাদের হিসাবে চল্লিশ

হাজার টাকারও বেশী) লাগবে। বাবা গেছেন, আমার কোনো ভাইও নেই। ক্ষেত-খামার দেখবে কে? আপেলবাগানটা পর্যন্ত বেচে দিয়েছি। তাই স্থির করেছি বাড়িটা সরকারকে দিয়ে দেবো। ওরা সব পুরোনো বাড়ির কিছু কিছু বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কারণ এ বাড়িটির স্টাইল এক্কেবারে খাঁটি রাইনল্যান্ডের।

আমি বললুম, "এটা মর্টগেজ করে টাকাটা তোলো না কেন?"

লীজেল বললে, "যে-টাকাটা কখনো শোধ করতে পারবো না সে-টাকা ধার করবো কি করে!"

আমার মনে গভীর দুঃখ হলো। বাড়িটা সত্যিই ভারী সুন্দর। শুধু বাড়িটি নয়, তার পেছনে রয়েছে ফল-ফুলের বাগান, তরিতরকারির ব্যবস্থা, কুয়ো, হ্যান্ডপাম্প দিয়ে জল তোলার ব্যবস্থা—গ্রামাঞ্চলে উত্তম ব্যবস্থা। ক্ষেত-খামার গেছে যাক। ওদের আপেল-বাগান এই অঞ্চলে বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠতমও ছিল। সেও গেছে যাক। কিন্তু এই সুন্দর বাড়িটা সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে, এটা আমার মন কিছুতেই মেনে নিতে চাইল না।

ইতিমধ্যে লীজেলের ছোট বোন মারিয়ানা এল। তিন বোনের ঐ একমাত্র যার বিয়ে হয়েছিল। যে ডীটরিষ্ আমাকে নিয়ে যাবার জন্য বন-এ এসেছিল তার মা। ছেলের বাড়ি দু-মিনিটের রাস্তা। সেখানে বউ নিয়ে থাকে।

মারিয়ানা বিধবা। প্রায় সাতাশ বছর পূর্বে তার বিয়ে হয়। ববটি ছিল খাসা ছোকরা—কিন্তু...

এ বাড়ির তিন বোনের কেউই নাৎসি ছিল না। এরা সবাই ধর্মভীরু ক্যাথলিক। ইহুদীরা প্রভু খৃষ্টকে হয়তো ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, হয়তো করেনি। যাই হোক, যাই থাক—তাই বলে দীর্ঘ সুদীর্ঘ সেই ঘটনার দু-হাজার বছর পর ওদের দোকান-পাট, ভজনালয়, ওদের লেখা বইপত্র পুড়িয়ে দেবে (মহাকবি হাইনরিষ হাইনের কবিতাও বাদ যায়নি), ইহুদী ডাক্তার, উকীল প্র্যাকটিস করতে পারবে না—এটা ওরা গ্রহণ করতে পারে নি। এটা ১৯৩৪ সালের কথা। তখনো কনসানট্রেশন ক্যামপ আরম্ভ হয়নি। যখন আরম্ভ হল তখন আমি দেশে। যুদ্ধ পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। চিঠি-চাপাটির (১) গমনাগমন সম্পূর্ণ রুদ্ধ। কিন্তু আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ ছিল না যে লীজেলদের পরিবার এ-প্রকারের নিষ্ঠুর নরহত্যা শুধু যে ঘৃণার চোখে দেখবে তাই নয়, এরা যে এর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারছে না সেটা তাদের মনকে বিকল করে দেবে।...এ সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি যখন জর্মনি যাই, তখন লীজেল আমাকে বলেছিল, "ড্ হালুঙ্কে, তুই তো ভালো করেই চিনিস, আমাদের এই মুফেনডার্ফ গ্রাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের না হোক, জর্মনির ক্ষুদ্রতম গ্রাম। সেই হিসেবে আমার প্রখ্যাততম গ্রাম। এখানে মাত্র একটা দুটো ইহুদী পরিবার ছিল। দিদি সময়মত ওদেরকে সুইটজারল্যান্ডে পাচার করে দিয়েছিল।

এবারে আরম্ভ হবে ট্রাজেডি।

১। আমার এক গুণী সখা আমাকে একদা বলেন, "সিপাহী বিদ্রোহের" সময় চাপাটি-রুটীর মারফৎ "বিদ্রোহী"রা একে অন্যকে খবর পাঠাতো বলে "চিঠিচাপাটি" সমাসটি নির্মিত হয়। কোনো এবং কিংবা একাধিক বিদ্বজ্জন যদি এ-বিষয়ে "দেশ" পত্রিকায় সবিস্তর আলোচনা করেন তবে এ-অজ্ঞজন উপকৃত হবে। কিন্তু দয়া করে আমাকে সরাসবি লিখবেন না। এটা পাঞ্চজন্য। আমি ছাড়াও পাঁচজনের উপকাবার্থে।

মারিয়ানা বড় সরলা। এ-সব ব্যাপার নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাতো না। অবশ্য সেও ছিল আর দুই দিদির মত পরদুঃখ-কাতর।

বিয়ে করে বসলো এক প্রচণ্ড পাঁড় নাৎসিকে। কেন করলো, এ মূর্খকে শুধোবেন না। মেয়েরা কেন কার প্রেমে পড়ে, কেন কাকে বিয়ে করে এ-নিগূঢ় তত্ত্ব দেবতারাও আবিষ্কার করতে পারেননি।

তারপর যুদ্ধ লাগল। সেটা শেষ হল।

এইবারে মার্কিন ইংরেজদের কৃপায় দেশের শাসনভার পেলেন নাৎসি-বৈরীরা। এরা খুঁজে খুঁজে বের করলেন নাৎসিদের। তখন আরম্ভ হল তাদের উপর নির্যাতন। আজ ধরে নিয়ে যায়। তিন দিন তিন রাত্তির গারদে নির্জন কারাবাসের পর আপনাকে ছেড়ে দিল। আপনি ভাবলেন, যাক বাঁচা গেল। দশ দিন যেতে না যেতে আবার ভোর চারটেয় আপনাকে গ্রেফতার করে ঠাসলো গারদে। (এই যে আপনাকে ছেড়ে দিয়েছিল—সেটা শুধু আপনার পিছনে গোয়েন্দা রেখে ধরবার জন্য কারা কারা আপনার সহকর্মী ছিল; কারণ স্বভাবতই আপনি তাদেরই সন্ধানে বেরুবেন। দ্বিতীয়ত এরা আপনার দরদী বন্ধু। আপনার দৈন্য-দুর্দিনে একমাত্র তারাই আপনাকে সাহায্য করবে—অবশ্য যদি তাদের দু-পয়সা থাকে।...এটা কিছু নবীন ইতিহাস নয়। আমাদের এই স্বদেশী আন্দোলনের সময়, পরবর্তী যুগে "মহামান্য" টেগার্ট সাহেবের আমলে—

"বারে বারে সহস্র বাব হয়েছে এই খেলা।
দারুণ রাহু ভাবে তবু হবে না মোর বেলা॥")

সর্বশেষে মারিয়ানার স্বামীর তিন বছরের জেল হল। সেখানে যক্ষ্মা। বেরিয়ে এসে ছ-মাসের পরই ওপারে চলে গেল।

পাঠক ভাববেন না, আমি নাৎসি-বৈরীদের দোষ দিচ্ছি।

বার বার শুধু আমার মনে আসছে :—

এদেশের লোক সবাই কৃশ্চান।

এদেশের প্রভু, প্রভু খৃষ্ট আদেশ দিয়েছেন, ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা।

জানি, মানুষ এত উঁচুতে উঠতে পারে না।

কিন্তু সেই চেষ্টাতেই তো তার খৃষ্টত্ব তার মনুষ্যত্ব।

॥ ১৪ ॥

হুর্‌রে, হুর্‌রে, হুর্‌বে।

কৈশোরে অবশ্য আমরা বলতুম, হিপ্‌স্ হিপ্‌স্ হুর্‌রে।

পুরোপাক্কা ক্রেডিট নিশ্চয়ই অ্যারইন্ডিয়া কোম্পানির।...দীর্ঘ হাওয়াই মুসাফিরীর পর অঘোরে ঘুমিয়েছিলুম সকাল আটটা অবধি। নিচে নাবতেই লীজেল চেঁচিয়ে বললে, "ডু হালুঙ্কে"! তোর হারানো সুটকেস ফিরে পাওয়া গিয়েছে।"

"কি করে জানলি?"

"আমাদের তো টেলিফোন নেই। চল্লিশ বছর আগে এই গজেসবের্গের যে বাড়িতে তুই বাস করতিস তার টেলিফোন নম্বরটি তুই কলোনের "হারানো প্রাপ্তির" দফতরে

সুবুদ্ধিমানের মত দিয়ে এসেছিলি। আশ্চর্য। সে নম্বর তুই পুত-পুত করে এত বৎসর ধরে পুষে রেখেছিলি কি করে আর সেটা যে কলোনের সেই "হারানো প্রাপ্তির" দফতরে আপন স্মরণে এনে ওদের দিয়েছিলি সেটা আরও বিস্ময়জনক। তোর পেটে যে এত এলেম তা তো জানতুম না। আমি তো জানতুম তোর পশ্চাৎ দেশে টাইম বম রাখতে হয় (আমরা বাঙলায় বলি "পেটে বোমা না মারলে কথা বেরয় না"), ফিউজের হিসহিস শুনে তবে তোর বুদ্ধি খোলে। সে-কথা থাক। কলোনের দফতর সেই নম্বরে ফোন করে, আর তোর সেই প্রাচীন দিনের ল্যান্ডলেডির মেয়ে "'আনা" সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেল তুই আমাদের বাড়িতে উঠেছিস। তা ছাড়া যাবি আর কোন্ চুলোয়। আনা-র বিয়ে হয়েছে এক যুগ আগে। ভাতার আর বাচ্চা দুটো রয়েছে। তাই সেখানে না উঠে আমাকে আপ্যায়িত করতে এসেছিস। ফের বলছি সে-কথা থাক। আনা কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়ে—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "হবে না কেন? আমি ওদের বাড়িতে ঝাড়া একটি বচ্ছর ছিলুম। আমার সঙ্গ পেয়েছে বিস্তর।"

লীজেল আমার দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে কোনো মন্তব্য না করে বললে, "সে জানে আমাদের টেলিফোন নেই। কিন্তু আমাদের পাশের বাড়ির মহিলার আছে। তাকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে যে তোর সুটকেসটি পাওয়া গিয়েছে এবং কলোন দফতরে জমা পড়েছে।"

আমি বললুম, "সর্বনাশ। আমাকে এখন ঠ্যাঙস ঠ্যাঙস করে যেতে হবে সেই ধেড়ধেড়ে-গোবিন্দপুর কলোনে? আধ-খানা দিন তাতেই কেটে যাবে। হেথায় এসেছি কদিনের তরে! তারও নিরেট চারটি ঘণ্টা মেরে দিয়েছে জুরিক। কনেকশন ছিল না বলে। আমি—"

লীজেল বাধা দিয়ে বললে, "চল্লিশ বৎসর পূর্বে প্রাথমিক পরিচয়ে তোকে যে একটা আকাট মূর্খ ঠাউবেছিলুম সেটা কিছু ভুল নয়; কলোনের দফতরে তোব প্র্যাকটিকাল বুদ্ধি ব্যত্যয়। অবশ্য আমি কখনো বলিনে, একসেপশন প্রুভজ দি রুল। আমি বলি, রুল প্রুভজ দি একসেপশন। তোর সুটকেস তারাই এখানে পৌঁছে দেবে।"

ওঃ। কী আনন্দ কী আনন্দ। কাল রাত্রে ভয়ে ভয়ে আমি আমাব হারিয়ে না-যাওযা সুটকেসটি খুলিনি। যদি দেখি, এদের এবং আমার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের জন্য ছোটখাটো যে-সব সওগাত এনেছি সেগুলো এই বড় সুটকেসটিতে নেই! এটাকেই নাকি বিদেশী ভাষায় বলে অসট্রিচ মনোবৃত্তি।

ইতিমধ্যে বাড়ির সদর দরজাতে ঘা পড়লো। লীজেল সেথায গিয়ে কি যেন কথাবার্তা কইলে। মিনিট দুই পরে সেই হারিয়ে-যাওয়া-ফিরে-পাওয়া সুটকেসটি নিয়ে এসে আমার সামনে রেখে বললে, "তোদের এ্যার-কোম্পানি তো বেশ স্মার্ট : কমপিটেন্ট্। এত তড়িঘড়ি হুলিয়া ছেড়ে, বাক্সটাকে ঠিক ঠিক পকড় করে তোর কাছে পৌঁছে দিলে!" আমার ছাতি—সুশীল পাঠক, ইঞ্চি ছয়—মাফ কববেন আজকাল নাকি তাবৎ মাপ সেন্টিমীটার মিলিমীটারে বলতে হয়—অর্থাৎ ১৫ মিলিমীটার (কিংবা সেন্টিমীটারও হতে পারে—আমার প্রিন্স্ অব্ ওয়েলস অর্থাৎ বড় বাবাজী যে ইসকেলখানা রেখে দিয়ে ঢাকা চলে গিয়েছেন সেটাতে তার হদীস মেলে না) ফুলে উঠলো।

বাক্সোটা খুলে দেখি, আমার মিত্র যে-সব বস্তু খাদী প্রতিষ্ঠান থেকে কিনে দিয়েছিল

তার সবই রয়েছে। (১) বারোখানা মুর্শিদাবাদী রেশমের স্কার্ফ, (২) উড়িষ্যায় মোষের শিঙে তৈরী ছটি হাতি, (৩) পূর্ববৎ ঐ দেশেরই তৈরী পিঠ চুলকনোর জন্য ইয়া লম্বা হাতল, (৪) দশ বাণ্ডিল বিড়ি (এগুলো অবশ্য লীজেল পরিবারের জন্য নয়; এগুলো আমার অন্য বন্ধুর জন্য), (৫) ভিন্ন ভিন্ন গরম মশলা এবং আচার, (৬) বর্ধমানের রাজপরিবারের আমার একটি প্রিয় বান্ধবীর দেওয়া একখানি মাকড়সাব জালের মত সুক্ষ্ম স্কার্ফ (তাঁর শর্ত ছিল সেটি যেন আমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠা বান্ধবীকে দি), (৭) তিনটি ফার্স্টক্লাস বেনারসী রেশমের টাই, কাশ্মীরের ম্যাংগো ডিজাইনের শালের মত ওগুলো বর্ধমানেরই দেওয়া, (৮) দুই-পৌন্ড দক্ষিণ ভারতের কফি ও পূর্ববৎ ওজনে দার্জিলিঙের চা।...এবং একখানা বই ঠাকুর রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে—তাঁর এক বিশেষ পূজারিণীর জন্য, তিনি বাস করেন সুইটজারল্যান্ডে। আর কি কি ছিল ঠিক ঠিক মনে পড়ছে না। বেশ কিছু কাসুন্দোও ছিল। এই ইয়োরোপীয়ানদের বড্ডই দেমাক, তাদের মাস্টার্ড নিয়ে। দম্ভজনিত আমাব উদ্দেশ্য ছিল, এদেরকে দেখানো যে আমাদের বাংলাদেশের কাসুন্দো এ-লাইনে অনির্বচনীয়, অতুলনীয়। পাউডার দিয়ে তৈরী ওদের মাস্টার্ড দুদিন যেতে না যেতেই মসনে ধরে সবুজ হয়ে অখাদ্যে পরিবর্তিত হয়। আর আমাদের কাসুন্দো? মাসের পব মাস নির্বিকার ব্রহ্মেব মত অপরিবর্তনশীল।

লীজেলকে বললুম, "দিদি, এসব জিনিস ঐ বড টেবিলটাব উপর সাজিয়ে রাখ। আর খবর দে উীটরিয্ ও তার বউকে। মাবিয়ানা আর তুই তো আছিসই। যার যা পছন্দ তুলে নেবে।"

লীজেল বললে, "এটা কি ঠিক হচ্ছে? এখান থেকে তুই যাবি ড্যুসলডর্ফে—সেখানে তোব বন্ধু পাউল আব তার বউ রয়েছে। তারপর যাবি হামবুর্গে; সেখানে তোর বান্ধবীর (তিনি গত হয়েছেন) তিনটি মেয়ে বয়েছেন। তাবপব যাবি স্টুটগার্ট-এ। সেখানে বয়েছেন তোব ফার্স্ট লভ। এখানেই যদি ভালো ভালো সওগাৎ বিলিয়ে দিস তবে ওবা পাবে কি?"

একেই বঙ্গভাষায় বলে, পাকা গৃহিণী। কোন্ গযনা কে পাবে জানে॥

॥ ১৫ ॥

গডেসবের্গ সত্যই বড সুন্দর। এ শহরের সৌন্দর্য আমাকে বার বার আহ্বান কবেছে। রাস্তাগুলো খুবই নির্জন। এতই নির্জন যে পথে কারো সঙ্গে দেখা হলে, সে সম্পূর্ণ অচেনা হলেও, আপনাকে অভিবাদন জানিয়ে বলবে, "গুটেন টাহ্"। আপনিও তাই বলবেন। রাস্তার দুপাশে ছোট ছোট গেবস্ত-বাড়ি। সবাই বাড়ির সামনে যেটুকু ফাঁকা জায়গা আছে তাতে ফুল ফুটিযেছে। যদি কোন বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আপনি ফুলগুলোর দিকে মুগ্ধনয়নে তাকিয়ে থাকেন তবে প্রাযই বাড়ির কর্তা কিংবা গিন্নি কিংবা তাদেব ছেলেমেয়েদের একজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপনার সঙ্গে কথা জুড়ে বসবে। শেষটায় বলবে, "আপনিও আমাদেবই একজন; কিছু ফুলটুল চাই? বলুন না, কোন্‌গুলো পছন্দ হয়েছে।" তারপর একগাল হেসে হয়ত বলবে, "প্রেমে পড়েছেন নাকি? তাহলে লাল ফুল। হাসপাতালে রুগী দেখতে যাচ্ছেন নাকি? তাহলে সাদা ফুল।" আমি একবাব শুধিয়েছিলুম, "আর যদি আমার প্রিয়ার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে থাকে, তাহলে কি ফুল

পাঠাব?" যাঁকে শুধিয়েছিলুম তিনি দুগাল হেসে বলেছিলেন, "সবুজ ফুল। সবুজ ঈর্ষার রং।" আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, "সবুজ ফুল তো এদেশে দেখিনি কখনো। আমাদের দেশেও সবুজ ফুল একেবারেই বিরল।" ভদ্রলোক বললেন, "আমাদের দেশেও। কিন্তু আমাদের এক প্রতিবেশীর বাড়িতে সবুজ ফুল আছে। আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।" "ও মশাই, দাঁড়ান দাঁড়ান, আমার সবুজ ফুলের তেমন কোনো প্রয়োজন নেই—ও মশাই—"

কিন্তু কে বা শোনে কার কথা!

মিনিট দুই যেতে না যেতেই সেই মহাত্মার পুনরাবির্ভাব। হাতে একটি সবুজ গোলাপ। চোখে মুখে যে-আনন্দ তার থেকে মনে হলো তিনি যেন বাকিংহাম প্রাসাদ কিংবা কুতুবমিনার কিংবা উভয়ই কুড়িয়ে এনেছেন। আমি বিস্তর "ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ডাঙ্কে শ্যোন্, ডাঙ্কে রেষ্ট্ শ্যোন্" বলে অজস্র ধন্যবাদ জানালুম।

ইতিমধ্যে বাড়িব দরজা খুলে গেল। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের একটি মহিলা ডেকে বললেন, "ওগো, তোমার কফি—"

হঠাৎ আমাকে দেখে কেমন যেন চুপসে গেলেন।

ভদ্রলোক বললেন, "চলুন না। এক পাত্র কফি—হেঁ হেঁ—"

আমি বললুম, "কিন্তু আপনার গৃহিণী—?"

"না, না, না,—আপনি চিন্তা করবেন না। আমার গৃহিণী খাণ্ডারিণী নয়। অবশ্য সে আপনাকে কখনো দেখেনি। চলুন চলুন।"

বসার ঘরে ঢুকে ভদ্রলোক আমাকে কফি টেবিলের পাশে সযত্নে বসিয়ে বললেন, "আপনাকে চল্লিশ বৎসর পূর্বে কত না দেখেছি। আমার বয়েস তখন চৌদ্দ-পনেরো। কিন্তু ভয়ে আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে পারিনি—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "সে কি?"

"এজ্ঞে, আমি জানতুম, আপনি ইন্ডিয়ান। আর ইন্ডিয়ানরা সব ফিলসফার। তারা যত্রতত্র যার তার সঙ্গে কথা কয় না। তাই। আপনি ধীরে ধীরে পা ফেলে ফেলে যেতেন রাইন নদের পারে। আমি কত না দিন আপনার পিছন পিছন গিয়েছি—। আপনি একটি বেঞ্চিতে বসে রাইনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন ভাবতেন। তখন কি আর বিরক্ত করা যায়?"

আমি বললুম, "ব্রাদার, এটা বড় ভুল করেছ। তখন আমার সঙ্গে কথা কইলে বড্ডই খুশী হতুম।"

ইতিমধ্যে বাড়ির গৃহিণী কেক ইত্যাদি নিয়ে এসে আমাদের টেবিলে রাখলেন। তাঁর গাল-দুটো আরো লাল হয়ে গিয়েছে, ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরছে এবং তিনি হাঁপাচ্ছেন। অর্থাৎ এ-পাড়ায় কোনো কেকের দোকান নেই বলে তিনি কুড়ি মিনিটের রাস্তা ঠেঙিয়ে কেক টার্ট নিয়ে এসেছেন।

এস্থলে যে-কোনো ভদ্রসন্তান ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মাফ চাইতো। বলতো, "এ-সবের কি প্রয়োজন ছিল?" কিন্তু আমি চাইনি। আমাকে বেয়াদব, মূর্খ, যা খুশী বলতে পারেন।

আমি শুধু আমার পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে তাঁব কপালটি মুছে দিলুম।

হুম্‌বল্‌ট্‌ স্টিফ্‌টুঙ্‌

ভ্রমণকাহিনী লিখতে লিখতে মানুষ আশকথা পাশকথার উত্থাপন করে। গুণীরা বলেন এটা কিছু দুষ্কর্ম নয়। সদর রাস্তা ছেড়ে পথিক যদি পথের ভুলে আশপথ পাশপথে না যায় তবে অচেনা ফুলের নয়া নয়া পাখির সঙ্গে তার পরিচয় হবে কি প্রকারে? কবিগুরুও বলেছেন,

"যে পথিক পথের ভুলে,
এল মোর প্রাণের কূলে—"

অর্থাৎ প্রণয় পর্যন্ত হতে পারে। তাই আমি যদি মাঝে মধ্যে এদিক ওদিক ছিটকে পড়ি তবে সহৃদয় পাঠক অপরাধ নেবেন না।

আলেকজান্ডার ফন্‌ হুম্‌বল্‌টের নাম কে না শুনেছে? নেপোলিয়ন গ্যোটে শিলারের সমসাময়িক। দুই কবির সঙ্গে তাঁর ভাবের আদান-প্রদান হত। এবং অনেকেই বলেন, ঐ সময়ে পাশ্চাত্ত্য মহাদেশগুলোতে নেপোলিয়নের পরেই ছিল হুম্‌বল্‌টের সুখ্যাতি। আসলে তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক এবং পর্যটক—ওদিকে কাব্য দর্শন অলঙ্কার শাস্ত্রের সঙ্গেও সুপরিচিত।

কিন্তু তার পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়া আমার শক্তির বাইবে এবং সে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এ-লেখাটি আরম্ভও কবিনি।

হুম্‌বল্‌ট্‌ গত হন ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। যেহেতু তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক যোগাযোগের জন্য (দক্ষিণ আমেবিকা থেকে ককেশাস সাইবীরিয়া পর্যন্ত) অতিশয় সযত্নবান ছিলেন তাই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বার্লিনের জর্মন পররাষ্ট্র দফতরের উৎসাহে ঐ দেশের জনসাধারণ একটি প্রতিষ্ঠান—এন্‌ডাওমেন্ট দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, ওযাকফ্‌, যা খুশী বলতে পারেন—নির্মাণ করলো : নাম আলেকজান্ডার ফন্‌ হুম্‌বল্‌ট্‌ স্টিফ্‌টুঙ্‌। তাদের একমাত্র কর্ম তখন ছিল বিদেশী ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে জর্মনিতে পড়াশুনো কবার ব্যবস্থা করে দেওযা। আমার বড়ই বিস্ময় বোধ হয়, জর্মনির ঐ দুর্দিনে (ইনফ্লেশন সবে শেষ হযেছে; তার খোঁয়ারী তখনো কাটেনি) সে কি করে এ-প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করলো? আমরা বলি "আপনি পায় না খেতে—"। অনেক চিন্তা করে বুঝেছিলুম, দয়াদাক্ষিণ্য আর্থিক সচ্ছলতাব উপর নির্ভর করে না। লক্ষপতি ভিখিরিকে একটা কানাকড়ি দেয় না, অথচ আমি আপন চোখে দেখেছি এক চক্ষুষ্মান ভিখিরি এক অন্ধ ভিখিরিকে আপন ভিক্ষালব্ধ দু-চার আনা থেকে দু-পয়সা দিতে। আমার এক চেলা এদানিং আমাকে জানালে গঙ্গাস্বরূপা ইন্দিরাজীও নাকি বলছেন, গরীবই গবীবকে মদৎ দেয।

সে আমলে ইন্ডিয়া পেত মাত্র একটি স্কলারশিপ—আজ অনেক বেশী পায়।* সেটি পেলেন আমার বন্ধু সতীর্থ বাসুদেব বিশ্বনাথ গোখলে।** ইনি সর্বজনপূজ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বর গোখলের ভ্রাতুষ্পুত্র। তার চার বৎসর পর পেলুম আমি।

---

* দয়া কবে আমাকে প্রশ্ন শুধিয়ে চিঠি লিখবেন না, কি কৌশলে এ স্কলারশিপ পাওযা যায়।

** দয়া করে "গোখেল" উচ্চারণ করবেন না।

সে-কথা থাক। মাঝে মাঝে গাধাও রাজমুকুট পেয়ে যায়।...

গোডের্স-বের্গ শহরের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখি, একটি বাড়ির সম্মুখে মোটা মোটা হরফে লেখা,

আলেকজান্ডার ফন
হুম্‌বল্‌ট স্টিফ্‌টুঙ্‌

আমারে তখন আর পায় কে? লম্বা লম্বা পা ফেলে তদ্দণ্ডেই সে বাড়িতে উঠলুম।

আমি অবশ্যই আশা করিনি যে সেই চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার লোক এ আপিস চালাবেন।

কিন্তু এনারাও ভদ্রলোক। অতিশয় ভদ্রভাবে শুধোলেন,

"আপনি কোন্ সালে হুম্‌বল্‌ট্ বৃত্তি পেয়েছিলেন?"

"১৯২৯।"

ভদ্রলোক যেন সাপের ছোবল খেয়ে লম্ফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

আমিও তাজ্জব বনে গিয়ে বললুম, "কি হল?"

"কী! চল্লিশ বছর পূর্বে!"

"এজ্ঞে হাঁ।"

"মাইন গট্ (মাই গড্), এত প্রাচীন দিনেব কোনো স্কলাবশিপ-হোল্ডাবকে আমি তো কখনো দেখিনি!"

আমি একটুখানি সাহস পেয়ে বললুম, "ব্রাদার, ইহ-সংসারে তুমিও অনেক কিছু দেখোনি, আম্মো দেখিনি। তুমি কি আপন পিঠ কখনো দেখেছ? তাই কি সেটা নেই?"

যেহেতু আমি এ-বাড়িতে ঢোকার সময় আমার ভিজিটিং কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, তাই তাবা ইতিমধ্যে চেক-আপ কবে নিয়েছে, আমি সত্য সত্যই ১৯২৯-এ স্কলাবশিপ পেয়ে এ-দেশে এসেছিলুম।

হঠাৎ ভদ্রলোকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

"অ—অ—অ। জানেন, আপনি আমাদের প্রাচীনতম স্কলারশিপ-হোল্ডার?"

আমি সবিনয় বললুম, "তা হলে আমাকে আপনাদের প্রাচ্যদেশীয় যাদুঘরে পাঠিয়ে দিন। টুটেনখামের মমির পাশে কিংবা রানী নফ্রেটাট্রির পাশে আমাকে শুইয়ে দাও।"

॥ ১৭ ॥

সুইটজারল্যান্ড, জর্মনি, ডেনমার্ক, নবওয়ে, সুইডেনে টাকাকড়িব এমনই ছড়াছড়ি, সে কড়ি কি কবে খরচ করবে যেন সেটা ভেবেই পায না। বিশ্বময সঠিক বলতে পারবো না, তবে বোধ হয় চীন এবং লৌহ-যবনিকার অন্তরালের দেশগুলো এখনও অপাংক্তেয়। গণ্ডায় গণ্ডায় স্কলারশিপ ছড়ানোর পবও হুমবল্‌ট্ ওয়াক্‌ফের হাতে বেশ-কিছু টাকা বেঁচে যায।

তাই তারা প্রতি বৎসর একটা জব্বর পরব করে। তিন দিন ধরে। জর্মনিতে যে শত শত হুম্‌বল্‌ট্ স্কলার ছড়িয়ে আছে এবং যারা একদা স্কলার ছিল, উপস্থিত জর্মনিতেই কাজকর্ম করে পয়সা কামাচ্ছে, তাদের সব্বাইকে তিন দিনের তরে বাড্ গডেসবের্গে

নেমন্তন্ন জানায়। যারা বিবাহিত, তাদের বউ কাচ্চাবাচ্চা সহ;—বলা বাহুল্য ঐ উপরোক্ত সম্প্রদায়, যারা কাজকর্ম করে পয়সা কামায়। আসা-যাওয়ার ট্রেনভাড়া, হোটেলের খাইখর্চা, তিন দিন ধরে নানাবিধ মীটিং পরব নৃত্যগীত অনুষ্ঠানে যাবার জন্য মোটর গাড়ি—এক কথায় সব—সব। প্রাচীন দিনে আমাদের দেশে যে-রকম জমিদার বাড়িতে বিয়ের সময় দশখানা গাঁয়ের বাড়িতে তিন দিন ধরে উনুন জ্বালানো হত না।

হ্যার পাপেনফুস্ স্টিফ্‌টুঙের অন্যতম কর্তাব্যক্তি। আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে বললেন, "আপনার তুলনায় জর্মনিতে উপস্থিত যে-সব প্রাক্তন স্কলার আছেন তাঁরা নিতান্তই শিশু—"

আমি বললুম, "আমার হেঁটোর .বয়স।"

পাপেনফুস্ ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন। অর্থাৎ বুঝতে পারেননি। সব দেশের ইডিয়ম, প্রবাদ তো একই ছাঁচে তৈরী হয় না। আমি বুঝতে দেওয়ার পর বললুম, "আমাকে যে আপনাদের পরবে নিমন্ত্রণ করেছেন তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাদের পরব আসছে সপ্তাহ তিনেক পরে। ওদিকে আমাকে যেতে হবে কলোন, ড্যুস্‌ল্‌ডর্ফ, হামবুর্গ, স্টুটগার্ট—এবং সর্বশেষে স্টুটগার্ট থেকে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে পাড়াগাঁয়ে আমার প্রাচীন দিনের এক বিধবা বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে। আমরা এক সঙ্গে পড়াশুনো করেছি। তার অর্থ আমার স্কলাবশিপের মত তিনিও চল্লিশ বছরের পুরানো—প্লাস তাঁর বয়স।"

লক্ষ্য করলুম, যে তৃতীয় ব্যক্তি "সভাস্থলে" উপস্থিত ছিলেন তাঁর চোখে ঠোঁটে কেমন যেন একটুখানি মৃদু হাসি খেলে গেল। এর অর্থ হতে পারে :—

(১) এ তো বড় আশ্চর্য। ষাট বছর বয়সের প্রাচীনা প্রিয়ার অভিসারে যাচ্ছে এই নাগব।

কিংবা

(২) এর এক-প্রিয়া-নিষ্ঠতাকে তো ধন্যি মানতে হয়।

(রামচন্দ্রকে বলা হয় একদারনিষ্ঠ)।

ইতিমধ্যে কর্তা বললেন, "সে কি কথা। আপনি আসবেন না, সে তো হতেই পাবে না। আপনাব ভাষায়ই বলি, আপনাব মত "মিউজিয়ম পীস" আমাদের কর্তাব্যক্তিদের গুণীজ্ঞানীদের দেখাতে পারবো না, সে কি একটা কাজের কথা হল? ওনাদের অনেকেই ভাবেন, আমাদের আলেকজান্ডার ফন্ হুম্‌বল্‌ট্ স্টিফ্‌টুঙ্ বুঝি পরশু দিনের বাচ্চা। অথচ আমাদের প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করে সেই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে—অবশ্য যুদ্ধের ফলস্বরূপ জর্মনি যখন তছনছ হয়ে গেল তখন কয়েক বৎসর প্রতিষ্ঠান দেউলে হয়ে রইল। এঁদের আমি দোষ দিই নে—সব জর্মনই তো ঐতিহাসিক মসজেন হয় না। অতএব চল্লিশ বছরের পূর্বেকার জলজ্যান্ত একজন বৃত্তিধারীকে যদি ওদের সামনে তুলে ধরতে পারি, তখন হুজুরদের পেত্যয় যাবে—"

আমি মনে মনে বললুম, "ঈশ্বর রক্ষতু। যাদুঘরে যে-রকম পেডেস্টালের উপর গ্রীক মূর্তি খাড়া করে রাখে, সে-রকম নয় তো। তা করুক, কিন্তু জামাকাপড় কেড়ে নিয়ে লজ্জা নিবারণার্থে কুল্লে একখানা ডুমুরপাতা পরিয়ে দিলেই তো চিত্তির—"

কর্তা বলে যেতে লাগলেন, "আপনি পরবের সময় কন্টিনেন্টে যেখানেই থাকুন না কেন আমরা সানন্দে আপনাকে একখানা রিটার্ন টিকিট পাঠিয়ে দেব। এখানে হোটেলের

ব্যবস্থা, যানবাহন সবই তো আমরা করে থাকি। তারপর আপনি ফিরে যাবেন আপন মোকামে।" বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, "আপনি কি মাত্র তিনটি দিনও স্পেয়ার করতে পারবেন না?...আচ্ছা, তবে এখন চলুন আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে।"

বড্ডই নেমকহারামী হয়। তদুপরি এরা আমাকে আবার দুই যুগ পরে আবার নেমক দিতে চায়। একদা যে প্রতিষ্ঠান যে জর্মন জাত এই তরুণকে স্কলারশিপ-নেমক দিয়েছিলেন, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে, তাদেরকে নিরাশ করি কি প্রকারে?

আমি সকৃতজ্ঞ পরিপূর্ণ সম্মতি জানালুম।

রেস্তোরাঁটি সাদামাঠা, নিরিবিলি ছোটখাটো ঘরোয়া। ব্যান্ডবাদ্যি, জ্যাজ্ ম্যুজিক, খাপসুরৎ তরুণীদের ঝামেলা কোনো উৎপাতই নেই। বুঝতে কোনো অসুবিধা হল না যে এ-রেস্তোরাঁতে আসেন নিকটস্থ আপিস-দফতরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা। তার অন্যতম প্রধান কারণ "মেনু" (খাদ্যনির্ঘণ্ট) দেখেই আমার চক্ষুস্থির। তড়িতেই হিসেব করে দেখলুম এখানে অতি সাধারণ লাঞ্চ খেতে হলেও নিদেন পনেরো মার্ক লাগবার কথা। আমাদের হিসেবে তিনখানা করকরে দশ টাকার নোট! অবশ্য গচ্চাটা আমাকে দিতে হবে না। কারণ ওঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন। এবং এ-দেশের রেস্তোরাঁতে যে ব্যক্তি অর্ডার দিল সে-ই পেমেন্ট করবে—যে খেলো তার কোনো দায় নেই।

কিন্তু এ-স্থলে সেটা তো কোনো কাজের কথা নয়।

যাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন তাঁরা আমাকে মেনু এগিয়ে দিয়ে বলেছেন, "কি খাবেন, বলুন।" আমি কি তখন তাদের ঘাড় মটকাবো!

আমি শুধোলুম, "আপনারা কি এই রেস্তোরাঁতেই প্রতিদিন লাঞ্চ খেতে আসেন?"

"এজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি খান; মানে, কোন্ কোন্ পদ।"

"সুপ, মাংস আর পুডিং। কখনো বা আইসক্রীম—তবে সেটা বেশীর ভাগ গ্রীষ্মকালে। মাঝেমধ্যে শীতকালেও।"

আমি অবাক হয়ে শুধোলুম, "শীতকালে আইসক্রীম!"

তখন আমার মনে পড়লো, আমরাও তো দারুণ গরমের দিনে গরমোতর চা খাই। তবে এরাই বা শীতকালে আইসক্রীম খাবে না কেন?

আমি অতিশয় সাদামাঠা লাঞ্চ অর্ডার দিলাম। যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে তার গলা মটকাতে নেই।

॥ ১৮ ॥

আহারাদির কেচ্ছা শুরু হলেই আমি যে বে-এক্তেয়ার হয়ে যাই আমার সম্বন্ধে সে বদনাম এতই দীর্ঘকালের যে তার সাফাই এখন বেবাক তামাদি—ইংরিজি আইনের ভাষায় "টাইম-বার" না কি যেন বলে—হয়ে গিয়েছে। তাই পাঠক "ধর্মাবতারের" সমুখে করজোড়ে স্বীকার করে নিচ্ছি—"আমি দোষী, অপরাধ করেছি।"

কিন্তু আমি জাত-ক্রিমিনাল। আমার মিত্র এবং পৃষ্ঠপোষক জনৈক জেল-সুপারিনটেনডেনট তাঁর একাধিক প্রামাণিক পুস্তকে লিখেছেন, এই বঙ্গদেশে "জাত-

ক্রিমিনাল” হয় না। হুঁ! আমি যে জাত-ক্রিমিনাল সেটা জানার পূর্বেই তিনি এসব দায়িত্বহীন “বাক্যবিন্যাস” করেছেন। তাই আমি আবার সেই লাঞ্চের বর্ণনা পুনরায় দেব।

সুপ আমি বড্ড বেশী একটা ভালোবাসিনে।

এ বাবদে কিন্তু আমি সমুদ্রের বেলাভূমিতে সম্পূর্ণ একাকী নুড়ি নই। ডাচেস অব উইন্ডসর (উচ্চারণ নাকি “উইনজার”) অতি উত্তম রান্নাবান্না করতে পারেন। তা সে অনেকেই পারেন। কিন্তু তিনি আরেকটি ব্যাপারে অসাধারণ হুনুরি। ভোজনটি কি প্রকারে “কমপোজ” করতে হবে—এ-তত্ত্বটি তিনি খুব ভালো করে জানেন।

অপরাধ নেবেন না। আমরা বাঙালী মাত্রই ভাবি, ভোজনে যত বেশী পদ দেওয়া হয় ততই তার খানদানীত্ব বেড়ে যায়। তিন রকমের ডাল, পাঁচ রকমের চচ্চড়ি, তিন রকমের মাছ, দু-তিন রকমের মাংস, চিনি-পাতা দই আর কত হরেক রকমের মিষ্টি তার হিসেব না-ই বা দিলুম।

আর প্রায় সব-কটাই অখাদ্য। কারণ, এতগুলো পদের জন্য তো এতগুলো উনুন করা যায় না, গোটা দশেক পাচক ডাকা যায় না। অতএব বেগুন ভাজা মেগনোলিয়ার আইসক্রিমের মত হিম, চিনি-পাতা দই পাঞ্জাব মেলের এনজিনের মত, গরম লুচি কুকুরের জিভের মত চ্যাপটা, লম্বা—খেতে গেলে রবারের মত। আজকাল আবার ফ্যাশন হয়েছে ঘি-ভাত বা পোলাউয়ের বদলে চীনা ফ্রাইড রাইস। চীনারা ‘র’ উচ্চারণ কবতে পারে না। অতএব বলে “ফ্রাইড লাইস”—অর্থাৎ “ভাজা উকুন”! তা সে যে উচ্চারণই করুক আমার তাতে কানাকড়ি মাত্র আপত্তি নেই। শুনেছি, মহাকবি শেকসপীয়র বলেছেন, “গোলাপে যে-নামে ডাকো গন্ধ বিতরে।” তাই “ফ্রাইড রাইস” বলুন বা “ফ্রাইড লাইস”ই বলুন—সোওযাদটি উত্তম হলেই হল। কিন্তু আজকালকার কেটারাররা (হে ভগবান, এই সম্প্রদায়কে বিনষ্ট করার জন্য আমি চেঙ্গিস খান হতে রাজী আছি) নেটিভ পাচক দিয়ে “ফ্রাইড লাইস” নির্মাণ করেন। সত্য সত্য তিন সত্য বলছি, সে মহামূল্য সম্পদ জিহ্বাগ্র স্পর্শ করাব পূর্বেই আপনি বুঝে যাবেন এই অভূতপূর্ব বস্তু “উকুন ভাজা”। আলবৎ আমি নতমস্তকে স্বীকার কবছি, “উকুন ভাজা” আমি এই কেটারার-সম্প্রদায়ের অবদান মেহেরবাণীর পূর্বে কখনো খাইনি। তাই গোড়াতেই বলেছি, আমরা মেনু কম্পোজ করতে জানিনে।

তা সে থাক, তা সে যাক। পরনিন্দা মহাপাপ। এখানেই ক্ষান্ত দি। বয়স যত বাড়ে মানুষ ততই খিটখিটে হয়ে যায়।

পুরনো কথায় ফিরে যাই। ডাচেস অব উইনজার নাকি তাঁর লাঞ্চ-ডিনারে নিমন্ত্রিতজনকে কখনো সুপ পরিবেশন করেন না। অতিশয় অভিজ্ঞতালব্ধ তাঁর বক্তব্য : “এই যে বাবুরা এখন ডিনার খেতে যাবেন তার আগে তেনারা গিলেছেন গ্যালন গ্যালন ককটেল, হুইস্কি। জালা জালা শেরি, পোর্ট। সক্কলেরই পেট তরল বস্তুতে টইটম্বুর—ছয়লাপও বলতে পারেন। ডাচেসের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাপ্রসূত সুচিন্তিত অভিমত : এর পরও যদি হুজুররা তরল দ্রব্য সুপ পেটে ঢোকান তবে, তারপর আর রোস্ট ইত্যাদি নিরেট সলিড দ্রব্য খাবেন কি প্রকারে? তাই তাঁর ডিনারে “নো সুপ!” অবশ্য ডাচেস সহৃদয়া মহিলা। কাজেই যাঁরা নিতান্তই সুপাসক্ত তাঁদের জন্য সুপ আসে। ওদেরকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য তিনিও মাঝে মাঝে দু-চার চামচ সুপ গল্যাতে ঢালেন।

অতএব আমাকেও নিতান্ত সঙ্গ দেওয়ার জন্য হুম্‌বলট্‌ স্টিফ্‌টুঙ প্রদত্ত লাঞ্চে কিঞ্চিৎ সুপ সেবন করতে হল।

বাঃ! উত্তম সুপ! ব্যাপারটা তা হলে ভালো করে বুঝিয়ে বলি।

যে সব দেশের কলোনি নেই—বিশেষ ভারত, সিংহল কিংবা ইন্ডোনেশিয়ার—তারা গরম মশলা পাবে কোত্থেকে? কেনার জন্য অত রেস্ত কোথায়? শত শত বৎসর ধরে তাদের ছোঁকছোঁকানি শুধু গোলমরিচের জন্য। শুনেছি, ভাস্কো দা গামা ঐ গোলমরিচের জন্য অশেষ ক্লেশ করে দক্ষিণ ভারতে এসেছিলেন। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, কলমবসও নাকি ঐ একই মতলব নিয়ে সাপ খুঁজতে গিয়ে কেঁচো পেয়ে গেলেন—অর্থাৎ ভারতবর্ষ আবিষ্কার কবতে গিয়ে আমেরিকায় পৌঁছে গেলেন। এর পর ইয়োরোপীয়রা দক্ষিণ আমেরিকায় ঝাল লাল লঙ্কা আবিষ্কার করলো, কিন্তু ওটা ওদের ঠিক পছন্দ হল না। যদ্যপি আমরা ভারতীয়রা সেটি পরমানন্দে আলিঙ্গন করে গ্রহণ করলুম।

ইতিহাস দীর্ঘতর কববো না।

ইতিমধ্যে জর্মনির এতই ধনদৌলত বেড়ে গিয়েছে যে, এখন সে শুধু কালা মরিচ কিনেই পরিতৃপ্ত নয়—এখন সে কেনে দুনিয়ার যত মশলা। বিশেষ করে "কারি পাউডার" আর লবঙ্গ, এলাচি, ধনে ইত্যাদির তো কথাই নেই। তবে কি না আমি কন্টিনেন্টের কুত্রাপি কাঁচা সবুজ ধনেপাতা দেখিনি। কিন্তু ভয় নেই, কিংবা ভয় হয়তো সেখানেই। যেদিন কন্টিনেন্টেব কুবেব সন্তানবা ধনে-পাতা-লঙ্কা-তেঁতুল-তেলেব চাটনির সোয়াদটা বুঝে যাবেন, সেদিন হবে আমাদের সর্বনাশ। হাওযাই জাহাজেব কল্যাণে কুল্লে ধনে-পাতা হিল্লি-দিল্লী হযে চলে যাবেন কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে। এটা তো এমন কিছু নয়া অভিজ্ঞতা নয। ভাবত বাংলাদেশেব বহু জাযগাতেই আজ আপনি আর চিংড়ি মাছ পাবেন না। টিনে ভর্তি হয়ে তাঁরা আপনার উদরে না এসে সাধনোচিত ধামে (অর্থাৎ কন্টিনেন্টে—যেখানে চিংডি মাছ কেন সর্ব ভারতীয় যুবকই যেতে চায) প্রস্থান করেন। একমাত্র কোলা ব্যাঙ সম্বন্ধেই আমাদের কোনো দুঃখ নেই। যাক, যত খুশী যাক। ওটা ফরাসীদের বড়ই প্রিয খাদ্য। তবে কিনা বাঙালোর থেকে তারস্বরে এক ভদ্রলোক প্রতিবাদ কবেছেন, পাইকিবি হিসেবে এ-ভাবে কোলা ব্যাঙ বিদেশে রফতানী কবাব ফলে ঐ অঞ্চলে মশাব উৎপাত দুর্দান্তরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে; কাবণ ঐ কোলা ব্যাঙরাই মশাব ডিম খেয়ে তাদের বংশবৃদ্ধিতে বিঘ্নসৃষ্টি করতো।

এটা অবশ্যই সমস্যা—দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আমার ভাবনা কি? আমার তো একটা মশাবি আছে।

॥ ১৯ ॥

"গুর্‌মে" ভোজনরসিকরা বলেন, সুইটজাবল্যান্ডের জর্মন ভাষী অঞ্চলের খাদ্যই সবচেয়ে ভোঁতা। অথচ নেপোলিয়ন না কে যেন বলেছেন—'ইংবেজ এ নেশন অব্‌ শপকীপারজ্‌ (অবশ্য ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে "সাকী" নামক ছদ্মনামের এক অতিশয় সুরসিক ইংরেজ লেখক বলেন, "আমবা এখন এ নেশন অব্‌ শপ্‌লিফ্‌টারজ্‌" অর্থাৎ আমরা এখন দোকানের ভিড়ে চটসে এটা-ওটা-সেটা চুরি করাতে ওস্তাদ) এবং "সুইসরা এ নেশন অব হোটেলকীপারস"। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তাবৎ ইয়োরোপে

সুইসরাই পরিচ্ছন্নতম হোটেল রাখে কিন্তু প্রশ্ন : তোমার হোটেল-রেস্তোরাঁ যতই সাফসুৎরো রাখো না কেন তোমার রেস্তরাঁর সুপে ব্লন্ড, ব্রুনেট, কালো চুল না পাওয়া গেলেও (দিনের পর দিন তিন রঙের চুল আবিষ্কার করতে করতে আমার এক মিত্র— সুইটজারল্যান্ডে নয়, অন্য এক নোংরা দেশের হোটেলে—একদিন মেনেজারকে শুধোলেন, "আপনার রান্নাঘরে তিনটি প্যাচিকা আছেন, না? একজনের চুল ব্লন্ড, অন্যজনের ব্রুনেট এবং তেসরা জনের কালো। নয় কি?" মেনেজার তো থ। এই ভদ্রলোকই কি তবে শার্লস হোমসের বড় ভাই মাইক্রফট হোমস? সবিনয়ে তথ্যটা স্বীকার করে শুধালে, "স্যার, আপনি জানলেন কি করে? আপনি তো আমাদের রসুইখানায় কখনো পদার্পণ করেন নি!" বন্ধু বললেন, "সুপে কোনো দিন ব্লন্ড, কখনো বা ব্রুনেট এবং প্রায়ই কালো চুল পাই—কালোটাই পাতলা সুপে চোখে পড়ে বেশী। এ তত্ত্বে পৌঁছবার জন্য তো দেকার্ত কান্ট-এর দর্শন প্রয়োজন হয় না। আমি বলছি ঐ কালো চুলউলীকে যদি দয়া করে বলে দেন, সে যেন আব পাঁচটা হোটেলের পাঁচজন পাচকের মাথায় যে রকম টাইট সাদা টুপি পরা থাকে ঐ বকম কোনো একটা ব্যবহার করে। আমার মনে হয় ওর মাথায় দুর্দান্ত খুসকি"—পাঠক অপরাধ নেবেন না, এ-কেচ্ছাটা বলার প্রলোভন কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলুম না। সুদ্দুমাত্র সুইস হোটেলের সুপমধ্যে হরেকরকম্বা চুল নেই বলেই যে দুনিয়ার লোক হদ্দমুদ্দ হয়ে সে-দেশে আসবে এও কি কখনো সম্ভবে? আমার সোনার দেশ পূবপচ্ছিমওতব বাঙলায় সুপ তৈরী হয় না। অতএব প্লাটিনাম ব্লন্ড, সাদামাটা ব্রন্ড, চেসনাট ব্রাউন, মোয়ায়েম ব্রাউন কালো মিশকালো কোনো রঙের কোনো চুলের কথাই ওঠে না। "মোটেই মা রাঁধে না, তার তপ্ত আর পান্তা।" কিংবা বলতে পারেন, "হাওযার গোড়ায বশি বাঁধার মত।" তাই বলে কি মার্কিন সুইস টুরিস্ট এ-দেশে আসে না?

"বিজনেস ইজ বিজনেস"—তাই সুইস এ পর্যন্ত তাদের রান্নাতে প্রাচ্য দেশীয মশলা ব্যবহাব কবতে আরম্ভ কবেছে।

আমাব কাছে একখানা সুইস সাপ্তাহিক আসে। তাব কলেবর প্রায ষাট পৃষ্ঠা। একদা কেউ ল্যাটে এলে আমবা ঠাট্টা করে বলতুম, "কি বেবাদর, কেপ অব গুড হোপ হয়ে এলে নাকি?"—সুয়েজ কানাল যখন বযেছে। এখন কিন্তু এটা আব মস্করা নয়। এ্যার মেলের কথা অবশ্য ভিন্ন। কিন্তু ষাটপৃষ্ঠা বপুধারী পত্রিকা তো আর এ্যার মেলে পাঠানো যায় না। খর্চা যা পড়বে সেটা সাপ্তাহিকের দাম ছাড়িয়ে যাবে। হিন্দীতে বলে—"লড়কে সে লড়কার গু ভারি"—বাচ্চাটার ওজনের চাইতে তার মলের ওজন বেশী।

সেই পত্রিকার একটি প্রশ্নোত্তর বিভাগ আছে। কেউ শুধোল; "মাংস আলু তরকারি-সহ নির্মিত ভোজনের মেন ডিশ (পিয়েস দা রেজিসতাঁস) খাওয়াব পব যেটুকু তলানি সস্ (শুকনো শুকনো ঝোল, কলকাত্তাইয়ারা কাইও বলে থাকে) পড়ে থাকে তার উপর পাঁউরুটি টুকরো টুকরো কবে ফেলে দিয়ে, কাঁটা দিয়ে সেগুলো নাড়িয়ে-চাড়িয়ে চেটেপুটে খাওয়াটা কি প্রতোকোল-সম্মত—এটিকেট মাফিক, বেয়াদবী 'অভদ্রস্থতা' নয় তো?"

উত্তর : "পৃথিবীতে এখন এমনই নিদারুণ খাদ্যাভাব যে ঐ সসটুকু ফেলে দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই (অবশ্য তার সঙ্গে রুটির টুকরোগুলোও যে গেল সে বাবদে বিচক্ষণ উত্তরদাতা কোনো উচ্চবাচ্য করেন নি। কারণ রুটিটি পরের ভোজনেও কাজে লাগতো, কিংবা গরীব-দুঃখীকেও বিলিয়ে দেওয়া যেত—এঁটো প্লেটের তলানি সস্ তো পরবর্তী

ভোজনের জন্য বাঁচিয়ে রাখা যায় না, কিংবা গরীব-দুঃখীকেও বিলোনো যায় না—লেখক)।" তারপর তিনি বলেছেন, "কিন্তু আপনি যদি নিমন্ত্রিত হয়ে কোথাও যান তবে এই কার্পণ্যটি করবেন না।" তার মানে আপনার বাড়ির বাইরের এটিকেট যেন বাড়ির ভিতরের চেয়ে ভালো হয়। আমি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন মত ধরি। আমার মতে বাড়ির এটিকেট, আদব-কায়দা যেন বাইরের চাইতে ঢের ঢের ভালো হয়।

প্রশ্ন : "কোহিনূর প্রস্তর কোন্ ভাষার শব্দ?"

উত্তর : "ফার্সী।"

(সম্পূর্ণ ভুল নয়। "কোহ্"=পাহাড়—ফার্সীতে। যেমন কাবুলের উত্তর দিকে কোহীস্তান রয়েছে (আমার সখা আব্দুর রহমান ঐ কোহীস্তানের লোক)। কিন্তু কোহ্-ই-নূরের "নূর" শব্দটি 'ন' সিকে আরবী খাঁটি ফার্সীতে যদি বলতেই হয় তবে "নূর"-এর বদলে "রওশন" বা "রোশনী" [বাঙলায় "রোশনাই"] ব্যবহার করে বলতে হয় কোহ্-ই-রওশন্। শুদ্ধ আরবীতে বলতে হলে "জবলুন্ (পাহাড়) নূর।"...কিন্তু এ রকম বর্ণসঙ্কর সমাস সর্বত্রই হয়ে থাকে। "দিল্লীশ্বর" ইত্যাদি।)

প্রশ্ন : "আমার বয়স বত্রিশ; আমি বিধবা। আমার ষোলো বছরের ছেলের একটি সতেরো বছরের ভেরি ডিয়ার ক্লাস ফ্রেন্ড প্রায়ই আমাদের এখানে আসে। কিন্তু কিছুদিন ধরে সে আমার সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা জমাবার চেষ্টা করছে। আমি করি কি?"

উত্তর : "আপনি ওকে সঙ্গোপনে নিয়ে গিয়ে বলুন, 'তুমি তোমার অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে প্রেমট্রেম করো। আমি তোমার মায়ের বয়সী। তোমার বয়সী মেয়ের তো কোন অভাব নেই।' কিন্তু আমার মনে হয়, ছেলেটার বোধ হয় মাদার কমপ্লেক্স্ আছে—অতি অল্প বয়সেই তার মা গত হন। কাজেই সে একটি মায়ের সন্ধানে আছে।" তার পর আরো নানা প্রকারের হাবিজাবি ছিল।

এ-উত্তর যে-কোনো গোগর্দভ দিতে পারতো।

কিন্তু এই প্রশ্নোত্তরমালা নিতান্তই অবতরণিকা মাত্র।

কয়েক মাস পূর্বে—মনে হল—একটি প্রাচীনপন্থী মহিলা—প্রশ্ন শুধালেন : "আজকালকার ছেলে-ছোকরারা এমন কি মেয়েরাও বড্ড বেশী মশলাদার খানা খাচ্ছে। আমি গ্রামাঞ্চলে থাকি। সেদিন বাধ্য হয়ে আমাকে শহরে যেতে হয়। যদি জানতুম, শহরের 'মাই লর্ড' রেস্তোরাঁওলারা কি জঘন্য ঝাল, মাস্টার্ড (আমাদের কাসুন্দো—লেখক), আর মা মেরীই জানেন কি সব বিদকুটে বিদকুটে বিজাতীয় মশলা দিয়ে যাবতীয় রান্না করেন, তবে কি আমি সে রেস্তোরাঁয় যেতুম। এক চামচ সুপ মুখে ঢালা মাত্রই আমার সর্বাঙ্গ শিহরিত হতে লাগলো। আমার কপালে, সেই শীতকালে, ঘাম জমতে লাগলো। মনে হলো, আমার জিভে যেন কেউ আগুন ঢেলে দিয়েছে। আমার চোখ থেকে যা জল বেরুতে আরম্ভ করলো সেটা দেখে আমার কাছেরই একটি সহৃদয় প্রাইভিট শুধলো—'মাদাম, আমি বহু দেশ-বিদেশ দেখেছি—যেখানে টিয়ার গ্যাস ছাড়া হয়; কিন্তু আমাদের এই সুইটজারল্যান্ডে তো কখনো দেখিনি। শোকাতুরা হয়ে কান্না করলে রমণীর চোখে যে অশ্রুজল বেরয় এটা তো তা নয়।'

একদা সুইস কাগজে প্রশ্ন বেরলো : "এই যে আমরা প্রতিদিন আমাদের রান্নাতে মশলার পর মশলা বাড়িয়েই চলেছি এটা কি আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো?"

সেই "সবজান্তা" উত্তরিলা :

"মাত্রা মেনে খেলে কোনো আপত্তি নেই, কোনো বস্তুরই বাড়াবাড়ি করতে নেই।" (মরে যাই! এই ধরনের মহামূল্যবান উপদেশ পাড়ার পদী পিসি, ইস্কুল বয় সবাই দিতে পারে!—লেখক) তারপর সবজান্তা বলছেন—"ডাক্তারদেরও আধুনিক অভিমত, 'মেকদার-মাফিক মশলাদার খাদ্য ভোজনস্পৃহা আহার-রুচি বৃদ্ধি করে। তদুপরি আরেকটা গুরুত্বব্যঞ্জক তত্ত্ব আছে। আপনি যদি আপনার ভোজন ব্যাপারে সর্বক্ষণ এটা খাবো না ওটা ছোঁবো না এরকম পুতুপুতু করে আপনার ভোজন যন্ত্রটিকে ন'সিকে মোলায়েম করে তোলেন, (ইংরিজিতে একেই বলে 'মলিকড্ল্' করেন) তবে কি হবে? আপনি যতই চেষ্টা দিন না কেন, আপন বাড়িতে তৈরী মশলা বিবর্জিত রান্নামাত্রই খাবো তথাপি ইহসংসারে বহুবিধ ফাঁড়া গর্দিশ আছে যার কারণে আপনাকে হয়তো কোনো রেস্তোরাঁতে এক বেলা খেতে হল। কিংবা মনে করুন, আপনি নিমন্ত্রিত হলেন। শক্তসমত্ত জোয়ান আপনি। কি করে বলবেন আপনি ডায়েটে আছেন? ওদিকে রেস্তোরাঁ বলুন, ইয়ার বখশীর বাড়িই বলুন সর্বত্রই সর্বজন শনৈঃ শনৈঃ গরম মশলার মাত্রা বাড়িয়ে যাচ্ছেন তো যাচ্ছেনই। পরের দিন আপনি কাৎ। অতএব"—আমাদের সবজান্তা বল্‌ছেন, "কিছু কিছু মশলা খেয়ে নেওয়ার অভ্যাসটা করে ফেলাই ভালো।"

কিন্তু মশলা পুরাণ এখানেই সমাপ্ত নয়। সেটা পরে হবে। ইতিমধ্যে আমি দুম্ করে প্রেমে পড়ে গেলুম।

কবিগুরু গেয়েছেন :—

> যদি পুরাতন প্রেম
> ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম জালে
> তবু মনে রেখো।

কিন্তু এ-আশা রাখেন নি, সেই প্রথম প্রিয়াই পুরনায় তাঁর কাছে ফিরে আসবে। আমার কপাল ভালো।

লাঞ্চ সেরে মৃদুমন্থনে যখন বাড়ি ফিরছি তখন বাসস্ট্যান্ডের বেঞ্চিতে বসেই দেখি বেঞ্চির অন্য প্রান্তে যে-মেয়েটি বসেছিল সে জ্বল-জ্বল করে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমার দুশমনরা তো জানেনেই, এস্তেক দোস্তরাও জানেন, আমি কন্দর্পকিউপিডের সৌন্দর্য নিয়ে জন্মাইনি। তদুপরি বয়স যা হয়েছে তার হিসেব নিতে গেলে কাঠাকালি বিঘেকালি বিস্তর আঁক কষাকষি কবতে হয়। সর্বশেষে সেটা ভগ্নাংশে না ত্রৈরাশিকে দিতে হবে তার জন্য প্ল্যাঁশেৎ মারফৎ ঈশ্বর সুকুমার রায়কে নন্দনকানন থেকে এই যবনভূমিতে নামাতে হবে।

অবশ্য লক্ষ্য করেছিলুম, আমি ওর দিকে তাকালেই সে ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে নেয়।

রোমান্টিক হবার চেষ্টাতে বলেছিলুম, "মেয়েটি"। কিন্তু তার বয়স হবে নিদেন চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ এমন কি পঞ্চাশও হতে পারে। কিন্তু তাতে কি যায় আসে! বিদগ্ধ পাঠকের অতি অবশ্যই স্মরণে আসবে, বৃদ্ধ চাটুয্যে মশাই যখন প্রেমের গল্প অবতারণা করতে

যাচ্ছেন তখন এক চ্যাংড়া বক্রোক্তি করে বলেছিল [১] চাটুয্যে মশাই প্রেমের কীই বা জানেন। মুখে আর যে-কটা দাঁত যাবো-যাচ্ছি যাবো-যাচ্ছি করছে তাই নিয়ে প্রেম।

চাটুয্যে মশাই দারুণ চটিতং হয়ে যা বলেছিলেন তার মোদ্দা : ওরে মূর্খ, প্রেম কি চিবিয়ে খাবার বস্তু যে দাঁতের খবর নিচ্ছিস!

প্রেম হয় হৃদয়ে।...একদম খাঁটি কথা। ভলতের, গ্যোটে, আনাতোল ফ্রাঁস, হাইনে আমৃত্যু বিস্তরে বিস্তর যারা ফট ফট করে নয়া নয়া হুরী পরীর সঙ্গে প্রেমে পড়েছেন। এই সোনার বাঙলাতেও দু-একটি উত্তম দৃষ্টান্ত আছে। তা হলে আমিই বা এমন কি ব্রহ্মহত্যা করেছি যে হুট করে প্রেমে পড়বো না।

বললে পেত্যয় যাবেন না, অকস্মাৎ একই মুহূর্তে একে অন্যকে চিনে গেলুম। যেন "আকাশে বিদ্যুৎ বহ্নি পরিচয় গেল লেখি।"

সে চেঁচালে "হ্যার সায়েড!"
এক সঙ্গে আমি চেঁচালুম "লটে।"

তারপর চরম নির্লজ্জার মত সেই প্রশস্ত দিবালোকে সর্বজন সমক্ষে আমাকে জাবড়ে ধরে দুই গালে ঝপাঝপ এক হন্দর বা দুই টন চুমো খেল।

সুশীল পাঠক, সচ্চরিত্রা পাঠিকা, আমার দেশের মরালিটি-রক্ষিণী বিধবা পদীপিসি এতক্ষণে এক বাক্যে নিশ্চয়ই নাসিকা কুঞ্চিত করে "ছ্যা ছ্যা" বলতে আরম্ভ করেছেন। আমি দোষ দিচ্ছিনে। এস্থলে আম্মো তাই করতুম—যদি না নাটকেব হেরোঈন আমাব প্রিয়া লটে (তোলা নাম "সার্লট") হত। বাকিটা খুলে কই। ওর বয়স যখন নয়-দশ আমার বয়স ছাব্বিশ আমি বাস করতুম ছোট গোডেসবের্গ টাউনের উত্তরতম প্রান্তে লটেদের বাড়ির ঠিক মুখোমুখি। ওদের পাশে থাকতো দুই বোন গ্রেটে ক্যাটে। আবো গোটা পাঁচেক মেয়ে—তাদের বাড়ির পরে। কারোরই বযস বারো-তেরোর বেশী নয়।

লটে ছিল সবচেয়ে ছোট,
আমার জীবনের প্রথমা প্রিয়া।

আর সবকটা মেয়ে এ তথ্যটা জানতো এবং হয়তো অতি সামান্য কিছুটা হিংসে-হিংসে ভাব পোষণ করতো। ওদের আশ্চর্য বোধ হত, যে লটে তো ওদের তুলনায় এমন-কিছু গুলে-বাকাওলী নয় যে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এসে আমি এরই "প্রেমে মজে যাবো।" এটা অবশ্য আমি বাড়িয়ে বলছি। "প্রেমে মজার" কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমার বয়স ছাব্বিশ ওর নয় কি দশ।

আসলে ব্যাপারটি কি জানেন? জর্মনদের ভিতর যে-চুল অতিশয় বিরল, লটের ছিল সেই চুল। দাঁড়কাকের মত মিশমিশে কালো একমাথা চুল। ঠিক আমার মা-বোনদেব চুলের মত। ওর চুলের দিকে তাকালেই আমার মা-বোনদের কথা, দেশের কথা মনে পড়তো। আর লটে ছিল আমার বোনদের মত সত্যই বড় লাজুক। সকলের সামনে নিজের থেকে আমার সঙ্গে কখনো কথা বলতো না।

আমাদের বাড়ির সামনে ছিল এক চিলতে গলি। সেখানে রোজ দুপুর একটা দুটোয আমরা ফুটবল খেলতুম। আমার বিশ্বাস তুমি পাঠক, আমাদেব সে টীমের নাম জানো না।

---

(১) বইখানা আমার চুরি গেছে। কাজেই উল্টোসুল্টো হয়ে গেলে পাঠক অপবাধ নেবেন না।

আমিও অপরাধ নেবো না। আমরা যে আই এফ এ শীল্ডে লড়াই দেবার জন্য সে-আমলে ভারতবর্ষে আসিনি তার মাত্র দুটি কারণ ছিল। পয়লা : অতখানি জাহাজ ভাড়ার রেস্ত আমাদের ছিল না এবং দোসরা : আমাদের "কাইজার টীমে" পুরো এগারো জন মেম্বর ছিলেন না। আমরা ছিলুম মাত্র আষ্টো জন। তৃতীয়ত যেটা অবশ্য আমাদের ফেভারেই যায়, আমাদের ফুটবলটি ছিল অনেকটা বাতাবী নেবুর মত। ওরকম ফুটবল দিয়ে কি সমদ, কি জুম্মা খান কখ্খনো প্যাটার্ন-উইভিং ড্রিবলিং ডজিং, ডাকিঙের সুযোগ পাননি।

হায়, হায়। এ-জীবনটা শুধু সুযোগের অবহেলা করে করেই কেটে যায়।

এসব আত্মচিন্তা যে তখন করেছিলুম তা নয়।

চল্লিশ বছর পব পুনরায়, এই প্রথম আমাদের পুনর্মিলন। লটে হঠাৎ শুধুলো, "হ্যার সায়েড! তুমি বিয়ে করেছো?"

শুনেছি, ইহুদীরা নিতান্ত গঙ্গাযাত্রার জ্যান্ত মড়া না হলে কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন শুধিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দেয়। আমি শুধলুম, "তুই?"

খল খল করে হেসে উঠলো।

"কেন? আমাব আঙ্গুলে এনগেজমেন্ট রিং, বিয়ের আংটি দুটোই এখনো তোমার চোখে পড়েনি। আমি তো দিদিমা হয়ে গিয়েছি। চলো আমাদের বাড়ি।"

আমি সাক্ষাৎ যমদর্শনের ন্যায় ভীতচকিত সন্ত্রাসগত হযে প্রায় চিৎকার করে উঠলুম, "সে যদি আমায় ঠ্যাঙায়।"

দুটি মিষ্টি মধুর ঠোঁটেব উপর অতিশয নির্মল মৃদু হাসি এঁকে নিযে বললে, "বটে' আমাব জীবনেব প্রথম প্রিয়কে সে প্যাদাবে! তাহলে সেই হালুঙ্কেটাকে আমি ডিভোর্স কববো না।"

তওবা, তওবা!

॥ ২১ ॥

লটে ছেলেবেলায কথা কইত কমই। এখন দেখি মুখে খই ফুটছে, তবে সেই বাল্য বয়সেব শান্ত ভাবটি যাযনি। আমি বললুম, চলো না "কাফে স্নাইডারে"। এক পট কফি আব আপফেল টার্ট (এপল টার্ট)—পঞ্চাশ বছরের কোনো মহিলা যদি বাসস্ট্যান্ডেব পেভমেন্টে বসে হঠাৎ হাততালি দেয তবে সবাই একটু বাঁকা নয়নে তাকায়। লটে বেপরোয়া। হাততালি দিয়ে উল্লাসভরে বললে, "তুমি ডিয়ার, সেই প্রাচীন দিনের ডিয়ারই রযে গেছ। কাফে স্নাইডার অতি উৎকৃষ্ট আপফেল টার্ট বানাতো সে তোমার এখনো মনে আছে।"

আমি বললুম, "সোওয়াদটি এখনো জিভে লেগে আছে অবশ্য তোমাকে যদি নিতান্তই ট্রাম ধরতে হয় তবে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে মুফেনডর্ফ—"

"মুফ্রিকা বলো। ঐ অজ পাড়াগাঁটা এমনই প্রোহিস্টরিষ (প্রাগৈতিহাসিক) যে আমবা ওটাকে আফ্রিকাব সঙ্গে এক কাতাবে ফেলে মুফ্রিকা নাম দিয়েছিলুম—ভুলে গেছ?"

আমি তীব্র প্রতিবাদ করে বললুম, "আমি এখনো লীজেলকে মুফ্রিকানরিন (মুফ্রিকাবাসিনী) ডাকি। সে আমায ডাকে 'হালুঙ্কে' (গুণ্ডা)—তুমি যে রকম এইমাত্র ঐ নামে তোমাব বেটার-না-ওয়ার্স ৫০%-কে রেফার করলে। তুমিও আমার মত অপরিবর্তনশীল।"

লটে বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে, "উপায় কি বলো। এই ধরো না, কাফে স্নাইডারের আপফেল টার্ট। ওটা কেন এত মধুর হতো জানো। ওটা বানাতো সম্পর্কে আমার এক মাসী। আর তোমার মনে আছে কি আমার ঠাকুদ্দার বাবা যখন একশ বছর বয়সে পা দিলেন তখন মা পরবের দিন আপফেল টার্ট বানিয়েছিল,—মাসীর চেয়েও ভালো। কার বুদ্ধিতে জানো? থাক। আমি বড্ড লাজুক ছিলুম; তাই তোমাকে কিছু বলিনি। তুমি তো খাও চড়ুই পাখির হাফ রেশন। তাই তুমি যখন পুরো দুপীস খেলে তখন আমার ভারি আনন্দ হয়েছিল। ওমা! তারপর সবাই চলে যাওয়ার পর বাড়ির লোক আমাকে যা ক্ষ্যাপালে। এস্তেক ঠাকুদ্দার বাবা। ওঁর কথা তখন জড়িয়ে যেত। জন্মদিনের বিশেষ সিগারে দম দিয়ে তাঁর খাস প্যারা ছেলেকে—বয়স তখন তাঁর সত্তর—বললেন, 'আমাদের লটে বাঁচলে হয়'। তবে হ্যাঁ আমার ঠাকুমা লটের চেয়েও মর্ডান ছিলেন। নবছর বয়সে প্রথম প্রেম করেন। সে হল গে ১৭৫০ কিংবা তারই কাছে পিঠে। এবং জানো, সেই দজ্জাল ছুঁড়ি আখেরে সেই ছোকরাকেই বিয়ে করে।"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "দ্যাৎ! ন-দশ বছরে আবার প্রেম! তবে কি না, দেবতা শ্রীকৃষ্ণ নাকি ঐ বয়সেই ভাব-ভালবাসা করেছিলেন।"

"আখেরে ঠাকুরমার ঠাকুমার মত ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করেছিলেন?"

আমি বললুম, "না। উনি বিবাহিত ছিলেন।"

"তাঁর বয়স কত ছিল?"

"ঠিক বলতে পারবো না। তবে বেশ কিছুটা সিনিয়র ছিলেন। আমাদের কাব্যে আছে :—

'নিশাকাল, এ যে ভীরু, তুমি রাধে
লয়ে যাও ঘরে
হেন নন্দাদেশ পেয়ে চলে পথে
যমুনার কূলে
শ্রীরাধামাধব কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে
রস কেলী করে।'

অপিচ শ্রীরাধার নানা বর্ণনার মধ্যে একটি বর্ণনা আমার মনের গভীরে উজ্জ্বল হিরকের মত চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে রেখেছে। আমাদের দেশের কাব্য নাট্যাদি আরম্ভ করার পূর্বে লেখক নাট্যকার সরস্বতী বা ঈশ্বরের কোনো অবতারের বন্দনা তথা এবং পাঠক-দর্শক মণ্ডলীর মঙ্গল কামনা করেন। এখন হয়েছে কি, শ্রীকৃষ্ণ বাল্যে বড্ড দামাল ছেলে ছিলেন। প্রায়ই মায়ের তৈরী ননী—"

"সে আবার কি?" আমার মস্তকে অনুপ্রেরণা এল। প্রিয়াকে প্রীত করার জন্য আমার মত গণ্ড মূর্খের প্রতিও কন্দর্প সদয় হন। অবশ্য হৃদয়ে ঐ অত্যাবশ্যকীয় প্রেম রসটি থাকা চাইই। তাই হাফিজ গেয়েছেন,

নেত্র নাই বাঞ্ছা হেরি বিধুর বদন
কর্ণ নাই চাই শুনি ভ্রমর গুঞ্জন॥
প্রেম নাই প্রিয় লাভ আশা করি মনে
হাফিজের মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে॥

বললুম, "এই যে তোকে কাফে স্নাইডারে নিয়ে যাবার জন্য এতক্ষণ ধরে ঝুলোঝুলি করছি, সেখানে আপফেল টার্টের উপর যে হুইপট ক্রীম বিছিয়ে দেয় অনেকটা সেই বস্তু।"

সঙ্গে সঙ্গে লটে উঠে দাঁড়ালো। "চলুন।"

আমি বললুম, "তুমি না কোথায় যেন যাচ্ছিলে?"

উত্তরে লটে যা বললে হিন্দীতে সেটা ভালো, "মারো গোলী (গুলি)। গোল কর্ যাও।" "চুলোয়" যাকগে বড্ড রূঢ়।

লটে বললে, "রাধার বয়ঃসন্ধিক্ষণ না কি যেন বলছিলে?"

আমার বাধো বাধো ঠেকছিল। যদিও তার বয়স এখন পঞ্চাশ তবু ক্ষণে ক্ষণে তার ঠোঁটের কোণের লাজুক হাসি, কথা বলতে বলতে হঠাৎ মাথা নীচু করে পায়ের দিকে তাকানো এসব যেন তাকে চল্লিশ বছরে উজিয়ে নিয়ে দশ বছরের ছোট্ট পরিবর্তিত মেয়েটিকে করে তুলছিল। তবু দুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়লুম। বললুম, "সেই শ্রীকৃষ্ণ পাঠক দর্শককে আশীর্বাদ করুন যিনি ছিলেন ননীচোরা। ধরা পড়ার পর নন্দপত্নী মাতা যশোদা যখন তাঁকে শুধালেন, 'তুমি কতখানি ননী চুরি করেছ?' তখন তিনি শ্রীরাধার স্তনযুগল দেখিয়ে বললেন, "ঐ অতটুকু"—সেই শ্রীকৃষ্ণ সর্বজনকে আশীর্বাদ করুন।"

বলা শেষ হতে না হতেই কেমন যেন লজ্জা পেলুম। অবশ্য মোদ্দা কথাটি এই ঐটুকু আট বছরের বাচ্চা আর কতখানি ননী খেতে পারে। অর্থাৎ ব্রজসুন্দরীব তখন উঠতি বয়স মাত্র।

লটে আমার লজ্জারক্ত ভাব দেখে খিল খিল করে হেসে উঠলো। বললে, "হায়, হায়, হায়; হাস আমাদের হ্যার ডক্টর। চল্লিশ বৎসর পূর্বে তুমি মেয়েছেলের মত যেরকম লাজুক ছিলে এখনো তাই আছ। ইতিমধ্যে কত কি হয়ে গেল, মায় একটা বিশ্বযুদ্ধ। এখনো তোমার চোখে পড়েনি, ছেলেমেয়ে পাশাপাশি ভিড়ে ভর্তি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একজন অন্যজনের কোমরে হাত দিয়ে—মেয়েটা ছেলেটার কাঁধে হাত দিয়ে—নাচের সময় আমরা যে পজিশন নিই—ঘাড় বাঁকিয়ে একে অন্যকে চুমো খেতে খেতে এগিয়ে যাচ্ছে—ধীর পদে। তৎসত্ত্বেও মাঝে মাঝে হোঁচট খাচ্ছে। রাস্তার লোক নির্বিকার, পুলিসও তুরীয় ভাব অবলম্বন করেছে। আমার কুড়ি বছর বয়সে নির্জন বনের ভিতরও হেরমান যখন আমাকে আদর করতো আমার আড়ষ্টতা তখনো কাটতো না। রাস্তায় চলতে চলতে চুম্বন—এ টেকনিক আমি আর কখনোই রপ্ত করতে পারবো না।...চল্লিশ বছর! কত পরিবর্তন হয়েছে—বাইরে ভিতরে—এবং তোমার আমার লীজেল 'আনার' পক্ষে সে পরিবর্তন যে কী নিদারুণ ট্রাজেডী সেটা বুঝতে তোমার বেশ কিছুদিন কেটে যাবে। তুমি কাফে স্নাইডার স্নাইডার করছিলে। আমি তোমাকে নিরাশ করতে চাইনি, ও-কাফে কত কাল উঠে গিয়েছে। ওখানে এখন পঁচিশ গজী লম্বা একটা মার্কিন বার। বারের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে হলে ট্যাক্সি ভাড়া নেয় মার্কিনরা। সেই শান্ত সুন্দর বাড়িটি; ভিতরে বসে শোনা যেত মাসী যে ঘরে টার্ট বানাতো সেখান থেকে আসছে আধমুঠো পরিমাণ ক্ষুদে ক্যানারি পাখির কাঁপা কাঁপা হুইস্‌ল্, আর আসছে বেকিং-এর কেকের মৃদু গন্ধ, আরো সর্বোপরি, ভেসে আসে, মাসীর রুমালেব ল্যাভেন্ডার গন্ধ।

সে-কথা থাক। অন্য একটা মধুর চিন্তা আমার মাথায়—হৃদযেও বলতে পারো

ভীনাস্ টিলার প্রজাপতির মত—সর্বক্ষণ ঘুর ঘুর করছে যদিও আমি কথা বলছি, তোমার কথাও শুনছি। সেটা বলি; এতদিন ধরে যে সবাই আমাকে ক্ষেপাতো যে তুমি আমাকে ভালোবাসো, তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানতো, ছাব্বিশ বছরের য়ুনিভার্সিটি স্টুডেন্ট (জর্মনিতে সে যুগে স্টুডেন্টরা উচ্চ সম্মান পেত—ধরে নেওয়া হত এরা সব এরিস্টোক্রেট) দশ বছরের বাচ্চার প্রেমে পড়ে না। সে পীরিত করে মেয়ে স্টুডেন্টদের সঙ্গে কিংবা বেকার কিন্তু ধনী ঝিয়ারীদের সঙ্গে। কিন্তু ওরা একটা কথা জানতো না, আমি তোমাকে সত্যি সত্যি ভালবাসতুম যাকে জর্মন বলে 'লীবে' ইংরিজিতে বোধ হয় 'লাভ'। আমি তো অবাক। কিন্তু যে-রকম গম্ভীর কণ্ঠে সীরিয়াসলি শব্দ কটি উচ্চারণ করলো তাতে ঐ নিয়ে পাগলামি করার মত রুচি বা সাহস আমার ছিল না। সেই চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমার বয়স ছিল লটের আড়াই গুণ। এখন তো আর আড়াই গুণ নয়—তা হলে আমার বয়স হত ১২৫ বৎসর। আমাদের বয়স এখন অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। ওর যদি আশি বৎসর হয়—আর হবেই না কেন ওর ঠাকুদ্দার বাপ তো একশ এক বছর অবধি বেঁচে ছিলেন—তখন আমার ছিয়ানব্বুই আর ওর আশিতে তো কোনো পার্থক্যই থাকবে না।

তুমি ভাবছো, দশ বছবের মেয়ে কি প্রেমে পড়তে পারে? পারে, পারে, পাবে! অবশ্য সিচুয়েশনটা খুবই অসাধারণ হওয়া চাই।

"আর তোমার যে পাকা একটি বান্ধবী ছিল—বন-এ তোমার সঙ্গে পড়তো, নাম আনামারি—"

সর্বনাশ! নামটা পর্যন্ত জানতো। এখনো স্মরণে রেখেছে।

॥ ২২ ॥

গডেসবর্গের সবচেয়ে বড় বাস্তা দিয়ে চলেছি। এ রাস্তা দিয়ে যাবাব সময় আগেব প্রায় দোকানীকে চিনতুম বলে তারা রোদ পোওয়াবার তরে চৌকাঠে দাঁড়ালে "গুট্‌ন্ মর্গেন" "গুট্‌ন্ টাখ" কিংবা দিনের শেষে ক্লান্ত কণ্ঠে "গুট্‌ন্ অকেনট" বলতুম। সুদ্ধ মাত্র ফুলওলার দোকানটির কাছে আসামাত্র পা চালিযে দ্রুতবেগে ওটাকে পেরিয়ে যেতুম। কেন? শো-উইন্ডোর বিরাট কাঠের জানলা দিয়ে দেখা যেত কত না সুন্দব তাজা ফুল—এক্কেবারে সাক্ষাত গুলস্তান। অনেক কিশোর কিশোরীই এই শো-উইন্ডোর সামনে রাঁদেভু করত। দ্বিতীয় পক্ষ সময়মত না এলে প্রথম পক্ষ ফুল দেখতে দেখতে হেসে খেলে দশ-বিশ মিনিট কাটিয়ে দিতে পারতো। তবে কি আমি ফুল ভালোবাসিনে? খুবই ভালোবাসি। বিশেষ করে শীতকালে যখন সবকিছু বরফে ঢাকা পড়ে যায়, গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত ঝরে গিয়ে উঁচু উঁচু শাখা ন্যাড়া সঙ্গীনের মত ভয় দেখায়। শুনেছি, তখন এ দোকানের বেবাক ফুল আসতো দক্ষিণ ইতালি, মন্তে কার্লো, কোৎদাজুর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো চার্লস ল্যামের রুদ্র রসিকতা। এক শৌখীন ধনী ব্যক্তি তাঁকে শুধিয়েছিল, "আপনার ঘরে ফুল নেই যে। আপনি কি ফুল ভালোবাসেন না?" তিনি জানতেন যে ঐ স্নব তাঁর অর্থকৃচ্ছ্রতা বাবদে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়েও এই বেতমীজ প্রশ্ন শুধিয়েছে। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "স্যার! আমি ছোট্ট বাচ্চাদের খুবই ভালোবাসি কিন্তু তাই বলে তাদের মুণ্ডুগুলো কেটে নিয়ে ফুলদানিতে সাজাই না।"..আমি দাঁড়াতুম না অন্য কারণে।

সেই প্রাচীন যুগে আমি এখানে আসাব দু-তিন দিন পর যখন মুগ্ধ নয়নে ফুলগুলো দেখছি, এমন সময় দবজা খুলে দোকানী একগুচ্ছ ফুল হাতে দিয়ে মৃদু হেসে আমাব দিকে এগিযে এসে বললে, "গুট্‌ন্ টাখ য়্যুঙাব হ্যাব (ইয়াং জেন্টলম্যান)! এই সামান্য কটি ফুল গ্রহণ কবে আমাকে আপ্যাযিত কববেন কি? আমাব ভাইঝি লিসবেতেব কাছে শুনলুম আপনি আমাদেব এই ক্ষুদে গোডেসবের্গে ডেবা পেতেছেন। আমাদেব এখানে যে কজন বিদেশী আছেন, তাঁদেব সংখ্যা গোনবাব জন্য হাতেব একটা আঙুলই যথেষ্ট। কিন্তু জানেন, এব চেযে ক্ষুদ্রতব পবিবেশে—সে শতাধিক বৎসবেব কথা—এখানে বাস কবতেন বাজদববাবেব এক সম্মানিত আমীব [১] তাঁবই জলসাঘবে বন শহবেব বেটোফেন তখনকাব দিনেব গ্রাঁ মেৎব্ (গ্র্যান্ড মাস্টাব) ওস্তাদস্য ওস্তাদ হ্যান্ডেলকে বাজনা বাজিযে শোনান—"

বলা বাহুল্য আমি দাম দেবাব চেষ্টা কবে নাস্তানাবুদ হযেছিলুম।

ফুস কবে একটি ক্ষুদ্রতম দীর্ঘশ্বাস বেরুল কিন্তু লটেব কান যেন বন্দুক। শুধালো, "কি হল? এবই মধ্যে আমাব সঙ্গসুখ তোমাব কাছে একঘেযে হযে উঠলো?" আমি সজোবে মাথা নেড়ে বললুম, "না, না, না।" তাবপব ওমব খৈযাম থেকে আবৃত্তি কবলুম—

'তব সাথী হযে দগ্ধ মরুতে
পথ ভুলে তবু মবি,
তোমাবে ছাড়িযা মসজিদে গিযা
কি হবে মন্ত্র স্মবি।'

তাবপব সেই ফুলওলাব কাহিনী বযান কবে বললুম, "ডার্লিং লটে। আমি এ-সব দোকানপাট তো বিলকুল চিনতে পাবছিনে। কিন্তু সেই ফুলেব দোকান নিশ্চযই সামনে এবং নিশ্চযই ফেব চেষ্টা দেবে আমাকে মুফতে ফুল দেবাব। চলো অন্য পেভমেন্টে।"

লটে পুনবায ডুকবে কেঁদে বললে, 'হায, হায, হায। কোন ভবে আছো তুমি। সে-দোকান আব নেই। তাব মালিক ওটাকে বেচে দিযে মাইল সাতেক দূবে আলু—আলু গো, আলু ফলাচ্ছেন। প্রাচীন দিনেব আব কজন দোকানী আপন আপন দোকান বাঁচাতে পেবেছে। এই ছোট্ট জাযগাটিতে যাবা বংশপবম্পবায বাস কবেছে তাবা হয পালিযেছে নয আপন আপন বাড়িতে আশ্রয নিযেছে। বাস্তায পযন্ত বেরুতে চায না। এই তোমাব লীজেল—অন্তত চাব মাইল না হাঁটলে অর্থাৎ মুফেনডর্ফ গোডেসবের্গ দুবাব না চষলে যাব পেটেব চকলেট হজম হত না (মনে পড়লো অত্যুৎকৃষ্ট ব্রান্ডি ভর্তি মোটা মোটা লাল আঙুলেব চকলেট খেত লিজেল) সে তো এখন আব একদম বাড়ি থেকে বেবয না। তোমাব ল্যান্ডলেডিব মেযে আনা বেবয না, আমাদেব যে একটি ক্ষুদ্র বিউটি সেলুন ছিল তাব মালিক কাটেবীনা সৌন্দর্য আব যৌবন বাঁচিযে বাখবাব জন্য বিস্তব সন্ধিসুড়ুক জানতো বলে—এবং বাচিযে বেখেছেও—এখনো তাকে দেখলে মার্কিন চ্যাংড়াদেব মুণ্ডুগুলো বাঁই বাঁই কবে ঘুবতে থাকে, সে পযন্ত বাড়ি থেকে বেবয না।

---

(১) অধুনা বাঙলায একাধিক লেখক একবচনে "ওমবাহ" লিখে থাকেন। বস্তুত ওমবাহ শব্দটি বহুবচন। একবচন আমীব শব্দেব বহুবচন ওমবাহ। এবং "আমীব-ওমবাহ" সমাস কলেক্টিভ নাউন রূপে ফার্সী উর্দু, বাঙলাতে ব্যবহাব হয।

তাই তো তোমাকে পেয়ে আমার এত আনন্দ। তোমার আজকের দিনের চেহারাতে আর সেদিনকার চেহারাতে আর কতখানি মিল? বার বার মনে হয়, যেন তোমাকে ঘন কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখছি। কি রকম জানো। তুমি যে বাড়িতে থাকতে সেটা প্রায় তিনশ বছরের পুরনো। সে-যুগে আস্তানার ভালো ব্যবস্থা ছিল না বলে আমার বাপ-মার বেডরুম সবকটা ঘর ছিল খুদে খুদে—যেন বেদেদের কারাভানের গাড়িতে ক্ষুদে ক্ষুদে বেড-রুম, ডাইনিং-রুম, কিংবা—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে ওয়ালট ডিসনির ম্যাজিক ল্যান্ডের রাজকন্যা বনের ভিতর কাঠুরের অতি ছোট্ট ঘরে আশ্রয় নিয়ে জানালার পাশে বসে আপন মায়ের কথা ভাবছে।

হুবহু ঠিক ঐ রকম একটি ছোট্ট জানলা ছিল তোমার ঘরে। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে একহাত হয় কি না হয়। তুমি আসবার আগে ওটাতে একটা সাদা মোটা পর্দা ঝুলতো। কিন্তু তোমার এখানে আসা স্থির হয়ে যাওয়ার পরই আনার মা আপন হাতে ক্রুশের কাঁটা দিয়ে একটুকরো নেট্ বুনলো। তার যা বাহার! আর তার মিহিন কাজ ডাচ লেসকেও টিঙ দেয়। আমি যখন মাখম কিনতে গেলুম আনাদের দোকানে তখন আনাকে শুধালুম, 'অতিথি আসছে নাকি?' উত্তর শুনে আমি ভয়ে ভিরমি যাই আর কি? আমাকে একদিন ভয় দেখাবার জন্য বাবা বলছিল, 'তবে ডাকি একটা ইন্ডারকে! তার মাথায় পাগড়ী, ইয়াব্বড়া দাড়ি আর হাতে বাঁকা ছোরা। (আমি বুঝলুম শিখ আর গুর্খাতে লটের বাবা ককটেল বানিয়ে ফেলেছিল—লেখক) নাভিকুণ্ডুলির উপর সেঁধিয়ে দিয়ে এক হ্যাঁচকায় পাঁজর অবধি ফাঁসিয়ে দেয়।' ওমা! তারপর কোথায় কি? সেই রাত্রে তোমার ছোট্ট জানলার বাহারে লেসের পর্দার ভিতর ছিল দেখি, ঠিক তাই, তোমাকে এইমাত্র যা বললুম, তোমাকে যেন তখন ঘন কুয়াশাব ভিতর দিয়ে দেখছি। তুমি টেব্‌ল্ ল্যাম্পের সামনে বসে কিছু একটা লিখছিলে।"

আমি বললুম, "কত যুগের কথা! কিন্তু জাস্ট বাই চান্‌স্ তোমার মনে আছে কি, সেটা কি বার ছিল?"

"দিব্য মনে আছে। শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা।"

"অ। তাই বলো। শুক্রবার রাত দুপুরে ইন্ডিয়ার জন্য লাস্ট মেল ছাড়ে। প্রতি মাসে চিঠি না পেলে সব বড্ড চিন্তিত হয়। তোমার বাজকন্যা যেরকম বনের ভিতর কাঠুবের কুটিরে ছোট্ট জানলার পাশে বসে তার মায়ের কথা ভাবতো, আমার মায়ের মনও তেমনি আমার দিকে উধাও হয়ে চলে আসে।"

লটে বললে, "আহা!" সেই অল্প বয়সে লটে লাজুক ছিল বটে কিন্তু তার দরদী হিয়াটি সে কখনো লুকিয়ে রাখতে পারতো না। বললে, "একদা যেখানে কাফে স্নাইডার ছিল সেখানে পৌঁছে গিয়েছি।"

আমি বললুম, "না। টাকার জোরে মার্কিনরা যে প্রতিষ্ঠান আত্মসাৎ করেছে সে পাপালয় তো ব্রথেল। আমি ওখানে যাবো না।"

লটে যেন খুশী হল। বললে, "ঐ যে 'ব্রথেল' বললে, সেটা একদম খাঁটি কথা। হয়তো না ভেবে বলেছ, কিন্তু পেরেকের ঠিক মাঝখানে মোক্ষম ঘা-টি মেরেছ। সেদিন একটা বইয়ে পড়ছিলুম, ইহুদীরা ঠিক এমনি ধারা কাঁড়া কাঁড়া টাকা নিয়ে প্যালেস্টাইন গিয়ে সেখানকার গরীব আরব দোকানদারদের দোকানপাট কিনে তো নিলেই, তারপর কিনল ওদের জমিজমা। আরবরা এখন নাকি ভিটেছাড়া হয়ে সর্বত্র ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে

বেড়াচ্ছে। আরেকটা বইয়ে পড়ছিলুম, কোনো জায়গায় যদি একটা নূতন বন্দর তৈরী করা হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এন্তের 'বার' আর বিস্তর 'ব্রথেল' হুশ হুশ করে ব্যাঙের ছাতার মত গজাতে থাকে।

আমি চিরকালই অ্যাডেনাওয়ারকে ভক্তি করেছি। তাঁরই কল্যাণে যুদ্ধে-বন্দী বিস্তর জর্মন মুক্তি পায় রুশ কারাগার থেকে, সাইবেরিয়া থেকে। ওদের মধ্যে ছিল আমার এক মাসতুতো ভাই—আমার মা তাকে ভালোবাসত আপন ছেলের মত। তা হলেই বুঝতে পারছো, আডেনাওয়ারের প্রতি আমাদের কতখানি শ্রদ্ধা। এবং সকলেই জানে এই বন্দীদের মুক্ত করার জন্য তাঁকে তাঁর মাথা অনেকখানি নিচু করতে হয়—সে লোক হিটলারের সামনেও কখনো নিজেকে খাটো করেননি।

কিন্তু এই যে তিনি ফুটফুটে সুন্দর ছোট্ট শহর বন-কে জর্মনির রাজধানীরূপে মনোনীত করলেন তাতেই হল বন-এর সর্বনাশ এবং আমাদের গোডেসবের্গের সর্বস্ব নাশ। বন-এর আশপাশে ফাঁকা জায়গা নেই। বিদেশী রাজদূত বাবুরা গোডেনবের্গের চতুর্দিকে গম ক্ষেত বরবাদ করে হাঁকলেন বিরাট বিরাট এমারত, তৈরী করলেন আপন আপন 'কলোনি'। অফ্ কোর্স মার্কিনরাই হলেন পয়লা নম্বরী কলোনাইজারস। তাঁরা চান ঝাঁকে ঝাঁকে বার। রাতারাতি গোডেসবের্গের চেহারা বদলে গেল। এদেশে স্লেভারি নেই। নইলে আমরা সব্বাই ওদের নীগ্রো স্লেভ বনে যেতুম।"

তারপর ঝপ করে আমাকে একটা চুমো খেয়ে বললে, "একটু দাঁড়াও—না, তুমিও সঙ্গে চলো। হেরমানকে ফোন করবো, আমার ফিরতে দেরি হবে।"

॥ ২৩ ॥

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কায়দা-কেতার পাবলিক টেলিফোন বক্স্, ফোন কিয়োস্ক্ থাকে। তার কোনো কোনোটাতে আপনি যদি প্রার্থিত নম্বর না পান, বা এনগেজড থাকে তবে B বোতাম টিপলে আপনার প্রদত্ত কড়ি একটা ফুটো দিয়ে ফেরত পাবেন। এখন হয়েছে কি, বেশীর ভাগ লোকই আপন বাড়ি থেকে ফোন করে। নম্বর না পেলে বা এনগেজড পেলে বোতাম টেপার কোনো কথাই ওঠে না। তাই পাবলিক ফোন থেকে ঐ দুই অবস্থায় B বোতাম টিপতে ভুলে যান। অতএব আপনার মত শেয়ানা লোকের কর্তব্য, পাবলিক ফোনে ঢুকেই প্রথম B বোতাম টেপা। যদি আপনার পূর্ববর্তী ভোলা-মন জনের কড়ি সেখানে থাকে তবে ফোকটে সেটি আপনি পেয়ে যাবেন এবং তাই দিয়ে আপনার কলটি—মাছের তেলে মাছ ভাজার প্রক্রিয়া অবলম্বনে সেরে নেবেন। এমন কি আপনি কোনো ফোন করবেন না; পথে যেতে যেতে দেখলেন একটি ফোন বাক্সো। ঢুকে B টিপবেন। কড়ি পেয়ে গেলে ভালো। না পেলে কীই বা ক্ষতি। কড়িটি পকেটস্থ করে শিস্ দিতে দিতে এগিয়ে চলবেন যতক্ষণ না আরেকটা ফোন বক্স্ পান। মার্কিন প্রসাদাৎ গোডেসবের্গের নানাবিধ অধঃপতন হওয়া সত্ত্বেও ঘড়ি ঘড়ি পথপ্রান্তে অর্থোপার্জনের এ-ধরনের চিত্তহারিণী প্রতিষ্ঠান ফোন বক্স্ খুবই কম, কিন্তু হামবুর্গ, বার্লিন, কলোন—মরি! মরি! তিনশ কদম যেতে না যেতেই সেই নয়নাভিরাম প্রতিষ্ঠান। আবার ঢুকবেন আবার টিপবেন। কীই বা সময় যায় তাতে। এতে আপনার বিবেকদংশন হওয়ার কথা নয়। কারণ কড়িটা তো সরকারের নয়। ওটা আপনার মতই কোনো

নাগরিকের। ওতে আপনার হক্কই বেশী।

লটেকে এ-কৌশলটি শেখাবার মোকা পূর্ববর্তী যুগে আমি কখনো পাইনি। ইতিমধ্যে আমার মত জউরী প্রেমিকও সে বোধ হয় পায়নি। ফোন বক্সে ঢুকে যেই না পয়সা ঢালতে যাচ্ছে আমি অমনি লম্ফ দিয়ে তাকে ঠেকালুম—"করো কি? করো কি?" বলে B-তে দিলেম চাপ।

ঈশ্বর পরম দয়ালু।
তাঁহার কৃপায় দাড়ি গজায়
শীতকালে খাই শাঁকালু।

দু-কান ভরে যেন কেষ্টঠাকুরের মুরলিধ্বনি শুনতে পেলুম। যদ্যপি খটাং করে—কাঁসার থালার পর টাকাটি ফেললে যে রকম কর্কশ ধ্বনি বেরোয়। তিনটি গ্রশেন, আমাদের দিশী হিসেবে সাড়ে ন গণ্ডা পয়সা সুরসুর করে বেরিয়ে এল। .

লটে তাজ্জব মেনে শুধালে, "এ আবার কি?"

ভারতের জন্য প্রথম এটম বানাতে পারলে আমার একাননে সীতালাভে দশাননে যে আত্মপ্রসাদ অহংশ্লাঘা উদ্ভাসিত হয়েছিল তারই আড়াই পেঁচ মেখে নিয়ে হিটলারী কণ্ঠে আদেশ দিলুম, "এই কড়ি দিয়ে উপস্থিত সাত পাকের সোয়ামীকে ফোন তো করো, পরে সঃবিস্তর হবে।"

লটে : "হেরমান?"

অন্য প্রান্ত থেকে ক্বচিত জাগরিত বিহঙ্গ কাকলীব মত শব্দ হল। হায়, কেন যে সেই ফরাসী কৌশল বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লো না—আফসোস করি প্যারিসে একদা পাবলিক কল বক্সে ফোন যন্ত্র থেকে একটি সরু রবারের নল—তার মাথায় ক্ষুদে একটি লাউড স্পীকার, এমপ্লিফায়ার-বোতাম লাগানো—ঝুলতে থাকে। এখানে সেটা থাকলে আমি সেই বোতামটি কানে লাগিয়ে দিব্য শুনতে পেতুম ঐ প্রান্ত থেকে হেরমান কি বলছে।

লটে . "আমি লটে বলছি। লীকসটে (ইংবিজিতে এ-স্থলে হানি=মধু!) আমাব ফিরতে দেরি হবে।...অ্যাঁ না না। আমার প্রাচীন দিনেব এক লাভাবের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। এখন তার সঙ্গে কফি টার্ট খাবো। তারপর সিনেমা। তারপর ছ-পদী ডিনার। সর্বশেষে পার্কের বেঞ্চিতে বসে দুদণ্ড বসালাপ (মৃদু মর্মর গানে মর্মের কথার মধুময় মাখামাখি)।" ওদিকে আমি প্রাণপণ হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে সর্বাঙ্গে মৃগী বোগীর কাঁপন তুলে তুলে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করছি—"কাট্ আউট, কাট্ আউট—মা-মেরীর দিব্যি, সাণ্টা মাগদালেনের দিব্যি, সান্তা আনার, সান্তা তেরেসের দিব্যি...।"

হেরমান বেশ একটানা কিছুক্ষণ কি-সব যেন বললে। লটে বললে, "দেখি চেষ্টা করে। কিন্তু তোমার সর্বনাশের জন্য প্রস্তুত থেকো।"

আমার বহু বৎসরেব নিপীড়িত অভিজ্ঞতা বলে মেয়েছেলে একবার ফোন ধরলে আপনি নিশ্চিন্ত মনে মর্নিং ওয়াক (রবীন্দ্রসবোবর প্রদক্ষিণ তদ্ অন্তর্ভুক্ত) সেরে ফোন বক্সে ফিরে দেখবেন তখনো তিনি বলছেন, "তাহলে ছাড়ি, ভাই। বাইরে জনা তিনেক ফোন করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। কেন বাপু, আব ফোন বক্স নেই কাছে পিঠে। এই তো মাত্র দু-মাইল দূরে গোবস্তানে (বাপ্স্—সেই রাতের ভূতুড়ে অন্ধকারে গোরস্তানের শর্টকার্ট প্রাশান আর্মি আপিসাব পর্যন্ত এড়িয়ে চলে) আবেকটা কল বক্স রয়েছে। তা হলে ছাড়ি ভাই—" এই ছাড়ি ভাই, ভাই—তার পরও নিদেন দশটি মিনিট ধরে চলবে।

কিন্তু লটে বড় লক্ষ্মী মেয়ে। যেই না দেখেছে একটি মহিলা কিয়োস্কের পাশে [illegible] দাঁড়িয়েছেন অমনি লটে বললে, "আউফ ভীডার হ্যোরেন" যতক্ষণ না পুনরায় একে অন্যের কণ্ঠস্বর শুনি (ততক্ষণের জন্য বিদায়"—এটা উহ্য থাকে।) [১]

রাস্তায় নেমে লটে বললে, "ফোন বক্স থেকে যে কৌশলে পয়সা বের করলে সেটা বুঝিয়ে বলো।"

আমি বললুম, "হেরমান কি বললে? এবং তার কটা পিস্তল?"

খিল খিল করে হেসে বললে, "দুটো। হেরমানের রেজিমেন্ট যখন রাশা থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে জর্মনি ফিরল তখন কোনো দফতর পর্যন্ত নেই যে পিস্তলটা জমা দেয়। অন্যটা তার দাদার আপন নিজস্ব ছিল। সে রয়ে গেছে।" আমি অন্যদিকে ঘাড় ফেরালুম। সুশিক্ষিত জর্মন জাত পর্যন্ত পয়া অপয়া মানে। "সে রয়ে গেছে" অর্থাৎ সে যুদ্ধ থেকে "ফেরেনি।"—খুব সম্ভব মারা গেছে। হয়তো আত্মীয়স্বজন সৈন্য বিভাগ থেকে চিঠি পেয়েছে, অমুক অমুক দিন অমুক স্থলে বীরের মৃত্যু বরণ করেছে। কিন্তু তারা ভাবে, মৃত সৈন্য সনাক্ত করাটা সব সময় নির্ভুল হয় না। হয়তো বা সে সাইবেরিয়ার কারাগারে বা লেবার ক্যাম্পে আছে। কিংবা হয়তো শেল শক্ খেয়ে তার স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পেয়েচে (এমনেসিয়া)। নিজের নামধাম পর্যন্ত স্মরণে আনতে পারছে না। হয়তো কোনো হাসপাতালে পড়ে আছে, নয় ইডিয়টের মত রাশার গ্রামে গ্রামে ভিখারির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত কি হতে পারে। হয়তো একদিন ফিরে আসবে। "মারা গেছে" এই অপয়া কথা বলি কি করে? সত্যি তো, আমিও তাই বলি।

কিন্তু সুশীলা লটে-চরিত্রের কোনো কোনো অংশ বেশ টনটনে। বললে, "কিন্তু ফোন থেকে যে কড়ি দুইয়ে বের করলে সেটা বুঝিয়ে বলো।"

আমি বললুম, "সেটা পরে হবে। তুমি বরঞ্চ বলো, হেরমান কি বললে?"

হঠাৎ থেমে গিয়ে বললে, "দেখো হের ডক্টর হের প্রফেসর, প্রাচীন দিনের কথা স্মরণে আনো। তোমার কোনো আদেশ, কোনো নির্দেশ আমি কস্মিনকালেও অমান্য করেছি। এখনো কি আমার পালা আসেনি আদেশ করার"—গলায়, অল্প অত্যল্প ভেজা ভেজা অভিমানের সুর।

আমি হন্তদন্ত হয়ে বললুম, "এ কী বলছো তুমি। তুমি যা বলবে, তাই হবে। সে-আমলে বললেও হত। ঐ যে ফোনের বাক্স—"

---

(১) সাক্ষাৎ দেখাদেখির পব বিদায় নেবার সময় জর্মন বলে "আউফ ভীডার জেন (দেখা) হয়।" ফোনে বলে আউফ ভীডার হ্যো রে ন্ (শোনা যায়)। ভিয়েনাতে বলে "আ দিয়ো" (ভগবানেব হাতে দিলুম)। নানা দেশে নানা রকমের বিদায়বাণী বলা হয়। জানিনে, এই লক্ষ্মীছাড়া মুল্লুকে এখন পনেবো আনা লোক—এমন কি মেযেরা পর্যন্ত ঘোর অপয়া "এখন তবে যাই" বলে। যেন অগস্ত্য যাত্রা করছে! "এখন তবে আসি" প্রায় উঠে গেছে। আমরা তখন উত্তরে বলতুম "এসো।" এখন কি উত্তর দেয়।

এই আধুনিক আধুনিকারা যখন কেউ বলে, "এখন তবে যাই?" তারা কি "হ্যাঁ, যাও" বলে? সর্বনাশ। এর চেয়ে মারাত্মক বর্বর অপয়া উত্তর কি হতে পারে। "যাই" শুধু তখনই বলা চলে যখন কেউ আসছে। ডাকলুম, "রামা, রামা, এদিকে আয় তো, বাবা।" সে উত্তরে বলে, "যাই, বাবু।"

তার বাঁ হাত দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে পাঁজরে দিলে কাতুকুতু।

আমি "কোঁক" করে সামনের দিকে দুভাঁজ হই আর কি।

লটে ভারী পরিতৃপ্ত হয়ে বললে, "একদিন তোমাদের বাড়িতে রান্নাঘরে ঢুকে দেখি সেই গুণ্ডা অসকার তোমাকে সোফায় চিৎ করে ফেলে তার লোহার আঙুল দিয়ে তোমার পাঁজরে যেন পিয়ানো বাজাচ্ছে। আর তুমি পরিত্রাহি চিৎকার ছাড়ছো। আমারও বড্ড শখ হয়েছিল, আমিও মজাটা চেখে দেখি। এবারে ভাবলুম, এত দিনে বোধ হয় পাঁজরে তোমার আর সে সেনসিটিভনেস নেই। আছে, আছে, আছে। তুমি এখনো আমাদের সনাতন ফুটবল টীমের ক্যাপটেন। থাক ফোনের কেচ্ছা। হেরমান বলছিল, কাফেতে যাচ্ছি, উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু ডিনার বাইরে কেন? তার শিকারের উত্তম হরিণের মাংস যখন বাড়িতে রয়েছে।"

আমি বললুম, "আঃ!"

"মানে?"

আমি জিভ চ্যাটাং চ্যাটাং করে বললুম, "হরিণ আমি বড্ড ভালোবাসি। কিন্তু তার জন্যে হরিণের মত আমিও কি তার হাতে শিকার হব!"

আর বললে, "সিনেমাটা বাদ দাও। ওখানে তো রসালাপ করতে পারবে না। বরঞ্চ বাড়িতে ডিনার খেয়ে পার্কে যাবে।" আমি বললুম, "চেষ্টা দেবো বন্ধুকে নিয়ে আসতে। এখন চলো কাফেতে।"

আমি পুনরায় মেরির ভেড়ার মত লটের পিছনে পিছনে কাফেতে ঢুকলুম।

॥ ২৪ ॥

"ভোজনান্তে দীর্ঘ জীহ্বা প্রকাশিয়া ইন্দ্রধনু বিনিন্দিত হনুদ্বয় বিস্তারীয়া"

আপনি যদি উদরস্থ বায়ু পাঠান-মুল্লুকের গিরিদরি প্রকম্পিত করে সশব্দে আস্যদেশ থেকে উচ্ছ্বসিত না করেন, সোজা বাঙলায় একটা বিরাট রামবোম্বাই ঢেঁকুর না তোলেন (নাবালেও পাঠান বিচলিত হয়ে স্বীয় উষ্ণীবপুচ্ছ নাসিকারন্ধ্রে স্থাপন করবে না) তবে পাঠান অতিথিসেবক বড্ডই ম্রিয়মাণ হয়ে আন্দেশা করে, তার ধর্মপত্নী স্বহস্তে ১২৮ ডিগ্রীর উষ্ণতম বাতাবরণে অশেষ ক্লেশ ভুঞ্জিয়া যে খাদ্যাদি প্রস্তুত করলেন সেটি আপনার রসনাপূত হয়নি। পক্ষান্তরে আপনি যদি এই "ভদ্রস্ততা" কোনো ডিউক—ডিউক কেন, ডিউকেতরের—বাড়িতেও করেন তবে অনায়াসে ধরে নিতে পারেন যে ও বাড়িতে প্রভু খৃষ্টের ন্যায় ঐটেই আপনার লাস্ট সাপার (Suffers) এবং সেইটে অজরামর করে রাখবার জন্য লেওনার্দো দা ভিঞ্চির সন্ধান নিতে পারেন।

ইংল্যান্ডের কায়দা-কেতার সঙ্গে কন্টিনেন্টের কায়দা-কেতার বেশ খানিকটে তফাৎ আছে। ইংলন্ডে সব সময়ই লেডিজ ফার্স্ট। এই সুবাদে একটি অতি মনোরম সত্য ঘটনা মনে পড়লো। সেটা বলছি।

ইতিমধ্যে সদর রাস্তা থেকে গলিতে ঢুকে লটে ছোট একটা কাফেতে ঢুকল। আমি পিছন পিছন। সঙ্গে সঙ্গে অন্তত তিনটি কণ্ঠ যেন গির্জের "হাল্লেলুইয়া, হে প্রভু! তোমার স্বর্গরাজ্য এই খর-তাপদগ্ধ মরুতে নেবে আসুক, ডমিনুস্ ভবিসকুম্" শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত, অবশেষে অবশেষে, আখের আখের এলি। দর্শন পেলুম। দিবারাত্তির মিনষেকে

জাবড়ে ধরে শুয়ে থাকিস নাকি? না—"

লটে রেসেপশন কমিটির গণ্যমান্য সদস্যদের হুলুধ্বনি উপেক্ষা করলে মদ্দেশীয় কংগ্রেসী মাইলর্ডরা যে রকম সর্বপ্রকারের প্রশস্তি নবমীনিন্দিত আবাহন "তাচ্ছিল্য" ভরে উপেক্ষা করেন কিন্তু শুনে যাওয়ার ভান করেন। লটে অবশ্য কোনো প্রকারের ছলাকলা কস্মিনকালেও জানতো না। তাই শুধলে, "হের প্রফেসর ডক্টর সৈয়দকে যে একটা মামুলি গুড মর্নিংও বললি নে!" মেয়েগুলো লটের মেয়ের বয়সী; আমাকে চিনবে কি করে? একজন বললে, "মাকে ডেকে আনি।"

লটে : "হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই কর। ওর সঙ্গে হয়তো আমাদের কালামানিকের গোপন প্রেম ঘুপসি ভাব-ভালোবাসা ছিল। আমাদের লটবরটি তোদের মায়ের যৌবনে ছিলেন একটি আস্ত পেটিকোট-শিকারী ব্রা-বিজয়ী।" আমি বললুম, "ছিঃ! প্ফুই।"

লটে বললে, "মর্ডান হতে শেখ। নইলে আমার সঙ্গে নাগরালী চতুরালি করবে কি করে? নিরামিষ প্রেমে আমার অরুচি।"

আমি কথাটা চাপা দেবার জন্য বললুম, "তোমাকে একটা মর্মস্পর্শী সত্য ঘটনা বলছি—এটিকেটের সুবাদে এইমাত্র মনে পড়ল। তোমাদের দেশে তো প্রায় কুম্নে মোকা বেমোকাতে লেডিজ ফার্স্ট। এখন হয়েছে কি, ফরাসী বিদ্রোহের সময় উন্মত্ত জনতা কোনোপ্রকারের বাছবিচার না করে কচুকাটা করছিল ফ্রান্সের ড্যুক, ব্যাবন জমিদার—তাবৎ খানদানী অভিজাতদের। প্রথম তাদেব জেলে পুরে, পরদিন ভোরবেলা একজনের পিছনে অন্যজনের দীর্ঘ লাইন কবে মেয়ে-মদ্দ সবাইকে মন্থর গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেত গিলোটিনের দিকে কারাগারের বিরাট চত্বব ক্রস করে। সর্বপ্রথম জন এগিয়ে গিয়ে মুণ্ডুটা ঢুকিয়ে দিত গিলোটিনের ফ্রেমের ফুটোটাতে। হুশ করে নেবে আসত দারুণ ভাবী সুতীক্ষ্ণ ট্যারচা তিনডবল খজোর চেয়ে সাইজে বড় একটা কাটার। বিদ্যুৎবেগে মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়তো মাফ-মাফিক অদূরে রক্ষিত একটা বাস্কেটের ভিতর (ফরাসী স্ল্যাঙ্গে তাই এখানে বলে "বাস্কেটে থুথু ফেলা" অর্থাৎ গিলোটিন প্রসাদাৎ পরলোকগমন)। জল্লাদ সেটা সরিয়ে দিয়ে সেখানে নূতন বাস্কেট রাখার পর কিউয়ের দ্বিতীয় "উমেদারের" দিকে তাকাবার পূর্বেই তিনি এগিয়ে আসতেন। পূর্ববৎ প্রক্রিয়া।

এখন হয়েছে কি, সে প্রভাতে কিউয়ের পঞ্চম ব্যক্তি ছিলেন এক সাতিশয় খানদানী মনিষ্যি ফ্রান্সাধিবাজ সম্রাটের ভাগ্নে না কি যেন। তিনি বন্দী হওয়ার সময়ই জানতেন তাঁর অদৃষ্টে কি আছে। তাই তাঁর সর্বোত্তম রাজদরবারী বেশ পরেই তিনি কারাগারে এসেছিলেন। সকালে বধ্যভূমিতে নির্গত হওয়ার পূর্বে ঘণ্টাখানেক ধরে প্রসাধন করেছেন। জুতোর খাঁটি রূপোর বগলস ঘষে ঘষে ঝাঁ চকচকে করেছেন। পা থেকে আবম্ভ করে সর্বশেষে মাথার পরচুলার উপব সযত্নে পাউডার ছড়িয়েছেন। আহা যেন নব বর—গিলোটিন বধূকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন।

তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, কিউয়ে ঠিক তাঁরই সামনে একটি মহিলা।

আমাদের নব বর কিউ থেকে এক পাশে সরে গিয়ে ডান হাত দিয়ে মাথার হ্যাট তুলে, বাঁ হাত বুকের উপর রেখে কোমরে দুভাঁজ হয়ে বাও করে মহিলাটিকে বললেন, "আমাকে স্মরণাতীতকাল থেকে আমার মা-জননী আদেশ করেছেন, লেডিজ ফার্স্ট। সে-আইন আমি কস্মিনকালেও অমান্য করিনি। আজ বড়ই প্রলোভন হচ্ছে মাত্র একবারের

তরে সে আইন খেলাফ করি। একবারের বেশী যে করবো না সে-শপথ আমি মা মেরীর পা ছুঁয়ে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। প্রমাণস্বরূপ আরো নিবেদন করতে পারি মাতৃলব্ধ সেই অনুশাসন ভঙ্গ করার পর 'ধন্য হে জননী মেরী, তুমি মা করুণাময়ী'র অশেষ করুণায়— যাঁর পদপ্রান্তে আমরা ত্রিসন্ধ্যা অশ্রুজলসিক্ত প্রার্থনা জানাই, দেবতাত্মা মা মেরী দেব-জননী। পাপী-তাপী আমাদের উপর এক্ষণে তোমার আশীর্বাদ বর্ষণ করো এবং যখন মরণের ছায়া আমাদের চতুর্দিকে ঘনিয়ে আসবে। আমেন—তাঁরই অশেষ করুণায় আমার মাতৃদত্ত সেই অনুশাসন ভঙ্গ করার পর আমি মাত্র মিনিট তিনেক ইহসংসারে মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করার বিবেকদংশনে কাতর হব, তিন মিনিট হয় কি না হয় মরণের ছায়া ঘনিয়ে আসবে, মা মেরী আশীর্বাদ করবেন, তাঁরই পদপ্রান্তে অনন্ত শান্তি অশেষ আনন্দ পাবো।

আমার একান্ত অনুরোধ কিউয়ে আপনি আমার স্থানটি গ্রহণ করুন। আমি আপনার স্থানটি গ্রহণ করার ফলে গিলোটিনে যাব আপনার পূর্বে—লেডিস ফার্স্ট আইন সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করবো এ-জীবনে প্রথমবার এবং এ-জীবনে শেষবারের মত। এই আমার সকরুণ ভিক্ষা আপনার কাছে। [১] যে-বংশে জন্মেছি তার প্রসাদে এবং প্রাসাদে আমাকে কখনো ভিক্ষা করতে হয়নি। এ-জীবনে এই আমার সর্বপ্রথম ভিক্ষাভাণ্ড গ্রহণ এবং দ্বিতীয়বার এ-দীনাচার করার পূর্বে সেটা চূর্ণবিচূর্ণ করে অনন্তলোকের প্রতি অভিযান। মা মেরীর জয় হোক।"

লটের চোখ দেখি ছলছল করছে। মেয়েটা চিরকালই স্পর্শকাতর আর অভিমানী।

কাফের রেসেপশন কমিটির মেয়েরাও তখন গুড়ি গুড়ি এসে আমার কাহিনী শুনছে।

আমি বললুম, "তুমি তো সাতিশয় খানদানী—"

"কি যে বলো!"

আমি বললুম, "তোমরা লীসেমরা রেগরা, গ্রেটে-কেটেরা, তোমরাই তো এখানকার প্রাচীনতম বাসিন্দা। এবং আপস্টার্ট মার্কিনদের সঙ্গে দু-পয়সার মোহে ধেই ধেই নৃত্য না করে উপায়ান্তর না দেখে আপন আপন বাস্তুবাড়িতে নিজেদের জ্যান্ত গোর দিয়েছ—"

"থাক, থাক। আমি হলে কি করতুম? বলতুম, 'না, সম্মানিত মহাশয়। আমি তিন মিনিট বেশী বাঁচলুম কি না বাঁচলুম সেটা অবান্তর। কিন্তু আপনি আপনার মাতৃ-আজ্ঞা—তা সে মৃত্যুর তিন মিনিট পূর্বেই হোক আর তিন বছর পূর্বেই হোক—লঙ্ঘন করতে যাবেন কেন? ফল যাই হোক না কেন। অবশ্য আমি নিশ্চয় জানি, আপনার পুণ্যশীলা মাতা মা মেরীর পদ-প্রান্ত থেকে সস্নেহ দৃষ্টিতে আপনার দিকে তাকিয়ে আপনাকে আশীর্বাদ করবেন, আপনাকে গর্ভে ধরে নিজেকে ধন্যা মনে করবেন।"

লটে হঠাৎ বলে উঠলো, "এই ছুঁড়িরা, তোরা ভাগ দেখি এখান থেকে। আমি

---

(১) আত্মহত্যা করার পূর্বে হিটলার তাঁর উইলে অনুশাসন করেন এবং তাঁকে বাচনিক আদেশ দেন গোবেলস যেন তাঁর মৃত্যুর পর প্রধান মন্ত্রী (চ্যান্সেলর) রূপে কর্মভার গ্রহণ করেন। কিন্তু গোবেলস আত্মহত্যা করেন হিটলারের মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টার পর। তাঁর উইলে লেখেন, "আমার জীবনে এই প্রথম আমি ফ্যুরারের আদেশ অমান্য করলুম। কিন্তু এটা লিখতে ভুলে গেলেই এবং এইটেই শেষ অবাধ্যতা।" আফটার অল গোবেলস তো খানদানী ভদ্রলোক নন। ফরাসী অভিজাতদের মত তাঁর পেটে এত এলেম, বুকে অত দরদ হবে কোথায়?

হেরম্যানকে ফাঁকি দিয়ে ছোঁড়াটাকে (আমি মনে মনে বললুম, আমি সিক্স্‌টি সিক্স্‌ ইয়ার ওল্ড নই, আমি সিক্স্‌টি সিক্স্‌ ইয়ার ইয়ং) নির্জনে নিয়ে এলুম পীরিত করব বলে। তোরা আবার বাগড়া দিচ্ছিস কেন? যাঃ!" মেয়েগুলো হুড়মুড়িয়ে একে অন্যের ঘাড়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান। শুধু একজন বললে, "কোজনেফ মা! লটে মাসী যে অ্যাদ্দিন ডুবে ডুবে শ্যামপেন খাচ্ছিলেন সে তো এ মুল্লুকের কোন চিড়িয়াও জানতো না।"

লটে আমার পায়ের উপর জুতো বসিয়ে সম্পূর্ণ মোলায়েমসে চাপ দিলে।

আমি সোৎসাহে বললুম, "গো...ল।"

লটে : "মানে?"

"তোমার পা দিয়ে কি করছো? ফুটবল খেলছো না?"

বললে, "ধ্যৎ"। আমার পাশেই ছিল একটা হ্যাট-স্ট্যান্ড। হঠাৎ লটের নজর গেল সেদিকে। সবচেয়ে ধূলিমাখা হ্যাটটি নামিয়ে এনে বললে, "এইটেই তো তোমার? দাঁড়াও আসছি।" বলে কাউন্টারে গিয়ে সেখান থেকে নিয়ে এল একটা ব্রাশ। টুপিটাকে অতি সযত্নে ব্রাশ করতে করতে বললে, "তোমাকে দেখভাল করার জন্য ইহসংসারে কেউ নেই। টুপিটার গণ্ডির নিচের দিক থেকে যে ধুলো বেরুল সে-রঙের ধুলো এ-দেশে নেই। আর এদেশে দেখভাল করার তরে কেউ যে নেই সেটা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

আমি বললুম, "কি যে বলো। তুমি তো রয়েছ।"

লটের চোখে ফের জলের রেখা। হতাশ কণ্ঠে বললে, "কদিনই বা এ-দেশে থাকবে। আর কবারই তোমার দেখা পাব। কিন্তু ভেবে দেখো দিকি, এটা কি একটা আশ্চর্য ঘটনা নয়। বলো দেখি এ পৃথিবীতে কটা মেয়ে দশ বছর বয়সে যাকে ভালোবেসেছে তাকেই ফিরে পেল চল্লিশ বছর পরে। তাও নিতান্তই দৈবাৎ। তুমি যদি দশ মিনিট পর ট্রাম-স্ট্যান্ডে আসতে তো তোমার সঙ্গে দেখাই হত না; আমার ট্রাম এসে যেত আর আমি চলে যেতুম কোথায় কোন্ পোড়ারমুখো বন শহরে। তারপর ফের দেখা হত পঞ্চাশ বছর পরে।"

আমি বললুম, "মোটেই বিচিত্র নয়। তোমার ঠাকুদ্দার বাবা তো বেঁচেছিলেন একশ এক বছর! তুমিই বা কি দোষ করলে।"

রাগের ভান না রাগ, হতে পারে দুটো, মিশিয়ে বললে, "তোমার শুধু হাসাহাসি আর ঠাট্টা মজা। কোনো জিনিস সিরিয়াসলি নিতে পারো না।"

আমি শঙ্কা আর দুর্ভাবনার ছল করে শুধালুম, "আমাদের প্রেমটা কি বড্ডই সিরিয়াস?"

'আকাশ পানে হানি যুগল ভুরু' বললে, "দারুণ ডেঞ্জারাস, কখন যে ফট করে আমার হার্টটা টুক করে ফেটে যাবে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। আর শোনো আমি একশ বছর বাঁচতে চাইনে।"

"কেন?"

"হেরমানের পরিবারের সবাই স্বল্পায়ু...বাপের দিক থেকে, মায়ের দিক থেকেও। সে আমার আগে চলে গেলে আমি সইতে পারবো না। বেশীদিন বাঁচবো না।"

আমি মনে মনে সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রার্থনা করলুম, "তোমার সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় থাকুক। তোমরা জীবন যেন খণ্ডিত না হয়। তুমি অখণ্ড সৌভাগ্যবতী হও।"

আমি শুধালুম, "লটে, এদেশে তো নিয়ম কাফে-রেস্তোরাঁ-পাব-এ ঢোকার সময়ে ব্যত্যয় হিসেবে লেডিজ ফার্স্ট নয়, পুরুষ আগে ঢোকে। তবে তুমি হুট করে এ-রকম পয়লা ঢুকলে কেন?"

উত্তর শুনে বুঝলুম লটে রীতিমত তালেবর মেয়ে হয়ে উঠেছে। বললে, "এটিকেট যারা অন্ধভাবে মেনে চলে তারা হয় মূর্খ নয় স্নব। স্নব-রা সর্বক্ষণ ভরে মরে, ঐ বুঝি এটিকেটের পান থেকে চুন খসে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সবাই বুঝে গেল যে সে আসলে নিম্ন পরিবারের লোক কিন্তু এখন দু-পয়সার রেস্ত হয়েছে বলে উঠে পড়ে লেগেছে কি করে খানদানী সমাজে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায়। তাহলেই তো সর্বনাশ। স্নেক অ্যান্ড ল্যাডার খেলায় সাপের মুখে পড়লে যেরকম এক ধাক্কায় স্-স্-স্-র করে পিছলে পড়ে ফের আপন কোঠে ফিরে যেতে হয় তারও হবে সেই হাল। আবার, ফের, ফিন্‌সে। আসলে এ-এটিকেটের কারণটা কি? রেস্তোরাঁ-পাব-এতে আকছারই কোনো কোনো পোঁচি মাতাল এমন কি অতিশয় খানদানী মনিষ্যিও (শোনোনি "ড্রাঙ্ক লাইক এ লর্ড") বানচাল হয়ে হইহল্লোড় লাগায় আকছার। ঐ অবস্থায় কোনো লেডি যদি হুট করে হঠাৎ ঢুকে পড়েন তবেই তো চিত্তির। তিনি হবেন বিব্রত অপ্রতিভ। তাই সঙ্গের পুরুষ তাঁর আগে ঢুকে পাব-এর বাতাবরণটা জরিপ করে নিয়ে হয় তদ্দণ্ডেই বেরিয়ে যায় নয় তাঁকে গ্রীন সিগনেল দেয়। বেরুবার সময় কিন্তু লেডিজ ফার্স্ট। লেডির উপস্থিতিতে সে হয়ত বিল বাবদে স্লো সার্ভিস নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে চায়নি। লেডি বেরিয়ে গেলে কাউন্টারে গিয়ে প্রেমসে লড়াই লাগাবে। হয়তো বা বড্ড বেশী বিয়ার খাওয়ার ফলে পেট টনটন করছে—সে-স্থলে স্বয়ং কাইজারও ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারেন না—অর্থাৎ বাথরুম—সে-স্থলে একটা টুঁ মেরে আসতে চায়।

এ-কাফেটি আমি চিনি আমার হাতের চেটোর মত—দশ বছর বয়স থেকে। কাফের অধিষ্ঠাত্রী মালিক আমাকে চেনেন সেই আদ্যিকাল থেকে। এখানে আমি হুট করে ঢুকলে বিব্রত হব কেন? তদুপরি সবচেয়ে মোক্ষম তত্ত্ব যেটা অবতরণিকাতেই বলা উচিত ছিল যে এ-কাফেতে মাদকদ্রব্য আদৌ বিক্রি হয় না। এখানে বানচাল হবে কি গিলে? আইসক্রীম, চা, কোকো, নেবুর রস, ইওগুর্ত (দই), কফি?—আর কালো কফি খেলে তো নেশা কেটে যায়।"

আমি শুধালুম, "লটে, তুমি কখনো নেশা করে বানচাল হয়েছ?"

লটে বললে, "বা রে। সেই যে দশ বৎসর বয়সে তোমাকে ভালোবেসেছিলুম সে নেশার খোয়াড়ি তো এখনো কাটেনি। অবশ্য এ-কথা ঠিক, তোমার সঙ্গে যদি ফের দেখা না হত তবে সে প্রেম এরকম মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠতো না। শুনেছি, চীন দেশে নাকি একরকম মোক্ষম দারুণ কড়া মদ আছে। রুশদের ভোদকা, ফরাসীদের আবস্যাঁৎ এর কাছে নাকি একদম নিম্বুপানি। সে-মদ রাত দশটা অবধি দু-তিন পাত্তর খেতে না খেতেই পুরো পাক্কা নেশা। তারপরও যদি খাও তবে হয় বমি করবে নয় অঘোরে ঘুমিয়ে পড়বে। পরের দিন ঘুম ভাঙতে দেখবে নেশা বিলকুল কেটে গিয়ে মাথা একদম সাফ। তখন সামান্য একটুখানি প্রাতঃরাশ সেরে খাবে দু-পেয়ালা গরম জল। আর যাবে কোথা? চড়চড় করে ফের নেশা চড়বে হুবহু আগের রাত্তিরের মত। চীনারা বলে, আগের

রাত্তিরের নেশার একটা তলানি পেটে জমে থাকে—আর পাঁচটা মদের মত শরীর থেকে বেরিয়ে যায় না। সেটাতে গরম জল পড়লেই সে মাথা চাড়া দিয়ে জেগে ওঠে, আবার সেই অরিজিনেল মদের কাজ করে। পরের দিন আবার দ্বিতীয় দিনের মত স্রেফ দু-পেয়ালা গরম জল ঢাললেই ফের উত্তম নেশা, করে করে একবার মদ খেয়ে তিন দিন ধরে তিন বার নেশা করা যায় একই খর্চায়।"

আমি শুধালুম, "মদ্যাদি ব্যাপারে যে তুমি এত গবেষণা করেছ সে তো আমি জানতুম না।"

চোখ পাকিয়ে বললে, "তুমি একটা আস্ত বুদ্ধু (জর্মনে বললে "ডোফ্"—তারপর সেই "ডোফ্" শব্দের তর তম করে বললে "ডোফ"—"ডোভার"—"কালো")। রূপকটা একদম ধরতে পারো নি। আমার দশ বৎসর বয়সে তুমি যে প্রেম মদিরা খাইয়েছিলে, চল্লিশ বৎসর পরে এসে তার তলানিতে ঢাললে দুপেয়ালা গরম জল। সে প্রেম ফের চাড়া দিয়ে উঠলো। বুঝলে? না টীকার জন্য প্রফেসর কির্ফেলের সন্ধানে বেরুতে হবে।"[১]

খানিকক্ষণ মুচকি হেসে শুধালে, "আচ্ছা বলো তো, আমার বয়স যখন কুড়ি আর তোমার ছত্রিশ তখন আমাদের দেখা হলে কি হতো?"

আমি সতর্কতার সঙ্গে শুধালুম, "হেরমান তখন বাজারে ছিল কি?"

বললে, "জোঃ। শুধু হেরমান! আমি কি অতই ফ্যালনা! আমার রসের হাটে অন্তত হাফ ডজন নাগর ছিলেন। সপ্তাহের ছটা দিন ছটা উইক-ডে ওদের ভাগ করে দিয়েছিলুম রীতিমত টাইম-টেবল বানিয়ে। আর রববারটা রেখেছিলুম ফ্রী চয়েসের জন্য। সপ্তাহের ছদিনের আটপৌরে কাপড় পরার মত আটপৌরে লাভার নিয়ে তো রববার বেরনো যায় না। পরতে হয় সানডে বেসট্। কিন্তু কই আমার কথার তো উত্তর দিলেনা।"

"কোন কথা?"

ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, "লাও! কোন কথা? হায়রে আমার লাভার! আমার বযস যখন কুড়ি আর তোমার—"

"অ! বুঝেছি বুঝেছি, কিন্তু জুলিয়েটের বয়স তো ছিল চোদ্দ।"

"সে তো ইতালির মেয়ে, প্রেমের ফুল ফুটে যায় কলিটা ভালো করে শেপ নেবার পূর্বেই। ওরা তো দক্ষিণ দেশের।"

মনে মনে বললুম খাস কলকাত্তাইও বজবজের লোককে বলে "দোনো"। ওরা নাকি বড্ডই অকালপক্কতা রোগ ধরে—দোহাই ধর্মের আমাকে দোষ দেবেন না—শুনেছি, কলকাতায় ফূর্তি করতে এসে চারটি পয়সা বেঁচে গেলে কাগজ কিনে খুড়োর নামে একটা ভুয়ো মোকদ্দমা লাগিয়ে গ্রামে ঢোকার সময় খুড়োকে শুধিয়ে যায় "মোকদ্দমা লাগিয়ে এসেছি, খুড়ো! এইবারে শিকেয় ঝুলনো হাঁড়ি থেকে ধুতি শার্ট বের করো। সদরে কবার ছুটোছুটি করতে হবে রাসবিহারী ঘোষও বলতে পারবে না। আর ধোপদুরস্ত

---

(১) প্রফেসব কির্ফেল গডেনবের্গে বাস করতেন বলে লটে তাঁকে চিনত। বন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়াতেন। পুবাণ সম্বন্ধে তিনি একখানা বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। নাম 'ইন্ডিশে কসমোগনী"। বহু জর্মন অজর্মনকে উত্তম সংস্কৃত শিখিয়েছিলেন—আমাকে শটকে শেখাতে পারেন। 'ন। সেন্সাস বিপোর্টে ধর্মস্থলে তিনি লেখেন, "বৌদ্ধ"।

জামাকাপড় পরে যেয়ো। নইলে খরটা আমার কানে পৌঁছলে আমি তোমার ভাইপো হিসেবে বড্ড লজ্জা পাবো যে।"

ওদিকে লটে অতিষ্ঠ।

আমি গম্ভীর কণ্ঠে বললুম, "ঐ সময়ে দেখা হলে, হুঁ, একটা আতশবাজী, একটা বিশ্বযুদ্ধ, একটা ভূমিকম্প, একটা দাবানল, একটা প্রলয়ঙ্করী মন্বন্তর, একটা—" মুখে আর কথা যোগালো না। ঈষৎ ভয় পেয়ে বললুম, "কিন্তু নাৎসিরা তখন সর্বশক্তিমান! তারা কি আমাকে ছেড়ে কথা কইত। আমাকে ইহুদী ভেবে—"

"যা। তোমাকে ইহুদী ভাবতে যাবে এমনতরো দুচোখ কানা নাৎসিদের ভিতরও হয় না। ইহুদীদের মত শকুনিপারা বাঁকা নাক তোমার কোথায়? কোথায় মোটা মোটা ঠোঁট যার নিচেরটা ঝুলে পড়েছে বিঘৎ খানেক? কোথায় দুটো বিরাট বিরাট কান যেগুলো মাথার সঙ্গে চেপ্টে না গিয়ে পার্পেনডিকুলার হয়ে যেন আকাশের দু-প্রান্ত ছুঁয়ে উঠে আছে দুনিয়ার কে কি বলছে সে সব সাকুল্যে শোনার জন্য যেন ফাঁদ পেতেছে। আর বলতে নেই কিন্তু কোথায় তোমার সেই হাফ মেয়েলি নাদুসনুদুস যুগ্ম নিতম্ব—ইহুদীদের পেটেন্ট করা মাল? বরঞ্চ আমাকে ইহুদিনী বলে ভাবতে পারে।"

আমি ভয় পেয়ে বললুম, "করেছিল নাকি?"

তাচ্ছিল্লির সঙ্গে বললে, "এক লক্ষ্মীছাড়া কালো কুর্তিপরা নাৎসি আমার সঙ্গে আলাপচারী করার জন্য কোনো অরিজিনাল পন্থা না পেয়ে শেষটায় ক্যাবলাকান্তের মত বত্রিশটা পোকায় খাওয়া মুলোর মত হলদে দাঁত বের কবে শুধলো, আমি ইহুদিনী কিনা?"

আমি বললুম, "সর্বনাশ!" আমসটার্ডামের আন ফ্রাঙ্কের কথা মনে পড়াতে শরীরটা শিউরে উঠলো। কনসানট্রেশন ক্যাম্পে অসহ্য যন্ত্রণা ভুলে যে গেল, তার দিদি মৃত্যুশয্যায় ছটফট করতে করতে উপরের বাঙ্ক থেকে সিমেন্টের মেঝেতে পড়ে শিরদাঁড়া ভেঙে মারা গেল। তাদের বুড়ী মা গেল অন্য ক্যাম্পে অনাহারে. কিন্তু শান্তসমাহিত-চিত্তে। পরিবারের মাত্র একজন বেঁচে গেলেন অলীলাক্রমে। হুকুম এসেছিল যে কটা ইহুদী, বেদে, বামন বাঁটকুল আছে (এই বাঁটকুলেরা সার্কাসের ক্লাউন প্রভৃতি সেজে নাৎসি কসাইদের মনোরঞ্জন করতো বলে এদের গ্যাস-চেম্বারে পাঠানোটা ক্রমেই পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছিল) তাদের সবাইকে খতম করে কনসানট্রেশন ক্যাম্প নিশ্চিহ্ন করা হোক। কিন্তু সে আদেশ পালন করার পূর্বেই রাশানরা ক্যাম্প জয় করে সবাইকে মুক্তি দিল। এরই মধ্যে ছিলেন আন ফ্রাঙ্কের পিতা। ইনি যখন কৃষ্ণ সমুদ্র থেকে "বাড়ি" "আমসটার্ডম" পাড়ি দিলেন তখন তাঁরই মত অবলীলাক্রমে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত ইহুদীদের কাছ থেকে শুনতে পেলেন তাঁর পরিবারের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির কথা।[১]

---

(১) হিমলাব সম্প্রদায় যে কী মারাত্মক আহাম্মুকী বশত কত লোক মেরেছে তার হিসেব নেই। একবার ধরা পড়ে কয়েকশ বা হাজাব এক অজানা জাতের লোক। বিস্তর এনসাইক্লোপীডিয়া ঘেঁটেও হিমলারেব "জাতি নিরূপণ বিভাগেব" ভুঁইফোঁড় "পণ্ডিতরা" স্থির করতে পারলেন না, এরা আর্য না অনার্য, "সাবধানের মার নেই" এই তত্ত্বের স্মবণে শেষটায়—বোধ হয়, একটা মুদ্রা টস করে—ওদের গ্যাস-চেম্বারেই পাঠানো হল। যুদ্ধের পর সন্দেহাতীতরূপে আন্তর্জাতিক গবেবকরা মীমাংসা করলেন এরা আর্য। এ জাতের কটা লোক এখনো বেঁচে আছে কেউ জানে না।

লটে বললে, "আমি তেড়ে বললুম, আমার চতুর্দশ পুরুষ ইহুদী।" তারপর হ্যান্ডব্যাগ থেকে বের করে আমাদের ছাপানো কুলজি দিলুম বাছাধনের হাতে। ওটা ছাপা হয়েছিল কাইজারের আদেশে। তিনি অবশ্য তখন নির্বাসনে কিন্তু কাইজার থাকাকালীন তিনি এরকম কেউ শতায়ু হলে তাকে অভিনন্দন জানাতেন, ঠাকুদ্দার বাবাকেও সেই রীতি অনুযায়ী শুভেচ্ছা জানান এবং অনুরোধ করেন আমাদের কুলজি যেন নির্মাণ করা হয়।

আমাদের অধ্যাপক কির্ফেল, গেরেমভারী বিস্তর বাঘা বাঘা প্রফেসর মায় পাদ্রী সাহেবরা যাঁদের গির্জেতে আমরা বাপ্তিস্ট হয়েছি এবং চার্চের কেতাবে আমাদের নাম রয়েছে—এস্তের গবেষণা করে প্রমাণ করলেন আমাদের পরিবার সাতশ বছরের পুরনো ক্যাথলিক। এর চেয়ে প্রাচীনতর কোনো পরিবার আছে বলে তাঁরা জানেন না। এটা যখন তৈরী হয় নাৎসিরা তখনো দাবড়ে বেড়াতে আরম্ভ করেন নি। কাজেই ওতে কোনো ফাঁকি-ফক্কিকারী ছিল না। আর গোটা ফতোয়াটাতে ক্যা অ্যাব্বড়াবড়া শিলমোহর—সুপ প্লেটের সাইজ।"

কথা থামিয়ে হঠাৎ বললে, "বেচারী হেরমানকে কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে? না বাইরে খাবে?"

আমি বললুম, "না হয় হেরমানের হাতে গুলি খেয়েই মরবো। কিন্তু হরিণের মাংসটা খেয়ে নিয়ে।"

বললুম, "এই আসছি", কাউন্টারে গিয়ে কিনলুম একটা ঢাউস কেক।

ফিরতেই লটে বললে, "এ আবার কি আদিখেত্তা।"

আমি বললুম, "হেরমানের জন্য ঘুষ।"

বললে, "আখ্! ঘুষ দেবার প্রাচ্যদেশীক পদ্ধতি এ-দেশে আবার আমদানি করছো কেন?"

॥ ২৬ ॥

বন-গডেসবের্গে একদা প্রবাদ ছিল, হাতে যদি মেলা সময় থাকে তবে ট্রামে চাপো, নইলে হন্টনই প্রশস্ততর, অর্থাৎ সঙ্কীর্ণতর অর্থাৎ কম সময় লাগবে। কারণ এসব প্রাচীন শহরে এত গলিঘুঁজির শর্ট-কাট রয়েছে যে ট্রামকে অনায়াসে টীড দিতে পারেন—কারণ তাকে যেতে হয় চওড়া রাস্তা দিয়ে এবং তাকে অনেকখানি ঘুরে ফিরে কখনো বা ট্রায়েঙ্গেলের দুই সাইড কাভার করে, কখনো বা চতুর্ভুজের তিন ভুজ দিয়ে তিন হদ্দী (ঈশ্বর রক্ষতু। চৌহদ্দী হয়) কেটে মোকামে পৌছতে হয়। বস্তুত আপনি গলিঘুঁজি দিয়ে যাবার সময় ঐ ট্রামকে অন্তত বার দুতিন অনেক দূর থেকে দেখতে পাবেন—আপনার অনেক পিছনে। বস্তুত সে আমলে তিনশ্রেণীর লোকে ট্রামে চাপতো : প্রথম-বিশ্বযুদ্ধে আহত খঞ্জ, বাচ্চা-কোলে মা এবং থুত্তুরে বুড়ী। বস্তুত কোনো সুস্থ-সমর্থ যুবক ট্রামে উঠলে সবাই ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাতো : ভাবতো নিশ্চয়ই অগা টুরিস্ট কিংবা মুক্ত পাগল (বদ্ধ পাগল নয়) : পাগলা গারদকে ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছে।

শুনেছি, কাশীর ঠিক মধ্যিখানে ঐ একই হাল। হাতে এস্তের সময় থাকলে টাঙ্গাগাড়ি নেবে, না থাকলে চরণশকট। দিল্লীতে তো রীতিমত এর আঙ্গিনা দিয়ে, ওর রান্নাঘরের দাওয়া থেকে লম্ফ মেরে তেসরা আদমীর চৌবাচ্চায় উঠে, এমন কি সুড়ুৎ করে কোনো

রমণীর প্রসাধনকক্ষের এক দরজা দিয়ে ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে মোকাম পৌঁছানই রেওয়াজ। কেউ কিছুটি বলবে না।

রাস্তায় নেমে লটে শুধোলে, "ট্রাম না হন্টন?"

আমি গুনগন করে গান ধরলুম,

"—তোমারি অভিসারে
যাবো অগম পারে—"

লটে খুশী হয়ে বললে, "বাঃ! তোমার তো বাস ডুঙ্কেলে (অন্ধকার) গলা।"

আমি শুধালুম, "ডুঙ্কেলে স্টিমে, সে আবার কি?"

"ও হরি, তাও জানো না। হেলে স্টিমে—সে হল পরিষ্কার গলা—"

আমি অভিমানভরে বললুম, "বদখদ গলা? সে-কথা সোজা কইলেই পারো অত ধানাইপানাই কেন? আর তোমার হেরমানের গলা বুঝি কোকিলের মত, ৎসুজ কুকুক্ নখ্‌মাল্ (চুলোয় যাকগে)"—[১]

বাধা দিয়ে লটে বলে, "তোর বুদ্ধি বাড়তি না কমতি?' সুকুমার রায় যেরকম "হযবরল" নামক তুলনাহীনা পুস্তিকায় কার যেন বয়স কত জানার পর বিদকুটে প্রশ্ন শুধোন "বাড়তি না কমতি?" অর্থাৎ বয়স বাড়ছে, না কমছে?

আমি তাড়া দিয়ে বললুম, "আমি ছেলেবেলাতেই ছিলুম অলৌকিক বালক। যে রকম বেটোফেন আট না দশ বছর বয়সে ওস্তাদস্য হেন্ডেল একবার এই গোডেসবের্গে এলে পর তার সামনে কি যেন এক যন্ত্র বাজান, মেন্ডেলজন ঐ বয়সেই গ্যোটের সামনে পিয়ানো বাজান। তোমরা যাকে বলো ভুন্ডার কিনট্ (ওয়ান্ডার চাইলড্) ইংরিজিতে বলে "চাইলড্ প্রডিজি"।"

লটে আমাকে জড়িয়ে ধরে—জায়গাটার ঈষৎ আলোছায়ার লুকোচুরি চলছিল—বললে, "হ্যাঁ আলবৎ! তুমি সেই ছাব্বিশ বছরেই ছেষট্টি বছরের বুদ্ধি ধরতে।"

আমি খুশি হয়ে বললুম, "হেঁ হেঁ।" তখন হঠাৎ খেয়াল গেল, লটে মীন করেছে, ছাব্বিশের পর আমার বুদ্ধি বাড়েনি। বললুম, "কি বললে?"

লটে একটা বাড়ি দেখিয়ে বললে, "এই তো তোমার আরেক প্রিয়া, লিস্‌বেটের বাড়ি।"

আমি চিন্তান্বিত হয়ে বললুম, "লিস্‌বেট? লিস্‌বেট?—আ এলিজাবেৎ।"

অবহেলার চরমে পৌঁছে লটে যা বললে সেটা আমরা বাঙলায় বলি, পাড়ার মেধো ও-পাড়ার মধুসূদন।

আমি বললুম, "ওর সঙ্গে আমার আবার কবে ভাব-ভালোবাসা হল? আমাদের মেলার সময় সবাই সকলের সঙ্গে কথা কয়। সেখানে প্রথম আলাপ। তারপর তো মাত্র দুতিন বার ট্রামে—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি আর ও তোমরাই তো ছিলে দুজন যারা এখান থেকে বন য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে যেতে।"

---

(১) জর্মন শিক্ষার্থীদের উপকাবার্থে · কোকিলকে জর্মনে কুকুক্ বলে। তবে দুটাতে বোধ হয় কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে—যদ্দূর আমার জ্ঞান। ৎসুজ কুকুক্ নখ্‌মাল্, অনেকটা আমাদেব "কচু, ঘন্টা, হাতী"ব মত। এস্থলে কোকিলকেই কেন বেছে নেওয়া হল সে প্রশ্ন যদি আপনি শুধোন তবে উত্তর, "কচু, ঘন্টা, হাতী"ই বা আমরা বেছে নিলুম কেন? "ছাই জানো" কেন?

"ট্রামে সামান্য আলাপ হয়।"

"তারপর সেটা যে দানা বাঁধলো তা তার একমাত্র কারণ, মেলার তিন-চারদিন পরই তো তোমার ল্যান্ডলেডি গোডেসবের্গের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বন-এ ফ্ল্যাট নিলে। তুমিও সুশীল ছেলের মত তার সঙ্গে সঙ্গে বন চলে গেলে। কেন? গোডেসবের্গে কি অন্য ঘব আর ছিল না?"

আমি চুপ।

বললে, "আমি কেঁদেছিলুম।"

আমি তো অবাক।

আমরা তখন রোমার প্ল্যাৎসে পৌঁছে গিয়েছি। লটে বললে, "ঐ দ্যাখো একটা ট্রাম আসছে। ওটা ধরলে পাঁচ মিনিটে বাড়ি পৌঁছে যাবো।"

আমি সেই প্রাচীন প্রবাদ "সময় হাতে থাকলে ট্রাম, নইলে হন্টন" উদ্ধৃত করলুম।

"ছোঃ এখন তো ট্রামটা একদম ফাঁকা রাস্তা দিয়ে নাক বরাবর মেলেম যাবে! একদম আমাদের বাড়ির সামনে ট্রামের টার্মিনাস।"

আমি উৎসাহিত হয়ে বললুম, "পায়ে চলার পথ দিয়ে কিছুটা ঝোপঝাড় পেরিয়ে একদম রাইনের পাড়ের উপর একটা ফুটফুটে কটেজ আছে বলে মনে পড়ছে।"

"হাঁ, হ্যাঁ। তোমার কি করে এত সব মনে আছে?"

"য়োহানেস সে তো যুদ্ধে রয়ে গেল, আংনেস আর আমি এখানে প্রায়ই আসতুম— রাইনে সাঁতার কাটতে। একদিন হয়েছে কি—সে ভারী মজার গল্প—আংনেস একটা ঝোপের আড়ালে ফ্রক-ট্রক ছেড়ে সেগুলো একটা উঁচু ঝোপের নিচের ডালে ঝুলিয়ে রেখে সুইমিং কসট্যুম পরে বেরিয়ে এল। সাঁতার কাটতে কাটতে সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ফেরার মুখে আংনেস কিছুতেই সে-ঝোপ খুঁজে পায় না। বোঝো ঠেলা। য়োহানেস, জানো তো, সব সময়ই ঠাট্টামস্করা করতে ভালবাসতো। সে বিজ্ঞভাবে বললে, "নিশ্চয়ই আংনেসের কোনো এডমায়ারার চুরি করেছে।" যেন চাপানের ওতর দিলুম, "যেন বৃন্দাবনের বস্ত্রহরণ।" য়োহানেস শুধালে, "সে আবার কি?" ওদিকে আংনেস কাঁদো কাঁদো। সুদ্দুমাত্র সুইমিং কসট্যুম পরে এখান থেকে বাড়ি পর্যন্ত সদর রাস্তা দিয়ে সে যাবে কি করে। চোখের জলে প্রায় ভেসে গিয়ে বললে, "তোমরা দুজনার কেউ কি লক্ষ্য করোনি আমি কোন ঝোপটার আড়ালে কাপড় ছেড়েছিলুম?"

কোরাস :

আর জর্মনে বলা হয়, যে কোকিললোকে (কুকুকস্ল্যান্ড) বাস করেছে সে মহাশূন্যে বাসা বেঁধেছে; বাস্তবের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। হিটলারের তাবৎ সৈন্যদল যখন পরাস্ত, রুশরা বার্লিন উপকণ্ঠে হানা দিয়েছে তখনো হিটলার ম্যাপের উপর লাল নীল নানা রঙের বোতাম সাজিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাল্পনিক সেনাবাহিনীর (কারণ তারা তখন হেরে গিয়ে উধাও) প্রতীক দিয়ে কোথায় তিনি পুনরায় আক্রমণ করে রুশদের মরণ কামড় দেবেন, তারই স্ট্যাটেজি-পরিকল্পনা করছেন। যেসব জেনারেল তখনো তাঁকে ত্যাগ করেননি তাঁরা বাস্তবের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন বলে যুদ্ধ-শেষে লিখেছেন, "হিটলার তখন কোকিললোকে বাসা বেঁধেছেন।" বিশেষ করে কোকিলকেই কেন বাছা হল—সে তো খুব উর্দ্ধাকাশে যায় না—তার কারণ বোধ হয় সেই অবাস্তবলোকে কোকিলই তাঁকে মধুর আশার বাণী শোনায়।

য়োহানেস, "বা রে! আমরা বুঝি আড়ি পেতে দেখব একটি তরুণী কি প্রকারে বিবস্ত্র হচ্ছে?"

আমি, "বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! ভদ্রতায় বাধে নইলে—"

আংনেস : অশ্রুবর্ষণ তথা রোদন।

শেষটায় আমি বললুম, "ঐ যে রাইনের পাড়ে বাড়িটি—সেখান থেকে না হয় তোমার জন্য একটা ফ্রক ধার নেওয়া যাবে।" অবশ্য ও বাড়ির বাসিন্দাদের আমরা আদৌ চিনতুম না।

লটে বললে, "তখন সে বাড়িতে থাকতেন আমার শ্বশুরশাশুড়ি আর হেরমান। তাঁরা গত হলে পর—সে অনেক দিনের কথা—হেরমান আমাকে বিয়ে করে ঐ বাড়িতে তোলে। নইলে তো অন্য বাড়ি খুঁজতে হত। কিন্তু—"

ট্রাম গাড়ি তখন প্রায় ফাঁকা। টার্মিনাসে পৌঁছেছে কিনা। ঠাঠা করে অট্টহাস্যে কন্ডাক্টারকে সচকিত করে লটে শুধু হাসে আর হাসে।

আমি শুধালুম, "কি হল?"

হাসতে হাসতে বললে, "সে বাড়িতে তখন তো আমার শাশুড়ি ভিন্ন অন্য কোনো মেয়েছেলে নেই। তাঁর ওজন ছিল নিদেন একশ কিলো। ইয়া দশাসই গাড়ুর্গুম লাশ। আংনেসের চেয়ে দেড় মাথা উঁচু। তাঁর ফ্রক পরে আংনেস রাস্তায় নামলে তোমাদের দুজনাকে মাটিতে লুটনো সেই ফ্রকের শেষপ্রান্ত তুলে ধরে চলতে হত—বিয়ের সময় গির্জেতে দুটি মেয়ে যে রকম কনের এ্যাল্‌লম্বা ফ্রকের শেষপ্রান্ত তুলে ধরে পিছন পিছন যায়। তা সে যাকগে। শেষটায় হল কি তাই কও।"

"পর্বতের মূষিক প্রসব। ব্যাপারটা কি জানো, আমাকে তোমরা যতখানি ভালো ছেলে বলে মনে করতে—"

"কে বললে?"

"আমি ততখানি মোটেই ছিলুম না। আড়ি পেতে বেশ কিছুটা—"

"চোপ!"

"অবশ্য আমি চালাকও বটি। যখন ঝোপটা খুঁজে পেলুম তখন তার থেকে বেশ খানিকটে দূরে গিয়ে য়োহানেসকে ডেকে বললুম, "ওহ্ সোনারচাঁদ য়োহানেস, ঐ হোথা ঝোপটায় তদন্ত করো তো। আমি এদিকটা সামলাই।"

মূর্খ য়োহানেস যখন আবিষ্কারের বজ্রধ্বনি ছাড়লে তখন কোথায় লাগে প্রাচীন যুগের 'ইউরেকা'—সে তো ঝিঁঝি পোকার মর্মরধ্বনির মৃদু গুঞ্জরণ।

আংনেস তখন য়োহানেসের দিকে যে ভাবে তাকালে তার তুলনা তুমি যদি আমার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে খুনের শাসানি দিয়ে শুনতে চাও তবে বলবো, য়োহানেস যদি কোনো গ্রামের দয়ানিধি নিরীহ্ পাদ্রীসাহেবকে সপরিবার হত্যা করে তাদের লাশ ঐ গ্রামের একটিমাত্র কুয়োতে ফেলে দিয়ে তার জল বিষিয়ে দিত তবুও বোধ হয় গ্রামের কনস্টেবল তার দিকে ওভাবে তাকাতো না।"

মনে মনে বললুম, "খেলেন দই রামকান্ত বিকারের বেলা গোবদ্দন।"

সেই ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে বনের পথে আঁধার-আলোর আলিম্পনের উপর দিয়ে আমি লটের কোমরে হাত রেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছি। লটে যেন আরো ধীরে ধীরে যাচ্ছে। সে বনে যেন আবেশ লেগেছে। রাইন থেকে বয়ে আসা বাতাসের পরশে পাতায় পাতায় যেন নূপুরধ্বনির মৃদু গুঞ্জরণ। হায় যদুপতি, কোথায় গেল

মথুরাপুরী—না, না, কোথায় গেল সেই কদম্ব বনঘন বৃন্দাবন। কলিযুগে দেবতাদের স্মরণ করা মাত্রই সম্বল।

—চলি পথে যমুনার কূলে
শ্রীরাধামাধব কিবা
কুঞ্জে কুঞ্জে রসকেলি করে।
বলো লটে, কেবা যায় ঘরে!!

হায় আমার কপাল যে বড়ই মন্দ।

লটে তার দীর্ঘতম উষ্ণ প্রশ্বাস ফেলে বললে "তুমি বড় দেরিতে এলে।"

আমি মনে মনে বললুম, "তবু তো এসেছি। কদম্ববনবিহারিণী বিরহিণীর শোক তো লটে জানে না। শ্যামসুন্দর যখন মথুরা চলে গেলেন তখন তারই স্মরণে আমারই গ্রামের কবি গেয়েছিলেন :

"দেখা হইল না রে, শ্যাম, আমার এই
নতুন বয়সের কালে।"

লটে বাড়ির দোরে ল্যাচকী লাগাবার পূর্বেই হুস করে দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে—কে আর হবে—হেরমান।

আমি মূর্ছাহতের ন্যায় দরজা চেপে ধরে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলুম, "কটা পিস্তল?"

॥ ২৭ ॥

এই হেরমান লোকটির সঙ্গে পরিচয় না হলে আমার জীবনে একটা দুঃখ থেকে যেত। খবরের কাগজে তাই কোনো কোনো বেসাতির চতুর বেসাতি বিজ্ঞাপনে বলেন "আপনি জানেন না, আপনি কি হারাইতেছেন" অর্থাৎ আপনি যে "সানসার্ফ" কিংবা "অমূল্য-রমা-দালদা" ব্যবহার করছেন না—তাতে করে আপনার যে কী মারাত্মক সর্বনাশ হচ্ছে সে-কথা আপনি জানেন না।" উত্তরে গুণীরা বলেন, "হুঁ। যার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনে, সেটা আমার আর কী ক্ষতি করতে পারে। যতক্ষণ আপনার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হওয়ার ফলস্বরূপ আপনি জানতে পারেন নি আপনার একচেটে প্রিয়া বিশ্বপ্রেমে বিশ্বাস করেন, ভূমাতে আনন্দ পান, কাউকে কোনো ব্যাপারে বঞ্চিত করে তাকে মনোবেদনা দিতে অতিশয় বিমুখ, ততক্ষণ আপনার কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ভয়।" কিন্তু হায়, এ তত্ত্বও সর্বাবস্থায় কার্যকরী হয় না। আপনার সেই প্রিয়াই আপনার অজানাতে খাদ্যে সেঁকো মিশিয়ে দিলে। আপনি সেঁকোর উপস্থিতি সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না বলে সেঁকো কি আপন ধর্মানুযায়ী কর্ম করে আপনাকে নিমতলায় পাঠাবে না? সে কথা থাক।

ইতিমধ্যে লটে টাট্টু ঘোড়ার মত ছুট দিযেছে, রান্নাঘরের দিকে।

হেরমান দেখলুম তৈরী। কোন গুরুর কৃপায় জানতে পেরেছে যে আমি মোজেল খেতে ভালোবাসি। অত্যুৎকৃষ্ট মোজেল নিয়ে এল ফ্রিজ থেকে। একটা গেলাসে নিজের জন্য ঢেলে নিয়ে আমার গেলাসে ঢাললে। পাঠক হয়ত আশ্চর্য হয়ে ভাবছেন, এটিকেট পর্যায়ে যেরকম প্রথম আপ্তবাক্য, লেডিজ ফার্স্ট, ঠিক তেমনি মেহমানদারীর মামেলায় প্রথম অনুশাসন, "গেস্ট ফার্স্ট"। কিন্তু লটে নির্দেশিত প্রথম আপ্তবাক্যের যে রকম ব্যত্যয় আছে, এই অনুশাসনের বেলাও হুবহু তাই। আপনি যদি মেহমান (অতিথি

সৎকারক) [১] হন, তবে আপনি সরবৎ, হুইস্কি ইত্যাদি দেবার সময় প্রথম মেহমানের জন্য ঢালবেন। কিন্তু যদি যে-বোতল থেকে ঢালছেন সেটা কর্ক দিয়ে ছিপি আঁটা থাকে তবে নিজের জন্য ঢালবেন, পয়লা। কারণ অনেক সময় কর্কের অতি ছোট ছোট টুকরো বা গুঁড়ো পানীয়ের উপরে ভাসে। হোস্ট নিজের গেলাসে প্রথম ঢালতে সে 'রাবিশ" তিনিই গ্রহণ করবেন। বিবেচনা করি বিদ্যেসাগরমশাই এই নীতিটি ঈষৎ সম্প্রসারণ করেই দুধ ঢালবার সময় আরশোলাটা আপন গেলাসে গ্রহণ করেছিলেন। [২]

হেরমান সিগারেট এগিয়ে দিয়ে অনুরোধ করলেন, "ইচ্ছে হোক।"

আমি সঙ্গে আনা কেকটা করিডরের একটি ছোট্ট টেবিলে রেখে এসেছিলুম। চিন্তা করতে লাগলুম, লটের অসাক্ষাতে কেকটি এই বেলা দরগায় ভেট দেব কিনা। এমন সময় লটেই ছুটে গিয়ে কেকটা নিয়ে এসে বললে, "এই নাও তোমার ঘুষ। তোমার কাছে দুটো পিস্তল আছে শুনে সেই ভয়ে এনেছে।"

হেরমান বললে, "তা হলে শেমপেন অনুপানরূপে ব্যবহার করতে হয়। তাবৎ ইয়োরোপে বিশেষ করে বিলেতে 'কেক অ্যান্ড শেমপেন', 'শেমপেন অ্যান্ড কেক'। (মদ্দেশীয় মুড়ির সঙ্গে পাঁপড়ভাজা' কিংবা 'মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু মরণকালে হরির নাম')। তুমি একটু বসো লটে, আমি সেলার থেকে নিয়ে আসছি।" কে বা শোনে কার কথা। হেরমানের অনুরোধ শেষ হওয়ার পূর্বেই সেলারের কাঠের সিঁড়িতে শোনা গেল লটের জুতোর খটখট শব্দ।

বোতল ঘিরে মাকড়ের জাল এবং দেড় পলস্তরা ধুলো। জর্মন, ডাচ, অস্ট্রিয়ান, সুইসরা ঘরদোর মাত্রাধিক ছিমছাম রাখে, কিন্তু ভুগর্ভস্থ কুটুরির মদের বোতল কক্‌খনো ঝাড়ামোছা করা হয় না। এবং মেহমানের সামনেও সেটা পেশ করা হয় ঐ অবস্থাতেই। তিনি স্বচক্ষে দেখতে পাবেন, ইটি প্রাচীন দিনের খানদানী বস্তু। [৩] ইতিমধ্যে লটে

---

(১) মেহমান শব্দ আমরা জানি, কিন্তু মেজমান (host) শব্দটিও যদি বাঙলায় চালু হয় তবে একটা জুৎসই শব্দ পাওয়া যায়। অতিথি-সৎকার ইত্যাদি শব্দে আমি ঈষৎ ভীত। এক মারওয়াড়ি "বিদ্যাসাগর" নাকি তাঁর বাঙালী অভ্যাগতকে সবিনয় বলেন, "আপনি এই এখানে দেহরক্ষা করুন। আমি আপনার সৎকার (আপ্যায়ন) করি।"

(২) "বঙ্গের রত্নমালা" না কি যেন এক পুস্তকে আমি এটা পড়ি। সেখানে "গেলাস" শব্দই ছিল, কিন্তু আমার বিশ্বাস সে-যুগে তখনো ফিরিঙ্গির গেলাস গৌড়ীয় পরিবারে প্রবেশাধিকার পায়নি। আর পাঠান মোগল ব্যবহার করতো "জাম"—যার থেকে জামবাটি। ইদানীং ইন্দ্রমিত্র মহাশয় নাকি বিস্তর বিদ্যাসাগরীয় লেজেন্ড ফুটো করে দিয়েছেন (আফসার অল, ঘটির দেশ তো!), এটা করেছেন কি না জানিনে। কারণ তাঁর পুস্তকখানি প্রাপ্তির ঘন্টাখানেকের ভিতর সেটি কর্পূর হয়ে যায়। চৌর মহাশয় যদি সেটা ফেরৎ দেন তবে আমি রাবণের মত দশ হাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ করবো। হায়রে দুরাশা—

(৩) এটিকেট, যার বাড়াবাড়িকে চালিয়াতি বলা যেতে পারে, বিলেতে নগণ্য জন কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কামিয়ে "হঠাৎ নবাব" (আপস্টার্ট) বনে যাওয়ার পর সে যখন সমাজের উচ্চতম স্তরের ডিউক আর্লদের সঙ্গে দহরম মহরম করে কল্কে পেতে চায় (স্নবারি) তখন তাকে সাহায্য করার জন্য একখানি প্রামাণিক পুস্তিকা লেখেন এক ডিউক স্বয়ং—বিলেতের প্রাচীনতম ডিউকদের অন্যতম। ডিউক অব বেডফর্ড লিখিত পুস্তিকার নাম "বুক অব স্নবস"। ইনি তাঁর প্রাসাদ দর্শকের জন্য অবারিত দ্বার করে দেন দেড় শিলিং দক্ষিণার পরিবর্তে।

এনেছে একটা রূপোর কিংবা ঐ জাতীয় কোনো ধাতু সংমিশ্রণে তৈরী, বরফে ভর্তি একটা বালতি। হেরমান বতরিবৎ বোতলটি ন্যাপকিন দিয়ে সাফসুৎরো করে বালতিতে ঢুকিয়ে বললে, 'বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। আমাদের সেলারটিই আধা ফ্রিজ। এই হল বলে। ততক্ষণ মোজেল চলুক।"

আমি রহস্যভরা কণ্ঠে বললুম, "যতক্ষণ বেত না আসে কানমলা চলুক।"

একরকম বেরসিক আছে যারা কোনোকিছু না বুঝতে পারলে হাসে। ভাবে, যখন বুঝতে পারিনি তখন নিশ্চয়ই কোনো রসিকতা। আশস্ত হলুম, হেরমান সে গোত্রের নয়।

এ স্থলে এটা রসিকতা। এবং এতই উত্তম যে যদিও এটি আমি ভিন্ন প্রসঙ্গে অন্যত্র উল্লেখ করেছি তবু অক্লেশে এটার পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে।

বললুম, "আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে কোনো মর্কট বড্ড বেশী বাঁদরামি করলে পণ্ডিত মশাই সর্দার পড়ুয়াকে আদেশ করেন 'একখানা লিকলিকে বেত নিয়ে আয় তো' এবং ছেলেটার কান মলতে মলতে বলেন, 'যতক্ষণ বেত না আসে কানমলা চলুক—"

অসম্পূর্ণ বাক্যাংশ না শুনেই হেরমান হো হো করে হেসে বললে, "বুঝেছি, বুঝেছি। যতক্ষণ শেমপেন না আসে মোজেল চলুক। উত্তম রসিকতা।"

"বিলকুল এবং শুধুমাত্র তাই নয়, এটা নিত্য ব্যবহার্য না হলেও পালপরবে অবশ্যই। এমন কি আপন গৃহেও। এই মনে করুন লটে আপনাকে কি একটা হাবিজাবি মাছ খেতে দিল। আপনি নিমন্ত্রিত বন্ধুসহ দুপুর বেলা বাড়ি ফিরে রান্নাঘর থেকে মুর্গী রোস্ট করার খুশবাই পেয়েছিলেন। তাই সেই হাবিজাবি খেতে খেতে ইয়ারকে বলবেন, 'যতক্ষণ বেত (রোস্ট) না আসে' ইত্যাদি এবং তারপর সেটি রসিয়ে রসিয়ে বুঝিয়ে বলবেন। এবং—"

ইতিমধ্যে আমার কোচের পশ্চাৎ থেকে হুঙ্কার শুনতে পেলুম, "কী! আমি বুঝি হাবিজাবি মাছ রাঁধি! জানো, রাইনের জন্ম হওয়ার বহু বহু যুগ আগের থেকেই আমরা পুরুষানুক্রমে রাইনের পারে বাস করছি (আমি মনে মনে বললুম, "রামের পূর্বেই বামায়ণ!"), রাইনের মাছ আমি রাঁধতে জানিনে—মুরমুরে ভাজা, আঙুর পাতায় জড়ানো স্যাঁকা—খেয়েছ কখনো?"

আমি বললুম, "রাইনের মাছ যে অপূর্ব সে-বিষয়ে সন্দেহ করে আমি কি তৃতীয় পিস্তলকে আমন্ত্রণ জানাবো। আমাদের গঙ্গার ইলিশও কিছু ফ্যালনা নয়। সংস্কৃতে শ্লোক আছে, আমার ঠিক ঠিক মনে নেই, কিসের উপরে যেন কি, তার উপরে যেন আরো কি, তার উপর বোধ হয় জল, তার উপর কচ্ছপ, কচ্ছপের উপর পৃথিবী, তার উপর হিমালয়—তোমাদের আলপ্‌স্ তো তার হেঁটোর বয়সী—তার সর্বোচ্চ চূড়ো এভারেস্টের উপরে শিব—"

"ও! শিবের কাহিনী আমি জানি। কিন্তু বলে যাও।"

"শিবের উপর তাঁর জটার ভিতর গাঙ্গেস (গঙ্গা) তার জলের উপর কেলি করেন ইলিশ। সেই সর্বোচ্চ স্থানাসীন ইলিশ যে খায় না, তার চেয়ে বৃহত্তর মূর্খ ত্রি-সংসারে আর কেউ আছে কি? [৪] কিন্তু ভদ্রে, আমি তো শুনেছি, অগুনতি জাহাজের পোড়া

---

(৪) সংস্কৃত শ্লোকটি কোনো কাব্যচুঞ্চু মহোদয় যদি "দেশ" সম্পাদক মহাশয়কে পাঠিয়ে দেন তবে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো, তথা বহু পাঠক উপকৃত হবেন।

তেল ইত্যাদি (বিল্‌জ্) প্রক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে এখন নাকি রাইনের মাছে আর সে সোয়াদ নেই।"

লটে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল। দশ সেকেন্ড যেতে না যেতে বললে, "এখুনি আসছি।"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "তুমি ঠিক আমার বোনেদের মত। যখনই ওদের বাড়িতে গিয়ে উঠি—এবং সেটা ঝাড়া চল্লিশ বছরের ব্যবধানে নয়—তখনই তারা ঠিক তোমারই মত ডার্বি ঘোড়ার স্পীডে ঘড়ি ঘড়ি রান্নাঘরের দিকে ছুট দেয়। ভালোমন্দ এটা-সেটা নয়, রাজ্যের তাবৎ পদ খাওয়াবে বলে। আমি বলি, 'বোস, তোর সঙ্গে দুটি কথা কই, কতদিন পরে দেখা। আমি তো খেতে আসিনি।' কিন্তু ওরা শোনে না, ওরা জানে, যবে থেকে মা গেছে, অন্য কারোরই রান্না আমার পছন্দ হয় না। ওরাই কিছুটা পারে, কিছুটা নয় বেশ বিস্তর।"

লটে তার ঠোঁটের উপর করুণ মুচকি হাসির সঙ্গে মধুরিমা মিশিয়ে বললে, "সে আমি জানি। তুমি একদিন বিষ্যুৎবারে রাত নটার সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে চলেছিলে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে। আমি তখনো ছোটদের মধ্যে। টায়-টায় আটটায় শুয়ে পড়তে হত। সে রাত্রে পূর্ণিমার চাঁদ পড়লেন তাঁর কড়া আলো নিয়ে আমার চোখের উপর। পর্দাটা টানবার জন্য জানালার কাছে যেতেই দেখি তুমি। ফিস ফিস করে ডাকলুম তোমাকে। তুমি থমকে দাঁড়িয়ে বললে, 'এক লহমার তরেও সময় নেই। চিঠি ফেলতে ডাকঘরে যাচ্ছি।' তারপর ঠিক জানালার নীচে দাঁড়িয়ে—"

হেরমান বিগলিত কণ্ঠে মুদিত নয়নে কাব্যি কাব্যি সুরে বললে—যেটা বাঙলায় দাঁড়ায়—"মরি গো মরি! সখী তোরা আমায় ধর, ধর। এ যে সাক্ষাৎ রুমিয়ো-জুলিয়েট। আর বলতে হবে না। রুমিয়ো তখন পূর্ণচন্দ্রকে সাক্ষী মেনে লটে—থুড়ি শারলটে-কে, ফের থুড়ি, জুলিয়েটকে তাঁর অজরামর প্রেম নিবেদন করলেন—তোমাদের কপাল ভালো, মাইরি। সে সন্ধ্যাটা পূর্ণিমা না হয়ে অমাবস্যাও হতে পারতো, পূর্ণিমা হয়েও গভীর ঘনমেঘের ঘোমটা পরে আত্মগোপন করে থাকতে পারতো—"

লটে বললে, "কি জ্বালা! হ্যার সায়েডের বুক পকেটে তখন তার প্রিয়া আনামারি, জরিমানা,.মার্লেনে—জানিনে কোন প্রিয়ার নামে লেখা প্রেমপত্র। আর সে তখন শপথ করবে আমাকে প্রেম নিবেদন করে! অতখানি ডন জুয়ান আমার বন্ধু কস্মিনকালেও ছিল না। শোনোই না বাকিটা। আমি তো সেই সন্দ করে ঠোঁট বাঁকিয়েছি—" আমার দিকে তাকিয়ে বললে—"এখখুনি ছুটতে হবে। ইন্ডিয়ান সাপ্তাহিক মেল-এর শেষ ক্লিয়ারেনস গোডেসবের্গে হয় প্রতি বিষ্যুৎবাবে—"

রহস্য উদঘাটিত হল। বললুম, "তাই বলো—নইলে সেটা যে বিষ্যুৎবার ছিল সে-কথাটা এত যুগ পরেও তোমার মনে রইল কি করে, আমিও তাই ভাবছিলুম।"

লটে অসহিষ্ণু হয়ে বললে, "শোনোই না! তুমি আর হেরমান যেন যমজ দুই ভাই জেমিনাই (অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয়) একজন যদি থামলেন তো অন্যজন পোঁ ধরলেন।"

আমি মুদিত নয়নে ঊর্ধ্বমুখে প্রার্থনা করলুম, "আমেন, আমেন।"

লটে : "মানে?"

"অতি সরল। জেমিনাই জমজ...অন্তত আমাদের দেশে—একই সময়ে একই রমণীর প্রেমে পড়েন।"

হেরমান লম্বা এক দমে শেমপেন গেলাস শেষ করে বললে, "লাও! অ্যাদ্দিন বাদে এসে জুটলেন আমার, সাতিশয় মাই ডিয়ার, টুইন ব্রাদার তার, খবর নিতে। তখন কোথায় ছিলে, বৎস, হ্যার ডক্টর, যখন লটের প্রেমে আমি চোখের জলে নাকের জলে হাবুডুবু খাচ্ছি, বিষ্টিতে ভিজে ঢোল হয়ে রাঁদেভূতে পৌঁছে মাদমোয়াজেলকে না পেয়ে তিক্ততম সত্য অনুভব করলুম, সেই জলঝড়ে তিনি তাঁর সাত বছরের পুরানো ফ্রকটি—যেটা এ আমলের ফ্যাশানের নিদর্শনস্বরূপ লুভর যাদুঘরে হেসে খেলে উচ্চ সিংহাসন পায়—সেটাকেও বরবাদ করতে নারাজ, এবং—"

হেরমানের খেদোক্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে লটে যেন শুধু আমাকে বলল—দুগালে দুটি টোল জাগিয়ে—"তখন তুমি বললে, 'সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে সেই সুদূর ইন্ডিয়ায় মা বসে আছে এই চিঠির প্রতীক্ষায়। শেষ ক্লিয়ারেন্স মিস করলে ইন্ডিয়ান মেলও মিস। মাকে নেক্স্‌ট চিঠির জন্যে প্রহর গুণতে হবে আরো পুরো সাতটি দিন। আর—আমার মা স্বপ্নেও কাউকে কখনো অভিসম্পাত করেনি—নইলে তার অভিশাপে গোটা জর্মন দেশটা জ্বলে পড়ে ছাই হয়ে যেত। মনে পড়ছে?"

আমি ভেজা গলায় বললুম, "খুব মনে পড়ছে। কিন্তু তোমার মনে অছে কি, তুমি প্রায়ই আমাকে তারপর শুধোতে 'মায়ের চিঠি লিখেছেন? কেন বাপু, বিষ্যুৎবারের শেষ মুহূর্তে চিঠি লিখতে বসা? দুদিন আগে ধীরে সুস্থে চিঠিটা লিখে পোস্ট করতে আপনাকে ঠেকিয়ে রাখে কোন হিন্ডেনবুর্গ?' তুমি বড় পাকা মেযে ছিলে. ডার্লিং লটে!"

॥ ২৮ ॥

"যোগাযোগ, যোগাযোগ! সবই যোগাযোগ।" দার্শনিকার মত বললে লটে।

আমি শুধালুম, "কি রকম?"

· বললে, "এই যে আকস্মিকভাবে আমাদের দেখা হল।"

হেরমান জর্মনে যে শব্দটি ব্যবহার করলে সে যদি বাঙাল হত তবে বলতো "খাইছে!" ঘটিগো ভাষায় "খেয়েছে!" "এই মরেছে"-তে ঠিক যেন সে-রকম খোলতাই হয় না। আবার ওরা যখন বলে "মাইরি" তখন আমাগো ভাষায় তার ইয়ার পাওয়া যায না।...তাবপর বললে, "বা—রে! এত বড় অত্যাচার! "অদ্য রজনীর" টাইমটেবল তো পাকাপোক্ত করা হয়ে গিয়েছে। আহারাদির পর তোমরা যাবে সিনেমায়, তারপর শাস্ত্রানুযায়ী যাবে পার্কে—অশাস্ত্রীয় রসালাপ করতে। তবে কেন, আমার প্রাণের লটে, আমার হক্কের উপর ট্রেসপাস করছো? আমাকে দুটি কথা কইতে দাও না, সায়েডের সঙ্গে?'

লটে বললে, "কোথায় হল ট্রেসপাস আর কোথায়ই বা রসালাপ! ট্রামে আসার সময় সায়েড আমাকে বলছিল, ১৯৩০-এ তুমি আমি হিটলারের থোড়াই তোয়াক্কা রাখতুম। তারপর ঐ তিরিশেই আখেরে সে পেল মেলাই ভোট। আমরা তবু নিশ্চিন্ত মনে আমাদের ফুটবল চালিয়ে গেলুম। [১] তিন বৎসর যেতে না যেতে ভিয়েনার সেই

---

(১) এই ফুটবল খেলা নিয়ে আমি বহু বৎসর পূর্বে ৮।১০।১২ বছর হতে পারে একটি "গল্প" লিখি। তার প্লট : আমাদের ফুটবল গ্রাউন্ডের (অর্থাৎ সক এক চিলতে গলির) শেষ

ভ্যাগাবন্ড, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আটপৌরে নিতান্ত সাধারণ একটা করপোরাল্—তারপর কি জানি কোন্ এক ভাষায় কি একটা কবিতা আউড়ে বললে আমি আবৃত্তি করেছিলুম, "বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।" "লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরে পোহালে শর্বরী বসে গেল রাজসিংহাসনে" জর্মনির মত অত্যুচ্চ শিক্ষিত দারুণ ঐতিহ্যপন্থী দেশের হয়ে গেল চ্যান্সেলার।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর লটে ফের বললে, "যোগাযোগ। যোগাযোগ সবই যোগাযোগ। এই যে আমরা খানিকক্ষণ আগে হোটেল ড্রেজেনের গা ঘেঁষে এলুম না সেখানে এসে উঠেছিলেন হিটলার। সমস্ত জর্মনির সব হোটেলের চাইতে তিনি বেশী ভালবাসতেন এই হোটেল ড্রেজেন। আর রাইনের ওপারে পেটেরসবের্গ পাহাড়ের উপরকার হোটেলে উঠেছিলেন ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুত চেম্বারলেন। সমঝাওতা হল না। শুভক্ষণে শুভলগ্নে কোন্ যোগাযোগ হল না বলে সব কিছু ভেস্তে গেল, সে তত্ত্ব আমরা কখনো জানতে পারবো না।

কিন্তু আরেকটা বিবরণ জানা আমার আছে।

গেল বছর আমি গিয়েছিলুম ম্যুনিক। তুমি হয়তো জানো না, সয়েড, জর্মনদের এখন এমনই বস্তা বস্তা ধনদৌলত হয়েছে যে কি করে খরচ করবে ভেবে পায় না। তাই নিত্যি নিত্যি লেগে আছে সেমিনার কনভেরজাৎসিয়োনে, কনফারেন্স আরো কত কী। আমার আজ আর মনে নেই যেটাতে গিয়েছিলুম সেটা বিশাল জর্মন ট্যাবাদের কনফারেন্স না—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "ট্যারাদের কনফারেন্সে তুমি যাবে কি করে? তুমি তো ট্যারা নও। এস্তেক লক্ষ্মী ট্যারাও নও।"

বললে, "কে বললে আমি ট্যারা নই। ঐ তো সেদিন আমার এক আত্মীয় কোত্থেকে জানি নিয়ে এল এক নয়া যন্তর। আমার হাতে সেটা দিয়ে বললে, 'ঐ ফুটাটার ভিতর দিয়ে তাকাও তো একটিবার। দেখতে পাবে একটা খাঁচা আর অন্য প্রান্তে একটা পাখি। এইবারে এই হান্ডিলটা নাড়িয়ে পাখিটাকে খাঁচার মধ্যে পোরো দিকিনি হুঁ!"

প্রান্তে বাস করতেন ফ্রাউ উলরিষ, থাণ্ডারিনী, ইয়া লাশ বুড়ি। একবার যদি তিনি কারণে অকারণে চটে গিয়ে বকা আরম্ভ করতেন তবে যতক্ষণ না তাঁর পরবর্তী ভোজনের সময় আসে তিনি নায়গ্রা প্রপাতের মত নাগাড়ে বকে যেতে পারতেন। আমাদেব পুরোপাক্কা খবরদারী হুঁশিয়ারী সত্ত্বেও একদিন "ফুটবলটা" দড়াম করে গিয়ে পড়লো তাঁব জানলার উপর—শার্সিখানা খান খান। এহেন অন্যায় আচরণ ফুটবলের নয়, আমাদের—যে তাঁকে সেদিন বকাবকির রেকর্ড নির্মাণের তরে টুইয়ে দেবে সে তত্ত্ব বাৎলে দেবার জন্য হেমলেটের পিতৃপ্রেতাত্মা কেন, আমি টেঁশে গেলে যে মামদো জন্মাবে তারও প্রয়োজন নেই। সে পেল্লায় কটু বক্তিমেব মূল বক্তব্য ছিল—"সরকার কি রাস্তা বানিয়েছে ফুটবলের তরে?" বহু বৎসর পবে জানতে পাই, বুড়ি উলরিষ তার বেবাক সঞ্চিত ধন উইল করে দিয়ে যায়, আমাদের পাড়ার ছেলেমেয়েদের জন্য একটা ক্ষুদে প্লেগ্রাউন্ড নির্মাণ করার জন্য। কাহিনীটি আমি হারিযে ফেলার ফলে সেটি পুস্তকাকারে কখনো প্রকাশিত হয়নি। কোনো সহৃদয় পাঠক যদি দয়া করে আমাকে জানান (C/o সম্পাদক "দেশ" ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-১) কোন্ বৎসর, কোন্ মাস, কোন্ পত্রিকায় এটি বেরোয়, তবে আমি তাঁর কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবো।

দম নিয়ে বললে, "হেরমানের মত সদাই উড়ুক্কু উড়ুক্কু চিড়িয়াকে পুরেছি চোখে-না-যায়-দেখা, হাতে না-যায় ছোঁওয়া খাঁচায়। আমারে ঠ্যাকায় কেডা?"

হেরমানের দিকে চোখ মেরে বললে, "কই, কিছু বলছো না যে?"

"কে কাকে পুরছে তার খবর রাখে কোন্ গেস্তা, কোন্ ওগ্‌পু? চিড়িয়াখানায় খাটাশটার খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা চিত্তবিনোদন করি। ওদিকে খাটাশটা ভাবে, নিছক তার চিত্তবিনোদনের জন্যই আমাদের ডেকে আনা হয়েছে। আমাকে জুর বড়কর্তা অতিশয় সঙ্গোপনে বলেছেন, যেদিন জলঝড় ভেঙে দুচারটি মুক্ত-পাগল ভিন্ন অন্য কেউ জু'তে আসে না সেদিন খাটাশটা তার নিত্যদিনের চিত্তবিনোদন বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে রীতিমত মনমরা হয়ে যায়।"

লটে বললে, "কই তোমাকে তো কখনো মনমরা হতে দেখিনি।"

আমি মনে মনে বললুম, 'লাগ, লাগ, লাগ'। বাইরে বললুম, "কে কাকে খাঁচায় পুবেছে সে তক্‌রার উপস্থিত থাক। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, দুজনাতে একই খাঁচাতে তো দিব্য দুঁহু দুঁহু কুঁহু কুঁহু করছো। রীতিমত হিংসে হয়। তা সে যাকগে। তুমি তো খাঁচায় পুরলে সেই চিড়িয়াটাকে। ডাক্তারেব আলু ক্ষেতে তাতে করে কগণ্ডা পুলি পিঠে গজালো, শুনি।"

লটে · "সায়েডষেন, সেইখানে তো রগড়। ডাক্তার বলে কি না, আমি নির্ভেজাল চোদ্দ ডিগ্রী ট্যারা।"

"সেন্টিগ্রেড না ফারেনহাইট?"

লটে ঘন ঘন মাথা নাড়িয়ে বললে, "কোনোটাই না। তুমি কিছু বোঝো না। চোদ্দ ডিগ্রী বলেছিল, না চোদ্দ কেজি বলেছিল সে কি আব আমি কান পেতে শুনেছিলুম। চোদ্দ—কোনো কিছু একটা। তারপর ডাক্তার কি বললে, জানো? বললে, এই ট্যারাইসিন সাবাতে হলে হয় কামচাটকা, নয় লুলুম্বা হুলা হুলা থেকে আনাতে হবে এক অতি বিশেষ রকমের চশমার পরকলা—" হঠাৎ থেমে গিয়ে আমাকে শুধোলে, "তোমার কি হল সায়েড ডিয়াব? হঠাৎ অভিনিবেশ সহকারে এ-রকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করছ কেন? বিস্তর পুরুষ মানুষ দেখেছি যারা ডিনার শেষে ওয়েটার বিল নিয়ে আসছে দেখলে হঠাৎ অতি অকস্মাৎ জানলা দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে লেগে যায়। ও! প্রকৃতির কী মাহাত্ম্য! পাঁচো ইয়ার তখন আর কীই বা করেন। হাঁড়িপনা মুখ করে সেই জিরাফকণ্ঠী বিলটা শোধ করে দেন। কই, আমরা তো এখনো তোমাকে কোনো বিল দিই নি, মাইরি।"

আমি চিন্তাকুল কণ্ঠে বললুম, "যত দুর্ভাবনায় ফেললে, লটে সুন্দরী।"

"যথা?"

"ওহে হেবমান, এমন মোকাটি হেলায় অবহেলা করো না ভাই। টাপেটোপে কই। তোমারই মত এক নিরীহ, গোবেচারীর বউয়ের জিভে কি যেন কি একটা বিদকুটে ব্যামো দেখা দিল। বউ একদম একটি কথাও বলতে পারছে না। এমন কি গা গা ইডিয়টের মত গাঁ—আঁ—আঁ, গাঁ—আঁ—আঁও করতে পারছে না। বেচারী সেই সাত পাকের সোয়ামী নিয়ে গেল বউকে ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার মাত্র একটিবারের তরে বউয়ের জিভের উপর চামচের চ্যাপটা হাতলটা বুলিয়েছে কি বুলোয়নি—দ্যাখ তো না দ্যাখ— সাত পাকের হাত পাকড়ে ধরে দে ছুট। বৃহৎ হাসপাতালের নিভৃততম কোণে

তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, হিপোক্রাতেসের শপথে এ বিধান নেই। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আমার ধর্মবুদ্ধি বলে কারো কোনো ব্যামো যদি অন্য কারোর উপকার সাধন করে তবে উপকৃতজনকে এ বিষয়ে কনসাল্ট করে নিতে। আপনাকে অতিশয় সঙ্গোপনে একটি তথ্য নিবেদন করি : আপনি সত্যই বড্ড 'লাকি' পুরুষ; কথায় বলে "স্ত্রী ভাগ্যে" ধন। এই যে আপনার স্ত্রীর জিভ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে, কোনো প্রকারের শব্দটি মাত্র উচ্চারণ করতে পারছেন না, টুঁ ফ্যা দূরে থাক, অষ্টপ্রহর বকর বকর করে আপনার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতে পারছেন না,—এ রকম 'লাক' দৈবাৎ কখনো কোনো স্বামীর কপালে নৃত্য করে।' বললে পেত্যয় যাবেন না, শতেকে গোটেক নয়, লাখে এক হয় কি না হয়। ডাক্তার দম নিয়ে স্বামীকে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, ভেবে দেখুন, ভালো করে চিন্তা করে নিন আপনি কি সত্য সত্য, তিন সত্য চান, যে আমি আপনার স্ত্রীর জিভটা সারিয়ে দিই। বলুন, আবার বলছি চিন্তা করে বলুন।"

হেরমানের হাসির পরিমাণ থেকে অনুমান করলুম, সে লটেকে কতখানি ডরায়।

বললে, "কিন্তু গল্পটি আমারই উদ্দেশে বিশেষ করে বললে কেন?"

আমি বললুম, "বলছি, বলছি। অত তাড়াহুড়ো করছো কেন, হের গট—সদাপ্রভু তো এক মুহূর্তেই বিশ্বসংসার নির্মাণ করতে পারতেন; তবে পূর্ণ ছয়টি দিন ঐ কর্মে ব্যয় করলেন কেন? কিন্তু তার পূর্বে লটে-কে একটা প্রশ্ন শুধনো দবকার। আচ্ছা লটে, তুমি যে চৌদ্দ ডিগ্রী না চৌদ্দ গজ ট্যারা সে তো বুঝলুম, কিন্তু তোমার ট্যারাতর ট্যারাতম মার্জিন আব কতখানি? ষোলো, আঠারো? আমাদের ছেলেবেলায চশমার 'পাওয়ার" মাইনাস কুড়ির চেয়ে বেশী হত না। [১]

লটে বললে, "আমি ঠিক ঠিক শুধোই নি। যদ্দূর মনে পড়ছে চোদ্দই শেষ সীমা। তবে মেরে কেটে আরো দু-এক মাত্রা, দু-এক পেগ সেবন করতে পারি বোধ হয়।"

"তাই সই। ওহে হেবমান, তুমি এই বেলা সময় থাকতে থাকতে লটের বিরুদ্ধে একটা ডিভোর্স কেস ঠুকে দাও। আদালতকে বলবে, 'এই রমণী আমাকে ধাপ্পা মেবে বিয়ে করেছে। বিয়ের পূর্বে একবাবও সেই গুহ্য তথ্যটি প্রকাশ করেনি যে সে ট্যারা। আর যা তা ট্যারা নয় হুজুর, একদম চৌদ্দ ডিগ্রী ট্যারা। এর বেশী ট্যারা মি লাট—মাই লর্ড—বিবাদিনী গেল বছর যে বিশাল—জর্মন ট্যারা কনফারেন্স-এ নিমন্ত্রিত হয়ে ম্যুনিক গিয়েছিলেন—"

এ স্থলে আদালত বাধা দিয়ে তোমার উকিলকে শুধোবেন, বিবাদিনী কেন নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন?

তোমার উকিল সোল্লাসে : ঠিক ঐ বক্তব্যেই আমরা আসছিলাম, হুজুর। আমবা জনৈক প্রসিদ্ধ চক্ষু চিকিৎসককে সাক্ষীরূপে এই মহামান্য আদালতে হাজির করবো, এবং তিনি কিছু হেজিপেজি যেদোমেধো—"

আদালত ঈষৎ শুষ্ক তথা দৃঢ়কণ্ঠে : 'বিজ্ঞ আইনজ্ঞের শেষোক্ত জনপদসুলভ গ্রাম্য সমাসদ্বয়ের প্রয়োগ মহামান্য আদালতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করবাব অবকাশ ধারণ করে।'

উকিল : 'আমি খুশমেজাজে বহাল তবিয়তে—মহামান্য আদালত ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন

---

(১) সুকুমার রায় যজ্ঞির ভোজে পরিবেশকদের বর্ণনা করেছেন, "কোনো চাটা অন্ধপ্রায় মাইনাস কুড়ি। ছড়ায় ছোলাব ডাল পথঘাট জুড়ি।"

করলেন কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল তিনি ভাষার জগাখিচুড়িকে আর ঘাঁটাতে চান না।) ঐ দুটো লক্ষ্মীছাড়া সমাসকে আদালত থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিলুম। কিন্তু হুজুর, ইংরেজও বেকায়দায় পড়লে এ জায়গায় টম ডিক অ্যান্ড হ্যারি এস্তেমাল করে থাকে।'

আদালত : 'অত্র আদালত স্বাধিকার-অপ্রমত্ত। কিন্তু অত্র আদালত অর্বাচীন আলবিয়নের রসনাসহযোগে অস্মদ্দেশীয় রাইন-মোজেল-মদিরা আস্বাদন করে না।'

উকিল : 'তথাস্তু মি লট্। পুরনো কথার খেই ধরে নিয়ে উপস্থিত জটটা ছাড়াই : সেই চোখের ডাক্তারের সুনাম দেশ-বিদেশের কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে ছড়িয়ে পড়েছে। গত বৎসর তিনি প্যারিস যান "সারা জাহাঁ আঁখ মজলিসের" দাওয়াৎ পেয়ে। তিনিই হরেক রকম হাতিয়ার চিড়িয়া পিঁজরা হুনর দিয়ে মহামান্য আদালতকে বাৎলে দেবেন, বিবাদিনী চোদ্দ 'পেগ-এর ট্যারা।'

বিবাদিনীর উকিল পেরি মেসন কায়দায় হাইজাম্প মেরে : 'আমি আমার সুবিজ্ঞ সহকর্মী বাদীপক্ষের উকিল যে মন্তব্য করেছেন তার তীব্রতম প্রতিবাদ জানাই। তিনি অশোভন ইঙ্গিত করছেন, আমাব সম্মানিতা মক্কেল চৌদ্দ পেগ হুইস্কির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।'

হেরমান বাধা দিয়ে বললে, "তোমাদের সিনেমা গমনের কি হল! আচ্ছা, তুমি বলছো, আমার কেস একদম ওয়াটার টাইট? মোকদ্দমা জিতবই জিতব?"

আমি সোৎসাহে : "আলবৎ, একশ' বার।"

"আর তুমি তখন লটেকে বগলদাবা করে ড্যাং ড্যাং করে নাপাতে নাপাতে এন্ডিয়া বাগে সটকে পড়ো! না? অফ কোর্স নট। আমাদের ফরেন মিনিস্টারের নাম হের শেল (Scheel), অর্থাৎ ট্যারা, লক্ষ্মী ট্যারা নয়, সমুচা ট্যারা। তার বউ তো তাকে তালাক দেয়নি।"

লটে এক লাফে হেরমানের কোলে বসে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে খেতে বললে, "ডার্লিং, তুমি সত্যই আমার মূল্য বোঝো।"

আমি বললাম, "কচু বোঝে। ওয়াইলড বলেছেন, 'আমাদের প্রত্যেকেরই এমন সব রদ্দিমাল আছে যা আমরা সানন্দে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিতুম। শুধু ভয়, পাছে অন্য কেউ না কুড়িয়ে নেয়।' এ স্থলে আমি শর্মা রয়েছি যে।"

"কী! আমি রদ্দি মাল! যাও! তোমার সঙ্গে সিনেমা যাবো না, না, না!!"

॥ ২৯ ॥

আমি বললুম, "সুন্দরী লটে, তুমি যাত্রারম্ভে বার বার মন্ত্রোচারণ করেছিলে 'যোগাযোগ, যোগাযোগ, সবই যোগাযোগ', এবং সঙ্গে সঙ্গে হিটলারেরও উল্লেখ করেছিলে সেটা তো সটীক প্রকাশ করলে না। আমি জানি, ভালো করেই জানি জর্মন মাত্রই হিটলার-যুগটাকে যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত ভুলে যেতে চায়। আমি তাদের খুব একটা দোষ দিইনে; আমি দেশে বসেই হিটলারের বিজয়ের পর বিজয়, পতনের পর পতন, প্রায় সবকিছুই স্বকর্ণে শুনেছি—"

"মানে?"

"অতি সবল। বেতার আমাদের দেশে ত্রিশ শতকেই বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে ইয়োরোপীয় বেতার কেন্দ্রগুলো আমাদের বড় একটা পরোয়া করতো না—একমাত্র বি

বি সি আমাদের জোর তোয়াজ করতো। বোঝাবার চেষ্টা করতো, আখেরে ইংরেজ জিতবেই জিতবে। ওদের ভয় ছিল আমরা যদি ইংরেজ পরাজয়ের মোকাটি হেলায় অবহেলা না করে ভারত থেকে তাদের তাড়াবার বন্দোবস্ত শুরু করি তাহলেই তো চিত্তির। তাই তারা সুবো-শাম জোর প্রপাগান্ডা চালাত—বিশেষ করে ডানকার্কের অতুলনীয় পরাজয়ের পর—যে ইংরেজকে হারানো চারটিখানি কথা নয়। জর্মনি তখন বিজয় মদে মত্ত। বিজয় মাত্রই বড় কড়া মদ। সে মদে যদি আবার 'পঞ্চরঙ' মিশিয়ে দাও তাহলে তো আর কথাই নেই—" অতুলনীয় পরাজয়ের পর—যে ইংরেজকে হারানো চারটিখানি কথা নয়। জর্মনি তখন বিজয় মদে মত্ত। বিজয় মাত্রই বড় কড়া মদ। সে মদে যদি আবার 'পঞ্চরঙ" মিশিয়ে দাও তাহলে তো আর কথাই নেই—"

"পঞ্চরঙ আবার কি মদ?"

আমি সবিনয় নিবেদন করলুম, "ঐ বস্তুটির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি বলে আমি সত্যই লজ্জা বোধ করি। শুনেছি পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন পাইপে ('ছিলিম' তো এরা বুঝবে না) পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন জাতের নেশা, যেমন গাঁজা, চরস, ভাঙ—"

"এ সব আবার কি?"

"বোঝানো শক্ত, কারণ নিজেই জানিনে। তবে ইউরোপোমেরিকায় প্রচলিত হশীশ, হেরইন, মরফিন এগুলোর প্রায় সবকটাই হয় গাঁজা নয় আফিম থেকে তৈরী হয়। এই যে তোমাদের হিপিরা—"

লটে ভুরু কুঁচকে বললে, "আমাদের!"

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললুম, "সরি, সরি! এই যে ইউরো-আমেরিকা থেকে হিপিরা ভারতে যায়, তারা তো সক্কলের পয়লা ধরে গাঁজা। [১] ওটার একটা লাতিন নামও আছে—কানাবিস ইন্ডিকা না কি যেন—তা সে যাকগে!...যা বলছিলুম, গাঁজা, চরস, ভাঙ, আফিঙ,—আরেকটার নাম ভুলে গিয়েছি—পাঁচটা পাইপে সাজিয়ে সে পাইপগুলো ঢুকিয়ে দেয় আরেকটা মোটা পাইপে। দেখে নাকি মনে হয় যেন একটা গাছের গুঁড়ি থেকে পাঁচটা শাখা ট্যারচা হয়ে উপর বাগে উঠেছে। আবার সেই বড় পাইপটা ঢুকেছে

---

(১) পশ্চিম বাঙলায় প্রচলিত আছে কি না জানিনে বলে একটি গঞ্জিকাপ্রশস্তি নিবেদন করি :

জীবন গাঞ্জা, তোরে আমি ছাড়তাম না (ধু)
এক ছিলিমে যেমন তেমন
দুই ছিলিমে মজা
তিন ছিলিমে উজীর নাজির
চার ছিলিমে বাজা।
পাঁচ ছিলিমে হুক্কুর হুক্কুর
ছয় ছিলিমে কাশ
সাত ছিলিমে রক্ত—গা

(মডার্ন মেয়েরা যাকে 'বাথরূপ পাওয়া' বলে।)

আট ছিলিমে নাশ

হিপিদের উচিত এটা তাদেরই কোনো একেলে বেটোফেনকে দিয়ে সুরে বসিয়ে ইন্টারনেশনাল রূপে গাওয়া।

একটা খোলে। সে খোলে থাকে কড়া ধান্যেশ্বরী। সেই খোলের একটা ফুটোর ভিতর ছোট্ট একটি পাইপ হুবহু সিগ্রেট হোল্ডারের মত দেখতে দেবে ঢুকিয়ে। ওদিকে পঞ্চ পাইপের মুণ্ডুতে ধরাবে মোলায়েম আগুন। আর হোল্ডারে মুখ লাগিয়ে দেবে ব্রহ্মটান। ওঃ! তাতে নাকি কৈবল্যানন্দ লাভ হয়। তা সে যাকগে। হিটলার আর তাঁর জাঁদরেলরা তো জর্মন জাতটাকে খাইয়ে দিলেন বিজয় মদ। তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন নাৎসি পার্টির হের ডক্টর অর্থাৎ গ্যেবেলস 'পঞ্চরঙ্গ' প্রোপাগান্ডা। কিন্তু তিনি নিজে মাতাল হলেন না। একে তোমার মত রাইন নদের পারে তার জন্ম—"

লটে "থাক, থাক" কিন্তু মোলায়েম গলায়। আমি এ মনোভাবটা বুঝি! গ্যোবেলস মার্কা-মারা পাজির পা-ঝাড়া হতে পারে কিংবা সৎ ব্রাহ্মণের পদধূলিও হতে পারে, কিন্তু যাই বলো যাই কও সে তো তার জন্মভূমি রাইনল্যান্ডকে বিশ্বের সুদূরতম কোণে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

বললুম, "তার শত্রুরা পর্যন্ত স্বীকার করে, নাৎসি পার্টির করাতের গুঁড়ো ভর্তি মাথাওলাদের ভিতর ওরকম পরিষ্কার মগজওলা দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। মায় হিটলার। [২] ইংরেজ জাত ফরাসী জাতটার উপর অত্যধিক সুপ্রসন্ন নয়, তারা পর্যন্ত স্বীকার করে লাতিন জাতের ফরাসীরাই এ-জাতের অগ্রণী, ইতালিয়রা যতই চেল্লাচেল্লি করুক না কেন—এত পরিষ্কার মাথা স্যাকসন টিউটনদের হয় না, এবং গ্যোবেলসের ধড়ের উপর যে ব্রেন-বক্সটি হামেশাই সজাগ থাকতো সেটা ছিল লাতিন মগজে টইটম্বুর। আশ্চর্য নয়, এই রাইনল্যান্ডেই যে জর্মন রক্তের সঙ্গে ফরাসী রক্তের সবচেয়ে বেশী সংমিশ্রণ হয়েছে সে তত্ত্বটি বর্ণসঙ্কর বিভীষিকায় নিত্য মিত্য ঘামের ফোঁটায় কুমীর দেখনেওলা হিমলার পর্যন্ত অস্বীকার করতে পারেননি। কেন লটে, তোমার যে চোদ্দ ডিগ্রী ট্যারার মত চোদ্দ কেন, চোদ্দশ' পুছ কালো চুল তার জুড়ির সন্ধানে বেরুতে হলে তো যেতে হয় ইতালি বা স্পেন মুল্লুকে। কি বলো, আমার কৃষ্ণা কেশিনী?"

তাচ্ছিল্যভরে বললে, "বেখে দাও তোমার ঐ রক্ত নিযে ধানাইপানাই। হিটলার চেল্লালেন, 'জর্মনরা সব নর্ডিক। এখন রব উঠেছে, আমরা রাইনলেন্ডার নই, প্রাশান নই, এমন কি আমরা জর্মনও নই (!), আমরা সব্বাই একন ইউরোপীয়ান!" ছোঃ। কিন্তু এই সুবাদে শুধোই, লোকে বলে বিপরীত বিপরীতকে টানে। তোমার চুল তো কালো। তবে তুমি প্লাটিনাম ব্লন্ড রূপোলী ব্লন্ডের এফাকে উল্লাসে নৃত্য করতে করতে তোমার টীমের গোলি না করে আমাকে করতে কেন?"

হেরমান এতক্ষণ অবহিত চিত্তে আমাদের চাপান ওতোর শুনছিল। মৌনভঙ্গ করে বললে, "শাবাশ! হে অশ্বিনীপ্রধান! (আশা করি শ্রুতিধর পাঠককে অযথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না, অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয় নিরবচ্ছিন্ন অভিন্নমনা ছিলেন বলে উভয়ে একই কামিনীকে কামনা করতেন) তোমার জয় হোক। তৎপূর্বে প্রিয়াকে সদুত্তর দাও। অনুজ শিক্ষালাভ করুক।"

---

(২) স্বয়ং গ্যোবেলস তাঁর ডাইরিতে লিখেছেন, "ফ্যুরারেব পশ্চাদ্দেশে (তিনি এস্থলে যে শব্দটি ব্যবহার কবেছেন সেটি জর্মনির গ্রাম্যতম আটপৌরে শব্দ এবং ইংবিজিতেও একই অর্থ এবং প্রায় একই ধ্বনি ধরে) আস্ত একটা জ্যান্ত টাইম বম না রাখা পর্যন্ত তাঁর চৈতন্যোদয় হয় না।"

আমি বললুম, "প্রিয়ে কৃষ্ণকুন্তলে! তোমার চুল আমাকে আমার দেশের খেলার সাথীদের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। তাদের চুল ছিল তোমারই মত কালো।"

(লটের চোখে কেমন যেন সন্দ সন্দ ভাব)

'আমার প্রথম খেলার সাথী জোটে সাত-আট বছর বয়সে।"

(লটের ঠোঁটে ক্ষীণতম মধুর স্মিতহাস্য)

"করে করে আমার পাঁচটি সঙ্গিনী জুটলো। আমি আমার ছোট বোনেদের কথা বলছি—"

লটে আমার দিকে রহস্যভরা নয়নে তাকিয়ে বললে, "খুশী হব, না ব্যাজার হব ঠিক অনুমান করতে পারছিনে। তুমি যদি বলতে, আমার চুল দেখে তোমার আপন দেশের প্রিয়ার কথা স্মরণে আসে তবে আমার বুক নিশ্চয়ই হিংসায় কিছুটা খচ খচ করতো। তা-ও না হয় সয়ে নিতুম, কিন্তু আমার চুল তোমাকে তোমার বোনেদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—সে যে বড্ড পানসে।"

হেরমান বললে, "মানুষের মতিগতি এমনিতেই বোঝা ভার, তার উপর যে-মানুষ দূর বিদেশ থেকে এসেছে তার হৃদয়, তার রুচি বোঝা আরও কঠিন। লটে ঠিকই শুধিয়েছে, কালো চুলের প্রতি তোমার, বিশেষ করে তোমার এহেন অহেতুক আনুগত্য কেন? কালোর কীই বা এমন ভুলোক দ্যুলোক জোড়া বাহার?"

মুচকি হেসে এবং বেশ গর্বসহকারে বললুম, "এর উত্তর তোমাদের কান্টও দেন নি, আমাদের শঙ্করাচার্যও দেন নি। দিয়েছে বাংলাদেশের এক গাঁইয়া কবি। গেয়েছে,

'কালো যদি মন্দ তবে
কেশ পাকিলে কান্দো কেনে?'

ব্লন্ডের সন্ধান সে কবি জানতেন না। কেশ পাকলে সাদা হয়, আর ধবল কেশ মানেই তো বার্ধক্য। তা সে-কেশকে যে নামেই ডাকো না কেন—ব্লন্ড, প্ল্যাটিনাম ব্লন্ড, সিলভার ব্লন্ড, পরান যা চায় সে নাম দাও। হ্যাঁ, স্বীকার করি, সত্যিকার ব্লন্ড চুল অদ্ভুত চিকচিক করে, ঠিক যে রকম লটের কালো চুল চিকচিক করে (লটের একটা ক্ষীণ আপত্তি শোনা গেল—তার চুলে নাকি পাক ধরতে শুরু করেছে)। কিন্তু যবে থেকে না জানি কোন্ নাৎসি লক্ষ্মীছাড়া ছাতের চিমনির উপর থেকে চ্যাঁচাতে আরম্ভ করলো, খাঁটি নর্ডিক জাতের চুল হয় ব্লন্ড, অমনি আর যাবে কোথা—বইতে লগলো গ্যালন গ্যালন হাইড্রজেন পরোক্সাইড না কি যেন এক রাসায়নিক দ্রব্য। রাতারাতি সবাই হয়ে গেল ব্লন্ড। কিন্তু সে দ্রব্যের প্রসাদাৎ—যে ব্লন্ড নির্মিত হন, তিনি না করেন চিকচিক, না আছে তেনাতে কোনো জৌলুস।"

লটে বললে, "থামো না। তুমি কি ওয়ার্লড ফেডারেশন ফর দি প্রিভেনশন অব হাইড্রজেন পেরক্সাইডের প্রেসিডেন্ট?"

আমি বললুম, "আর একটুখানি সময় দাও। কিন্তু আমি জানি, হেরমান কেন তোমাতে মজেছে। চুল কালো হলে এদেশে চোখ হয় কটা। বিদকুটে কটাও আমি দেখেছি—ঠিক যেন বেড়ালের চোখের মত। কিন্তু কালো চুল আর নীল চোখের সমন্বয় বড়ই বিরল। লটের বেলা সেই সমন্বয় ঘটেছে। আর জানো সুনীল-নয়না লটে, নীল চোখ আমি বড় ভালোবাসি। তোমাদের দেশে খাঁটি নীল রঙের আকাশ বড় একটা দেখা যায় না। যেটা আমাদের দেশে দিনের পর দিন দেখা যায়—বিশেষ করে শরৎকালে।

নীল চোখ এন্তের না হলেও বিরল নয় এ-দেশে। লটের কালো চুল আমার স্মরণে আনতো বোনেদের কথা, আর তার নীল চোখের দিকে তাকালেই আমি যেন দেশের নীলাকাশ দেখতে পেতাম; মনটা বিকল হবে না তো কি? বিশ্বাস করবে না, ঐ নিয়ে একটা কবিতাও লিখে ফেলেছিলুম।

কাতরে শুধাই, একি
তোমার নয়নে দেখি,
আমার দেশের নীলাভ আকাশ
মায়া রচিছে কি?"

জর্মন অনুবাদটা আমার পছন্দসই হল না। কিন্তু লটেকে পায় কে? সে কবিতার বাকিটা শুনতে চায়।

আমি কিন্তু-কিন্তু করে গোটা দুই ঢোঁক গিলে বললুম, "কিছু মনে করো না লটে, আর ব্রাদার হেরমান, কবিতার বাকিটা একটু স্কেটিং অন থিন আইস, আমাদের দেশের ভাষায় সদ্য নূতন ভেসে-ওঠা চরের চোরাবালির উপর হাঁটা। যে-যুগে কবিতাটি লেখা হয় তখন সেটা রীতিমত দুঃসাহসিক কর্ম ছিল।"

হেরমান বললে, "বাইরের দিক দেখতে গেলে কবিতা গদ্যের তুলনায় অনেকখানি শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাকে ছন্দের বন্ধন, মিলের কড়া শাসন মেনে চলতে হয়; আর সনেট রচনা করতে গেলে তো কথাই নেই। সেখানে এসবের বন্ধন তো আছেই তদুপরি ক'ছত্রে সে কবিতাটিকে সুষ্ঠু সমাপ্তিতে আনতে হবে সেটা যেন রাজ দণ্ডাদেশ। কোনো কোনো দেশে যাবজ্জীবন কারাবাসের অর্থ চোদ্দ বছরের শ্রীঘর। আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় এই চোদ্দর অনুশাসনটি আইন-কর্তারা ধার নিয়েছেন কবিদের কাছ থেকে, তাদের সনেট হবে চতুর্দশপদী। এবং তারও উপর আরেকটা মোক্ষম বন্ধন—বিষয়বস্তু কোন্ কায়দা-কেতায় পরিবেশন করবে সেটাও আইনকানুনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। প্রথম চার ছত্রে প্রস্তাবনা, দ্বিতীয় চার ছত্রে—আমার মনে নেই আরো যেন কী কী। কিন্তু ঠিক এই কারণেই সে অনেক-কিছু বলার স্বাধীনতা পেয়ে যায়, যেটা গদ্যের নেই, গদ্যে সেটা কর্কশ এমন কি ভালগার শোনায়। এই যে আমি লটেকে বিয়ে করে পরাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছি—"

লটে : "অর্থাৎ বিয়ের সদর রাস্তা ছেড়ে আইবুড়ো বয়সের সাইড জাম্প আর মারতে পারো না।"

"ইগ্‌জেকলি! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নীলাকাশে উড্ডীয়মান হওয়ার মত, কিংবা বলতে পারো লটের নীল চোখের গভীরে ডুবে যাওয়ার মত এমন একটা স্বাধিকার লাভ করেছি যেটা অতুলনীয়, যেটা না পাওয়া পর্যন্ত বাউন্ডুলে আইবুড়ো সেটার বিন্দু পরিমাণ কল্পনাও করতে পারে না। লটেকে আমি সব কিছু বলতে পারি। এস্তেক আমার মারাত্মকতম দুর্বলতা। কবিতার বেলাও তাই। দেখোনি—প্রিয় অপ্রিয় গোপন কথা বাদ দাও—বহু কবি তার হীনতা নীচতা পর্যন্ত অম্লান বদনে স্বীকার করেছেন আপন আপন কবিতায় এবং সেটাও কোনো বিশেষ ব্যক্তির সম্মুখে নয়, বিশ্বজনকে সাক্ষী মেনে। তুমি নির্ভয়ে বলে যাও।"

আমি তবু আমতা আমতা করে বললুম, "পূর্বেই বলেছি তোমাদের দেশে নীলাকাশ হয় না, কিন্তু নীল নয়ন হয়। ঠিক তেমনি না হলেও বলা যায়, তোমাদের দেশে পদ্ম

ফুল ফোটে না বটে, অর্থাৎ সরোবরে ফোটে না, কিন্তু ফোটে অন্যত্র! আমাদের দেশে মেয়েরা শ্যাম, উজ্জ্বল শ্যাম, এমন কি ফর্সাও হয় বটে, কিন্তু ধরো আমাদের লটের মত ধবলশুভ্র কস্মিনকালেও হয় না। তাই, যার নীল নয়ন দেখে দেশের নীলাকাশ মনে পড়েছিল তাকে বললুম,

তোমার বক্ষতলে
আমার দেশের শ্বেত পদ্ম কি
ফুটিল লক্ষ দলে?"

॥৩০॥

হেরমান দুষ্টু হাসির মিটমিটি লাগিয়ে বললে, "লোভ হচ্ছে না?"

আমি বললুম, "সে আর কও কেন, ব্রাদার?"

লটে বুঝতে পারেনি। চটে বললে, "কি সব হেঁয়ালিতে কথা বলছো তোমরা?"

কবি বলেছেন,

"মধু তার নিজ মূল্য নাহি জানে,
মধুকর তারে না বাখানে।"

আসলে লটে কি করে জানবে, সামান্য কয়েক গ্লাস ওয়াইন খেতে না খেতে তার গাল দুটি আরো টুকটুকে হয়ে গিয়েছে। দেখতে পাচ্ছে হেরমান, লক্ষ্য কবছি আমি। লটে জানবে কি করে? আমাদের দেশের সাধারণ জনের বিশ্বাস, ইয়োরোপের মেমসায়েবরা সায়েবদেরেই মত জালা জালা মদ গিলে ধেই ধেই নৃত্য করে। দ্বিতীয়টা সত্য। পুরুষের তুলনায় মেয়েরা নাচতে ভালোবাসে বেশী (কাষ্ঠরসিকরা তার সঙ্গে আবার যোগ দেন, "বাচ্চা বয়সে তারা আপন খেয়াল-খুশীতে নাচে; একটু বয়স হওয়ার পর বেকুব পুরুষগুলোকে নাচায়") কিন্তু মদ তারা খায় পুরুষের তুলনায় ঢের ঢের কম। কেন কম খায়, সে এক দীর্ঘ কাহিনী। তবু একটা ইঙ্গিত দিতে পারি; কাচ্চাবাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা লোপ পাওয়ার পর অনেক মেয়েছেলেই পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মদ খেতে শুরু করে এবং বিস্তর পয়সাওলী বৃদ্ধা খাটে শুয়ে শুয়ে রাত বারোটা অবধি খাসা ঢুকুস ঢুকুস করে। লটের এখনো বাচ্চা হতে পারে কিনা বলা কঠিন—অসম্ভব নয়। তবে এ-কথা ঠিক, লটের ওয়াইন চুকুস চুকুস করার কায়দাকেতা থেকে পষ্ট মালুম হয়, ও-রসে এ-গোবিন্দদাসী বঞ্চিত না হলেও আসক্তা তিনি নন। তাই কুল্লে আড়াই গ্লাস চুষতে না চুষতেই তার গোলাপী গাল দুটি হয়ে গিয়েছে টুকটুকে লাল—বুড়িদের নাক হয়ে যায় বিচ্ছিরি কোণী ঘেঁষা লাল।

হেরমান নির্ভয়ে বললে, "হের সায়েড তার দেশের কি এক মাছের বিরাট বয়ান দিয়ে বলেছিল না, সে-মাছ যে খায় না সে মূর্খ। তোমার গাল দুটি যা টুকটুকে লাল হয়েছে—মনে হয় ঠোনা দিলেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে—সে গালে একটুখানি হাত বুলিয়ে দিতে যে-লোকের ইচ্ছে হয় না সে মূর্খের চেয়েও মূর্খ, গবেট, গাড়ল এবং বর্বর।"

লটে আমার দিকে তাকিয়ে শুধোলে, "আর তুমি সায় দিচ্ছিলে?"

আমি ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে—এ-পোড়ার দেশে আবার টাইট কলারের চাপে

আপন অপ্রতিভ ভাবটা যথারীতি পাকা ওজনে চুলকোনোও যায় না—নানা প্রকারের অস্ফুট আনুনাসিক মার্জার সুলভ অ্যাঁও ম্যাঁও করতে করতে বললুম, "তা,—সে—ওটাতে—সত্যি বলতে কি,—এহেন দুরাকাঙ্ক্ষা যদি আমার হৃৎকন্দরে অঙ্কুরিত হয় তবে সেটা এমন কি অন্যান্য হল বলো তো। তোমাদের দেশেই তো, বাপু, প্রবাদ আছে, "বেরালটা পর্যন্ত খুদ কাইজারের দিকে তাকাবার হক্ক ধরে।"

আমি মনে মনে ভাছিলাম, লটে বোধ হয় বিরক্ত হয়েছে।

ওমা, কোথায় কি! লটে চটে নি।

বললে, "আমার বয়স পঞ্চাশ—বুড়ি হতে আর কবছর বাকি?"

আমি গম্ভীর কণ্ঠে বললুম, "জরমনিতে বুড়ি নেই। এ-দেশে কেউ বুড়ি হয় না।"

"মানে?"

"এ তত্ত্বটা আমি শিখি এই গোডেসবের্গ শহরেই। তোমার মনে আছে, আমাদের সেই ফুলওলা? সবে এখানে এসেছি, তার সঙ্গে আলাপ হয় নি। ইতিমধ্যে আনার মার পেটে কি যেন একটা হল। জব্বর অপারেশন করলেন কলোন থেকে এসে ডাকসাইটে এক সার্জন।"

লটে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার পষ্ট মনে আছে। আমাদের পাড়ার হাসি-খুশী তখন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।"

"একদম খাঁটি কথা। আনাব মা যখন সেরে উঠছেন তখন ভাবলুম, কিছু ফুল নিয়ে যাই। ঢুকলুম সেই ফুলের দোকানে। সেই ছোকরা—প্রায় আমার বয়সী—তো উল্লাসে প্রায নৃত্যমান। বার তিনেক জপ-মন্ত্রের মত 'গুটন্ মর্গন্' বলতে বলতে শুধোল, 'আপনাব ইচ্ছে? আদেশ করুন।" এবং পূর্ববৎ অদৃশ্য সাবানে হাত কচলাতে লাগল।

জর্মন ফুলের তত্ত্ব তখনো কিছু জানিনে। কোন ফুল নিলে ভদ্রদুরস্ত হয় সে বাবদে আরো অজ্ঞ। তাই 'কিন্তু কিন্তু' করছি দেখে অতিশয় লাজুক খুশীভরা মুখে বললে, 'স্যর, কিছু মনে কববেন না। কে, কার জন্য, কোন ফুল নেবেন কি নেবেন না, সে-সম্বন্ধে কোনো প্রকারের কৌতূহল দেখানো আমার পক্ষে, সর্ব ফুলবেচনেওলার পক্ষে অমার্জনীয় অপবাধ। তাই, হেঁ—হেঁ, কিছু মনে করবেন না, যদি সামান্যতম ইঙ্গিত দেন—'

আমার বয়স তখন আর এমন কি। লজ্জা পেয়ে থতমত হয়ে তোতলালুম, না, না, সে-রকম কিছু নয়। আমি ফুল কিনব একজন অসুস্থ বৃদ্ধা—'

সঙ্গে সঙ্গে—যেন কেউ তার উদোম পিঠে সপাং করে বেত মেরেছে—কোঁৎ করে ককিয়ে বললে, 'এমন কথাটি বলবেন না, স্যার।'

আমি তো রীতিমত ভীত সন্ত্রস্ত। নাচতে গিয়ে আবার কোন এটিকেট নাম্নী মহিলার পা মাড়িয়ে দিয়েছি।

কোমরে দুভাঁজ হয়ে বাও করে বিনয়নম্র কণ্ঠে বললে—আপনি বিদেশী; তাই জানেন না, আমাদের এই "ডয়েচ্‌শ্‌লানট য়্যুবার আলেসের" দেশে, বিশেষ করে এই সুর-কানন-সুন্দর রাইনল্যান্ডে কোনো বৃদ্ধা, এমন কি প্রৌঢ়া মহিলাও নেই। কস্মিনকালে হয়নি, হবেও না। বলতে হয় "বর্ষীয়সী" এবং সর্বোত্তম পন্থা, কিঞ্চিৎ "হেঁ হেঁ" করে যেন বড়ই অনিচ্ছায় বলছেন, "এই একটুখানি বয়স হয়েছে আর কি"।' সেই আমার প্রথম শিক্ষা। তাই বলি, "পঞ্চাশ! ছোঃ! সে আর এমন কি বয়স!"

লটে বললে, "পিরামিডের তুলনায় তেমন আর কি?....সেই যে বলছিলুম, আর বচ্ছর যখন আমি ম্যুনিক গিয়েছিলুম—"

আমি উৎসাহিত হয়ে বললুম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ 'হিটলার", 'যোগাযোগ', 'ড্রেজেন হোটেল' এসব দিয়ে কেমন যেন একটা ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল্ বানাচ্ছিলে?"

"ম্যুনিকে পরিচয় হল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে, পরবের শেষ পার্টিতে। কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল, তিনি হিটলারের যে অ্যারোপ্লেন পাইলট ছিলেন বাওর, তাঁর নিকট আত্মীয়। আমাদের মধ্যে কে যেন আশকথা-পাশকথার মাঝখানে 'যোগাযোগের' মাহাত্ম্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছিল। আত্মীয়টি তখন বললেন, 'এই যে পাঁচ বছর ধরে পৃথিবীর বীভৎসতম যুদ্ধ হয়ে গেল, কত নিরপরাধ ইহুদি কনসানট্রেশন ক্যাম্পে মারা গেল, বমিঙের ফলে হাজার হাজার নারী শিশু মারা গেল এর কিছুই হয়তো শেষ পর্যন্ত ঘটতো না, যদি না সামান্য একটা 'যোগাযোগে' একটুখানি গোলমাল হয়ে যেত।' তারপর বিশেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি গর্ডেসবের্গের বাসিন্দা বললেন না, সেই গডেসবের্গের ড্রোজেন হোটেলে গিয়ে উঠেছেন হিটলার। তারিখটা ২৯-এ জুন ১৯৩৪। আমার আত্মীয় বাওর বলেন, হিটলারের আশু প্রোগ্রাম সম্বন্ধে কেউই বিশেষ কিছু জানতো না। তবে হিটলার তাঁকে বলে রেখেছিলেন, তাঁর প্লেন যেন হামেহাল তৈরী থাকে। বাওর খানিকক্ষণ পরে এসে বললেন, সে-প্লেনে নাকি কি একটা গলদ দেখা গিয়েছে তবে তিনি অন্য প্লেনে বার্লিন গিয়ে সেখান থেকে রাতারাতি স্পেয়ার নিয়ে আসতে পারবেন। হিটলার অসম্মতি জানালেন। রাতের খানাদানা শেষ হলে পর হিটলার কেমন যেন চুপ মেরে গেলেন। যথারীতি তাঁর প্রিয় ভাগনারের রেকর্ড বাজতে শুরু করলো। হিটলারের সেদিকে যেন কান নেই, অভ্যাসমাফিক সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে উরুতে ঠেকাও দিচ্ছেন না আর সর্বক্ষণ উসখুস করছেন। বাওর তখন সেই একঘেঁয়েমি থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য হিটলারের কাছ থেকে ঘণ্টা দুত্তিনের ছুটি চাইলেন। ইচ্ছে, পাশের বন শহরে একটা রোঁদ মেরে আসেন। এটা কিছু নূতন নয়। হিটলার হামেশাই এ ধরনের ছুটি সবাইকে মঞ্জুর করতেন। আজ কিন্তু বললেন, "না, তোমাকে যে কোনো সময় আমার প্রয়োজন হতে পারে।" দুপুর রাতে বাওরকে বললেন, "খবর নাও তো, ম্যুনিক ফ্লাই করার মত আবহাওয়া স্বাভাবিক কি না।" বাওর পাশের বড় এ্যারপর্ট কলন শহরে ট্রাঙ্ককল করে খবর পেলেন, আবহাওয়া খারাপ। হিটলার কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বাওরকে আদেশ দিলেন, খানিকক্ষণ বাদে বাদে যেন তিনি ট্রাঙ্ককল করে আবহাওয়ার খবর নেন। বাওর তাই করে যেতে লাগলেন। শেষটায় রাত তিনটের সময় বাওর সুসংবাদ দিলেন, এখন ফ্লাই করা সম্ভব। হিটলার সঙ্গে সঙ্গে মোটরে উঠলেন, প্লেনে চেপে ভোরের আলো ফুটি ফুটি করছে এমন সময় ম্যুনিক পৌঁছলেন। এস্থলে বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়, হিটলারের আপন প্লেন মেরামৎ হয় নি বলে তিনি ম্যুনিক পৌঁছলেন অন্য প্লেনে। এ্যারপর্টে পৌঁছেই হিটলার জোর পা চালিয়ে গিয়ে উঠলেন মোটরে। সে গাড়িতে তাঁর কয়েকজন অতিশয় বিশ্বাসী সশস্ত্র সহচর তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। মোটর সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতিতে উধাও হল। বাওর প্লেন হ্যাঙারে তোলার ব্যবস্থা করে দিয়ে এ্যাবপর্টে পাইচারি করছেন এমন সময় তাঁর পরিচিত এক অফিসার তাঁকে দেখে শুধোলেন, "আপনি এখানে?" "কেন, ফ্যুরারকে খানিকক্ষণ আগে প্লেনে করে এখানে নিয়ে এলুম যে।"

অফিসার আরো আশ্চর্য হয়ে শুধোলেন, "সে কি? তাঁর প্লেন তো দেখতে পেলুম না।"

"আমরা অন্য প্লেনে এসেছি। কিন্তু ব্যাপার কি?"

অফিসার অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে বললেন, "কেপটেন র‍্যোম আমাকে খাড়া হুকুম দিয়েছিলেন, আমি যেন এখানে কড়া চোখ রাখি, ফ্যুরারের প্লেন দেখা গেলেই যেন তাঁকে ফোন করে খবর দি। এখন করি কি?"

বাওর বললেন, "করার তো কিছুই নেই আর। ফ্যুরার তো এতক্ষণে কেপটেন র‍্যোমের ওখানে নিশ্চয়ই পৌঁছে গিয়েছেন।"

এস্থলে বলা প্রয়োজন, হিটলার সম্বন্ধে বিশেষ কোনো বই পড়া না থাকলেও একাধিক ফিলমের মারফৎ অনেক পাঠকই জানেন, এই কেপটেন র‍্যোমই হিটলারের সর্বপ্রধান অন্তরঙ্গ সখা যিনি হিটলারকে জর্মনির চ্যানসেলর রূপে গদীনশীন করার জন্য সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখান। তাঁর অধীনে প্রায় পাঁচলক্ষ নাৎসি যুবক আধা-মিলিটারি ট্রেনিং পেয়েছিল। হিটলার নাকি হঠাৎ খবর পান—কখন পান বলা কঠিন—যে র‍্যোম নাকি তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন, তাঁকে হটিয়ে স্বয়ং গদীতে বসবেন। তাঁবেতে আছে, বিশেষ করে তাঁরই (র‍্যোমেরই) অনুগত পাঁচ লক্ষ নাৎসি—এদেরই নাম ব্রাউন শার্ট।

হিটলার তাই কাউকে কোনো খবর না দিয়ে, গোপন ব্যবস্থা করে হঠাৎ গোডেসবের্গ থেকে (সেখানে গিয়েছিলেন যেন পূর্বাভ্যাস মত বিশ্রাম নিতে—আসলে র‍্যোমের চোখে ধুলো দেবার জন্য; অবশ্য র‍্যোমও কিছুটা সন্দেহ করেছিলেন বলে পূর্বোল্লিখিত অফিসারকে এ্যারপর্টে মোতায়েন করেছিলেন) ম্যুনিকে পৌঁছে সোজা র‍্যোম যে হোটেলে স্বাস্থ্যোদ্ধাব করছিলেন সেখানে অতি ভোরে পৌঁছে তাঁকে অতর্কিত ভাবে হামলা করে বন্দী করেন।

র‍্যোম এবং তাঁর নিতান্ত অন্তরঙ্গ ষড়যন্ত্রকারীদের গুলি করে মারা হয়।

লটে বললে, "আবহাওয়ার যোগাযোগ তো আছেই কিন্তু আসল কথা এই, হিটলার যদি আপন প্লেনে আসতেন তবে সেই পাহারাদার অফিসার তৎক্ষণাৎ র‍্যোমকে জানাতেন। র‍্যোমও তৈরী থাকতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গকে জড়ো করতেন। কে জানে, আখেরে কি হত। হয়তো ব্যোমই জিততেন। তা হলে কি হত? কে জানে? হিটলাবেব মতে র‍্যোম তো ফ্রানসের প্রতি বিরূপ ছিলেন না—ভালোবাসতেন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আব জানো, সব-কিছু ঠাণ্ডা হযে যাওয়ার পর বাওর এই প্লেনের গুবলেট-কাহিনী হিটলারকে বলেন।

হিটলার নাকি প্রত্যুত্তরে বলেন, "নিয়তি।"

লটে বললে, "আমি বলি, 'যোগাযোগ'।"

॥৩১॥

"আচ্ছা লটে, আর পাঁচজন জর্মনের মত তুমি তো হিটলার-যুগটা একটা বিভীষিকা-ভরা দুঃস্বপ্নের মত ভুলে যেতে চাও না। তবে একটি কাহিনী আমি শুনতে চাই—বরঞ্চ বলা উচিত, আমি শুনতে চাই আর নাই চাই, আমার দেশের ছেলেছোকরা মোকা পেলেই আমাকে শুধোয়, 'হিটলার বিয়েশাদী করলেন না কেন?' তা সে করুন আর নাই করুন—ইয়োরোপে যখন দুধ সস্তা তখন গাই কিনে সেটার হেপাজতীর বয়নাক্কা—

ঝামেলা পোয়ানো মহা আহাম্মুখী—প্রেম-ট্রেমের দিকে তাঁর কি কোনো প্রকারেরই ঝোঁক ছিল না?"

লক্ষ্য করেছি, এ প্রশ্নে অনেক জর্মনই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। কিন্তু লটে মেয়েটির সমঝ-বুঝ আছে। একদিকে যেমন খানিকটে প্যুরিটানিজম আছে অন্যদিকে কথাপ্রসঙ্গে যদি প্রেম এমন কি আলোচনা দৈহিক কামনার দিকে মোড় নেয় তবে সে সব সময় নাসিকা কুঞ্চিত করে না। এমন কি মাঝে মাঝে হাজার ভল্টের প্রাণঘাতী শকও দিতে জানে। যেমন আমাদের তিনজনাতে বেশ যখন জমে উঠেছে তখন লটে বেশ রসিয়ে রসিয়ে য়োহানেস-আঙনেস-আমার স্নান-বিহারের বিপর্যয় কাহিনী হেরমানকে শোনালে। হেরমান কৌতুকভরে আমাকে শোধালে, "আচ্ছা সায়েড, সবই তো হল কিন্তু ঝোপের আড়াল থেকে অষ্টাদশী আঙনেসের বার্থডে ফ্রকপরা যে অনাবিল সৌন্দর্য—"

ঝোপের ভিতর দিয়ে আসার সময় কাহিনী বলতে বলতে যখন এই অঙ্কে পৌঁছই তখন যে রকম রসভঙ্গ করে লটে ধমক দিয়ে বলেছিল "চোপ" এস্থলেও সেটা তদ্বৎ।

আমি হেরমানের দিকে তাকিয়ে করুণ কণ্ঠে ফরিয়াদ জানালুম, "ভায়া হেরমান, আড়াল থেকে মাত্র দুটিবার এ জীবনে নগ্ন সৌন্দর্য দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল—"

ঠোঁটকাটা হেরমান শুধোলে, "আর মুখোমুখি?"

লটে ফের ধমকালে, "চোপ!" এ—"চোপেতে" আমার সর্বান্তঃকরণের সম্মতি।

রূঢ়বাক্য প্রয়োগের বেলায় লটের শব্দভাণ্ডার বড্ডই-বাড়ন্ত। অনুমান করলুম, প্রাচীনদিনের সেই নবীনা লটে নানা অনাবশ্যকীয় কিন্তু অনিবার্য পরিবর্তন সত্ত্বেও সেই লটে এখনো শান্তা নাম নিতে পারে। কাউকে ধমক-টমক দিতে দিতে কড়া কথার স্টক বড় একটা বাড়াতে পারেনি।

আমি হেরমানকে করুণতর কণ্ঠে বললুম, "শুনলে ভাইয়া শুনলে? দেখলে, কী মারাত্মক প্যুরিটান, ঝুরঝুরে সেকেলে পদিপিসি!"

লটে স্থির নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "আমার সঙ্গে যুগ্ম অভিসারে বেরিয়েছো আমারই বাড়ির সামনেকার কুঞ্জবনে—"

আমি মনে মনে খানিকটে আমেজ করে গুণগুণালুম,

আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমারি আঙ্গিনা দিয়া।

লটে বাক্যের শেষাংশ পুনরাবৃত্তি করে বললো—"আমারই বাড়ির সামনেকার কুঞ্জবনে, আর আমাকে শুনতে হবে, কান ভরে শুনতে হবে, প্রাণভরে 'আমরি-আমরি' বলতে হবে আঙনেসের নগ্ন সৌন্দর্য বর্ণনার প্রতিটি শব্দ যখন আমার কানের পর্দাতে কটাং কটাং করে হাতুড়ি ঠুকবে। ভেবো না আমি হিংসুটে। নগ্ন সৌন্দর্যের বর্ণনা যে-কোনো পুরুষ যে-কোনো রমণীর এবং ভাইস-ভার্সা দিক। আমার তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই—তা সে বিন্দু সরেসতম নেপলিউন ব্রান্ডিরই হোক আর নিরেসতম জাপানী বিয়ারেরই হোক কিন্তু তুমি যদি দিতে চাও—তা সে তোমার জীবনে প্রথমবারের মতই হোক, আর শেষবারের মতই হোক—তুমি দেবে আমায় রইলো কথা।"

হেরমান বললে, "ব্রাভো, ব্রাভো, ন-বউ বাঁচলে হয়।"

এবার আমার "চোপ" বলার পালা। হেরমান যেন রণাঙ্গনে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়ে বললে, "কেন? শুনতে পাবার মত অধিকার আমার আছে কি, বর্ণনাটা গেলবার

মত প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছি কি, সে সিনেমাটা এ-মার্কা না বি-মার্কা, জানতে পারি কি? কেন আর্টিস্টরা কি ন্যুড মডেল সামনে দাঁড় করিয়ে ছবি আঁকে না? আর দাঁড় করিয়েই বা বলছি কেন? আর্টিস্ট পিট্‌ম্যুলারের স্টুডিয়োতে যখনই গিয়েছি, তখনই দেখেছি, নিদেন গোটা তিনেক মডেল বার্থডে ফ্রক পরে কেউ বা কফি বানাচ্ছে, এখান থেকে দেশলাই আনছে, ওখান থেকে চিনিটা আনছে, সেখানে আতিপাতি খুঁজছে, কফির কৌটোটা গেল কোথায় শুধোচ্ছে, জানো তো আর্টিস্ট মাত্রই কি রকম মারাত্মক গোছ-গোছানোর নীট অ্যান্ড ক্লীন বেড়ালটির স্বভাব ধরেন—অন্যজন ম্যুলারের আসন্ন প্রদর্শনীর জন্য ছবি খুঁজতে গিয়ে কখনো কাত হয়ে গড়াতে গড়াতে সোফার নিচে ঢুকছেন, কখনো বা অর্ধ-লম্ফে জানলার চৌকাঠের উপর উঠে একটি বাহু সম্প্রসারিত করেছেন সর্বোচ্চ শেলফের দিকে, আমি তো ভয়ে মরি হাতখানির প্রলম্বিত ঐ টান-টান টানের ফলে দেহশ্রীর উচ্চার্ধ না বক্ষচ্যুত হয়—"

হেরমান সবিনয় বললে, "ভাই সই!" বাকিটা সংক্ষেপে সারছি। কারণ তৃতীয়া মডেলটি সবাকার সেরা। সেই বিরাট স্টুডিয়োর মাঝখানে তিনি মেদ বৃদ্ধি নিবারণার্থে জিমনাস্টিক জুড়েছেন। আর সে যা তা জিমনাস্টিক নয়—ভারতীয় সাপুড়ে নাচ থেকে শুরু করে মিশরী বেলিডানস—নাভিকুণ্ডলীটি কেন্দ্র করে।

আর ঐ সব হুরীপরীদের কর্মকলাপের মধ্যিখানা যেন তুর্কীর পাশা জর্মন পিট্‌ম্যুলাব তার খাস-প্যারা ডিভানটির উপর অঘোরে ঘুমঘোরে নাক ডাকাচ্ছেন। একদিন পিট্‌কে শুধিয়েছিলুম, মঞ্চের উপর মডেল ছিল....দাঁড়িয়ে আছেন সে না হয় বুঝি। কিন্তু কাজকর্ম করার সময় ওনারা জামা-কাপড় পরলে কি দোষটা হয়। পিট্ বললে, আমি নাকি একটা আস্ত বুদ্ধু। দুনিয়ার তাবৎ মেয়েই তো এমন কিছু আর্টিস্টের মডেলের মত 'যাবজ্জীবেৎ' ততকাল মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে 'সুখং জীবেৎ' বরাত নিয়ে আসে না। ওরা হাঁটে, কাজ করে, উপু হয়ে এটা-সেটা কুড়োয়, পায়ের আট আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে নাগালেব প্রায় বাইরের তাকটা থেকে আচারের বোয়াম নামায়। এগুলোও তো আঁকতে হয়—অবশ্য ফ্রক ব্লাউস তখন তাদের পরনে থাকে, আমিও তাই আঁকি। কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থান পবিবর্তন এবং তজ্জনিত নানাবিধ আন্দোলন ন্যুডে না দেখা থাকলে ছবি ডাইনামিক হয় না। উদাহরণ দিয়ে পিট্ বলেছিল, গাছের যে ডালপালা—তার গতিবিধি হুবহু জানতে হলে গাছটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হয়, যখন শীতকালে সে সর্ব পত্র বিবর্জিত নগ্ন।

আমি বললুম, "তা হতে পারে। কিন্তু আর্টিস্টরা সব-কিছু দেখে নিরাসক্ত নয়নে। ন্যুড গাছ, ন্যুড রমণীকে—একই নিরাসক্ত নয়নে। কিন্তু আর পাঁচজন তো প্রভু খৃষ্টের মত নয়। তিনি বলেছেন, 'পাপনয়ন উপড়ে ফেলো'। আর বললে বিশ্বাস করবে না, আমাদের দেশের এক বেশ্যাসক্ত পাপী ঐ উপদেশ না জেনেও জ্ঞানচক্ষু খুলে যাওয়াতে চর্মচক্ষু উপড়ে ফেলে। আশ্চর্য, প্রভু খৃষ্ট উদ্ধার করলেন ভ্রষ্টা নর্তকী মারি মাগদেলেনকে আর ভ্রষ্টা নর্তকী চিন্তামণির উপদেশে উদ্ধাব পেল পাপী বিল্বমঙ্গল। কিন্তু সে-কথা থাক। আমি বলছি, তোমার বউ তো বিরাট ওকগাছ—"

লটে : "কি বললে! আমি ধুমসী মুটকী ওকগাছ?"

"আহা চটো কেনে? অন্য হাতটা আনতে দাও—"

"সে আবার কি জ্বালা?"

"পরে হবে,—কিংবা তুমি তন্বঙ্গী চিনার গাছও নও, তাহলে, বলো বৎস, হেরমান, করি কি?"

হেরমান : "কে বললে তোমাকে, আর্টিস্টরা নিরাসক্ত নয়নে কুল্লে দুনিয়ার দিকে তাকায়? তা হলে কোনো ন্যুডকে সরলা, কোনোটিকে চিন্তাশীলা, কোনোটিকে কামুকা, কোনোটিকে চিত্তপ্রদাহিণী, কোনোটিকে শান্তিদায়িনী আঁকে গড়ে কি প্রকারে? নিশ্চয়ই তাঁদের হৃদয়মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবোদয় হয়। অবশ্য পূর্ণ সিদ্ধা মডেল তার থোড়াই পরোয়া করে। "সঙ অব সঙ"—"সঙ অব সলমন" নামেও পরিচিত—ফিলিম দেখেছ? আমাদের ঐ পাশের শহরে কলোনের মেয়ে—হিটলার-বৈরী রমণী মার্লেন ডীটরিষ্ সে ফিলিমের প্রধান নায়িকা। গাঁইয়া মেয়ে এসেছে শহরে পিসীর দোকানে কাজ করতে। সেখানে এক ছোকরা ভাস্করের সঙ্গে মাত্র কয়েক মিনিটের আলাপ। ছোকরা পিসীর ভয়ে বেরুবার সময় শুধু আঙ্গুল দিয়ে দেখালে—সামনের পাঁচতলার বাড়ির চিলেকোঠায় তার স্টুডিও। মেয়েটা মজেছে। সে-রাত্রেই গেল আর্টিস্টের কাছে। আর্টিস্ট সত্যই মেয়েটিকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছে—যেন সন্ধান পেয়েছে তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি, মাস্টারপীস্ 'সঙ অব্ সঙস্' সর্বগীতির সেরা গীতি ওরই ন্যুড দিয়ে নির্মাণ করবে। অনুপ্রাণিত ভাষায় মেয়েটিকে তার আদর্শ, তার সর্বকীর্তির শ্রেষ্ঠতম কীর্তির কথা বলে বলে সেই সরলাবালার হৃদয়ে তার ভাবাবেগ সঞ্চারিত করলো। অবশেষে অনুরোধ করা মাত্র সর্ব আবরণ খুলে ফেলে দাঁড়ালো মঞ্চের উপর সে মেয়ে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য আর্টিস্ট উর্ধ্বশ্বাসে দ্রুততম গতিতে এঁকে যেতে লাগল প্রথম স্কেচ। সম্বিতে ফিরে এলো স্কেচ শেষ হওয়ার পর। তখন এই সর্বপ্রথম, সে লক্ষ্য করলো মেয়েটির দেহের সৌন্দর্য। তার চোখের উপর ফুটে উঠলো সে ভাব-পরিবর্তন, মেয়েটি এক পলকেই সে আবেশ লক্ষ্য করলো। সঙ্গে সঙ্গে পেল নিদারুণ লজ্জা। ছুটে গিয়ে সর্বাঙ্গ জড়ালো, হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়ে।

এতক্ষণ অবধি দুজনার কারোরই কোনো আচরণে কোনো প্রকারের আড়ষ্টতা ছিল না। দুজনা একই সৃষ্টিকর্মের ভাবাবেশে নিমজ্জিত, একই আদর্শে অনুপ্রাণিত—একজন ডাইনামিক অন্যজন স্টাটিক। একজনের সে-ভাব পরিবর্তন হওয়া মাত্রই সে পরিবর্তন ওর মনে সঞ্চারিত হল। মৃন্ময় দেহ সম্বন্ধে সে এই প্রথম সচেতন হল। সঙ্গে সঙ্গে তার চিত্তে উদয় হল, সঙ্কোচ ব্রীড়া লজ্জা। সঞ্চারিত হল দেহে।

অনুরোধের সঙ্গে সঙ্গে এ-মেয়েটির বিবস্ত্র হওয়া, আর্টিস্ট যতক্ষণ স্কেচ করছিল আপন নগ্নদেহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন থাকা, স্কেচ শেষে হঠাৎ আর্টিস্টের চোখে ভাবান্তর লক্ষ্য করে চিন্ময়ভুবন থেকে মৃন্ময়লোকে পতন—এসবই সম্ভব হয়েছিল, তার একটিমাত্র কারণ সে ছিল জনপদবালা সরলা কুমারী।"

হেরমান ঠিক সমে এসেই থামলো। আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "বে-আদবী মাফ হয়। আমি একটু আসি।"

আমি লটের দিকে তাকালুম। তার নয়ন মুদ্রিত। হেরমানের ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার শব্দ শুনে চোখ মেলে আমার দিকে গভীর স্নেহভরা চোখে তাকিয়ে বললে, "হেরমান অনায়াসে চিন্ময় মৃন্ময়ে আনাগোনা করতে পারে। আমার অতখানি বুদ্ধি নেই, অতখানি স্পর্শকাতরও আমি নই। আমি অত্যন্ত সাদামাটা রাইনের কাদায় গড়া মানুষ। তবু বলবো, হেরমান যেভাবে সমস্যাটা বুঝিয়ে বললে এরপর হিটলারের প্রেম নিয়ে

আলোচনা করা যায় না। লোকে বলে "হিটলারের প্রেম", কিন্তু সে-পঙ্কিল বস্তুটাকে প্রেম নাম দিতে হলে অনেকখানি কল্পনাশক্তির প্রয়োজন, ওটা আজ থাক।"

খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে শুধোলো, "আজ চাঁদের আলোটা ঠিক তেমন উজ্জ্বল নয়, সেই সে-রাত্রে তুমি যখন রাইন গলট্ এক্সপ্রেসের তুফান বেগে চিঠি ডাকে ফেলতে যাচ্ছিলে। তবু নেই নেই করে কিছুটা তো আছে। আচ্ছা তুমি কখনো চাঁদের আলোতে ক্যানভাসের ফোলডিং বোট-এ রাইনের উপর ঘোরাঘুরি করেছ?"

আমি বললুম, "কেন?"

"আমাদের একটা আছে! যাবে?"

আমি শুধালুম, "সে তো বেশ কথা। হেরমান নিশ্চয়ই ভালো নৌকো বাইতে জানে —রাইনের পারে জন্মাবধি এতটা কাল কাটালো।"

লটে খিল খিল করে হেসে বললে, "তুমি কি ভেবেছো আমাদের ফোলডিং বোট স্বর্গীয় মানওয়ারী জাহাজ 'বিসমার্ক' বা 'কুইন মেরি' সাইজের জাহাজ। ওটাতে মাত্র দুজনার জায়গা হয়।"

আমি বললুম, "সর্বনাশ।"

॥৩২॥

কথায় বলে "কানু ছাড়া গীত নেই।" অবশ্য সে গীত শ্রীকৃষ্ণের শৌর্যবীর্য তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এমন কি তিনি যে মথুরায় একাধিক বিবাহ করেছিলেন এবং হয়তো বা এঁদের কোনো একজন বা একাধিক জনকে ভালোও বেসেছিলেন—এসব বিষয় নিয়ে নয়। সত্রাজিত দুহিতা সত্যভামার প্রতি তিনি যে বিলক্ষণ অনুরক্ত ছিলেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মহাভারতে আছে, "সত্যভামা কোপাবিষ্ট চিত্তে রোদন করিতে করিতে বাসুদেবের ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কোপানল উদ্দীপিত করিলেন।" এবং ফলস্বরূপ পরে যে হানাহানি আরম্ভ হয় সেটাতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বিস্তর ভোজ এবং অন্ধক বংশের বীরদের বিনষ্ট করেন। কিন্তু প্রশ্ন, সত্যভামার প্রতি বাসুদেবের অনুরাগ নিয়ে কোনো কবি উচ্চাঙ্গের কাব্য সৃষ্টি করেছেন বা "গীত" গেয়েছেন এ-কথা তো কখনো শুনিনি। কানুর গীত মানেই শ্রীরাধার উদ্দেশে কৃষ্ণের প্রেমনিবেদনের গীত এবং তার চেয়েও মধুরতর এবং বেদনায় নিবিড়তর—বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়—কানুর বিরহে রাজার ঝিয়ারির আর্তগীতি।

গোডেসবের্গ-মেলমের অতি কাছেই রাইনের দুটি অপরূপ সুন্দর দ্বীপ। অর্থাৎ লটেদেব বাড়ি থেকে দূরে নয়। কিন্তু উজানবাগে।

হেরমান নৌকাটি ফিটফাট করে সেটাকে এক ধাক্কায় ভাটির দিকে ঢালু করে দিয়ে বেশ উঁচু গলায় বললে, "বলি লটে, বেশী বাড়াবাড়ি করো না। রিভার-পুলিস কাছেই।" আমাদের স্টেশনে স্টেশনে যে-রকম একদা সাইনবোর্ড সাবধান বাণী শোনাতো "পকেটমার নজদীকে হৈ।" আমি বললুম, "তবেই হয়েছে।" বলেই ফিক করে আধগাল হেসে নিলুম।

তোমার কথায় আর আচরণে কোনো মিল নেই। এদিকে বলছো, "তবেই হয়েছে", অর্থাৎ কাছেপিঠে রিভার-পুলিস থাকলে আমাদের সর্বনাশ হবে। ওদিকে ঠোঁটের

আলোতে খেলে গেল মোলায়েম হাসি। মানে খুশী। কোন্‌টা ঠিক? হেঁয়ালি ছেড়ে কথা কও। তুমি চিরকালই বেখেয়ালী। অভদ্র ভাষায় বলতে হলে নির্ভয়ে বলবো, তুমি আমার মনে আমার বুকে কি চলছে সে-সম্বন্ধে উদাসীন। আচ্ছা, তুমি কি একবারের তরেও নিজের মনকে শুধিয়েছ, আমি তোমাকে সর্বক্ষণ কোন্ প্রশ্নটি, মাত্র একটি প্রশ্ন শুধোতে চাই? বলো।"

এর চেয়ে পকেট-বুক সাইজের ভেলা, মোচার খোলও অক্লেশে বলা যেতে পারে ত্রিসংসারে হয় না। জর্মন জাতটাই দুই একসট্রিম নিয়ে গেণ্ডেরী খেলতে ভালোবাসে, ক্ষণে আসমান ক্ষণে জমীন, ক্ষণে মোচার খোল নৌকো ক্ষণে জেপেলীন। এ ভেলাটি সাইজে দেশের মাদ্রাজী মেস বাড়ির—মাদ্রাজী উচ্চারণে হিন্দীতে "চোটা সে চোটা"—তক্তপোশের যমজভাই দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে। অবশ্য নৌকাটির হাল আর গলুইয়ের দিক দুটো ছুঁচলো বলে সে দু-প্রান্তে তক্তপোশকে অবশ্যই হার মানায়। লটে হাল ধরে বসেছে একপ্রান্তে আমি অন্যদিকে। দেশের কোঁদা নৌকোর সঙ্গে এ-ভেলার আর একটা সর্বনাশা প্রাণঘাতী মিল আছে। কোঁদা নৌকোতে ওঠার সময় নৌকোর ঠিক মধ্যিখানে পায়ে ভর না দিলে আসন নেবার সময় ভাগ করে গলুইয়ের ঠিক মধ্যিখানে না বসলে, বসার পরও ডাইনে বাঁয়ে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রীর বেশী, হঠাৎ কাৎ হয়েছো কি অমনি নৌকো কুপোকাৎ। হাটবারে কচ্ছপকে চিৎ করে রাখে, আর ইনি হয়ে যান উপুড়। হ্যাঁ, হেরমান অতি নিশ্চিত তালেবর মাল। এ-ভেলায় আর যা হয় করতে চাও করো কিন্তু ঢলাঢলিটি —উভয়ার্থে—করতে যেয়ো না, বাপধন! আচ্ছা এক নয়া সেফটিবেল্ট অবিষ্কার করেছে রাম ঘুঘু হেরমান। ওদিকে আমি তো "ঘুঘু দেখেই নাচতে শুরু। ফাঁদ তো, বাবা দেখি নি॥"—হেরমান যখন পার্কের বেঞ্চিতে বসার প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়ে কত না সোহাগভরে তরণীবিহারের প্রস্তাবটা পাড়লে তখন সে কত ধুরন্ধর বুঝতে পারিনি—পরে লটে বলেছিল।

সংস্কৃতের ডাকসাইটে অধ্যাপক প্রফেসর কির্ফেল বহু বৎসর রাইনের পারে বাস করেছেন। একদিন আমি যখন রাইনের পাড়ে বসে আত্মচিন্তায় মগ্ন তখন তিনি আমার পাশে এসে বসাতে আমার ধ্যান ভঙ্গ হল। তিনি শুধোলেন, "রাইন আজ কি রকম?" আমি বললুম, "নদীর এ-পার ও-পার দু-পারই তো বেশ পরিষ্কার কিন্তু ঠিক জলের উপরটা কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা দেখায়।" প্রফেসর বললেন, "সে প্রায় গোটা বছর ধরেই চলে। তাই যেসব আর্টিস্ট রাইনের ছবি এঁকেছেন তাঁরাই বাইনের ঠিক উপরটা যেন সামান্য কুয়াশা ঢাকা ঝাপসা ঝাপসা এঁকেছেন।" এ বাক্যালাপের পর আমি রাইনের বহু ছবি দেখেছি। প্রফেসরের কথা ন-সিকে খাঁটি।

আজও তাই লটেকে দেখতে পাচ্ছি ঠিকই। কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। চাঁদের আলো আজ রাতে তেমন উজ্জ্বল নয়। কিন্তু সে-আলো কুহেলির গ্লানি ছিন্ন করে মাঝে মাঝে তার মুখের রেখা স্পষ্ট করে দিচ্ছে। কপালের উপরকার অতি সামান্য ঘাম তখন চিকচিক করে ওঠে। আর চিকচিক করে ওঠে তার অতি কৃষ্ণ কুন্তলের মাঝখানে তুষারশুভ্র সীমান্তরেখা। এ-রকম শুভ্র সিতের সমন্বয় তো আমাদের দেশে চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে আমার দিকে এক ঝলক তাকায় আর একটুখানি মুচকি হাসে।

শুধোলে, "কই? আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না!"

মুশকিল। বললুম, "তুমি কি প্রশ্ন শুধোতে চাও সেটা আমি এতক্ষণ চিন্তা করতে করতে হঠাৎ আমার একটি কবিতা মনে পড়ে গেল। তাই সমস্যাটার কোনো শেষ সমাধানে পৌঁছতে পারিনি। কখনো পারবো বলে মনেও হয় না।"

""আমি বলবো?"

"বলো।"

"তুমি বাকী জীবন এই গোডেসবের্গ-মেলেমে কাটাবে না, সে আমি জানি। কিন্তু কদিন এখানে থাকবে সেটা আমি বার বার জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থেমে গিয়েছি। যদি হঠাৎ বলে বসো, কালই চলে যাচ্ছো, তখন কি? এটা বলতে তোমার তো এতটুকু বাধবে না সে আমি ভালো করেই জানি। তোমার হৃদয়ে যে রত্তিভর মায়ামহব্বৎ নেই সে আমি ভালো করেই জানি। আর সত্যি বলতে কি, তোমার আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন যে চাঁদের আলোতে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় একদা জানলার পাশে এসে আমি দেখি, তুমি ছুটে চলেছ মায়ের চিঠি ডাকে ফেলতে। তুমি যদি সেদিন রহস্য করে যা লোকে আকছারই করে থাকে বলতে হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ এই—এই—প্রিয়ার চিঠি ডাকে ফেলতে যাচ্ছি—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "ছিঃ! দশ বছরের বাচ্চা মেয়েকে কেউ কখনো এ-রকম কথা বলে?"

লটে অবাক হয়ে বললে, "কেন? সবাই তো বলে, সক্কলের সামনে!"

"আমাদের দেশে বলে না।"

"সে কথা থাক! আসল কথা তুমি যে তোমার মাকে খুব ভালোবাসো সেটা আমাকে বড় আনন্দ দিয়েছিল সেদিন। ঐটুকু ছিল বলে—"

"কাকে চিলে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যায়নি।"

"মানে?"

"অতি সরল, অর্থাৎ এমনই পচা জিনিস যে কেউ তার দিকে ফিরেও তাকাবে না। পচা জিনিসের প্রতি লোভ কার? কাকের চিলের। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলি, লটে, যদি প্রতিজ্ঞা করো, আমি যা বলতে যাচ্ছি, সেটা নিয়ে তারপর তুমি আমার সঙ্গে কোনো আলোচনা জুড়বে না, কোনো প্রশ্ন শুধোবে না।"

"প্রতিজ্ঞা করছি।"

গলায় দরদ ঢেলে বললুম, "তুমি বড় লক্ষ্মী মেয়ে লটে। তাহলে বলি। আমি আমার মাকে জানা অজানায় যতখানি কষ্ট দিয়েছি অন্য কেউ সেরকম দিয়েছে কিনা বলতে পারবো না। আর আমি আমার জীবনে যা-কিছু দুঃখকষ্ট পেয়েছি সে শুধু মাকে কষ্ট দিয়েছিলুম বলে তার শাস্তিস্বরূপ, সে-কথা জানি। ব্যস, এ বিষয়ে আর কোনো কথা না। এবারে তোমার কথার উত্তর দি। আমি গোডেসবের্গ ছেড়ে কাল যাচ্ছিনে পরশু যাচ্ছিনে তরশুও না।"

খুশীতে গলা ভরে বললে, "বাঁচালে।" তারপর মনমরা হয়ে শুধোলে, "তরশুর পর?"

আমি গম্ভীর হয়ে বললুম, "লটে, তোমার কথা শুনলে যে কোনো লোক ভাববে যেন কোনো বাচ্চা মেয়ে জীবনে এই প্রথম প্রেমে পড়েছে।"

নিশ্চিন্ত মনে লটে বললে, "তা ভাবুক না। আমার তাতে কি? যে জিনিসের মূল্য না বুঝে কিংবা নিজেদের এঞ্জেলের মত মনে করে দম্ভভরে কতকগুলো পাঁড় ইডিয়ট

হাসি-ঠাট্টা করে তার গায়ে তাতে করে কোনো ক্ষত হয় না।"

আমি উৎসাহভরে বললুম, "দাঁড়াও, দাঁড়াও। তোমার কথাতে আমার গুরুর একটি আপ্তবাক্য মনে হল। শোনো, শোনো।

"বাহুর দম্ভ, রাহুর মতো, একটু সময় পেলে
নিত্য কালের সূর্যকে সে এক-গরাসে গেলে,
নিমেষ পরেই উগরে দিয়ে মেলায় ছায়ার মতো,
সূর্যদেবের গায়ে কোথাও রয় না কোনো ক্ষত।"

হায়, অনুবাদে কি আর সে রস আসে, সাধে কি বিবেকানন্দ বলেছেন, অনুবাদ— সে তো কাশ্মীরি ডিজাইনের উল্টো দিকটা দেখার মত।"

লটে বললে, "মূর্খ মূর্খ মূর্খ, কি ভাববে সবাই? বুড়ি লটের ভীমরতি ধরেছে, এইবারে দেখে নিয়ো। কী কেলেঙ্কারিটাই না হয়। ড্যাং ড্যাং করে লাফাতে লাফাতে হের সায়েডকে বগলে চেপে চললো লটে মন্তে কার্লো কিংবা হাওয়াই দ্বীপে। জব্বর অপারেশন করিয়ে মুখের চামড়া টান-টান করাবে। পাকি-পাকছি পাকি-পাকছি চুলের উপর লাগাবে তিন পলস্তরা কলপ—"

"তা হলে?"

"তা হলে? এই যে তুমি তিন দিন থাকবে আমি কি তোমার পিছন পিছন ছোঁক ছোঁক করবো নাকি? তোমার গায়ে পোস্টেজ স্ট্যাম্পের মত সেঁটে রইব নাকি—"

"গেল গেল" চিৎকার করে উঠলুম আমি। কি যেন কি একটা ভাসন্ত জিনিসের সঙ্গে ভেলা খেয়েছে জব্বর এক ধাক্কা॥

॥৩৩॥

জর্মন কবি গ্যোটেকে নিয়ে যত গবেষণা আলোচনা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তার শতাংশের একাংশ হয়েছে কিনা সন্দেহ। অথচ জর্মন সাহিত্যে গ্যোটে ছাড়াও এমন সব কবি রয়েছেন যাঁদের দু-চারজনকে পেলে আমাদের সাহিত্য বর্তে যেত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাই অল্প বয়সেই জর্মন কবি হাইনের গুটিকয়েক কবিতার বাঙলা অনুবাদ করেন। লোকে বলে গ্যোটে সম্বন্ধে জর্মনে তথা পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাতে এত বেশী আলোচনা টীকা-টিপ্পনী করা হয়ে গিয়েছে যে আজ নয়, প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে এক ছোকরা গবেষক তার ডকটরেটের জন্য অন্য কোনো সবজেক্ট্ না পেয়ে থিসিস লেখে "গ্যোটে ও দন্তশূল" বিষয়ের উপর। তার বক্তব্য ছিল গ্যোটের কাব্যে যে-সব বিষাদময় নৈরাশ্যব্যঞ্জক অনুভূতি আমরা পাই, তার অধিকাংশই কবি রচনা করেছেন যখন তিনি দাঁতের কনকনানিতে কাতর, কিংবা কাতর না হলেও সেটা তাঁকে স্বস্তিতে আপন রুচি অনুযায়ী (কলকাত্তা-ই হিন্দীতে যে-রকম বলে "আপ রুচি খানা") কবিতা রচনা করতে দিত না। দন্তরুচি অনুযায়ী অর্থাৎ দাঁতের যা রুচি, সেই অনুযায়ী লিখতে বাধ্য হতেন, অর্থাৎ "পর রুচি" খেতেন—এখানে আমি অবশ্য "দন্তরুচি" প্রচলিত "দাঁতের সৌন্দর্য" অর্থে ব্যবহার করিনি। এবং দাঁতের রুচি যে কি হতে পারে সেটা ভুক্তভোগী পাঠক নিশ্চয়ই আমার নিবেদন শেষ হওয়ার বহু পূর্বেই দন্তরুচি বিকশিত করে সহাস্য আস্যে অনুমান করে নিয়েছেন।

এসব অবশ্য বাড়াবাড়ি। কিন্তু আমরা সকলেই জানি, নদী এবং প্রধানত পদ্মাই—রবীন্দ্রনাথের জীবনের কতখানি বৃহৎ অংশ অধিকার করে তাঁকে সুখে-দুঃখে সঙ্গ দিয়েছে। এমন কি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনা করার পর থেকে পদ্মার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ক্ষীণতর হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাব্যজগতে "সে বিরাট নদী চলে নিরবধি"। ক্ষীণস্রোতা তো হয়ই নি, বরঞ্চ সে মৃন্ময়ী নদী তখন চিন্ময় রূপ ধারণ করে তাঁর জীবনদর্শনে প্রধানতম স্থান অধিকার করে নিয়েছে। তাই বৈতরণীর সম্মুখীন হওয়ার বহু পূর্বেই তিনি গেয়েছেন :

'ওরে দেখ, সেই স্রোত হয়েছে মধুর,
তরণী কাঁপিছে থর থর।...

তিনি চলবেন,

মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।'

নদী তরণীর দেশ "বাংলাদেশ"। সে শুভদিন প্রত্যাসন্ন যেদিন ঐ বাঙলাদেশের ভাবী পদ্মা-সন্তান "রবীন্দ্রনাথ-পদ্মাতরণী" রচনা করে বাঙলাদেশের চিন্ময়রূপ আলোকিত করবেন।

পদ্মার জলে স্নান করেছি, সাঁতার কেটেছি বিস্তব। কিন্তু নৌকো কুপোকাত হওযার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ কখনও নাকানিচোবানি খাইনি। একদা মিস মেয়ো যখন তাঁর ড্রেন-ইনিস্‌পেক্‌টর রিপোর্টে ভারতবাসীর নোংরা স্বভাবের চুটিয়ে নিন্দা করেন তখন তদুত্তরে প্রাতঃস্মরণীয় লালা হরকিষণ লালের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত কানহাইয়া লাল গাওবা তাঁর "আংকল শ্যাম" (Uncle Sham = ঝুটা চাচা বা "ঠক চাচা"ও বলতে পারেন) পুস্তকে প্রসঙ্গক্রমে মার্কিনদের স্বপ্নলোক ফ্রানস্‌ভূমি—মার্কিন প্রবাদে আছে "অশেষ পুণ্যবান আমেরিকান পরজন্মে ফ্রানস ভূমিতে জন্মলাভ করে"—তথা তথাকার জনসাধাবণের বদখদ নোংরা স্বভাব সম্বন্ধে বক্রোক্তি করেন, "সেই ফরাসী দেশ—যেখানকার আপামর জনসাধারণ নিতান্ত জাহাজডুবি ভিন্ন অন্য কোনো অবস্থাতেই স্নান করে না।" কিন্তু আমি এমন কি পাপ করেছি যে এই রাতদুপুরে নৌকোডুবির ব্যবস্থা করে বরুণদেব আমাকে স্নান করাবেন—আমি তো হে, প্রভো, নিত্য প্রভাতে দিব্য স্নান করি। তদুপরি যে দুর্ভাবনা আমার মনের ভিতর চড়াৎ করে নেচে গেল সেটি শুনলে লেডি-কিলার মাত্রই আমাকে বর্বরস্য বর্বর ভিন্ন অন্য কোনো উপাধি দেবেন না—লটে সাঁতার জানে তো, আমি তো ব্রিটনের প্রাক্তন মন্ত্রী নটবর মি. প্রফুমো নই যে মাঝরাতে রাইন নদীতে লটের সঙ্গে জলকেলি করবো। হুঃ—

নদীর জলে স্নান করাটা
বলেন গুণী, স্বাস্থ্যকর।
প্রাণটা আগে বাঁচাই দাদা,
জলকেলিটা তাহার পর॥

কিন্তু উলটো বুঝলি রাম; লটে চেঁচিয়ে শুধোলো, "সায়েড, তুমি সাঁতার জানো তো?"

বাঁচালে। কারণ যে সুরে প্রশ্নটা শুধলো, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, লটে সাঁতার জানে, তার দুশ্চিন্তা আমাকে নিয়ে। বদরপীর সোনাগাছির জন্মদাতা সোনা গাজী দুজনাই পাণির পীর, এবং মাঝি-মাল্লার ত্রাণকর্তা। এতক্ষণ মনে মনে উভয়কে স্মরণ করছিলুম; এখন বিস্তর শুক্‌রিয়া জানালুম।

কিন্তু কোনো পীর কোনো বরুণদেবের শরণ না নিলেও চলতো। লটে দেখি খোলামকুচিখানা খাসা সামলে নিয়েছে। কিন্তু ধাক্কা লেগেছিল কিসে? কোনো বয়াতে নাকি? কিন্তু লটে আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা বিলকুল বেকার মনে করে শুধালো, "ভয় পেয়েছিলে নাকি?"

"না।"

লটে তাচ্ছিল্যভরে বললে, "এ-রকম তো আখছারই হয়। আর ছোট নৌকো তো বড় জাহাজের চেয়ে ঢের বেশী নিরাপদ। নইলে বিরাট জাহাজ ডুবে গেলে মানুষ ক্ষুদে লাইফ-বোটে ওঠে কেন? তাহলে আগেভাগে ছোট নৌকো চড়লেই হয়। কিন্তু এ-যুক্তিটা আমার আবিষ্কার নয়। কে যেন এক মিনি-নৌকো-পাগলা দুঁদে আটলান্টিক শিকারী, বলতে গেলে ডিমের খোলায় চড়ে স্পেন থেকে পানামা না কোথায় যেন পৌঁছয়। সেখানে কেউ ওকে না থামালে হয়তো তারপর লেগে যেতো প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিতে। তাকে নাকি হিটলার প্রশ্নটা শুধিয়েছিল। হয়তো লোকটার কথাই ঠিক। আমি কিন্তু ওরকম সাগর পাড়ি দিতে একা-একা পারবো না।"

"কেন, মেয়েরা একা কোনো কাজ করতে ভয় পায় তাই?"

"কিছু জানো না তুমি সায়েড। একা একা বিস্তর কাজ করে থাকে মেয়েরা। কিন্তু ভয় পায় একা থাকতে। শারীরিক মানসিক দুই অবস্থাতেই ভয় পায় একা থাকতে। এই যে ছোঁড়াছুঁড়িরা ধেই ধেই করে নৃত্য করছে, তাদের তিন কোয়ার্টার শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে চায়। কিন্তু আরেকটা একা থাকা সত্যই রীতিমত বিপজ্জনক। আমাদের বাড়িটা দেখেছো তো—চতুর্দিক নির্জন। যে কোনো রাত্রে এমন কি দিনের বেলাও যে-কোনো মহাপ্রভু মার্কিন স্টাইলে বাড়ি হানা দিতে পারেন—হাতে পিস্তল চোখের উপর দুটো ফুটোওলা পট্টি। এবং মেয়েরাও কম যান না। পিস্তল ব্যবহার করতে মোটেই বাধে না। ব্যাঙ, ব্যাঙ, ব্যাঙ। ব্যস হয়ে গেল। তুমি দু-ভাঁজ হয়ে সামনের দিকে—না, দড়াম করে নয়, চুবশে-যাওয়া বেলুনটার মত ধীরে ধীরে কার্পেটের উপর গুটিয়ে পড়বে। তারপর রক্তগঙ্গা—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "লটে, তুমি বড্ড বেশী মার্কিন 'ক্রীমী' পড়েছো (ক্রাইম-নভেল, ক্রাইম-টেলিভিজনের মার্কিনী এই শব্দটি জর্মনরা গোগ্রাসে গ্রহণ করেছে)। আমাদের দেশের লোক একটুখানি অলঙ্কার চাপিয়ে এস্থলে বলে, 'ঘামের ফোঁটায় কুমির দেখছো'।"

"কথাটা তো চমৎকার। মনের খাতায় টুকে রাখলুম। কিন্তু তোমাকে যা বলছি সেটা একদম সত্যি। আচ্ছা, সব-কিছু বাদ দিয়ে তোমাকে শুধোই, তুমি কখনো 'বাড়ারমাইন্‌হফ্‌-গ্রুপ'-এর নাম শুনেছ?"

"না। পলিটিক্যাল পার্টি নাকি?"

"না। তাই এখনো নিজেদের 'গ্রুপ' বলে। এই তো তোমাদের এলেম। কথায় কথায় তুমি যে আমাকে মার্কিনী মার্কিনী খেতাবটা দাও, যেন আমি মার্কিন বেড়ালের জর্মন

ন্যাজ, তুমি বরঞ্চ মার্কিন রিপ ভান উইনক্‌লকে হার মানাতে পারো। সে ঘুমিয়েছিল কুল্লে কুড়িটা বছর, তুমি ঝাড়া চল্লিশটি বছর। এরকম—"

"আহা! চল্লিশটি বছরে আমার কোনো অভিজ্ঞতা হয়নি, আর পাঁচটা দেশের তুলনায় জর্মনি যে অনেকখানি বদলে গেছে তার কোনো খবর রাখিনে—এই তো?"

"উ—"

"সে-ই তো ভালো। তাই তোমাকে দেখামাত্রই চিনে ফেললুম,

'তোর পানে চেয়ে চেয়ে
হৃদয় উঠিল গেয়ে,
চিনি, চিনি, সখী।
কত প্রাতে জানায়েছে
চিরপরিচিত তোর হাসি,
"আমি ভালোবাসি"॥'

এইবারে বলো, চল্লিশ বছরে আর পাঁচজন যে-রকম বদলে গেছে আমার বেলা তাই হলে কি ভালো হত।"

খুশী মুখে লটে বললে, "শুনতে মন্দ লাগছে না। কিন্তু এই ভালোবাসার ব্যাপারেই যে তুমি কি দারুণ অগা সেটা আমি তোমাকে না শুধিয়ে বুঝতে পেরেছি। এবং যৌন সম্পর্ক ব্যাপারে আজ জর্মনি কোন্ জায়গায় এসে পৌঁচেছে তার কোনো খবরই রাখো না। আচ্ছা বলো তো, তোমার কি মনে হয়, এদেশের ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের শতকরা কজনের ইস্কুলে থাকতে থাকতেই যৌন অভিজ্ঞতা হয়ে যায়?"

"কি করে বলবো, বলো। খুবই অল্পই। ধর্তব্যের মধ্যে নয় নিশ্চয়ই।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে লটে বললে, "তাহলে শোনো, এবং ভির্মি খেয়ো না। ষোল-সতেরো বছর বয়স হতে না হতেই শতকরা পঁয়ত্রিশটি ছেলের ত্রিশটি মেয়ের পরিপূর্ণ যৌন অভিজ্ঞতা হয়ে যায়। পনেরো বছর বয়সেই যথাক্রমে শতকরা চৌদ্দ/পনেরো ও দশ। এবং চৌদ্দ বছর বয়সেই একশোটার ভিতর জনা পাঁচেক!"

আমি স্তম্ভিত হয়ে শুধোলুম, "এ-সব কি সত্যি? আর তুমি জানলেই বা কি করে?"

"জানতে হয় তাই জেনেছি। আমি যে একটা ইস্কুলে আমার বান্ধবীর হয়ে মাঝে মাঝে পড়াতে যাই। হালেরই তো একখানা প্রামাণিক বই বেরিয়েছে। আমি তোমাকে শুধোচ্ছিলুম, তোমাদের দেশে পরিস্থিতিটা কি রকম, তার খবর নিয়ে তুলনা করে দেখতে। জানো, আমার নিজের বিশ্বাস যে-দেশের লোক অল্প বয়সেই যৌন অভিজ্ঞতা পেয়ে যায় তারা উন্নতিশীল প্রোগ্রেসিভ হয় না। এসব কথা এখন থাক। তোমাকে সেই স্টাটিসটিকস্ ভর্তি বইখানা দেব। তুমি সেটা পড়ে নিলে আলোচনার সুবিধে হবে। কিন্তু হাতের কাছে ভিরমি ভাঙবার জন্য স্মেলিং সলটস্ রেখো।. .ঐ দেখো, আমরা জর্মন রাইষের প্রেসিডেন্টের বাড়ির কাছে গিয়েছি।"

॥৩৪॥

এদেশে, এ-দেশে কেন পৃথিবীর সর্বত্রই এ-যুগে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে এত বেশী আলোচনা, নাটক, ফিল্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত তৈরী হচ্ছে যে, আমরা এই হট্টগোলেব

মাঝখানে প্রায়ই ভুলে যাই যে, এই ভারতেই রতি বা কাম সম্বন্ধীয় প্রথম পুস্তক রচিত হয়। এই সর্বপ্রথম পুস্তক বহু যুগ ধরে সম্মানিত হয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এ-যুগে পৃথিবীর সর্বত্র এ বই এমনই সিংহাসনে আসন পাচ্ছে, শুধু তাই নয়, এমনই জনপ্রিয় হয়েছে যে, একে এখন অক্লেশেই ওরো-আমেরিকার অন্যতম বেস্ট্-সেলার বলা যেতে পারে। ঠিক মনে পড়ছে না, কোথায় যেন পড়েছি, এক নাতিবৃদ্ধ জ্যাঠামশাইকে তাঁর ভাইঝি একখানা অতি মনোরম দ্য-লুকস বই উপহার দেয়—তাঁর জন্মদিনে। এই ভদ্রজন পুস্তক সঞ্চয়নে অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন এবং এ-রকম মরক্কো চামড়ার বাঁধাই সোনালী, চারুকার্যে ঝলমলিয়া কেতাব যে তিনি একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন, মেয়েটি সে-আশা নিশ্চয়ই করেছিল! জ্যাঠামশাই সেরকম কিছু করলেন না বটে, কিন্তু দেখা গেল, তিনি অতিশয় সযত্নে তাঁর আপন ডেসকে আর পাঁচটা দামী জিনিসের সঙ্গে সেটি তালাবন্ধ করলেন। তারপর বহু বৎসর কেটে গেল, সামান্য এই ঘটনাটি কে-ই বা মনে রাখে। তাঁর মৃত্যুর পর (যতদূর মনে পড়ছে তাঁর অন্য এক ভাইঝি) তাঁর ঘরদোর গোছগাছ করতে গিয়ে ডেসকের ভিতর আবিষ্কার করলো সেই প্রাচীন দিনের বইখানি। ততদিনে ইয়োরোপ নানা বিষয়ে মুক্তমনা হয়ে গিয়েছে কিন্তু ভাইঝি বইখানা দেখে স্তম্ভিত। সেই সে-আমলে কোনো ভদ্র পরিবারের মেয়ে তাঁর শান্তশিষ্ট বয়স্ক জ্যাঠামশাইকে "কামসূত্র" উপহার দেবে, এ তো একেবারেই অবিশ্বাস্য। আসলে মেয়েটি দোকানে গিয়ে নিশ্চয়ই চেয়েছিল, কোনো একখানা বেস্ট-সেলার এবং তার চেয়েও বড় কথা, সেটার বাঁধাই যেন অসাধারণ চাকচিক্য ধরে। জ্যাঠামশাই সব জাতের বইয়ের খবর রাখতেন। রঙিন মোড়ক খুলে এক নজর তাকাতেই বুঝে ফেলেছিলেন, ব্যাপারটা কি, কিন্তু মেয়েটি যাতে লজ্জা না পায় তাই তিনি ঐ পন্থা অবলম্বন করেন।

এর থেকেই পাঠক অনায়াসে বুঝে যাবেন যে, ঘটনাটি ঘটেছিল মান্ধাতার আমলে; নিদেন মহারানী ভিক্টরিয়ার সুবর্ণযুগে এবং খুব সম্ভব তাঁর পূতপবিত্র আপন দেশে। কারণ বহু বহু কন্টিনেন্টাল গুণীজ্ঞানীর দৃঢ় প্রত্যয়, কুল্লে ইয়োরোপের একমাত্র বিলেত-দেশেই যৌনজীবন নামক কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, কস্মিনকালেও ছিল না—অন্তত ফরাসীদের গলা কেটে ফেললেও তারা এ-বিশ্বাস কিছুতেই ত্যাগ করবে না। অবশ্য দেশকালপাত্র হিসেবে নিয়ে ইংরেজ জীবনযাপন পদ্ধতি সম্বন্ধে সে তার মতবাদের অতি সামান্য কিছুটা অতি অবরে-সবরে সামান্য রদবদল করতে পারে। যেমন, একদা ইংরেজ সম্বন্ধে ফরাসীদের মধ্যে সুপ্রচলিত প্রবাদ ছিল, "কন্টিনেন্টের আর-সর্বত্র নরনারীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক থাকে, ইংরেজের থাকে, গরম জলের বোতল।"[১] কিন্তু ইতিমধ্যে এই পৃথিবীতে, তার সর্বোত্তম গৌরবময় যুগে, মানুষ কলকব্জা যন্ত্রপাতি, এক কথায় টেকনিকাল সর্ববাবদে এমনই উন্নতি করেছে যে, এস্তেক ফরাসীও সেটাকে এড়িয়ে যেতে পারে না। বংশবৃদ্ধি বংশ-নিরোধ আরো মেলা আশকথা পাশকথা তার কানে এসেছে।

---

(১) এ-দেশেও বলে, "শীত কাটাতে হলে হয় দুই, নয় রুই (তুলার লেপ)।" ইংলন্ডের কাঠফাটা শীতে তুলোতে কিছু হয় না বলে হট-ওয়াটার-বটল্‌কে সে শয্যাসঙ্গিনী করে। ইংরেজের চাচাতো ভাই ডাচদের সম্বন্ধে বলা হয়—যদিও বিলেতের মত ও-দেশেও যৌন-জীবন নেই, এ-কথা কেউ কখনো বলেনি—"অন্য দেশের পুরুষ যৌবনে বিয়ে করে, হল্যান্ডের লোক পাশবালিশ কেনে", এটা চালু হয় ডাচদের কিপটেমি বোঝাবার জন্যে।

তাই বিস্তর ঘাড় চুলকে অনেক ভেবেচিন্তে তার পূর্বেকার প্রবাদটি বছর দশেক পরে পরিবর্তিত করে সর্বাধুনিক পরিমার্জিত সংস্করণ ছাড়লে, "এখন তারা ইলেকট্রিক কারেন্টে গরম করা লেপ ব্যবহার করে।"

এসব বিষয়ে অধুনা এক অতিশয় খানদানী ডিউক একখানি প্রামাণিক পুস্তিকা রচনা করেছেন। এ পুস্তিকা রচনা করার হক্ক তাঁর ন-সিকে, প্লাস "শরণার্থী সহায়তা" কী লীয়ে পাঁচ নয়ে পয়সে। বললুম বটে কিন্তু বক্ষমান "জান্" (কোম্পানি আমলের বানান) সায়েব যখন রাজসিক চাকচিক্যময় ডিউকত্ব লাভ করলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে লাভ করলেন মহারানীর রাজত্ব বাঁচাবার জন্য, সহায়তা কী লীয়ে চার মিলিয়ন পৌণ্ডের চেয়েও বেশী মৃত্যু-কর, বা ডেথ ডিউটি। ফরেন এক্সচেনজ নিয়ে কালোবাজার করার মত কিস্মৎ কপালে লেখা ছিল না বলে সেই পাঁচ পয়সী ডাকঘর যিনি নিরিখ বেঁধে মৃন্ময় টাকাকে 'হিরন্ময়' পৌণ্ডে পরিণত করেন সে-আর্যা নির্দেশ দিয়ে বলে মোটামুটি ১০০০০০০০০ (দশ কোটি) টাকা—যদি খেসারতী চার মিলিয়নের উপরে ধরা হয়—; নইলে কত আর?—এই ধরুন কোটি সাত আষ্টেক।

এ-ভদ্রলোক বলছেন, "যৌন সম্পর্ক ব্যাপারটা নিছক কন্টিনেন্টের একচেটে আবিষ্কার নয়। কন্টিনেন্টের বাসিন্দারা তাঁদের 'কমন মার্কেটে' আমাদের পাত পাড়তে না দিয়ে সে-সুখ থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে পাবেন কিন্তু প্রেম করার সুখ থেকে বঞ্চিত করতে পারবেন না। তফাৎটা তবে কোথায়? ওনারা তাঁদের যৌনজীবন নিয়ে বিস্তর ঢাকঢোল বাজিয়ে বেহদ্দ চেল্লাচেল্লি করেন, এন্তের বড়ফাট্টাই মারেন, ঐ নিয়ে অষ্টপ্রহর ভ্যাচর ভ্যাচর করেন। আমরা করিনে। আমাদের বিবেচনা-বোধ আছে, আমরা পিছিয়ে থাকতে ভালোবাসি। এর থেকে কি স্পষ্টই ধরা পড়ে না যে, নিজেদের উপর ওদের প্রত্যয় নেই, আমরা ওদের চেয়ে সরেস? (ড্যুক বোধ হয় বলতে চেয়েছেন, 'ইংরেজ জাতটা নীরব কর্মী'! —লেখক) আর এইটেই হল সব কথার নির্যাস। পৃথিবীর আর সর্বত্র যা ঘটে থাকে এ-দেশেও তাই ঘটে। শুধু আমরা আমাদের যৌনজীবন নিয়ে বড় একটা কথা বলিনে। হয়তো বা প্রকৃতিদেবীই এই প্রবৃত্তিটি দিয়ে আমাদের গড়েছেন। পুরুষানুক্রমে হয়তো বা আমরা নীতিবাগীশ—ঐটে পেয়েছি উত্তরাধিকারে। কিংবা হয়তো এও হতে পারে যে, এ-খেলাটার আইনকানুন আমাদের দেশে অন্য এক ভিন্নভাবে গড়ে উঠেছে; আর সবাই জানে স্পোর্টসের আইনকানুন মেনে চলাতে আমরা পয়লা নম্বরী এবং তার চেয়েও ঢের ঢের বেশী কেরদানী আছে আমাদের ভণ্ডামিতে।"

এই এতক্ষণে আমাদের মাই লর্ড ডিউকপ্রবর হাটের মধ্যিখানে হাঁড়িটি ফাটালেন—ইংরাজীতে বলা হয় কার্পেটের হ্যান্ডব্যাগ থেকে লুকনো বেড়ালটা বেব হবার মোকা পেয়ে এক লম্ফে কেলেঙ্কারিটা ফাঁস করে দিলে। কিন্তু এস্থলে শ্রী ড্যুক জন-এর প্রতি সুবিচারের খাতিরে অবশ্যই বলতে হয়, তিনি সজ্জন এবং সঙ্গে সঙ্গে এককাঁড়া দুষ্টুবুদ্ধিও ধরেন। ইংরেজের নষ্টামি ভণ্ডামির চিচিং ফাঁক করে দিতে পারলে তিনি সদাই নির্বিষ বিমলানন্দ উপভোগ করেন। তার একটা কারণ হয়তো এই যে, সাতপুরুষের (আসলে ইনি গোষ্ঠীর ত্রয়োদশ পুরুষ) ভিটের উপর খাড়া প্রাচীন কাস্‌লটি বাঁচাতে হলে তাঁকে সরকারের প্রাপ্য অষ্ট কোটি টাকার ট্যাক্সটা দিতে হয় রোক্কা নগ্দানগ্দি, এবং সে-রেস্তটা কাছারিবাড়ির ছেঁদো তহবিলে বাড়ন্ত। তাই বহু পূর্বেই নিবেদন করেছি, এস্থলে আমাদের

উল্টো "উপীন" যেন তেন প্রকারেণ কাস্‌লটি খুলে দিলেন পবলিকের তরে। "ফ্যালো দর্শনীর কড়ি—মাখো ত্যাল।" বলে কি! বিলেতের খানদানী পরিবারের কেউ কস্মিনকালেও এ-হেন "অনাছিষ্টি কম্মো" করেননি। নবাব সায়েবরা যে কি পরিমাণ চটেছিলেন তার জরীপ এ-স্থলে অবান্তর। বরঞ্চ জন মিঞার দাদ নেবার কায়দাটি বড়ই মুখরোচক—তিনি ওনাদের যাবতীয় ধূর্তামি নষ্টামি বের করে দিলেন দুখানি বইয়ে—এবং ইহসংসারে ভিলেজ ইডিয়টটা পর্যন্ত বিলক্ষণ অবগত আছে ভণ্ডামির গণ্ডা গণ্ডা ভাণ্ড চিরকালই যৌনরসে টৈটম্বুর।

এই বৃদ্ধ বয়সে আমি যে ইয়োরোপের কাম-কাণ্ড নিয়ে অল্পবিস্তর গবেষণা করছি তার জন্য কোনো প্রকারের কৈফিয়ৎ দেবার বা সাফাই গাইবার প্রয়োজন আমার পাপ বিবেক রত্তিভর অনুভব করছে না। আমার অকরুণতম পাঠক এমন কি এদানির যে-সব রুচিবাগীশ মার্কামারা পদিপিসীর পাল এসব "ঢলাঢলি" না করে খট্টাঙ্গপুরাণ বা এরণ্ডমৌলার নবনির্ঘণ্ট নির্মাণ করতে মাণ্ডামাস ঝাড়েন তাঁদের স্মরণে আনছি যে, ঝাড়া বিয়াল্লিশ বছর ধরে আমি ভারত ইয়োরোপ আফ্রিকায় মাকু মারছি, ক্রনিক মেলিগনেন্ট বেকারি ব্যামো থেকে ভুগছি বলে গত বাইশ বছর ধরে মাঝেসাঝে সেই মাকু মারার বয়ান লিখে পথ্যির হাঁড়ি চড়িয়েছি, তার পূর্বেকার অর্থাৎ ভ্রমণারম্ভের প্রথম কুড়ি বছরের কাহিনী কাবলীওলার বোয়াল মাছের মত চোখ-রাঙানি সত্ত্বেও মা সরস্বতীর কাছ থেকে ভিক্ষে চাইনি। সে সব কথা এখন থাক। আমি শুধু শুধোচ্ছি, অর্ধসিদ্ধ অর্ধপক্ক যা-সব লিখেছি তাতে কি পাঠকের মনে কখনো সন্দেহ জেগেছে যে, আমি যৌন-কেচ্ছার সন্ধান পাওয়ামাত্রই তার পিঠের উপর ডাকটিকিটের মত সেঁটে গিয়েছি? বরঞ্চ বলবো ও-বাবদে আমার উৎসাহ ছিল অত্যল্প। তার প্রধান কারণ, আমার ধারণা জন্মেছিল, যদিও ইয়োরোপের যৌনজীবন, প্রেমের ছড়াছড়ি প্রাচ্যভূমির তুলনায় অনেকখানি বে-আবরু তবু তাদের ঐতিহ্য বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে তাদের আচরণের খতেন মেলালে সামঞ্জস্যটাই চোখে পড়ে বেশী। (বরঞ্চ মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, কামসূত্র, কুট্টনীমতম্, চৌরপঞ্চাশিকা, এমন কি অর্বাচীনকালে বিদ্যাসুন্দর লেখার পর আমরা কেমন যেন ঈষৎ বেরসিক হয়ে গিয়েছি। সে কথা থাক।) মাত্র দশ বছর পূর্বেও ইয়োরোপে যে বাড়াবাড়ি দেখেছি তাতেও মনে হয়নি যে, ঐ নিয়ে কাউকে অত্যধিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হবে। তবে খুব সম্ভব দু-এক জায়গায় আধা-সাদা অপ্রসন্নতা প্রকাশ করেছি। এবারে যা দেখলুম, শুনলুম, পড়লুম, বিশেষ করে লটে যে-সব কথা বললো তার থেকে মনে প্রশ্ন জাগলো, প্রতীচ্যের বহু দেশে অত্যধিক মদ্যপান যেমন এই শতাব্দীর গোড়ার থেকে একটা কঠিন সমস্যায় দাঁড়িয়েছে, ঠিক তেমনি এদের যৌন আচরণ যে-স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছে, যে গতিতে এগিয়ে চলেছে, বিশেষ করে ইস্কুলের পনেরো ষোল সতেরো বছরের ছেলেমেয়েদের উপর এটা যে-ভাবে প্রভাব বিস্তার করছে তার পরিণতি কোথায়? ব্যক্তিগতভাবে আমার মাত্র একটি বিষয়ে কৌতূহল আছে : ব্রহ্মচর্য, সেক্স স্টার্ভেশন কি মহত্তর কর্মে সাহায্য দেয়, উচ্চতর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে? দু-হাজার বছর ধরে ক্যাথলিক পাদ্রিরা ব্রহ্মচারী জীবনযাপন করার পর আজ বহুতর ব্রহ্মচারী এবং গৃহীর মনে ঐ নিয়ে সন্দেহ জেগেছে—বৌদ্ধদের ভিতর এ সমস্যা নিয়ে কোনো আলোচনা এখনো আমার কানে এসে পৌছয়নি।...পাঠকদের মধ্যে যাদের বয়স কম তাদের মনে নিশ্চয়ই আরেকটা

চিন্তার উদয় হবে : আজ ইয়োরোপে যা হচ্ছে কাল সেটা এ-দেশে দেখা দেবে না তো? এবং দিলে দু-দিনের মধ্যে যে তার ভেজাল রূপ দেখা দেবেই সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।

সবুরদার পাঠক! এ কচকচানিতে তুমি যদি কিঞ্চিৎ চঞ্চলিত হয়ে থাকো, তবে আমি মাফ চাইছি। ভবিষ্যতে আর কক্‌খনো এমন গুনা করবো না—এ-ওয়াদা করলে অধর্ম হবে, তবে চেষ্টা দেব, পরশুরামী ভাষায় তোমার "মন যেন হিল্লোলিত হয় : চিত্তে চুলবুল লাগে।"

তার জন্য ঐ জন্ সাহেবটির সরেস মন্তব্য যেন মন্তব্যমগুলীর সায়েব।

পাঠক, ফরাসী দেশে তুমি যদি কোনো ফিল্ম-স্টার বা অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রেম জমাতে পারো তবে আর পাঁচজনের চোখে ফুটে উঠবে সম্ভ্রম; মুখে ফুটবে সপ্রশংস "ও! লা লা!" বুকে ফুটবে কাঁটা—কিন্তু সেটি অতিশয় বেবি সাইজের, দুশ্চিন্তার কারণ নেই, কারণ ফরাসী জাতটা মোটেই হিংসুটে নয়। "কিন্তু", জন্ বলছেন, "এমন কম্মটি লন্ডনে করতে যেয়ো না। এতে করে তোমার খ্যাতি-প্রতিপত্তি বাড়বে তো না-ই বরঞ্চ তোমার পক্ষে রীতিমত খতরনাক্ হতে পারে—বিশেষ করে তুমি যদি এ লাইনে এমেচার হও। এমন কি মেয়ে আর্টিস্টের প্যার পেলেও ঐ একই হাল। আর্টের সঙ্গে প্রেম মোটেই ম্যাচ করে না। ও দুটোর মধ্যে কোনো সম্পর্কই নেই। ফরাসীরা অবশ্য প্রেমটাকে আর্টের উচ্চাসনে বসায় (গুরুচণ্ডালী!—বলবো আমরা) এবং ওটাকে একটা অত্যন্ত প্রকৃষ্ট আপন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আর্ট বলে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু আমরা ইংরেজ জাতি স্পোর্টসের নেশন; এ দেশে প্রেমকে এক বিশেষ ধরনের ডনকসরত (জিমনাস্টিক) বলে স্বীকৃত হয়।"

॥৩৫॥

স্বখাত সলিলে আমি ডুবিনি, তোমাকেও ডোবাইনি। পাঠক নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আর ডুবলেই বা কি? কবিগুরু বাউলের গীত উদ্ধৃত করে বলেছেন, "যে-জন ডুবলো, সখী, তাব কি আছে বাকি গো" অবশ্য 'পাতকো'তে নয়, "রসের সাগরে" "অমিয় সায়বে"। কিন্তু আশ্চর্য, ইংরেজের আপন দেশের চতুর্দিকে গভীর জলের সমুদ্র থাকা সত্ত্বেও সে ডোবাডুবির প্রস্তাব বড় একটা পাড়ে না। তাই ড্যুক জন্ সেটা লক্ষ্য করে বলেছেন, অন্য দেশের লোক প্রেমকে আর্টের পর্যায়ে ফেলুক (কিংবা ঈশ্বরোপলব্ধির প্রথম সোপান বলে গণনা করুক—লেখক), ইংরেজের কাছে প্রেম এক প্রকারের জিমনাস্টিক। কৌতূহলী মন জানতে চাইলো, সেটা কোন্ প্রকারের জিমনাস্টিক? তখন, ও হরি, আবিষ্কার করলুম ইংরেজের আরেকপ্রস্ত ভণ্ডামি। মার্কিন জাতের পুণ্যভূমি যে রকম প্যারিস, বিলেতের ভণ্ড এবং স্নব—দুজনার মধ্যে খুব যে একটা ফারাক আছে তা নয়—দুজনারই মোক্ষক্ষেত্র অক্সফর্ড। সেই অক্সফর্ডে আছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। ইংরেজ মোকাবে মোকায় হামেশাই কভু বা কনে বউয়ের মত ফিসফিসিয়ে কভু বা বাঘা জমিদারের মত গলা ফাটিয়ে মহারাণীর যে রাজত্বে সূর্য কখনো অস্তমিত হন না সে-রাজত্বে এবং তারই কাছে-পিঠে উপীনদের যে দু-বিঘে জমি আছে সে সব জায়গাকেও জানিয়ে দেয় অক্সফর্ডের মত বিদ্যায়তন ত্রিসংসারে আর কোথাও নেই, এবং এসব ব্যাপারে ইংরেজের ন্যাজ মার্কিন

স্নব সাধারণ সর্বাঙ্গ ঘন ঘন আন্দোলিত করে সম্মতিসূচক মুদ্রা মারে। সেই বিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় একখানা রাজভাষার অভিধান।[১] অভিধানটি উত্তম কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু স্নবারিতে ভর্তি। সেই কোষ খুলে দেখতে গেলুম, "টু মেক লাভ" বলতে কি বোঝায়? "প্রেমে পড়া" সে তো খুব সম্ভব বিলেতের 'টু ফল ইন লাভ" থেকে কবে, কোনকালে পালতোলা জাহাজে করে সরাসরি এদেশে চলে এসেছে। দেখি 'টু পে অ্যামরাস অ্যাটেন্‌শনস্ টু—।" তবেই তো ফেলল মুশকিলে। ইংরেজ কী ধুরন্ধর জাত। যেখানে টাকাকড়ির ব্যাপার নয় সেখানে চট করে ঋণ স্বীকার করতে ভারি চটপটে। তদুপরি দায়টা ফরাসীর ঘাড়ে ফেলে দিয়ে নিজে চটসে সরে পড়লো—প্রেমট্রেম তো বাধা, জানে ওরাই। কথাটা এসেছে ফরাসী ভাষা থেকে; "আমূর" শব্দের অর্থ "প্রেম" (মূলত অবশ্য এসেছে লাতিন "আমরসুস্" থেকে) কিন্তু ফরাসীরা "আমূর" বলতে প্রেম, কাম সবই বোঝে। ওদিকে ইংরেজ "অ্যামরাস" বলতে বোঝে নিছক প্রেম—সে প্রায় আমাদের "রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম/কামগন্ধ নাহি তায়"...তাহলে আমাদের মহাখানদানী অক্সফর্ড অভিধানের মতানুযায়ী 'টু মেক লাভ" কথাটার অর্থ "বল্লভার প্রতি সপ্রেম মনযোগ দেওয়া, তাঁর যত্ন "আত্যিকর"। এস্থলে বলে রাখা ভালো "লাভ" শব্দে "সেক্স্" জাতীয় কোনো প্রকারের ভেজাল নেই এ কথাটা পষ্টাপষ্টি বলবার মত দুঃসাহস অক্সফর্ডের নেই। তাই অতি অনিচ্ছায় (আমার মনে হয়) স্বীকার করেছেন, "সেকসুয়াল অ্যাফেকশন, ডিজায়ার" ইত্যাদি। পুনরপি বলেছেন, "রিলেশন" বিটউঈন সুইট হার্টস—এইবারে পাঠক নিশ্চয়ই ঠাহর করে নিয়েছে শ্রাদ্ধটা কোন্ দিকে গড়াচ্ছে "সুইট হার্টস"—একে অন্যের প্রতি অনুরক্ত জনের সম্পর্ক তো হাজারো রকমের হতে পারে। এখানে যদি অক্সফর্ড সত্যের খাতিরে সাতিশয় কায়ক্লেশে লিখতেন "স্বামী-স্ত্রীব সম্পর্ক" তা হলেই তো ল্যাঠা চুকে যেত।

এইবারে আইস, নিম্ননাসিক পাঠক, অন্য একখানা অভিধানের শরণাপন্ন হই। যে "কনসাইস অক্সফর্ড ডিকশনারি" নিয়ে এতক্ষণ নাড়াচাড়া করছিলুম, যাঁর নাম শ্রবণেই শ্রীরাধার ন্যায় উন্নাসিকজনের "কপোল ভাসিয়া যায় নয়নের জলে" তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৯১১ খৃষ্টাব্দে; পক্ষান্তরে আমি যে অন্য কোষের শরণাপন্ন হচ্ছি সে-কোষ প্রথম

---

(১) ইংরেজ জাতটার প্রাণপুরুষ যে বেনে সেটা বোঝাবার জন্য বহু জ্ঞানী বহুতর যুক্তিতর্ক উদাহরণ-হদীশ পেশ করেন। সেগুলো নিতান্তই কাঁচা পড়ুয়ার সেই যুক্তির মত ডাস্টবিন মার্কা : "গুরুমশাই, আমি ঘুমুচ্ছিলুম, কে যেন আমার হাত দিয়ে তামাক খেয়ে গেছে।" আসল মোক্ষম যুক্তি, কামারের এক ঘা-র মত, এই বিপুল বসুন্ধরায় লক্ষ্মী এবং সরস্বতীকে একই গোয়ালে নাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে কে কোথায়? ইংরেজ—অক্সফর্ডে। পেত্যয় না হয় তো যান সেই বিগ্রহ-পাণ্ডাব যুগল-মিলন দেখতে সেখানে। এই বিদ্যায়তন এন্তেক কেতাবাদি ছাপে, প্রকাশ করে। এবং সবচেয়ে বড় কথা লাভ করে। কন্টিনেন্ট বা ভারতের বিদ্যায়তনদের লাভ করা মাথায় থাকুন গচ্চা দিতে দিতে কণ্ঠশ্বাস। অর্থশাস্ত্রের মহাজনরা বলেন, ১৯৩০-৩২ যখন বিশ্বময় ব্যবসা-বাণিজ্য জীবন্মৃত তখন যে প্রতিষ্ঠান রেকর্ড মুনাফা করেন তিনি অক্সফর্ড। অস্মদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইষ্টমন্ত্র "Advancement of Learning" এই কাষ্ঠরসিকতা শুনে এক ইংরেজ বলেছিল, "সেকি! একশ বছর হয়ে গেল, তোমরা এখনো ফালতো "L" অক্ষরটি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমাদের মত Advancement of Earning করতে পারোনি!"

যে রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয় সেটি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ অক্সফর্ডের প্রায় একশ বছর পূর্বে। তার অর্থ, গত একশ বছর ধরে এ অভিধানের ঐতিহ্য। একে সচরাচর ওয়েবস্টার বলা হয় এবং উপস্থিত "Webster's Seventh New Collegiate Dictionary" নাম দিয়ে কলকাতার রাস্তাঘাটে জলের দরে বিক্রী হচ্ছে—আমার হিসেবে যার দাম হওয়া উচিত ৬০/৭০ টাকা, বিক্রী হচ্ছে সেটি দশ টাকায়—চেষ্টা-চরিত্র করলে পাবেন আট টাকায়। এ-অভিধান অবহেলা করার মত কেতাব নয়। এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা বলেন, "অভিধানের ইতিহাস লিখতে গিয়ে এ-অভিধানের উল্লেখ না করলে সে-বিবরণী অসম্পূর্ণ থেকে যায়" এবং "কনসাইস অক্সফর্ড" যে পাঁচখানি "বেসট্‌ মর্ডান ডিকশনারির" কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন তার মধ্যে ওয়েবস্টার রচিত কোষ অন্যতম। এইবারে দেখি ইনি কি বলেন। প্রথমেই দেখা যাচ্ছে, ইনি ঈষৎ ধর্মভীরু, কারণ "লাভ" শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "পিতার ন্যায় ঈশ্বর মানব সন্তানের জন্য যে মঙ্গল-চিন্তা করেন ('উদ্বেগ ধরেন'ও বলা যায়, কারণ ইংরিজিতে আছে "ফাদারলি কনসার্ন")। অক্সফর্ডে ভগবান নেই—না, না—আমি বলতে চাই, অক্সফর্ড অভিধানে "লাভ" শব্দ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সঙ্কলনকারী মানুষের প্রতি ঈশ্বরের, কিংবা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালোবাসার উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি কিংবা এই "কুসংস্কারে" বিশ্বাস করেন নি। তা সে যাই হোক, সেই ধর্মভীরু ওয়েবস্টার "লাভ" শব্দের নানা অর্থ দিতে গিয়ে (কেউ কেউ যে ঈশ্বরের প্রতিশব্দরূপে "লাভ" ব্যবহার করেন সেটাও বলেছেন) লিখছেন "যৌন আলিঙ্গন" এবং সেটা বোঝাতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপিটাল অক্ষরে লিখছেন, "COPULATION" অর্থাৎ "মৈথুন" যৌন "সঙ্গম" এবং যে "টু মেক লাভ" নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেছিলুম তার বেলা ইংরেজের মত বিস্তর ধানাই-পানাই না করে, আশকথা পাশকথা (বীট অ্যাবাউট দি বুশ) না ঝেড়ে, এর ঘাড়ে ওর কাঁধে আপন বোঝা না চাপিয়ে একদম এক ঘায়ে সোজাসুজি উত্তর দিচ্ছেন : 'টু এনগেজ ইন সেক্‌সায়েল্‌ ইন্টারকস।"

অবশ্য বলতে পারেন, ওয়েবস্টার অভিধান মূলত মার্কিন অভিধান। এর উত্তরে নিবেদন : (১) এ-অভিধান আমেরিকায় প্রকাশিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই এর বিলিতি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং এখনো যে সব ইংরেজ উন্নাসিকতা অপছন্দ করেন (আমি নেটিব ঘৃণা করি) তাঁরা এ-অভিধানই ব্যবহার করে থাকেন; (২) কনসাইজ অক্সফর্ড বহুস্থলে বিশেষ বিশেষ ইংরিজি শব্দ মার্কিন মুল্লুকে যে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয় তার উল্লেখ করেন; এ-স্থলেও করলে পারতেন; (৩) আমি ভুরি ভুরি ইংরেজ-লিখিত গল্প-উপন্যাসে এর ব্যবহার পেয়েছি। কিন্তু "স্ক্রু" পাইনি, এবং ওয়েবস্টারেও শব্দটা নেই কারণ শব্দটা এখনো গ্রাম্য; (৪) এবং সর্বশেষ বক্তব্য, ওয়েবস্টার মার্কিন দেশগত বলে যদি তাকে অস্পৃশ্য বিবেচনা করতে হয় তবে এ-অভিধানখানি এ-দেশের গুণীজনের আশীর্বাদ লাভ করলো কি প্রকারে? কারণ গ্রন্থ-পরিচিতিতে স্পষ্ট ছাপা আছে।

Published with the assistance of Joint Indian-American Text Book Programme"

এ-বিষয়ে এতখানি লেখবার কারণ কি? গত সপ্তাহে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, কচর কচর আর করবো না, কিন্তু আমার কপাল মন্দ, তার দু-দিন পরেই এক সদ্য বিলেতফেরতা তরুণের সঙ্গে মোলাকাৎ। ছেলেটি ভালো, কিন্তু বিলিতি মোহ ঝেড়ে ফেলতে এখনো

তার ঢের সময় লাগবে। তখন হঠাৎ আমাকে স্ট্রাইক করলো, কে যেন বলেছিল, বিলিতি স্নবারি স্বরাজ লাভের পর আদৌ কমেনি, বরঞ্চ বেড়েছে। যে-সব ছেলেছোকরারা আমার লেখা পড়ে আমাকে সম্মানিত করে অন্তত তারা যেন অক্সফর্ড বলতে ভিরমি না যায়, রকবাজি গুলমারার সময় খোদার-খামোখা বিলিতি স্নবারির "চিত্রিত গর্দভ" না হয় তাই এত সব বলতে হল, অন্যান্য—যথা "বিদেশের" বর্তমান অনুচ্ছেদ প্রধানত সেক্স নিয়ে—সেগুলো পূর্বেই নিবেদন করেছি। অভিধান নিয়ে আলোচনা করে স্পষ্ট বোঝা গেল, ইংরেজ ভাজে ঝিঙে, বলে পটল।

ড্যুক অব বেডফর্ড জন ভণ্ডামি সম্বন্ধে যা বলেছেন তার অনেকখানি সর্বদেশে সর্বকালেই থাকে—তবে কোনো কোনো দেশে চক্ষুলজ্জাটার বাড়াবাড়ি কোনো কোনো দেশে কম। কোনো ফরাসী যখন সমাজে সম্মানিতা কোনো মহিলাকে প্রণয়িনীরূপে গ্রহণ করে তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে সেটা গোপন রাখার কোনো প্রয়োজন বোধ করে না, কিন্তু বিলেতে ঠিক তার উল্টো—অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্জনীয়। এবং অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজ তার "ভাব-ভালোবাসাটা" এমনই নিরন্ধ্র গোপন রাখতে সক্ষম হয় যে মহিলাটিও তার ডবল সুযোগ নেবার পথটা নিজের থেকেই দেখতে পান। জন সাহেব একটি সত্য ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, একটি প্রখ্যাতা মহিলা (এই গোপনীয়তার সুযোগ নিয়ে) সমাজের অতি উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত দুজন অভিজাত জনের সঙ্গে একই সময়ে প্রণয়লীলা চালালেন। কথায় বলে ডান হাতের কারবার বাঁ হাত জানে না—নটবরদ্বয়ের একজনও জানতেন না, মহিলাটি দুজনার এজমালি রক্ষিতা। মহিলাটি যে-সব কেনাকাটা করতেন, তাঁর খরচাপাতি যা হত তার প্রত্যেকটি বিল তিনি দোকানীর কাছ থেকে ডুপ্লিকেটে চেয়ে নিতেন এবং আমাদের চৌকশ শেয়ালের একই কুমিরছানা দু-দুবার দেখাবার কায়দায় দুই মহাশয়ের সামনে পেশ করতেন। মাগ্যি-ভাড়ায় ছিমছাম যে-বাড়িটিতে বাস করতেন তার ভাড়াও গুণতেন দুই হুজুরই। বলা বাহুল্য, হাফাহাফি নয়, পুরোপুরিই—কারণ প্রেমের বখরাদার আছে সে তথ্যটি না জানলে ভাড়ার বখরাদার জুটবে কোত্থেকে? কিন্তু তাবৎ কেচ্ছার মধ্যে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ব্যাপার : বেশ অনেক বৎসর ধরে উভয়েই কাচ্ছাবাচ্চাগুলোর জনকরূপে গণ্য হতেন।

এখানে আমি পড়েছি বিপদে। কার কাছে গণ্য হতেন? ধরে নিচ্ছি তালেবর মহিলাটি সযত্নে দুই প্রস্থ বন্ধুবান্ধব বেছে নিয়েছিলেন যাদের এক প্রস্থ অন্য প্রস্থকে চিনতেন না। দুই প্রস্থকে দুই নাগরের নাম দিতেন। কিংবা হয়তো ড্যুকের চিন্তাধারা আদৌ সেদিকে যায়নি। তিনি বলতে চেয়েছেন, দুজনাই ভাবতেন, বাচ্চাগুলো তাঁরই। কিন্তু তবু শেষ প্রশ্ন থেকে যায়, বাচ্চাগুলো ভাবতো কি? তারা ঠিক যে রকম জানে, এক জোড়া জুতোতে দুটো জুতো থাকে ঠিক সেই রকম মেনে নিয়েছে একই বাড়িতে দুটো বাপ আনাগোনা করে! পাঠক জানেন, আমার কল্পনাশক্তি বড়ই অনুর্বরা। আপনারাই না হয় এ সমস্যাটি সমাধান করে নিলেন।

এবং সর্বশেষ জন বলেছেন, দু-দুজন নাগরের কাছ থেকে প্রেম, আত্মনিবেদন, প্রশস্তি-গীতি, আসঙ্গসুখ-লাভ করে, সমাজের দু-দুটো হোমরাও সিং চোমরাও খানকে আস্ত দুটো বোকা ম্যাড়ার মত আঙ্গিনার খুঁটিতে বেঁধে রেখে তিনি যে তাঁর আত্মশ্লাঘা বাড়াতে চেয়েছিলেন তা নয়, তিনি সব-কিছু করেছিলেন সুদ্ধুমাত্র পৌন্ড শিলিং পেন্সের জন্য।

ফ্রান্সে তো এসব নিত্যদিনের ডাল ভাত। রীতিমত একটা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না, জনও আমাদের বলছেন, পৃথিবীর আর সর্বত্র যা ঘটে থাকে, বিলেতে তাই ঘটে, তবে, সায়েবরা এ সব বাবদে উচ্চবাচ্য করেন না।

কিন্তু জন যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিলেত তথা তাবৎ কন্টিনেন্টের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন আপন মতামত প্রকাশ করেন, কিংবা যখন নীরব থাকেন, অথবা কোনো প্রকারের উপদেশ দেওয়া থেকে নিরস্ত থাকেন, সবক্ষেত্রেই তাঁর বৈশিষ্ট্য আছে। তারই একটা পরিস্থিতির উল্লেখ তিনি করেছেন বড় বে-আব্রু ভাষায়। আমি সেটা মামুলী ঢঙে পেশ করি। বলছেন, "কোনো হাউস পার্টিতে (অর্থাৎ যেখানে উইক এন্ড কাটাতে হয়) যদি তুমি সুযোগ পেয়ে গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে কিংবা কোনো বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে মাত্রাধিক প্রেম করে ফেলো তবে সে-গেরো থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করো—অবশ্য যতখানি পারো ভদ্রতা বজায় রেখে। বলা বাহুল্য, অতিশয় চতুরতাসহ। কারণ কোনো মহিলারই হৃদয়ানুভূতিতে আঘাত হানা অনুচিত। কিন্তু হায়, ইহসংসারে সব গেরো তো আর এড়াতে পারা যায় না।"

এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, পরিস্থিতিটা জন-এর মনঃপূত নয়। কিন্তু তিনি তাঁর দেশবাসীর তথা বিশ্বজনের মনোবৃত্তি ভালো করেই জানেন বলে লম্বা লেকচার ঝেড়ে সদুপদেশ দেন নি। তাঁর নীববতা বহু ক্ষেত্রেই হিরণ্ময়।

॥৩৬॥

যুদ্ধ ব্যাপাবটা কি তার সঙ্গে আমাদের সামান্য কিছু কিছু পরিচয় হচ্ছে। ভালোই। না হলে অবশ্য আরো ভালো হত। ভবিষ্যতে, কখনো, কস্মিনকালেও হবে না সে-ভরসা যদি কার্তিকেয় দিতেন তবে হত সবচেয়ে ভালো। কিন্তু চতুর্দিকে যে হালচাল দেখছি তাতে তো মনে হয়, বর্তমান যুদ্ধটা ঝটপট শেষ হোক বা রয়ে-সয়েই শেষ হোক, এটাই শেষ যুদ্ধ নয়। আরেকটা মোক্ষমতর লাগবে। কবে লাগবে? সঠিক কেউ বলতে পারবেন না, তবে কোনো মস্তান যদি আমাব কানের উপর পিস্তল বসিয়ে "না বললে নিষ্কৃতি নেই" রবে হুঙ্কার ছাড়ে তবে বলবো, বছর পঁচিশেকের ভিতর। কেন. কাতে কাতে, এসব প্রশ্নের উত্তর কিন্তু দেব না। আমি শুধু ভবিষ্যদ্বাণীটি করে রাখলুম এবং আজ-দিনের যে-সব নাবালক নিতান্ত আর কিছু না পেয়ে আমার এ-লেখাটি পড়েছে তারা যেন সেদিন আমাকে স্মরণে আনে—অবশ্যই প্রাণভরে অভিসম্পাত দিতে দিতে। কারণ, ততদিনে আমি ইহলোকের ডাঙাকে এক লাথি মেরে পরলোকের নৌকোয় বসে ভরা পাল তুলে বৈতরণীর হেপারে।

যুদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি উত্তম এ-কথা কোনো সুস্থ ব্যক্তি বলেছেন বলে শুনিনি, বরঞ্চ বহু বহু বিজয়ী বীর যুদ্ধের অজস্র নিন্দা করে গেছেন। তবে একটা বিষয়ে যুদ্ধের কি শত্রু কি মিত্র সকলেই অকুণ্ঠ প্রশংসা করে গেছেন। যুদ্ধের সময় অতি সাধারণ মানুষও প্রায়ই এমন সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বার্থত্যাগ, দেবদুর্লভ পরোপকার করে থাকে, পরের জন্য অশেষ ক্লেশ সহ্য করে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করে নেয় যে তার সামনে বহু রণের বিজয়ী বীর নেপোলিয়ন-সম্প্রদায় পর্যন্ত অবনত মস্তকে স্বীকার করেন যে ঐ সাধারণ জনের অসাধারণ কীর্তির কাছে তাঁদের লক্ষ রণজয় তুচ্ছ।

তারই একটা উদাহরণ লটে আমার সামনে পেশ করেছিল : তার উল্লেখ প্রকাশিত প্রবন্ধ বা পুস্তকে কোথাও আমি পাইনি, লটেও পায়নি।[১] কাহিনীটি পড়া সমাপ্ত করে পাঠক হয়তো কিছুটা নিরাশ হবেন। ইংরেজ এ-স্থলেই বলে থাকে : "নাথিং টু রাইট হোম অ্যাবাউট"—"চিঠি লিখে বাড়িতে জানাবার মত এমন কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়।" আমি কিন্তু তবু জানাচ্ছি, তার কারণ প্রথমত দুশমন ইংরেজ যা করে না করে তার উল্টোটা করতে পারলে আমার জানটা বড় খুশ হয়। দ্বিতীয়ত ঘটনাটির নায়ক আমার পরিচিত। নাতিদীর্ঘ আট বছরের পরিচয়—সেটা দীর্ঘতর হবার সুযোগ কেন পেল না সেইটেই আমি "রাইটিং হোম এবাউট"।

লটে বললে, "উইলিকে তো চিনতে নিশ্চয়ই ভালো করে চিনতে—তোমাদের সেমিনারের হাউসমাস্টার?"

আমি বললুম, "বন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পীরমুরশিদ চিনতেন না তাকে? এস্তেক সেমিনারের বড়কর্তা প্রফেসর ডকটর পাউল কালে পর্যন্ত উইলির বাক্যস্রোত চট করে থামাবার চেষ্টা করতেন না।"

এস্থলে কাহিনীর প্রথম অংশটা আমাকেই বলতে হবে। উইলির সঙ্গে লটের পরিচয় —বরঞ্চ বলা উচিত ফ্রাউ উইলির সঙ্গে লটের পরিচয় হয় অনেক পরে। বিশেষত, অন্তত দুটি বছর তার সঙ্গে আমাকে মুখোমুখি হতে হত প্রতিদিন পাঁচ দশবার। তার পদবী ছিল "হাউস মাইস্টার"। "মাইস্টার" শব্দের অর্থ জর্মনে যদিও "মাস্টার" তবু "হাউস-মাইস্টার" বলতে "হাউস মাস্টার" বা বর্ডিং স্কুলের শিক্ষক বোঝায় না। হাউস-মাইস্টার কোনো বাড়ি বা আফিসের দেখ-ভাল করে। একে দরওয়ান বলা চলে না। বরঞ্চ ইংরিজেতে 'হাউস-কীপার' বলা চলে, ফরাসীতে ইনিই 'কাঁসিয়ের্জ' নামে পরিচিত।

উইলি, তোলা নাম ভিলহেলম, সেমিনার বাড়িটা ফিটফাট ছিমছাম রাখত সে-কথাটার বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সেন্ট্রাল হীটিঙে, উনিশ-বিশ, মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ফোটোস্টাট করার জন্য ডার্করুমের পর্দা থেকে আরম্ভ করে সূক্ষ্মতম যন্ত্রপাতিতে এক কণা ধুলো পড়ে থাকতে কেউ কখনো দেখেনি। কোনো একটা ট্যাপের ওয়াশার বিগড়ে যাওয়াতে সেটার থেকে পিটির পিটির জলের ফোঁটা ঝরছে, এহেন গাফিলতী কেটে কখনো দেখাতে পারলে, হাউস-মাইস্টার উইলি যে তন্মুহূর্তেই এক ছুটে রাইন ব্রিজের উপর পৌঁছে সেখান থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতো সে-সত্য সম্বন্ধে আমাদের কারো মনে ধূলিপরিমাণ সন্দেহ ছিল না।

---

(১) "অসংখ্য রতনরাজি বিমল উজ্জ্বল
খনির তিমির গর্ভে রয়েছে গভীরে
বিজনে ফুটিয়া কত কুসুমের দল
বিফলে সৌরভ ঢালে মধুর সমীরে।'

গ্রে-র কবিতা থেকে এই অংশানুবাদ বছর চল্লিশ পূর্বে এতই মুখে মুখে প্রচারিত ছিল যে কেউ সেটা ছাপালে পাঠক সম্প্রদায় বিরক্তিভাবে অবজ্ঞাও প্রকাশ করতো না। আজ সে যুগের পাঠক, বৃদ্ধরা পুরনো দিনের স্মরণে দু-চোখের জল ফেলছেন, তরুণরা হয়তো পড়বেনই না— আদৌ 'মডার্ন' নয়।

সেমিনার বাড়ির পাশে ছোটো একটি দোতলা বাড়ির উপরের তলায় ছিল মাইস্টার উইলির কোয়ার্টার। সেখানে সর্বাধিকারিণী ছিলেন তাঁর বীবী। গাব্দাগোব্দা শরীর, হাসিভরা মুখ—নসিকে টিপিকাল জর্মন হাউস-ফ্রাউ। বয়স চল্লিশের মত হবে, কিন্তু উইলিকে দেখে ঠাহর করা যেত না তার বয়স কত হতে পারে। সেমিনারের সবচেয়ে পুরনো কর্মী বলতেন, পনেরো বছর ধরে তাকে ঐ একই চেহারায় দেখেছেন। সর্বাঙ্গে সর্বত্র অনেকগুলো ছোট ছোট সাইজের মাসল ছড়ানো; ছোট ছোট সাইজের কারণ আর পাঁচটা জর্মনের তুলনায় উইলি ছিল রীতিমত বেঁটে।

সেমিনার পূর্ণসিদ্ধ অর্ধসিদ্ধ পণ্ডিতে পণ্ডিতে ভর্তি, আর জনা পাঁচেক সুপ্রাচীন অর্ধপ্রাচীন অধ্যাপক। সর্বশেষে ডক্টরেটের থিসিস লেখাতে ব্যস্ত আমরা কয়েকজন তো ছিলুমই। আমার মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগতো, এত সব পণ্ডিত আর এঁদের দিনের পর দিন একটানা বিদ্যাচর্চা—দিনে দশ ঘণ্টা খাটা সেমিনারের ডাল-ভাত—এসব দেখে দেখে পাণ্ডিত্যের প্রতি উইলির মনোভাবটা ছিল কি? কাউকে যে বড্ড বেশী একটা সমীহ করে চলতো, উইলির ধরনধারণ দেখে সেটা তো মনে হত না। তাকে কোনো দিন খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়তে দেখি নি। আমি তার কোয়ার্টারে বহুবার গিয়েছি, কারণ আশপাশের কাফের তুলনায় উইলির বউ আমাদের জন্য কফি বানিয়ে দিত ঢের সস্তায়। আমাদের সময়াভাব তাই তার ব্লিৎস সার্ভিস উপেক্ষা করে খুদ কাফেতে যাওয়াটা আমরা নিছক থার্ডক্লাস স্নবারি চালিয়াতি বলে মনে করতুম। সেমিনারের জানলা দিয়ে ফ্রাউ উইলিকে শুধু আঙ্গুল তুলে দেখাতে হত ক-কাপ ক-পট কফি চাই। রেকর্ড টাইমের ভিতর ফ্রাউ উইলি ডাইনে বাঁয়ে দুলতে দুলতে ট্রেতে করে কফি নিয়ে উপস্থিত। আমি কিন্তু সোজা ওদের ঘরে গিয়ে কফি খেতুম—কি হবে ওই ফুল স্লিম (গাব্দাগোব্দার ভদ্র ইংবিজি প্রতিবাক্য) ফ্রাউকে সিঁড়ি ভাঙতে দিয়ে। সেখানে একদিন লক্ষ্য করলুম, ঘরে মাত্র একখানা বই—বাইবেল। বহু ব্যবহৃত। আমি জানতুম, ক্যাথলিক জনসাধারণ সচরাচর বাইবেল বড় একটা পড়ে না—তারা তাদের "উপাসনা পুস্তিকা" নিয়েই সন্তুষ্ট, গির্জেয় যাবার সময় ঐ বই-ই সঙ্গে নিয়ে যায়। কথায় কথায় শুধালুম বাইবেলখানা পড়ে কে? উইলি। এবং একখানা বই ছাড়া অন্য কোনো কেতাব ছোঁয় না। তাই তো। সমস্যাটা একটু তলিয়ে দেখতে হয়।

সেমিনার খোলা থাকতো সকাল আটটা থেকে রাত দশটা অবধি। জবরদস্ত গবেষকরাও রাত আটটার সময় বাড়ি গিয়ে আর বড় একটা ফিরতেন না। কিন্তু আমার তখন "গৃহিত্বৈব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ" মৃত্যু যেন তোমার চুল পাকড়ে ধরে আছেন এই ভাবে ধর্মের আচরণ করবে। ধর্ম মাথায় থাকুন, মাথার উপরকার কেশ পাকড়ে ধরে আছেন আমার ট্যাঁক। সোজা বাঙলায় কইতে গেলে, ইংরেজ যে সত্যি বেনের জাত সেটা সপ্রমাণ করলো আমার শেষ কপ্পীনখানা কেড়ে নিয়ে একদিন বিলকুল মিন নোটিশে—গোলড স্ট্যান্ডার্ড বর্জন করে। আদাজল খেয়ে যে কড়ি ক'টা জমিয়েছিলুম —আরো ছটি মাস জর্মনিতে বাস করে রয়েসয়ে আমার "গব্বযন্তনা" থীসিসখানা নামাব বলে, তাদের উপর বমিং হয়ে গেছে। গোলড় স্ট্যান্ডার্ড নাকচ হওয়ার ফলস্বরূপ হঠাৎ একদিন দেখি আমার ট্যাঁকের তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় চটসে দুকড়ি চাটুয্যেতে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছেন। অতএব আর মাত্র দুটি মাসের ভিতর যদি সেই লক্ষ্মীছাড়া থীসিসটা শেষ করে, তিন-তিনটি ভাইভা পরীক্ষা পাশ না করতে পারি তবে শয়নং

যত্রতত্র ভোজনং হট্টমন্দিরে—তা-ই বা কি করে হয়, এই পাথরফাটা শীতের দেশে যত্রতত্র শয়ন করলে মৃত্যু অনিবার্য এবং বন শহরের হাটবাজারে ভিখিরিকে দিনান্তে খয়রাতি এক পেলেট সুপ দেবার ব্যবস্থাও নেই—ফ্যুরার হিটলার ভিয়েতন তেথার বরাতে একদিন যমরাজকে ফাঁকি দিতে পেরে অন্য "পুণ্যভূমিতে" পরজন্ম লাভ করলেন। তাই তখন প্রাণপণ রেস দিচ্ছি টাইমের সঙ্গে। সকাল, বিকেল পাঁচ পাঁচ দশ ঘণ্টা কাজ করার পরও মাঝে মাঝে আলুসেদ্ধ মাখম রুটি দিয়ে "ব্যানকুয়েট" সেরে রাত সাড়ে আটটায় আরেক প্রস্ত সেমিনার যেতুম। কিন্তু আমার ওয়াটারলু ছিল অন্যত্র। সেটা এতক্ষণ পেশ করিনি, কারণ অধিকাংশ শ্যানা পাঠকই সেটা আমার লেখক-জীবনের প্রথম প্রভাতেই জেনে গিয়েছেন; নিতান্ত যাঁরা জানেন না তাঁদের বলি লেখাপড়ায় আমি চিরকালই ছিলুম বিংশ শতাব্দীর এক নবকালিদাস যিনি মা সরস্বতীর কৃপালাভ কস্মিনকালেও কামনা করেননি এবং দেবীও অহেতুক তাঁকে দর্শন দেননি। সাদামাটা ভাষায় বলতে গেলে কেতাবপত্র দেখলেই আমার গায়ে জ্বর আসতো, ইস্কুল-বাড়িটা আমার কাছে শ্মশানমশানের লাগোয়া ওয়েটিংরুমের মত মনে হত এবং ক্যুয়েশচন পেপারের উপর চোখ বুলুতে না বুলুতেই পরীক্ষার হলে কতবার যে ভির্মি গিয়েছি সেটা আমাদের শহরের এমবুলেনস তাদের রেকর্ডরূপে সযত্নে লোহার সিন্দুকে পুরে রেখেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কি করে, কোন্ দুষ্টগ্রহের তাড়নায় যে আমি বন শহরে ডক্টরেট নেবার জন্য এসেছিলাম সেটা গোপন রাখতে চাই—পাঠক অযথা খোঁচাবেন না।

কাঁটায় কাঁটায় রাত দশটায় মাইসটার উইলি এসে আমাকে হুনো লাগিযে একখানা লেকচার ঝাড়তো। রাইনল্যান্ডের গাঁইয়া ডাএলেক্টে। সে-ভাষা বোঝে কার সাধ্যি? সেমিনারের নমস্য পণ্ডিতগণ তো কানে ডবল আঙ্গুল পুরতেন। আমি যে অক্লেশে বুঝতে পারতুম তার একমাত্র কারণ আমার দিনযামিনী কাটতো—এই শেষের কমাস ছাড়া—শহরের বেকার, ফোকটে পয়সা মারায় তালেবর, ঘাঘরা-পল্টনের তাঁবেদার মস্তানদের সঙ্গে। তারা গ্যোটে শিলারের ভাষায় কথা কয় না। কিন্তু থাক সে পুবনো কাসুন্দো।

সে লেকচারের সাবাংশ : "কি হবে, হে, ছোকরা অত নেকাপড়া করে? দুটো প্যাখনা গজাবে বুঝি? ঢের ঢের বাঘা বাঘা পণ্ডিতকে তো এই হাতের চেটোতে চটকালুম, বাওয়া, অ্যাদ্দিন ধরে! কি পেলুম ক দিকনি, তবে বুঝি তোর পেটে কত এলেম। বলি—কান পেতে শোন, আখেবে ফয়দা হবে, তাই ভাঙিয়ে খাবি। এই যে হেথায় কেতাবে কেতাবে চতুদ্দিক ছয়লাপ, ওদেরই মত ওরা খসখসে শুকনো—বুঝলি, শুকনো। রসকষের নামগন্দো নেই। বাড়ি যা, বাওয়া বাপের সুপুত্তুর—দু-গেলাস বিয়ার স্যাঁটস্যাঁট করে মেরে দে। গায়ে গত্তি লাগবে। জানটা ত-র্-র্-র্ হয়ে যাবে, চোখের সমানে গুল-ই-বাকওয়ালীর পাল ফটফট করে ফুটে উঠবে—"

আমি পকেট থেকে একটা সস্তার চেয়েও সস্তা সিগার বের কবলুম। ওদেশে সেটাকে 'রেট কিলার' 'মূষিক নিরোধ' খেতাব দেওয়া হয়। কিছু না, রান্নাঘরে ওবই এক টুকরো রেখে দিন। আর দেখতে হবে না—পরের দিন গণ্ডাখানেক মড়া ইঁদুর ঘরে বাইরে পেয়ে যাবেন। ঐ "সিগারে" বার দুই ঠোক্কর মেরেই ওক্কা লাভ করেছেন। এই সোনার শহর কলকাতাতেও বিড়িওলার কুটুরিতে ব্লেক-আউটের মধ্যিখানেও সে দিব্য মূর্তমান। আমার

এক মিত্র আকছারই ঐ মাল আমাকে রূপোর কেস থেকে বের করে সাড়ম্বর প্রেজেন্ট করে—জানিনে কোন্ দুরাশায়।

উইলির দিকে এগিয়ে দিয়ে সিরিয়াস গলায় বলতুম, "পাক্কা বাকিংহাম পেলেসের সিগার। বহুকষ্টে তোমার জন্য পাচার করিয়েছি। লাও, হলো তো?"

উইলি পুনরায় সেই ধুয়ো ধরে, "কি যে হয় নেকাপড়া করে"—বিড়বিড় করতে করতে চলে যেত এক পণ্ডিতের কামরায়। সেখানে লেকচার না ঝেড়ে চাবির গোচ্ছাটা শুধু ঝমঝমাতো।

উইলি আর ঘণ্টা দেড়টাক তাড়া দিতে আসতো না।

কে বলে সাধু জর্মন মুল্লুকে ঘুষের মত লুবরিকেনট ভাদ্রবধূ?

তবে হ্যাঁ, বলে রাখা ভালো, উইলি সিগারটার সওগাৎ প্রতিবারে নিত না। না নিলে ও আমার ম্যাদ বাড়াতো, নিত্যি নিত্যিই।

॥৩৭॥

অর্ধশিক্ষিত বহু মার্কিন যে একটিমাত্র জর্মন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতির কথা শুনেছে সেটি বন শহরে প্রতিষ্ঠিত। এবং সে-খ্যাতির জন্য চোদ্দ আনা শিরোপা পায় ওই বিশ্ববিদ্যালয়েব যে-বিভাগ তবো-বেতোবো ভাষা শেখায়—প্রাচীন মিশরীয় বাবিলনীয়, বৈদিক সংস্কৃত থেকে আরম্ভ করে অদ্যদিনের মডার্ন জাপানী পর্যন্ত—তার নাম ওরিয়েন্টাল সেমিনার। এখানে দুনিয়ার কুল্লে রকমের ঝোপ থেকে নানান রঙের চিড়িয়া আসে হরেক রকমের বুলি শেখার তরে এবং মাঝে মধ্যে অধ্যাপকরা যখন সেমিনারে অনুপস্থিত, তখন যা কিচিরমিচির লাগায় তাতে ধ্বনিশাস্ত্রের জানা-অজানা কোনো আওয়াজই বাদ যায় না। ওদিকে মার্কিনদেশের বাসিন্দাদের জাত আগাপাস্তলা সাতান্ন জাতের জগাখিচুড়ি দিয়ে তৈরী। তাই তাবা আসে বন শহরে, আর অনেকেই জর্মন দেশের সেবা সেই সেমিনারে বসে পড়ে আপন আপন মাতৃভাষায় খববের কাগজ। অনেকটা সেই কাবণেই সেমিনারের কাছেই ছিল একটি খবরের কাগজের হরবোলা কিয়োসক্। আমরা উইলিমাস্টারকে কাছে পেলে তার হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে বলতুম, "ফেরাব সময় আমার জন্য সেই খবরের কাগজটা এনে দেবে তো?" "সেই" বলার কারণ ওস্তাদ উইলি পৃথিবীর তাবৎ ভাষা উচ্চারণ করতো তার আপন নিজস্ব মৌলিক গাঁইয়া রাইন উচ্চাবণে। আমি স্বকর্ণে শুনেছি, সেমিনারের সর্বাধিকারী খুদ ডিরেকটর সায়েব উইলিকে বললেন একখানা "টাইম্‌স্" নিয়ে আসতে। উইলি এক সেকেন্ড চিন্তা করে বললে, "ও! 'টে টিমেস্'?" THE TIMES-এর THE জর্মন ভাষায় আইনানুযায়ী উচ্চারিত হয় 'টে' এবং TIMES উচ্চারিত হবে 'টিমেস'। ধ্বনিতত্ত্বের বাঘা পণ্ডিত অধ্যাপক মেনজেবাটের গুরুরও সাধ্য নেই যে লাতিন অক্ষরে লেখা শব্দ তা সে জর্মন হোক, ইংরিজি হোক বা সাঁওতালীই হোক, জর্মন উচ্চারণে যদি পড়তে হয় তবে মাস্টার উইলির উচ্চারণে খুঁৎ ধরেন। ভূরি ভূরি উদাহরণ দিয়ে ভাষা বাবদে আমার মত মূর্খও সপ্রমাণ করতে পারবে যে মাইস্টার উইলি আমাদের সেমিনারের লেকচারার হ্যারৎসিগেনশ্‌পেকের (নামটা শুনুন স্যর! শব্দার্থ 'ছাগলের চর্বি') যখন অতিশয় ধোপ-দুবস্ত সুমধুর উচ্চারণ সহ 'রাজসিক' জর্মন বলতেন তখন উইলি উপস্থিত থাকলে তার

মুখে স্পষ্ট দেখা যেত সে যেন প্রচ্ছন্ন কৌতুক অনুভব করছে। এমন কি যখন প্যারিস, ভিয়েনা, অক্সফোর্ড, হারভার্ডের ইয়া বড়াব্বড়া দাড়িওলা বাঘা বাঘা প্রফেসর পণ্ডিতরা আমাদের সেমিনারে এসে এ দেশের সিণ্ডিমার্কা বিদ্যেবাগীশদের সঙ্গে "একটি একটি কথা যেন সদ্য-দাগা কামান" ঝেড়ে যে তুমুল বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি করতেন আর উইলি মেস্টার একপ্রান্তে ভুরভুরে খুশবাইয়ের ম-ম-মারা কফি সাজাতো তখন তার চেহারা দেখে দিবান্ধ-জনও সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতো, উইলি একটি সাক্ষাৎ পরমহংস : মিঞা-মৌলানাদের বাক্যবর্ষণের ঝরঝর বারিধারা তার রাজহাঁসের পালকের উপর পড়ামাত্রই সঙ্গে সঙ্গে ঝরে যেতো। পাঠকমাত্রই অবশ্য এসব শুনে বলবেন, বড় বড় পণ্ডিতদের যুক্তিতর্কে ভরা আলাপ-আলোচনা উইলি বুঝবে কি করে? কাজেই তার পক্ষে ঐ প্রতিক্রিয়াই তো স্বাভাবিক। উত্তরে বলি, প্রবাদ আছে, "কাজীর বাড়ির বাঁদীও দু-কলম জানে।" তা জানুক আর না-ই জানুক, এ-সব ক্ষেত্রে বহুলোক দু-পাঁচটা লবজো কুড়িয়ে নিয়ে স্নবের ন্যায় বিদ্যে জাহির করে। কিন্তু এহ বাহ্য : স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুরকে স্মরণে এনে তাঁরই আপ্তবাক্যের পুনরাবৃত্তি করি : প্রকৃত সভ্যতার উপলব্ধির জন্য বিস্তর লেখাপড়া করতে হয় না, কেতাবপত্র ঘাঁটতে হয় না।...এই যে সেদিন কুষ্ঠিয়া অঞ্চল রাহুমুক্ত হল, সেই অঞ্চলের গাঁইয়া লালন ফকিরের গীত নিয়ে কবিগুরু থেকে আরম্ভ করে যে সব তত্ত্বান্বেষী সজ্জন আলোচনা করেছেন তাঁরা সকলেই দ্বিজেন্দ্রনাথের আপ্ত-বাক্যটিকে বার বার নমস্কার জানিয়েছেন।

সে-কথা যাক। আমার মনে কিন্তু একটা ধোঁকা ছিল। উইলি যদি সত্যই পাণ্ডিত্য বাবদে এতই উদাসীন হয় তবে সে আমাদের জন্য বই যোগাড় করার বেলা এত তুলকালাম কাণ্ড করে কেন? প্রয়োজনমত আমরা তাকে সকালবেলা যে-সব পুস্তক ধার চাই তার একটা ফর্দ দিতুম। সেইটেই নিয়ে সে যেত বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেবিতে। এবং ফিরে এসে করিডরে ঢুকতে না ঢুকতে প্রায়ই শোনা যেত তার উচ্চ কণ্ঠস্বর;—অর্থ, কয়েকখানা বই সে পায়নি। আমাদের কেউ কেউ তাকে কখনোসখনো বোঝাবার চেষ্টা করেছি, সব সময় সব বই পাওয়া যায় হেন লাইব্রেরি ইহসংসারে নেই। আমি স্বয়ং একদিন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলুম, "ও-বই না পেলেও আমার কাজ আটকাবে না।" উইলি মাস্টার গরগর করে বলেছিল, "আটকাবে কেন? বই না হলে কি সংসার চলে না? বই লেখা না হওয়ার আগে কি সংসার চলে নি? ইত্যাদি ইত্যাদি।"

১৯৩২-এ পরীক্ষা পাশ করে দেশে ফিরলাম। ১৯৩৪-এ ফের বন শহবের সেমিনারে উইলির সঙ্গে দেখা। এবারে আমাকে সেখানে তিনবেলা খেটে মরতে হত না। কিন্তু উইলিকে প্রাচীন দিনের কায়দা অনুযায়ী মাঝে মাঝে একটা সিগার দিতুম। হিটলার তখন দেশের কর্ণধার। তার চেলাচামুণ্ডারা গরম গরম বুলি কপচাচ্ছে। প্রধান বুলি যুদ্ধং দেহি। কিন্তু আজ এই বঙ্গদেশে এখনো বারুদের গন্ধ যায়নি। ও-কথা থাক!

১৯৩৮-এ গবমের ছুটিতে বন শহরে পৌছেই গেলুম সেমিনারে—পথমধ্যে উইলির সঙ্গে দেখা। ততদিনে নাৎসি আদেশে প্রায় সবাই একে অন্যকে "হাইল হিটলার" বলে নমস্কার জানায়। "গুটেন মর্গেন" "গুটেন আবেনট্" উঠে যাওয়ার উপক্রম। অনেকটা যেন অভ্যাসবশত উইলিকে "হাইল হিটলার" বলে প্রীতি-অভিবাদন জানালুম। চার বছর পরে দেখা। উইলি সানন্দে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে কাছে এসে কেমন যেন বিষাদভরা গম্ভীর কণ্ঠে বললে, "তুমি তো, বাপু, বিদেশী। তুমি আবার 'হাইল হিটলার'

করছো কেন?" কথাটা সত্য। বিদেশীর পক্ষে এ-আইন প্রযোজ্য ছিল না।

বুঝলুম—অবশ্য আগেই অনুমান করেছিলুম—উইলি প্রচ্ছন্ন হিটলারবৈরী।

এইবারে লটে যেন আমার কাহিনীর খেই ধরে নিয়ে বললে, উইলি রাজনীতির বড় একটা ধার ধারতো না। কিন্তু যুদ্ধ লেগে যাবার পর তখন আর কোথায় রাজনীতি কোথায় কি? গোড়ার দিকে জয়ের পর জয়। চতুর্দিকে হর্ষধ্বনি। বৃদ্ধেরা হিসেব করে দেখালেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় এ-যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা নগণ্য। তাই সই। কিন্তু তখন কজন জানতো জঙ্গল থেকে পুরোপুরি বেরুবার পূর্বেই আনন্দধ্বনি ছাড়তে নেই : আরম্ভ হল জর্মনির উপর বোমাবর্ষণ। প্রথমটায় বড় বড় শহরের উপর। ওই সময় একদিন ব্ল্যাক-আউটের ঠেলায় আশ্রয় নিতে হল উইলি-পরিবারে। স্বয়ং উইলির তখন দম ফেলার ফুরসৎ নেই। হেথা-হেথা ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে, বুংকার বানাচ্ছে এবং তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেমিনার বাড়িটাকে যেন হিটলারের আবাসভূমি কিংবা বাকিংহাম প্রাসাদের চেয়েও সুরক্ষিত জিব্রল্টর-দুর্গে পরিণত করে ফেলতে পারে—সে একা, তার দুখানা হাত দিয়ে। স্বয়ং লর্ড মেয়ার থেকে আরম্ভ করে 'ভায়া' রেক্টর হয়ে, সেমিনারে সেই একটিমাত্র নাৎসি লেকচারার শ্র্যোডার এস্তেক সে সক্কলের সঙ্গে ঝগড়া-কাজিয়া কান্নাকাটি করে যোগাড় করেছে সেমিনারের বরাদ্দানুযায়ী প্রাপ্যের চেয়ে তিন ডবল মালমশলা; অষ্টপ্রহর বয়ে বেড়াচ্ছে বালির বস্তা, ইঁট সেমেন্টের ডাঁই।

লটে বললে, হ্যার উইলি ঘরে ঢুকলে মজুরদের এপ্রন গায়ে। সর্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত কর্দমাক্ত। কথায় কথায় আমি বললুম, "মার্কিনরা যত বুদ্ধুই হোক, ওরা তো জানে, বন য়ুনিভার্সিটি-টাউন, এখানে বন্দুক কামানের কারবার নেই বললেও চলে। এখানে বোমা ফেলে ওদের কি লাভ?"

উইলি একটু শুকনো হাসি হেসে বললে, "মার্কিনরা বন শহরটাকে ভালো করেই চেনে। এই সেমিনারেই কত মার্কিন এল গেল। ডকটরেট পাশ করলো বাইবেল নিয়ে কাজ করে। আমিও তো অন্তত জনাতিরিশকে চিনি। ওরাই আমাকে বলেছে, তাবৎ মার্কিন মুল্লুকে সবচেয়ে বেশী করে নাম-করা এই বন-এর য়ুনিভার্সিটি। কিন্তু লড়াইয়ের ব্যাপারে ওরা আকাট। আকাশ থেকে বন শহরটাকে সনাক্ত করবে প্যারিস বলে, ভিয়েনাকে ভাববে ইস্তাম্বুল। আর হাতের তাগ তো জানো। দুনিয়ার সবকিছু এক্কেবারে চাঁদমারীর মধ্যিখানের বুলস-আইয়ের মত বেধড়ক হিট করতে পারে—সব হিট করতে পারে, শুধু যেটাকে হিট করতে চায়, যেটাকে তাগ করেছে সেইটে ছাড়া! তাগ করবে বার্লিনের রাইষটগ, বোমা পড়বে বন-এর সেমিনারের উপর।"

লটে বললে, আমি জানতুম না উইলি দুরবস্থা দুর্দৈব নিয়েও পুটকারি করতে পারে। কিন্তু তার কথাই ফললো। ভগবান যে কখন কার মুখ দিয়ে কোন্ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়ে নেন কে জানে। এবং এখনো জানিনে কোন্ নিশানা তাগ করতে গিয়ে তারা লাগিয়ে দেয় সেমিনারের পাশের বাড়িতে আগুন।

উইলি তো প্রথম আপ্রাণ চেষ্টা দিল আগুনটা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে। যুদ্ধের শেষের দিক—শক্ত জোয়ানসোমথ মদ্দমানুষ কোথায় যে তাকে সাহায্য করবে; আগুন পৌঁছে গেল সেমিনার বাড়িতে।

তখনকার দিনের সেই ছেঁড়াখোঁড়া সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে অনেক আগেই উইলি বিস্তর মূল্যবান পুঁথিপত্র পাণ্ডুলিপি নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু

সেমিনারের নিত্যদিনের গবেষণাকর্ম পঠন-পাঠন সীলমোহর সেঁটে তো একেবারে বন্ধ করে দেওয়া যায় না—বিশেষ করে ছাত্রদের অসম্পূর্ণ ডক্টরেটের থিসিস অধ্যাপকদের পুস্তক। উইলি পাগলের মত দোতলা তেতলা উঠছে নামছে আর দু-হাতে জড়িয়ে ধরে সে-সব সেমিনারের দোরের গোড়ায় নামাচ্ছে। তার বউ সেগুলো দূরের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে।

সেমিনার বাড়ি তখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। সবকিছু পুঁথিপত্র কেতাব কাগজের ব্যাপার। পুরনো কেতাবে আবার আর্দ্রতা একেবারেই থাকে না। বারুদ পেট্রলের পরেই বোধ হয় তারা পুড়ে মরতে জানে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে।

উইলি তখনো ওঠানামা করছে।

উইলির বউ প্রতিবার স্বামীকে উপরে যেতে বারণ করছে। সেও প্রতিবার বলে, 'এই শেষবার, বউ। আর যাব না।"

কি আর বলবো।

উইলির বউ বলেছিল, হঠাৎ বাড়িটা যেন একসঙ্গে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল।

লটে রুমাল বের করে চোখের জল মুছল।

বললে, "জানো সায়েড, উইলির বউ আমাকে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিল, শেষবারের মত উইলি যখন তার বউকে বলে, এই তার শেষ ক্ষেপ, আর উপরে যাবে না, তখন তার গলায় এমন কিছু ছিল যার থেকে বউ বিশ্বাস করেছিল, এর পর আব সে উপরে যাবে না। সে তার কথা রেখেছিল—না? উপরে সে যায়নি—নাবেইনি যখন।

আরেকটা কথা আমার মনে বড় দাগ কেটেছে। উইলির বউ যেসব পাণ্ডুলিপি নিরাপদ জায়গায় এক ডাঁইয়ের উপর আরেক ডাঁই ডাম্প্ করেছিল সেগুলো পরে সরাবার সময় ধরা পড়লো উইলি 'ফার্স্ট প্রেফরেন্স্' দিয়ে সক্কলের পয়লা উদ্ধার করেছিল ছাত্রদেব অসমাপ্ত অসম্পূর্ণ থিসিস—তারপর অধ্যাপকদের পাণ্ডুলিপি। ...তোমাদের, আই মীন, ছাত্রদের সে খুব ভালোবাসত। না! বোধ হয় জানতো, প্রথম বাচ্চা প্রসব করার মত স্টুডেন্টদের প্রথম বই—ডক্টরেট থিসিস—বিয়োনোটা শক্ত ব্যাপার। আবার সেই বাচ্চা, আঁই মীন, ওই অর্ধসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিও যদি পুড়ে গিয়ে বিনষ্ট হয়ে যায়। সে তো মারাত্মক গর্ভপাত। প্রফেসরদের তো সে ভাবনা নেই। তাঁদের কেউ কেউ তো শুনেছি, বছরবিয়েনী—বছরের এ-মোড়ে একখানা কেতাব ওই মোড়ে আরেকখানা।"

জ্বলন্ত কেতাব পুঁথির আগুনে পুড়ে মারা গেল উইলি।

আমার মনে পড়ে গেল আরব পণ্ডিত বহুর উল জাহিজের কথা। [১]

মৃত্যুর তিন-চার দিন পূর্বে তাঁর স্বাস্থ্যের একটুখানি উন্নতি দেখা দেওয়াতে তিনি তাঁর স্ত্রীকে অনুরোধ করেন, তাঁকে যেন ধরে তাঁর কাজ করার তক্তপোশে নিয়ে যান। স্ত্রী আপত্তি জানালে তিনি অনুনয় করে বললেন যে, তাঁর বইখানার আর মাত্র কয়েকখানি পাতা লিখলেই বইটি সমাপ্ত হয়।

---

(১) যাঁরা এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার নামে অজ্ঞান, তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন, সে কেতাবে তাঁর মৃত্যুর সন দেওয়া হয়েছে ১৮৬৯। আসলে তাঁর মৃত্যু ৮৬৯ খৃষ্টাব্দে।

জাহিজ যে জায়গায় বসে কাজ করতেন তার চতুর্দিকে থাকত দুচার গজ উঁচু বইয়ের 'মিনার'। [২] তারই নিচের একখানা টেনে বের করার চেষ্টাতে সে মিনার তো ভেঙে পড়লই, তার ধাক্কাতে আর-কটা মিনারের বিস্তর বইয়ের তলায় চাপা পড়লেন জাহিজ। বই সরানো হলে দেখা গেল, বইখানা সমাপ্ত করতে গিয়ে তিনি জানটি খতম করে দিয়েছেন।

তাঁর জীবনীকার বলেছেন, "পণ্ডিতের পক্ষে পুস্তকস্তূপের নিচে গোর পাওয়ার চেয়ে শ্লাঘনীয় সমাধি আর কি হতে পারে।"

উইলি পণ্ডিত ছিল না। কিন্তু পণ্ডিতদের সেবক, পুস্তক সংরক্ষণের একনিষ্ঠ সাধক। পুস্তক সহমরণে সমাধি লাভ করলো—এর চেয়ে শ্লাঘনীয় শেষকৃত্য আর কি হতে পারে।

---

(১) "বঙ্গীয় শব্দকোষের" লেখক ঈশ্বর হবিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই পদ্ধতিতে কাজ করতেন। তাঁর পাণ্ডুলিপিব এক ক্ষুদ্র অংশ তিনি তাঁব কাঁচা ঘবে রেখে বিদ্যালয়ে পড়াতে যান। ঘরে আগুন লাগাতে তিনি অর্ধোন্মাদ উইলির মত জ্বলন্ত গৃহে প্রবেশ করতে গিয়ে বাধা পান। হবিচরণের প্রতি নিয়তি—অন্তত উপরের দুই বিষয়ে—সদয় ছিলেন। তাঁর পরলোকগতি জাহিজ বা উইলির মত হয়নি। তিনি অন্ধ হয়ে যান।

বাংলাদেশ

অবতরণিকা

॥ ১ ॥

এই নয় মাসে যা ঘটেছে সেটা পৃথিবীর ইতিহাসে তুলনাহীন। পাঠক সাধারণ যেন না ভাবেন এটা একটা কথার কথা মাত্র। ঠিক দু-মাস পূর্বে ১৫ জানুয়ারিতে আমি এখানে এসেছি। দীর্ঘ সাড়ে তিন মাস ধরে আমার অগণিত আত্মীয় আত্মজনের আপন আপন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা দিনের পর দিন শুনে গিয়েছি। এমন একটি মাত্র প্রাণী পাইনি যার কোনো-কিছু বলার নেই। মাত্র চার বছরের শিশুরও তার আপন গল্প আছে। সে আদৌ বুঝতে পারেনি ব্যাপারটার কারবার জীবন মৃত্যু নিয়ে। আমাকে বললে, "মা আমার হাত চেপে ধরে চানের ঘরে নিয়ে গিয়ে ফিস্-ফিস্ করে বললে, 'চুপ করে থাক, কথা বলিস নি, টুঁ শব্দটি করবি নি।' সমস্তক্ষণ কানে আসছে বোমা ফাটার শব্দ। আমি ভেবেছি, একসঙ্গে অনেকগুলো বিয়ের আতশ বাজি ফাটছে। মা এত ভয় পাচ্ছে কেন?"
...প্রাচীন দিনের এক বন্ধু তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন—তাঁর আত্মীয়েরা আমার সঙ্গে পরিচিত হতে চান। গিয়ে দেখি, প্রাচীনতর দিনের সখা আমার প্রিয় কবি আবুল হোসেন বৈঠকখানার তক্তপোশে বসে আত্মচিন্তায় মগ্ন। আমাকে দেখে মুচকি হেসে বললেন, "এই যে।" যেন ইহসংসারে এই ন-মাসে বলাব মত কিছুই ঘটেনি। আর পাঁচজন আশ-কথা পাশ-কথা বলছিলেন। বর্বর না-পাকদের সম্বন্ধে মামুলী কথা। আমি কেন জানিনে কবির দিকে একবার তাকালুম। তাঁরই পাশে আমি একটি কৌচে বসেছিলুম। অতি শান্তকণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন, "আমার চুয়াত্তব বছরের বৃদ্ধ আব্বা গাঁয়ের বাড়ির বৈঠকখানায় চুপচাপ বসেছিলেন। জানতেন না-পাকরা গাঁয়ে ঢুকেছে। তিনি ভেবেছেন, আমি চুয়াত্তর বছরের বুড়ো। আমার সঙ্গে কারোরই তো কোনো দুশমনী নেই।...না-পাকরা ঘবে ঢুকে তাঁকে টেনে রাস্তায় বের করে গুলি করে মারলো।"

আমি কোনো প্রশ্ন শুধোইনি। কোনো কিছু জানতে চাই নি।

আমার নির্বাক স্তম্ভিত ভাব দেখে আর সবাই আপন আপন কথাবার্তা বলা বন্ধ করে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে সে জড় নিস্তব্ধতা ভাঙবাব জন্য আমিই প্রথম কথা বলেছিলুম। মনে মনে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণে এনে প্রার্থনা করছি, "হে আল্লাতালা, এ-সন্ধ্যাটা তুমি আমাকে কাটিয়ে দিতে দাও, কোনো গতিকে।"

আমার বিহ্বলতা খানিকটে কেটে গিয়েছে ভেবে—আল্লা জানেন, এ-বিহ্বলতা কালধর্মে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণতর হবে কিন্তু এটাকে সমূলে উৎপাটিত করার মত যোগীশ্বর আমি কখনো হতে পারবো না—এক দরদী শুধোলে, "আপনারও এ ন-মাস নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তায় কেটেছে। আপনার স্ত্রী আর দুটি ছেলে তো ছিল ঢাকায়।"

আমি বললুম, "আপনাদেব তুলনায় সে আর এমন কি? সে কথা না হয় উপস্থিত মুলতুবী থাক।"

নানা জাতের আলোচনা ভিড় জমালো। তবে ইয়েহ্ইয়ার আহাম্মুখী, ভুট্টোর বাঁদরামী, পাকিস্তানের (বাঙলাদেশ রাহুমুক্ত হওয়াতে পাকিস্তানের যে-অংশটুকু "বাকি" আছে তাই নিয়ে এখন "বাকিস্থান") ভবিষ্যৎ মাঝে মাঝে ঘাই মেরে যাচ্ছিল। কথাবার্তার মাঝখানে আমার মনে হল, এঁরা যেন আমাকে স্পেযার করতে চান বলে আপন আপন

বীভৎস অভিজ্ঞতার কথা চেপে যাচ্ছেন।

এমন সময় গৃহকর্তা আমার সখা এসে সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমার ছোট বোনটি আপনাকে দেখতে চায়।" আমি এক গাল হেসে বললুম, "বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। নিশ্চয়, নিশ্চয়।" আমি যে অত্যন্ত গ্যালান্ট সে তো সবাই জানে।

সাদামাটা গলায় বন্ধু যোগ করলেন, "এঁর উনিশ বছরের ছেলেটিকে পাকসেনারা গুলি করে মেরেছে।"

পাঠক ভাববেন না, আমি বেছে বেছে কতকগুলো বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত উদাহরণ দিয়ে ন-মাসের নির্মমতার ছবি আঁকছি। তা নয়। এ মন্বন্তর এ-মহাপ্রলয় এমনই সর্বব্যাপী, এমনই কল্পনাতীত বহুমুখী, প্রত্যেকটি মানুষের হৃৎপিণ্ডে এমনই গভীরে প্রবেশ করেছে, এক একটা শাণিত শর, যেন এক বিরাট প্লাবন সমস্ত দেশটাকে ডুবিয়ে দিয়ে সর্বনরনারীর হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি বন্ধ্র কর্দমাক্ত জলে ভরে নিরন্ধ্র করে দিয়ে এই দুখিনী সোনার বাংলাকে এমনই এক প্রেত-প্রেতিনী গৃধ্র-শৃগালের সানন্দ হুহুঙ্কার ভূমিতে পরিণত করে দিয়ে গিয়েছে যে তার সর্বব্যাপী সর্বাত্মক বহুবিচিত্র রূপ আপন চৈতন্যে সম্পূর্ণরূপে সংহরণ করতে পারেন এমন মহাকবি মহাত্মা কোনো যুগে জন্মাননি। এরই খণ্ডরূপ আয়ত্ত করে প্রাচীনকালে কবি-সম্রাটগণ মহাকাব্য রচনা করেছেন। আমার মনে হয় একমাত্র মধুসূদন যদি এ-যুগের কবি হতেন তবে তিনি "মেঘনাদ-বধ" না লিখে যে মহাকাব্য রচনা করতে পারতেন তাব তুলনায় মেঘনাদ ঝিল্লিধ্বনির ন্যায় শোনাতো।

হয়তো বহুযুগ পবে, মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে, চক্রনেমির পূর্ণাবর্তন সম্পূর্ণ হলে মানুষ পুনরায় মহাকাব্য রচনা করতে সক্ষম হবে। যদি হয়, তবে সে-মহাকাব্যের সম্মুখে অন্য সর্ব মহাকাব্য নিষ্প্রভ জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। একমাত্র মহাভারতই তখনো ভাস্বর থাকবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে বলি সম্পূর্ণ নিরর্থক পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় বাংলাদেশের সে-মহাকাব্য পরবর্তী সর্ব মহাকাব্যের অগ্রজরূপে পূজিত হবে।

জানি, ভীমসেন দুঃশাসনেব রক্তপান করেছিলেন। কিন্তু সেটা প্রতীক। এস্থলে পাকসেনারা নিরীহ বালকের আধখানা গলা কেটে ছেড়ে দিয়েছে। বালক ছুটেছে প্রাণরক্ষার্থে, হুমড়ি খেয়েছে, পড়েছে মাটিতে, আবার উঠেছে আবার ছুটেছে। বধ্যভূমি অতিক্রম করার পূর্বেই-তার শেষ পতন।

খান সেনারা প্রতি পতন, প্রতি উত্থানে খল-খল করে অট্টহাস্য করেছে।

শুনেছি কে কজনকে এ-পদ্ধতিতে নিধন করা হয়েছে তার রেকর্ড রাখা হত এবং পদোন্নতি তারই উপর নির্ভর করতো।

মহাকাব্য লেখা হোক, আর নাই হোক, এ-দেশের দাদী নানী এখনো রূপকথা বলেন। মরণোন্মুখ রাক্ষসী পাগলিনী প্রেতিনীপারা, দক্ষিণে বামে সর্ব লোকালয় জনপদ বিনাশ করতে করতে ছুটে আসছে যে ভোমরাতে তার প্রাণ লুক্কায়িত আছে সেটাকে বাঁচাতে। এ-সব রূপকথা ভবিষ্যতেব "কদ্রুপ-কথার" সামনে নিতান্তই তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলে মনে হবে। যে চার বছরের মেয়েটিব কথা বলেছিলুম সে যেদিন দাদী নানী হবে—ইতিমধ্যে সমস্ত জীবন ধরে বিকট বিকট দুঃখ-দুর্দৈবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বয়ান যার জীবনে জমে জমে হয়ে উঠবে পর্বতপ্রমাণ—সে যে রাক্ষসীর বর্ণনা দেবে সে রাক্ষসী সংখ্যায়

ক্রমবর্ধমান অগণিত। মান্ধাতার আমলের সাদা-মাটা রাক্ষসী রাস্তায় দাঁড়াত না—এ-সব রাক্ষস ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের আধখানা গলা কেটে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে, গ্রামের মসজিদ দেউলের সামনে ছেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে ভস্মশয্যায় গড়াগড়ি দেবে। অঋতুপ্রাপ্তা শিশুকন্যাকে পাশবিক অত্যাচারে অত্যাচারে নিহত করে প্রেতার্চনার থালা সাজাবে নরখাদক পিশাচরাজ ইয়েহিয়ার পদপ্রান্তে।

অন্তরীক্ষে শঙ্কর স্তম্ভিত হয়ে তাণ্ডব নৃত্য বন্ধ করবেন।

লক্ষ বিষাণে ফুৎকারে ফুৎকারে কর্ণপটহবিদারক ধ্বনিতে ধ্বনিতে আহ্বান জানাবেন লক্ষ লক্ষ চক্রপাণিকে—এবারে মাত্র একটি সতীদেহ খণ্ডন নয়।

লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত পিশাচ বহির্গত বন্দীশালা হতে
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারি উড়ায়ে চলে পথে—

সে নিধন ভবিষ্যতের পুরাণে কী রূপ নেবে সে তো এ যুগের নরনারীর দৃষ্টি-চক্রবালের বহু সুদূরে।

পুরাণের উপাদান যখন নির্মিত হয়েছিল তখন কি সেকালেব মানুষ জানত ভবিষ্যতের মহাকবি পুরাণে তাকে কিভাবে বর্ণাবেন?

পুরাণ পড়ে একদা আমার মনে হত এসব সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। শুধু প্রশংসা কবেছি পুরাণকারের কল্পনাশক্তির। আজ জানি, নিশ্চযই এমন কিছু ঘটেছিল যাব জন্য কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি।

আগামী দিনের রূপকথার প্রসঙ্গে এসে গেল পুরাণেব—নব-"ভবিষ্য পুবাণের" স্বরূপ-কাহিনী। কিন্তু এ-দুই ইতিহাস কাব্যেব সংমিশ্রণ একই উপাদানে নির্মিত হয়। একটি সম্মান পায় সাহিত্যের সিংহাসনে, অন্যটি আদব পায় ঠাকুরমার কোলে।

সাধারণজনের বিশ্বাস, মুসলমানদের পুরাণ নেই। আছে :—

"রাণীর আকৃতি দেখি বিদরে পবাণ।
নাকের শোযাস যেন বৈশাখী তুফান॥
দুধে জলে দশ মণ কবি জলপান।
আশী মণী খানা ফের খায় সোনাভান॥
শৃঙ্গাব করিয়া বিবি বামে বান্ধে খোঁপা।
তার 'পরে গুঁজে দিল গন্ধবাজ চাঁপা।"

যে রাণীর শ্বাস কালবৈশাখীর মত, যিনি নাশ্‌তা করেন দশমণ ওজনের দুধ-জল দিয়ে এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের ওজন যাঁর আশি মণ, তিনি যদি পুবাণের নায়িকা না হন, তবে কিসের? তাই সোনাভানের পুঁথি কেচ্ছা-সাহিত্যের অনবদ্য কুতুবমিনার।

আর রূপকথা?—তার তো ছড়াছড়ি। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বলি!

গালেবুতুরুম্ বাশ্‌শা (বাদশাহ্)—পাঠক, "গালেবুতুকম্" নামটার দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করি—অবশ্য বস্তুতান্ত্রিক সমালোচক আপত্তি জানিয়ে বলবেন, "গালেবুতুরুম্ গাল-ভরা নাম; এটা শোনার জিনিস, দেখার নয়—অতএব পাঠকের কর্ণ আকর্ষণ কর।" কিন্তু করি কি প্রকারে? ব্যাকরণসম্মত বাক্যই যে সুজনতাসম্মত কর্ম হবে শাস্ত্রে তো সেরকম কোনো নির্দেশ নেই।

"গালেবুতুরুম্ বাশ্‌শা; মক্কাশ্‌শর (মক্কা শহবে) তার বারি (বাড়ি)।" পাঠক সাবধান,

আরব ভূমির প্রামাণিক ইতিহাস অনুসন্ধান করতে যেয়ো না। এ-বাশ্‌শা, এ-মক্‌কাশ্‌শের বাস্তব জগৎ ছাড়িয়ে চিন্ময় দ্যুলোকের চিরঞ্জীব আকাশকুসুম রূপে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।

এবং এ ন-মাসের কাহিনী তার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ পাবে ভাটিয়ালি গীতে। কত বিচিত্র রূপ নেবে সে আমার কল্পনার বাইরে। একটা মোতিফ যে বার বার ঘুরে ফিরে আসবে সে বিষয়ে আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই।

মুক্তিফৌজে ডাকে মোরে,
থাকুম্ ক্যাম্‌নে কও।
গামছা দিয়া পরানডারে
বাইন্‌ধা তুমি লও।

পাঠক আমার অনধিকার চর্চা ক্ষমা করো।

কিন্তু যে-সব সমসাময়িক সাহিত্যস্রষ্টা এ-যুগের ক্ষুধা এ-যুগের চাহিদা মেটাতে পারতেন তাঁদের অনেকেই তো আজ আর নেই। হায়দার কোথায়, কোথায় মুনীর? আমি শুধু আমার অন্তরঙ্গজনের কথাই বলছি। এ-সব বাংলাদেশী-সাহিত্যিকদের প্রতিই তো ছিল ইয়েহিয়ার বিকটতম আসুরিক জিঘাংসাবৃত্তি।

আমার পিঠুয়া ছোট বোনের ছেলে একটি চাটগাঁয়ে ব্যবসা করতো। ভালো ব্যবসা করতো। সে যত না সাহিত্য সৃষ্টি করতো, তার চেয়ে বেশী করতো সাহিত্যসেবা। ব্যবসা থেকে দু-পয়সা বাঁচাতে পারলেই বের করতো ত্রৈমাসিক—'প্রাচী'।

এপ্রিলের গোড়ার দিকে না-পাকরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মারে।

অবতরণিকা

॥ ২ ॥

না-পাক অফিসারদের ভিতর এক ধরনের চটি ত্রৈমাসিক বিলি করা হয়। আষ্টেপৃষ্ঠে কড়া পাঠনাই জবানে ছাপা থাকে "অনধিকারীর হস্তে এ কেতাব যেন কস্মিনকালেও না পড়ে: ফালতো কপি যেন ফলানা ঠিকানায় পাঠানো হয়।" কিন্তু প্রাণের ভয়ে যখন মোগল পাঠান তুর্ক আফগান (অবশ্য পাকিস্তানীরা) মুক্ত কচ্ছ হয়ে "বাপ্পো-বাপ্পো" রব ছেড়ে পালাচ্ছেন তখন টপ সিক্রেটই হয়ে যায় বটমলেস। শুনেছি, শেষ খালাসি লাইফবোটের শরণ না পাওয়া পর্যন্ত মাল জাহাজ এমন কি আধা-বোটের কাপ্তেন তক্ জাহাজ ছাড়ে না—মানওয়ারী জাহাজের কথা বাদ দিন। আর এ-সব "কাপ্তেন"-রা জোয়ানদেরও না জানিয়ে রেতের অন্ধকারে, অ্যারোপ্লেন হেলিকপটার যা পান তাই চুরি করে বর্মা বাগে পাড়ি দেন—এগুলো যুদ্ধের কাজে এমন কি আহত সৈন্যদের সরাবার জন্যও যে দরকার হতে পারে সে-কথা মনের কোণেও ঠাঁই না দিয়ে। জোয়ানরা তাই টপসিক্রেট চোখের মণি এই সব বুলেটিন ঠোঙাওলাদের কাছে বিক্রি করেছিল কি না জানিনে[১] কিন্তু পাকেচক্রে এরই দু-চারখানা আমার হাতে ঠেকেছে। "যে খায় চিনি তারে যোগায় চিন্তামণি।"

(১) সে-বারে (১৯৭১-এ) ঈদ পড়েছিল ২০।২১ নভেম্বরে। সেই বাহানায় পাঞ্জাবী মহিলারা

যেমন আপিসারকে উপদেশ দেওয়া সেই টপসিক্রেট চোখের মণিতে "তুমি যদি কোনো নদীপারে পোস্টেড হও তবে জোয়ানদের সাঁতার শেখাবে।" ওঃ! কী জ্ঞানগর্ভ উপদেশ!

এক ওকীবহল গুণী ব্যক্তিকে সাঁতার কাটা সম্বন্ধে সেই সদুপদেশের উল্লেখ করতে তিনি মৃদু হেসে বললেন, "অইছে, অইছে—জানতি পারেন না। এই যে আপনাদের বাড়ির পিছনে ছোট্ট একটি নালা এসে ঝিলের মত হয়ে গিয়েছে ঐটে ঈস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের হেড-কোয়ার্টার। ২৫ মার্চের গভীর রাত্রে না-পাকরা কেন্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাঙ্ক মর্টার মেশিনগান কামান দিয়ে আক্রমণ করে বাঙালি জোয়ানদের। ওরাও রুখে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ওরা পারবে কি করে? ওদের ফায়ার পাওয়ার কোথায়? আট আনা পরিমাণ কচুকাটা হয়—ভাগ্যিস বাকিরা পেছন বাগে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে বুড়ীগঙ্গা সাঁতার কেটে পেরিয়ে—"

"সাঁতার কেটে?"

"এজ্ঞে হ্যাঁ। তার থেকেও না-পাকদের শিক্ষে হয়, এ-দেশে সাঁতার না-জানাটা কত বড় বেকুবী—রীতিমত বেয়াদবী!!"

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, "তা বটেই তো, তা বটেই তো। তবে 'ভাগ্যিস চলে গিয়েছিল' বললেন কেন?"

গুণী বিরক্তির সুরে বললেন, "ঝকমারি! ঝকমারি—আপনাকে এ ন-মাসের ইতিহাস শেখানো। এ বি সি দিয়ে তাবৎ বাৎ আরম্ভ করতে হয়। এ-দেশের শিশুটি পর্যন্ত জানে, এরা এবং (দুই) পুলিশের যে কটি লোক ঐ একই ধরনের কিন্তু অনেক মোক্ষমতর হামলা থেকে গা বাঁচাতে পেরেছিল, (তিন) বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে যারা এসে জুটলো —এরাই ট্রেনিং দিল ছাত্রদের—তারাও ইতিমধ্যে এসে জুটে গিয়েছে এদের সঙ্গে, খুঁজে বের করেছে ওদের। আর কস্মিনকালেও চাষাভূষো, ছেলে-হেলেদের কথা ভুলবেন না। ওদের সাহায্য না পেলে—ঐ যে তেসরা ডিসেম্বরে মরণকামড় দিলে তিন দল, মুক্তিবাহিনী, ভারতীয় সেনা, পেছনে সামনে চাষাভূষোর মদদ্—সেটা না থাকলে সেটা তেরো দিন না হয়ে কত দিন ধরে চলতো কে জানে!"

আমি সোল্লাসে বললুম, "বর্ হক্ বর্ হক্! একদম খাঁটি কথা। এটা মেনে নিতে আমার রত্তিভর অসুবিধা হচ্ছে না। এই ফেব্রুয়ারিতে দেখা হয় আমাদের সিলটা কর্নেল রব-এর সঙ্গে। ইনি ছিলেন জেনারেল ওসমানির চীফ অব্ স্টাফ। এঁর উপর ছিল চাটগাঁ-নোয়াখালি-সিলেটের ভার। প্রধান কাজ ছিল, চাটগাঁ বন্দরে না-পাক্‌রা জাহাজ

স্বদেশে "প্রত্যাবর্তন" করতে আরম্ভ করেন। কিছু কিছু অফিসারও সময় থেকে গা-ঢাকা দেবার প্র্যাকটিস রপ্ত করতে থাকেন। ১৬ ডিসেম্বর না-পাক জাঁদরেলরা আত্মসমর্পণ করেন। আপিসরেরা তার আগের থেকেই দুই দল নারায়ণগঞ্জ খুলনা থেকে জেলেনৌকোয় করে, তৃতীয় দল প্লেনে করে পালাতে শুরু করেছেন দেশে তাঁদের বাড়িব পাহারাওলা সেপাইরা হুজুবদের মালপত্র বিক্রি করতে থাকে। পরে আত্মসমর্পণ করার প্রাক্কালে কেউ কেউ গাদা গাদা নোট বাঙালীদের সামনে পোড়ায়—"বরঞ্চ যমকে সোয়ামী দেব, তবু সতীনকে না"—ভাবখানা অনেকটা ঐ। অন্যরা গোপন জায়গায় পুঁতে রেখে যায়। শান্তি তো একদিন ফিরে আসবেই; তখন কাবুলীওলার ছদ্মবেশে কিংবা তীর্থযাত্রী রূপে—মরে যাই, কী ধর্মপ্রাণ।—এদেশে এসে উদ্ধার করবে।

থেকে যে-সব জঙ্গী মাল-রসদ নামাবে সেগুলো যেন ঢাকা না পৌঁছাতে পারে। সে-কর্মটি এঁর নেতৃত্বে সুষ্ঠুরূপে ন-মাস ধরে সুসম্পন্ন হয়। বিদেশী সাংবাদিকরা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন, মার্চ থেকে ডিসেম্বর না-পাকরা জখমী রেল-লাইন মেরামত করতে না করতেই এঁরা উড়িয়ে দিতেন আবার রেলের ব্রিজ।...তিনি আমাকে বলেছিলেন, ২৬-২৭ মার্চ থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত গেছে সবচেয়ে সঙ্গীন সময়। 'স্বাধীন-বাংলাদেশ সরকার' তখনো তৈরি হয়নি। দেশের ভবিষ্যৎ কোন্ দিকে, প্রত্যেকের আপন কর্তব্য কি সে-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকা সত্ত্বেও সেই দিনাজপুর থেকে সিলেট চাটগাঁ বরিশালের লোক অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে যদি সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জান কবুল করে শয়তানের মোকাবেলা না করত তবে পরিস্থিতিটা কী রূপ নিত কে জানে?"

"তা সে কথা থাক। আপনি বলছিলেন—"

"হুঁ। সে-কথা থাক। তবে এ বিশ-বাইশ দিনের ইতিহাস তার পরিপূর্ণ সম্মান তার পরিপূর্ণ মাহাত্ম্য দিয়ে লেখা উচিত। আমি বিশেষ করে জানতে চাই, তারা এ মনোবল পেল কি করে, কোথা থেকে?"

"না, না। সাঁতারের কথা বলছিলুম। হারামীরা স্পষ্ট চোখে দেখতে পেল, বাঙালী সমুচা বন্দুক হাতে নিয়ে গপাগপ ডুবসাঁতার দিয়ে বুড়ীগঙ্গার জল পেরুল তথাপি বাবুদের কানে জল গেল না। কে জানে, কে বোধ হয় হুকুম দিয়েছিল—ব্যবস্থা করা হল, জোয়ানরা সাঁতার কাটা শেখবেন! আরে মশয়, কাঁচায় না নুইলে বাঁশ—! তদুপরি আরেক গেরো। যে-আপিসর হুজুররা ডেঙ্গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুকুম কপচাচ্ছেন, তেনারাই যে জলে নাবলে পাথরবাটি। বাঁজী ছুঁড়ি পয়লা পোয়াতীকে শেখাচ্ছে বাচ্চা বিয়োবার কৌশল।

তদুপরি আরেক মুশকিল, জল পদার্থটা বড্ড ভেজা।"

আমি বললুম, "হ্যাঁ, আইরিশম্যান রবারের দস্তানা দেখে বলেছিল, খাসা ব্যবস্থা। দিব্য হাত ধোওয়া যায় জলে হাত না ভিজিয়ে।"

গুণী বললেন, "আইরিশম্যানের 'হেড-আপিসে' বিস্তর ঘিলু। এদের আণ্ডা সাইজের মাথা ভর্তি ঠকঠকে ঘুঁটে। এদের বেশ-কিছু জোয়ান অনেকদিন ধরে এদেশে আছে কিন্তু কোনো প্রকারের কৌতূহল নেই। শোনেন নি বুঝি সেই কুট্টি রসিকতা? ওদিকে কখন যে গুলির ঘায়ে ঘায়েল হবে সে খেয়াল আছে নসিকে, এদিকে কিন্তু মস্করা না করতে পারলে পেটের ভাত চালভাজা হয়ে যায়।... কুট্টির গণিভাই বাড়ি থেকে বেরুতে ভয় পাচ্ছে। মোগলাই কণ্ঠ বললে, পাঠানগো অত ডরাইস ক্যান—বুদ্দু, বুদ্দু, বেবাক গুলাইন বুদ্দু। হোন্ কথা। কাইল আমাগে আটকাইছে ইস্‌কাটনের ধারে। এককে জনরে জিগায়, নাম কিয়া হ্যায়? হিন্দু নাম অইলেই সর্বনাশ—তার লাইগ্যা সাক্ষাৎ কিয়ামৎ (মহাপ্রলয়)। পয়লা তারে দিয়া কবর খোরাইবো। তার বাদে একডা গুলি। যদি না মরে—বাবুগো হাতের নিশানা, হালা আইনুধারে তেলা হাতে বিল্লির নেঙ্গুর ধরার মত—তো বন্দুকের কোন্দা দিয়া ঠ্যাঙাইয়া ঠ্যাঙাইয়া মারে, নাইলে হালা জিন্দা মানুষ কবরে পুত্যা দেয়।... আমার পিছে আছিল আমাগো মহল্লার বরজো। মনে মনে কই, ইয়াল্লা, এর তো কিয়ামৎ আইয়া গেল আইজই। আন্দিশা করলুম, দেহি, না, হালা, আমাগো পাঠান সম্বন্ধী কোন্ পয়লা নম্বরী পাক মুসলমান—হিন্দু মাইরা দাবরাইয়া বেরাইতাছে?...আমাকে যে-ওক্তে জিগাইল 'তুমারা নাম কিয়া হ্যায়?' আমি কইলাম—'কিয়ামৎ মির্জা, বুক চিতাইয়া।

হোনো কথা—কিয়ামৎ বুঝি নাম অয়? কইল, 'বোহৎ ঠিক হ্যায়। যাও!' তার বাদে আইল বরজো-বিবি শিরনীর পাঁঠিটার মতন কাঁপতে কাঁপতে। আমি তার চেহারার বাগে মুখ তুল্যা চাইতা পারলাম না। ক্যা নাম হ্যায়? আরে মুসলমান নাম কইলে কি হয়? না ডরের তাইশে আচম্বিতে কইয়া ফালাইছে ব্রজবিহারী বসাক। খান সায়েব খুশী অইয়া কইল, বিহারী হ্যায়? তো যাও, যাও। বাচ্যা গেল বরজো হালা। তারে কইলাম, আ মে বরজা, বিহারী হইয়া বাচ্চা গেল।..." গল্প শেষ করে গুণী বললেন, কিন্তু মাঝে মাঝে বিপদও আসে প্রদেশের নামে। সাঁজের ঝোঁকে মসজিদে ঢুকছে এক মোল্লাজী। পাশের পকেটটা বড্ড ফোলা-ফোলা দেখাচ্ছে বলে খানের মনে হল সন্দেহের উদয়। হাঁক ছেড়ে শুধোলে, "জেবমে ক্যা হ্যায়।" থতমত খেয়ে বললে, "কুছ নহী হুজুর, একঠু পাঞ্জাবি হয়।" খান তো রেগে খান খান। "কী! তোর এত গোস্তাকী! পাঞ্জাবের খানদানী একজন মনিষ্যিকে তুই পুরেছিস জেবে!" মসজিদের ইমাম তখন ছুটে এসে এক হ্যাঁচকা টানে বের করলেন পাঞ্জাবিটা। খানকে বললেন, "হুজুর, আপনারা—পাঞ্জাবীরা—প্রথম আমাদের কুর্তা পরতে শিখিয়েছিলেন কি না, তাই আমরা সব কুর্তাকেই পাঞ্জাবি বলি—আপনাদের ফখরের তরে।"

গুণী বললেন, "আপনি খবর নিন, জানতে পারবেন, শুধু যে পাঠানরা, পাঞ্জাবীরা, বেলুচরা এদেশ সম্বন্ধে কিছুই জানতো না তা নয়, এদেরকে দিনের পর দিন শেখানো হয়েছিল, বাঙালিরা পাকিস্তানী নয়, এবং তার চেয়েও বড় কথা মুসলমান নয়। এরা হিন্দুদের জারজ সন্তান। এরা আল্লা রসুল মানে না, নামাজ রোজার ধার ধারে না—"

আমি বললুম, "বা রে! এ আবার কি কথা! শুধু বললেই হল। পাঞ্জাবী পাঠান কি মসজিদও চেনে না। গম্বুজ রয়েছে, মিনার বয়েছে, ভিতরে মিহরার রয়েছে, বাইরে ওজু কবার জন্য জলের ব্যবস্থা রয়েছে, জানি, ওদের দেশে বাংলার তুলনায় মসজিদ অনেক কম। তাই বলে মসজিদ চিনবে না।"

বললেন, "মসজিদ চেনার কি বালাই ওরা শুনেছে, এককালে এগুলো মসজিদ ছিল কিন্তু ইন্ডিয়ানদের পাল্লায় পড়ে ওসব জায়গায় এখন নামাজটামাজ আর পড়া হয় না। শুধু কি কবে পাকিস্তান ধ্বংস কবতে হবে তাই নিয়ে ইন্ডিয়ান এজেন্টদেব সঙ্গে আলোচনা হয় ঐখানে। উত্তর বাংলার এক টাউনে এক প্রৌঢ়া মহিলা সন্ধ্যার আধা-অন্ধকারে বেবিয়েছেন তাঁর কিশোরী কন্যার সন্ধানে। পাড়ার মসজিদ পেরিয়ে কিছুটা যেতে না যেতেই—সামনে খান সেনা, জনা পাঁচেক! মহিলা পিছন ফিরে ছুটলেন বাড়ির দিকে। মসজিদের পাশ দিয়ে ছুটে যাবার সময় করলেন চিৎকার। মুসল্লিদের নামাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারা ছুটে এল বাইরে। খান সেনাদের বাধা দেবার চেষ্টা করতেই তারা চালালো গুলি। কয়েকজন পড়ে গেল রাস্তার উপর। বাকিরা দৌড়ে ঢুকলো মসজিদের ভিতর। না-পাকরা সেখানে ঢুকে সবাইকে খতম কবলো। ইমাম সাহেবও বাদ যাননি।"

আমি বললুম, "আমার কাছে তো এসব কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ঠেকছে।"

গুণী বললেন, "কিন্তু এত শত বজ্র-বাঁধন দিয়ে বাঁধা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে ফাটল ধবতো।

গাঁ থেকে জোয়ান জোয়ান চাষাদের ধরে আনা হচ্ছে একসঙ্গে গুলি করে খতম করে না-পাকরা "গাজী" হবেন। একটি ছোকরাকে ধরে এনেছিল, সঠিক বলতে গেলে, প্রায় তাব মায়ের আঁচল থেকে। সে কান্নাকাটি চিৎকার চেঁচামেচি কিছুই করেনি। শুধু যখন

তাকে না-পাকরা দাঁড় করাতে যাচ্ছে, গুলি করার জন্য, তখন ফিসফিস করে সেপাইটাকে বললে, "আমার আম্মাকে বলো, আমার রূহ (আত্মা)-র মগফিরাতের (সদ্‌গতির) জন্য দোয়া (প্রার্থনা) করতে।" রূহ, মগফিরাত (যেমন 'সাধনোচিত ধামে প্রস্থান') এগুলো প্রায় টেকনিকাল কথা, সব ধর্মেই থাকে। সেপাই 'আম্মা', 'রূহ', 'দোয়া' কথাগুলো বুঝতে পেরে একেবারে হতবাক হয়ে গেল। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর সামনে অতিশয় পাষণ্ডও তো ঝুটমুট ঝুট কথা বলে তার পরকাল নষ্ট করতে চায় না। আবার জিজ্ঞেস করে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাকে নিয়ে গেল অফিসারের সামনে। বললে, 'এ তো মুসলমান।' অফিসার সরকারী নির্দেশমত ইসলামের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর তোতার বুলি কপচাবার পূর্বেই হই হই রব উঠেছে, 'মুক্তি (গ্রামের লোক "মুক্তি-ফৌজ" "মুক্তিবাহিনী" বলে না, বলে "মুক্তি") এসে গেছে, মুক্তি এসেছে।' সঙ্গে সঙ্গে—"ভাগো ভাগো" চিৎকার। আর ধনাধন একই সাথে সে কী সাম্যবাদ। আপিসারকে ধাক্কা মেরে জোয়ান দেয় ছুট, জোয়ানকে ঠেলা মারে অল্-বদর, তাদের ঘাড়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ে অশ্‌শম্‌স্। এস্থলে রণমুখো বাঙালি আর ঘর-মুখো সেপাই।

ছোঁড়াটাকে আখেরে অফিসার মুক্তি দিত কি না সে সমস্যার সমাধান হল না বটে কিন্তু সে যাত্রায় সে-সুদ্ধু বেঁচে গিয়েছিল বেশ কয়েকজন।

এ তো গেল মামুলী উদাহরণ।

আরেক জায়গায় না-পাকবা মেরেছে গাঁয়ের কয়েকজন মুরব্বীকে। তাবপর এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেসব মৃতের আত্মার সদ্‌গতির জন্য শেষ উপাসনা (জানাজা) করার সাহস কার? মৃতদেহগুলো সামনে রেখে সারি বেঁধে সে জানাজার নামাজ পড়তে হয়। খানেরা তৈরী, জড়ো মাল পটপট গুলি করে ঝটপট গাজী হয়ে যাবে। কিন্তু তবু জনাদশেক সার বেঁধে নামাজ আরম্ভ করে দিল।

পাঞ্জাবী, পাঠান, বেলুচে পাঁচ ওকতো দৈনন্দিন নিত্য নামাজের বড় একটা ধার ধারে না। চোদ্দ আনা পরিমাণ নামাজের সংক্ষিপ্ততম মন্ত্রও জানে না। বাঙালি মুসলমান ওদের তুলনায় কোটিগুণে ইনফিনিটি পার্সেন্ট আচারনিষ্ঠ। কিন্তু পাঠান বেলুচ আর কিছু জানুক আর নাই জানুক মৃতের জন্য শেষ উপাসনায় সে যাবেই যাবে। তার মন্ত্র জানুক আর না জানুক। ইহসংসারে সর্ব পাপকর্মে সে বিশ্বপাপীকে হার মানায। তাই এই নামাজে তার শেষ ভরসা। নামাজীদের দোওয়ায় সে যদি প্রাণ পায়।

গুলি করার আগেই তারা লক্ষ্য করলো, এ নামাজ তো বড্ড চেনা লাগছে। এ নামাজ নিয়ে তো কেউ কখনো মস্করা করে না। জানের মায়া ত্যাগ করে যারা এ নামাজে এসেছে তারা তো নিশ্চয়ই মুসলমান। মৃতের জন্য মৃত্যুভয় ত্যাগ!

এরা সেদিন গুলি করেনি।

কিন্তু তাই বলে ওরা যে সেদিন থেকে প্রহ্লাদপালে পরিণত হল সেটা বিশ্বাস করার মত অতখানি বুড়বক আমি নই। এটা নিতান্তই রাঙা শুক্কুবারের, ওয়ান্‌স্ ইন এ ব্ল্যু মুনের ব্যত্যয়।

লুটতরাজ খুন-খারাপীর সময কে হিন্দু কে বা মুসলমান!

কাশ্মীরে ঢোকার পূর্বেই তো পাঠানরা আপন দেশে লুঠতরাজ করেছে। আর কাশ্মীরের মুসলমানদের উপর অত্যাচারের তো কথাই নেই। ওদিকে লেট জিন্নাহ তো ওদের দিব্যি দিলিশা দিয়েছিলেন, কসমফতোয়া ঝেড়েছিলেন—পাঠানরাই দুনিয়ার

সবচেয়ে বঢ়হিয়া মুসলমান, তাদের উপরই পড়লো নিরীহ কাশ্মীরীদের জান-মান বাঁচাবার দায়িত্ব। আমেন! আমেন!!

অবতরণিকা

॥৩॥

মার্চ থেকে ডিসেম্বরের কাহিনী এমনই অবিশ্বাস্য, এমনই অভূতপূর্ব যে সে-কালটা বুঝতে গেলে তার পূর্বেকার ইতিহাস পড়ে খুব একটা লাভ হয় না। কারণ এটা তো এমন নয় যে তার পূর্বে দু-বছর হক পাঁচ বছর হক বেশ কিছু কাল ধরে পূর্ব বাংলায় মোতায়েন পাঞ্জাবী-পাঠান পাক সেনা আর সে-দেশবাসী বাঙালিতে আজ এখানে কাল সেখানে হাতাহাতি মারামারি করছিল এবং একদিন সেটা চরমে পৌঁছে যাওয়াতে এক বিরাট বিকট নরহত্যা নারীধর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেল। বস্তুত যে দু-তিন হাজার পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য বাংলাদেশে বাস করতো তাদের সঙ্গে কখনো কোনো মনোমালিন্য হয়েছিল বলে শুনিনি। আমি এ-দেশে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে একবার "পূর্ব পাকিস্তান" দেখতে আসি এবং ১৯৫১ থেকে ১৯৭০ অবধি পারিবারিক কারণে প্রতি বৎসর দু-একবার এসেছি এবং প্রতিবারই একটানা কয়েক মাস কাটিয়ে গিয়েছি। আমার গুষ্টিকুটুমে তাবৎ বাংলাদেশ ভর্তি। তাই রাজশাহী থেকে চাটগাঁ-কাপ্তাই, সিলেট থেকে খুলনা অবধি মাকু মেরেছি। মাত্র একবার দুজন পশ্চিম পাকিস্তানী জোয়ানকে রাজশাহীতে পদ্মার একটা খাড়ির পারে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি—অতি অবশ্য পাড় থেকে হাত দশেক দূরে জল থেকে খুব সন্তর্পণে গা বাঁচিয়ে; একটি কিশোব সেখানে জলে ডুবে মরেছে শুনে সে "তামাশা" দেখতে এসেছিল।

আরেকবার ট্রেনে ঢাকা থেকে মৈমনসিং যাবার সময় ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে দুজন সুবেদার উঠেছিল। তার একজন মৈমনসিং-এর লোক, অন্যজন বেলুচ। এটা ১৯৬৬ সালের কথা। মৈমনসিংহী আর পাঁচজনের সঙ্গে গালগল্প জুড়ে দিল এবং স্বভাবতই ৬৫-র যুদ্ধের কথা উঠলো। "বাঙালরা" তখন পশ্চিম পাকিস্তানে কি রকম জোর লড়াই দিয়েছিল সে-কাহিনী সে যেমন-যেমন দফে দফে বলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে বেলুচ "ঠিক বাৎ, বিলকুল সহী বাৎ" "ম্যায় ভী তো থা, ম্যায় নে ভী দেখা" মন্তব্য করে। এস্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে উল্লেখ করি, ঐ যুদ্ধে বাঙালি রেজিমেন্টই আর সব রেজিমেন্টের চেয়ে বেশী মেডেল ডেকরেশন পায়। এবং অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করি, ১৯৭১-এর গরমিকালে রাজশাহীতে বেলুচ জোয়ানদের এক বাঙালি প্রসেশনের উপর গুলি চালাবার হুকুম হলে অগ্রবর্তী জোয়ানরা শূন্যে গুলি মারে, আর জনতাকে বার বার বলতে থাকে, "ভাগো, ভাগো।"...সে যাত্রায় বিস্তর লোক বেঁচে গিয়েছিল।

মোদ্দা কথা সেপাইদের সঙ্গে এ দেশবাসীর কোনো যোগসূত্র ছিল না। কোনো প্রকারের মনোমালিন্যও ছিল না। সেটা হয়েছিল মার্চ মাসের গোড়ার দিকে—সে কাহিনী যথাস্থানে হবে।

আর আর্মি অপিসারদের তো কথাই নেই। যে সামান্য কজন আপন মিলিটারি গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এদের সিভিলিয়ান অপিসারদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন তারা ছিলেন ভদ্র, খামোখা গায়ের জোরে যেখানে কমন ল্যাঙুজ ইংরিজিতে কথাবার্তা হচ্ছে সেখানে

"উর্দু ভাষা চালিয়ে উঁচু ঘোড়া চড়তে যেতেন না।

'অভদ্র ইতর ছিল পাঞ্জাবীরা এবং তৎসঙ্গে যোগ করতে হয় দম্ভ, অহংকার, গায়ে পড়ে অপমান করার প্রবৃত্তি। বেহারীদের—এরা অসামরিক। ভাবখানা, এনারা খানদানী মনিষ্যি, কুরানশরীফের আরবী, রূমীহাফিজের ভাষা ফার্সী এগুলোকে প্রায় ছাড়িয়ে যায় তেনাদের নিকষ্যি কুলীন উর্দু ভাষা। পাটনা, বেহারে এনাদের অন্য রূপ! ঢাকাতে একদা এক বাঙালির ড্রইংরুমে যখন উর্দু নিয়ে এনাদের এক প্যাকম্বর বড্ড বেশী বড়ফাট্টাই করতে করতে থামতেই চান না তখন আমি তাঁর নভলোকে উড্ডীয়মান বেলুনটিকে চুবসে দেবার জন্য মাত্রাধিক মোলায়েম কণ্ঠে শুধালুম, "আচ্ছা আপনার সঠিক মাতৃভাষাটি কি? ভোজপুরী মৈথিলী না নগ্‌হই?" আর যাবে কোথায়? ছাতুখোর তো ফায়ার! হাজার দুই ফারেনহাইট। .. উপস্থিত সেটা থাক।

·তাই পঁচিশের "পিচেশিমির" পয়লা নম্বরী মন্দ্বী ছিলেন এঁরাই। অল-বদর, অশ-শমস এবং প্রধানত রাজকরদের সম্মানিত সভ্য ছিল এরাই। পঁচিশের পিচেশিমির পটভূমি অধ্যয়ন করলে মাত্র এইটুকু আমাদের কাজে লাগে। কিন্তু ভুললে চলবে না, এহ্ বাহ্য। কারণ গণনিধনের প্রধান পাণ্ডা-পুরুত না-পাক সেনা এবং ইসলামবাদ-নশীন ফৌজী জাঁদরেলরা।[১] এঁরা যদি পুবো মিলিটারি তাগদ খাটিয়ে নিরস্ত্র সিভিলিয়ানদের কচু-কাটা (কৎল-ই-আম) কর্মে সমস্ত শক্তি নিয়োগ না করতেন তবে এ দেশেব নুন নেমক খেয়ো পোস্টাইপেটে জারজ বিহারীদের (আমি বিহার বাসিন্দা, বিহারী বা কলকাতাবাসী বিহারীদের কথা আদৌ ভাবছি না, এবং বাংলার বিহারীদের ভিতরও যে আদৌ কোনো ভদ্রসন্তান ছিলেন না সে কথা বলছিনে) কী সাধ্য ছিল বাংলাদেশীর সঙ্গে মোকাবেলা করে!

এটা নিয়তির পরিহাসই বলতে হবে, যে-জোয়ান, যে-অপিসারদের সঙ্গে বঙ্গজনের কোনো দুশমনী ছিল না তারাই নাচলো তাণ্ডব নৃত্য, বেহারীরা শুধু বাজালো শিঙে। বেঙ্গল অর্ডিনেনস বঙ্গদেশের উপর চাপানোর সময় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> "হিমালয়ের যোগীশ্বরের রোষের কথা জানি
> অনঙ্গেরে জ্বালিয়েছিলেন চোখের আগুন হানি।
> এবার নাকি সেই ভূধরে কলির ভূদেব যারা
> বাংলাদেশের যৌবনেরে জ্বালিয়ে করবে সারা!
> সিমলে নাকি দারুণ গরম, শুনছি দার্জিলিঙে
> নকল শিবের তাণ্ডবে আজ পুলিশ বাজায় শিঙে।"

.এই অগ্নিগর্ভ মৃত্যুঞ্জয় কবিতাটি থেকে এ প্রবন্ধে আরো উদ্ধৃতি দিতে হবে। কিন্তু এটি এতই অনাদৃত যে আমি—অভিমানভরে তার নির্দেশ দিই না। রচনাবলী থেকে খুলে বের করুন।

---

(১) এঁদের নাম টুকে রাখলে পশ্চিমবঙ্গীয় পাঠক বেসকর্সে না গিয়ে, রক এ বসেই বাজী খেলতে পা'ববেন শ্রীযুত ভুট্টোর পর কোন্ বাজীরাজ পাকিস্তানের গদীতে সোওয়ার হবেন—বাংলাদেশে এঁদের নাম ডাল-ভাত, থুড়ি!—ছাইভস্ম। লেফ-জেনারেল পীরজাদা হামিদ খান টিক্কা খান (এর গৌরবার্জিত খেতাব "বমর অব বেলুচিস্তান"), ("বুচর অব বেঙ্গল") মেজর জেনাবেল আকবর খান, মেজর জেনবেল উমর খান, লেফ-জেনরেল গুল হাসান।

পটভূমি নির্মাণের জন্য একাধিক চিন্তাশীল লেখক অন্যান্য কারণ দেখান। সেগুলো একটা জাত একটা দেশকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে, এমন কি ক্ষেপিয়ে তুলতেও যথেষ্ট। প্রত্যুত্তরে দমননীতি বরণ করে শোষকরা। এমনতরো কাণ্ড তো বার বার সহস্রবার হয়েছে পৃথিবী জুড়ে। কিন্তু প্রত্যুত্তরে পিচেশিমির যে উলঙ্গনৃত্য হল তার হদিস তো বড় একটা পাওয়া যায় না—আমি কোথাও পাইনি। মাত্র একবার একজন একটা প্ল্যান করেছিলেন যার সঙ্গে ইয়েহিয়ার প্ল্যান মিলে যায় কিন্তু সেই পূর্বসূরীও সেটা কার্যে পরিণত করার জন্য এতখানি পিচেশিমি করার মত বুক বাঁধতে পারেননি। কিন্তু সে-প্ল্যান এ ভূমিকার অঙ্গ নয়। সেটা ঘটনাবলীর ক্রমবিকাশের সঙ্গে এমনই অঙ্গাঙ্গি বিজড়িত যে সেটাকে বিচ্ছিন্ন করে এস্থলে সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করার মত শক্তি আমার নেই—সহিষ্ণুতম পাঠক পর্যন্ত বিরক্ত হবেন। সেটি যথাস্থলে নিবেদন করবো।

পূর্ব বাঙলাকে পশ্চিম পাকের একুশটি কোটিপতি পরিবার কী মারাত্মকভাবে শোষণ করেছে সে সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দুজন লোক অসীম সাহস দেখিয়ে আইয়ুব ইয়েহিয়ার আমলেই সরকারী তথ্যের উপর নির্ভর করে যে-সব রচনা প্রকাশ করেন সেগুলো পড়ে আমার মনে ভয় জেগেছিল এঁদের ধরে ধরে না ইয়েহিয়ার চেলা-চামুণ্ডারা ফাঁসি দেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁদের প্রকৃত মূল্য উত্তমরূপেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বলে ভণ্ড ইয়েহিয়া যখন আলাপ-আলোচনার নাম করে—আসলে টিক্কা খান যাতে করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আরো না-পাক সেনা ঢাকায় আনতে পারার ফুরসত পায়—মার্চের মাঝামাঝি ঢাকা আসেন, তখন বঙ্গবন্ধু জনাব তাজউদ্দীনের সঙ্গে অধ্যাপক রহমান সুবহান ও ড. কামাল হুসেনকে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

এই ভণ্ডামির চমৎকার বয়ান বহুল প্রচারিত একখানি জর্মন সাপ্তাহিক নির্ভয়ে প্রকাশ করে। 'নির্ভযে' এই কারণে বললুম, ওই প্রবন্ধের জন্য যে জর্মন লেখক জিম্মাদার তার নাম, ইসলামাবাদে তার বাসস্থান, ফোন নম্বর ইত্যাদি সবই ভালভাবে দেওয়া ছিল। ভাবখানা অনেকটা এই : "ওহে হেইয়া খান। আমার মতে, তুমি রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে যে ভণ্ডামির ভেল্কিবাজিটি দেখালে তার হাঁড়িটি আমি হাটের মধ্যিখানে ফাটালুম। যে ভণ্ডামিটি তুমি করলে সেটা কোনো কূটনৈতিক রাষ্ট্রদূতও ইজ্জতের ভয়ে করতো না—কারণ দু-দিন বাদেই তো ভণ্ডামিটা ধরা পড়ে যেত। আর কেউ না হোক, আমি তো বাপু এ-ব্র্যান্ডের ফক্কিকারি বিলক্ষণ চিনি। মাত্র আরেকজন রাষ্ট্রপ্রধান এ-ধরনের ত্যাঁদড়ামি করতেন তিনি আমারই দ্যাশের লোক—নাম তার হিটলার। তা অত সব ধানাই-পানাই ক্যান? করো না আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা, না হয় তাড়িয়ে দাও আমাকে তোমার সাতিশয় পাক মুল্লুক থেকে। হই হই পড়ে যাবে দুনিয়ার সর্বত্র। দেখি, তোমার কতখানি মুরদ!"

"অতি অবশ্য ভারিক্কি ওজনের ইয়েহিয়া অনভ্যাসের (ফোঁটা) অসামরিক ড্রেস পরে উড়ো জাহাজে করে পৌছলেন পূব-দেশের রাজধানী ঢাকায় (সে আরেক মিনি ধাপ্পা; ভাবখানা, আমি মিলিটারি ডিকটেটর নই, আমি সাদামাটা নাগরিক মাত্র।)—শেখ মুজিবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য। কিন্তু প্রকৃত সত্য, ওই আসাটাই ছিল দীর্ঘসূত্রতার কৌশল। পূর্ব প্রদেশ কেটে পড়তে চায়; তাকে তখনকার মত কোনো গতিকে ঠেকিয়ে পরে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করা।

"কারণ, পাঠান জাঁদরেল (ইয়েহিয়া পাঠান নন। তিনি জাতে কিজিলবাশ্ এবং সুন্নীবৈরী শীয়া সম্প্রদায়ের লোক[২] কিন্তু তিনি পাঠানদের ভাষা পশতু অনর্গল বলতে পারেন বলে অতি অল্প লোকেই জানেন যে তিনি পাঠান নন—অনুবাদক) যে কটা দিন জেনেশুনে তিনি হাবিজাবি এ-প্যারাগ্রাফ ও-প্যারাগ্রাফ নিয়ে বাংলার জননেতার সঙ্গে বেকার আলোচনা চালাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়ে বেসামরিক "পাকিস্তান ইন্টার-ন্যাশনালের" উড়ো জাহাজ নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বাংলাদেশে নিয়ে আসছিল উচ্চদেহ বাছাই বাছাই যুবক—পরনে একদম একই ধরনের বেসামরিক বেশ।"

(এদের ভুয়ো পাসপোর্টও দেওয়া হয়েছিল; কারণ সিংহলে উড়ো জাহাজে তেল নেবার সময় পালের পর পাল জঙ্গীয়ুনিফর্ম পরা সৈন্যবাহিনী যাচ্ছে দেখলে সিংহল কর্তৃপক্ষ 'যুদ্ধের প্রস্তুতি' বন্ধ করে দিতেন। কিন্তু না-পাক জাঁদরেলদের আজব হস্তীবুদ্ধি দেখে তাজ্জব মানতে হয়! সক্কলেরই একই কাপড়ের একই কাটের একই জামা-জোড়া যদি হয় তবে সেটাও তো একটা য়ুনিফর্ম। হোক না সে সিভিল। বস্তুত যে ঢাকার লোককে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করা হয় তারা—'খানদানী' উর্দু ভাষায়—ফৌরনকে পাঁচ মিনিট পহলে অর্থাৎ তদ্দণ্ডেই বিলক্ষণ হুঁশিয়ার হয়ে যায় এ-সব ভেড়ার-ছাল-পরা নেকড়ের পাল)।

শেখ সাহেব চাণক্য মাকিয়াভেল্লির ইস্কুলে-পড়া কূটনৈতিক নন। কিন্তু গাঁয়ের লোক—ক-সের ধানে ক-সের চাল হয় অন্তত সে-হিসেবটুকু তাঁর আছে। পাঞ্জাবী পাঠানদের এই হাতী-মার্কা স্থূল প্যাঁচটি বোঝবার জন্য তাঁকে মার্কিন কমপ্যুটারের শরণ নিতে হয়নি। কিন্তু তিনি তাঁর দিকটা সাফসুৎরো রাখতে চেয়েছিলেন; ঘরে বাইরে কেউ যেন পরে না বলে তিনি অভিমানভরে গোসাঘরে খিল দিয়েছিলেন।

তাই তিনি দুই অর্থশাস্ত্রবিশারদ সুবহান, কামালকে তাজউদ্দীনের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁদের কাজটি খুব কঠিন ছিল না। কারণ

---

(২) পাকিস্তানের সৌভাগ্য বলুন, দুর্ভাগ্যই বলুন, তার জন্মদাতা মরহুম জিন্না শীয়া, ইসকন্দর মির্জা ও ইযেহিয়াও শীয়া। ইসকন্দর মির্জা ও ইয়েহিয়া পীবিত করতেন শীয়া ইবানেব সঙ্গে এবং তাচ্ছিল্য করতেন সুন্নী আফগানিস্থানকে। ডিসেম্বর ১৯৭১-এর প্রথমার্ধে যখন পশ্চিম পাকবাসী জেনে গেল, পুব পাক যায়-যায়, তখন ইয়েহিয়ার চরিত্র-দোষ, কুলদোষ এসবের সন্ধান অকস্মাৎ আরম্ভ হল। তখন—যদিও ইয়েহিয়া কখনো সেটা গোপন করেনি—সবাই চেঁচাতে আরম্ভ করলো, "ব্যাটা ইয়েহিয়া শীয়া। তাই—আমাদের আজ এই দুর্গতি।" সে-'পাপ' স্খালনের জন্য তিনি এক শুক্কুরবারে 'জাতধর্ম' খুইয়ে সুন্নীদের মসজিদে গিয়ে জুম্মার নমাজ পড়লেন। এ যেন কোনো পরম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব রক্ষাকালীর মন্দিরে পাঁঠা বলি দিলেন! কিন্তু হায়, সবাই জানেন জাত গেল পেটও ভরলো না।...ভুট্টো সুন্নী, তাই তিনি "ক্ষুদে হিটলার দি থার্ড" হয়েই ছুটলেন সুন্নী কাবুল বাগে।

পাকিস্তানের ফরেন পলিটিকস অধ্যায়ে এব সবিস্তার বয়ান দেব। এই শীয়া, সুন্নী, কাদিয়ানী (স্যর জফরুল্লা কাদিয়ানী এবং সাধারণ কাদিয়ানীজন সুন্নী শীয়া উভয়কে কাফির বিবেচনা করে) বোরা, খোজা, মেমনদের মতবাদ সম্বন্ধে কি দিশী কি বিদেশী সর্ব রিপোর্টার উদাসীন। এ যেন আইয়ার আয়েঙ্গার, ব্রামিন, ননব্রামিন সম্বন্ধে খবর না নিয়ে দক্ষিণ ভারতের রাজনীতি আলোচনা করা।

'ক্ষুদে হিটলার দি সেকেন্ড' হওয়ার কয়েক মাস পরেই ইয়েহিয়া সর্বজন সমক্ষে (বেতার ও টেলিতে) দরদী গলায় স্বীকার করেছেন, "পূর্ব পাকিস্তানীদের অসন্তুষ্ট হওয়ার যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে। রাষ্ট্রের যে উচ্চ পর্যায়ে মীমাংসা গ্রহণ করা হয় এবং আরো কতকগুলি জাতীয় কার্যকলাপে তাদেব পুরো সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হয়নি।" এখন তা হলে দাঁড়াল এঁরা পিণ্ডির চেলাচামুণ্ডাদের হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে দফে দফে বোঝাবেন শিল্পে বাণিজ্যে সর্বক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা স্বাধীনতার চব্বিশ বৎসর পরও কী মারাত্মক রকম পঙ্গু হয়ে আছে।

কি কথাবার্তা হয়েছিল, বস্তুত তাঁরা আদৌ সে-সুযোগ পেয়েছিলেন কি না, জানিনে। তবে আজ আমি এ-প্রসঙ্গ তুলছি কেন?

হ্যাঁ, আজই তুলছি। আজ জষ্টি মাসের পয়লা তারিখ আপনি যান ঢাকার নিউ মার্কেটে। সেখানে জলজ্যান্ত স্পষ্ট দেখতে পাবেন এই দুই পণ্ডিতের গভীর গবেষণা কিভাবে জলজ্যান্ত চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। শুনেছি, বিলেতের কোন্ এক কোম্পানি ছুঁচ থেকে আরম্ভ করে হাতী পর্যন্ত বিক্রি করে। এখানে করে না। একদা করতো। আজ কোনো কিছু চাইলেই সেই এক পেটেন্ট উত্তর "পশ্চিম পাকিস্তানে তৈরী হত : এখন আর আসছে না।" বিশ্বাস করবেন পকেট সংস্করণ শোভন "গীতাঞ্জলি" হাতে নিয়ে বললুম ইটি একটু ধুলোমাখা। তাজা হলে ভালো হয়। বললে এই শেষ কপি; লাহোরে ছাপা, আর আসবে না।" পাঁচমেশালির দোকানেও "নেই, নেই" শুনে বিরক্ত হয়ে বললুম, "আরে মিঞা, মধু—মধু চাইছি। সে তো আসতো সোঁদর বন থেকে, বোতলে পোরা হত ঢাকায়...লাল বাগ্ না কোথায় যেন?" কাঁচুমাচু উত্তর, "জী, ঠিক বলেছেন। তবে না, কারখানার মালিক ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী। তিনি হাওয়া। দোকানে তালা পড়েছে।" মনে মনে কাষ্ঠহাসি হেসে বললুম, পাট তো এদেশের ডাল ভাত। মস্করা করে এক গাঁট পাট চাইলে হয়তো বলবে, "জী আদমজী দাউদ মিলের কর্তা তো ভাগ গিয়া; গুদোম বন্ধ।"

শেষটায় খাস ঢাকায় তৈবী ঢাকাই মালিকানায়—কি পেলুম জানেন? ওটার আমার দরকার ছিল না। মার্কিং ইনক্। লনড্রিতে যে কালি দিয়ে কাপড়ে নম্বর লেখে। এদেশের ধোপানী যেটা আপন কুঁড়েঘরে বানায়। প্যোর কটিজ ইনডাসট্রি!

কান্না পেল।

হ্যাঁ, একদা এরাই দুনিয়ার সেরা মসলিন—যার তরে দুনিয়ার সবচেয়ে ডাঙর বাদশা—চীনের বাদশা এদেশে বাজদূত পাঠিয়েছিলেন!

অবতরণিকা

॥ ৪ ॥

গোড়াতেই সরল সাধুতা ও সহজ ভাষায় পুনরায় স্বীকার করে নি, বাংলাদেশের অনবিস্মরণীয় ন' মাসের ইতিহাস লেখার মত পাণ্ডিত্য, তথ্যানুসন্ধান করার মত শক্তি, দূর তথা গভীর দৃষ্টিনিক্ষেপজনিত দার্শনিক বিজ্ঞতা আমার নেই। বস্তুত এদেশের স্কুল-বয় পর্যন্ত হেন কর্ম করার মত দুরাকাঙ্ক্ষী-জনকে বলে দিতে পারবে, দিনাজপুর থেকে চট্টগ্রাম, সিলেট থেকে বরিশাল জুড়ে ন-মাস ধরে যে ভূতের নৃত্য হয়ে গিয়েছে তার

সাক্ষ্যস্বরূপ মানুষের মনে, মাটির উপর নিচে যেসব সরঞ্জাম-নিদর্শন সঞ্চিত হয়ে আছে সেগুলো আংশিকভাবে সংগ্রহ করাও কঠিন কর্ম। গুণীজন বলবেন, করতে পারলেও অতঃপর শিখাগ্রে আরোহণ করে তার প্রতি সিংহাবলোকন[১] নিক্ষেপ দ্বারা সেগুলো আপনারা অন্তরে সংহরণ করে তার প্রতি ঐতিহাসিক তথা দার্শনিক সুবিচার করা অসম্ভব—উপস্থিত। বলা বাহুল্য আমা দ্বারা কস্মিনকালেও এহেন কর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। শতায়ু হলে না সহস্রায়ু হলেও না। তবু কেন যে যে-টুকু পারি লিখছি সেটা ধীরে ধীরে স্বপ্রকাশ হবে। উপস্থিত পাঠকের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ, এ বয়ান থেকে কেউ যেন প্রামাণিকতা প্রত্যাশা না করেন। একই ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শুনেছি। খুঁটিনাটিতে পার্থক্য থাকার কথা। সাজানো মিথ্যা সাক্ষ্যের বেলাতেই খুঁটিনাটিতেও কোনো হেরফের থাকে না। সত্য সাক্ষ্যে মূল ঘটনাতে নড়চড় হয় না; ডিটেলে বেশ-কিছুটা থাকবেই। এ ছাড়া যেসব কাহিনী-কেচ্ছা মুখে মুখে এখনো বিচরণ করছে তার অনেকগুলোই কবিজনের কল্পনাবিলাস বা আকাশকুসুম। কিন্তু তারও মূল্য আছে। ব্রজবিহারীকে সত্য সত্যই বিহারবাসী মনে করে রামপাঁঠা পাঠান ছেড়ে দিয়েছিল কি না তাতে বিন্দুমাত্র আসে-যায় না—আসল তত্ত্বকথা এই :—গল্পটা ক্যারেক্টারিস্টিক কি না, অর্থাৎ গল্পটাতে পাঠান ক্যারেকটারের নির্যাস, তার রাম-পন্টকামি ফুটে উঠেছে কি না। কাঠবেরালি সত্য সত্যই সর্বাঙ্গে ধুলো মেখে সেতুবন্ধের উপর সে-ধুলো ঝেড়ে রামচন্দ্রকে সাহায্য করেছিল কি না সেটা বিলকুল অবান্তব। গল্পটা বোঝাতে চায়, রাবণের ডিকটেটেরির বিরুদ্ধে তখন জনসাধারণ কি রকম উঠে পড়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। অবশ্য সেটা যদি সত্য হয় তবে তো প্ল্যাটিনামে ডায়মন্ড! নিয়াজীব কোলে ফরমান আলী, পিছনে দাঁড়িয়ে পাখা দোলাচ্ছেন, যশোবন্ত শ্রীমান গভর্নব ডঃ (?) মালিক!

১৯৬৯ সালের ২৫/২৬ মার্চ সকালবেলা পূর্ব পশ্চিম উত্তর পাকিস্তানের জনসাধাবণ শুনতে পেল "ছোট হিটলার ডিনেস্টির" পয়লা চোট্টা-ওয়ালা হিটলার স্বপ্রশংসিত স্বনির্বাচিত উপাধি "ফিল্ড মার্শাল" বিভূষিত, পৃথিবীর অন্যতম কোটিপতি, মার্কিন প্রেসিডেন্টের দোস্তো, মহামহিম শ্রীযুত আইয়ুব খানের পশ্চাদ্দেশে একখানি সরেস

---

(১) গুরুগম্ভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে যেখানে ফুটনোট অবর্জনীয় সে স্থলেও ওই প্রতিষ্ঠানটি আকছারই পীড়াদায়ক। আমার আটপৌরে হাবিজাবির বেলা তো কথাই নেই। তাই সবল পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তিনি আমার রচনার ফুটনোট না পড়লে মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না—(আসল না পড়লেও হবেন কি না সেটাও বিতর্কাতীত নয়)। আসলে ফুটনোটে এমন কিছু থাকা অনুচিত যেটা না পড়লে পরের মূল লেখা বুঝতে অসুবিধা হয়। অবশ্য মূলে (টেকসটে) কোনো তারাচিহ্ন দেখে যদি পাঠকের মনে হয় ওই বিষয়ে কিঞ্চিত আশকথা-পাশকথা শুনতে চান তবে সেটি সাধু প্রস্তাব। কিংবা আপনি বোক্কা একটি টাকা খরচা করেছেন বলে পত্রিকার বিজ্ঞাপনতক বাদ দিতে চান না তবে সেটা সাধুতর প্রস্তাব। কিন্তু পুনবপি হা—ফি—জ! ফুটনোট পড়ার বাধ্যবাধকতা নেই।

"সার্ভে" শব্দের গুজরাতী অনুবাদ "সিংহাবলোকন"। সিংহ যেরকম পাহাড়ের উপরে উঠে মাথা এদিকে ওদিকে ঘুরিয়ে চতুর্দিকে বিস্তৃত দৃষ্টিনিক্ষেপ করে সবকিছু দেখে নেয়। শব্দটি পর্যবেক্ষণজাত এবং সুন্দরও বটে, বাঙলায় চালু হলে ভালো হয়।

পদাঘাত দিয়ে জেনারেল আগা মুহম্মদ ইয়েহিয়া খান সুবে পাকিস্তানের ঢোটা হিটলার দি সেকেন্ড রূপে গদি-নশীন হয়েছেন। কিন্তু বিসমিল্লাতেই গয়লৎ (গলৎ)। "আগা" উপাধি সচরাচর ধারণ করেন ইরানবাসী শীয়ারা—"খান" উপাধিধারী হয় সুন্নী পাঠানেরা। এ যেন সোনার পাথরবাটি। কিন্তু "খান" অনেক সময় সম্মানার্থে সকলের নামের পিছনেই জুড়ে দেওয়া হয়—কাবুলে আমার এক জনপ্রিয় সখা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের নামের পিছনে কাবুলীরা খান জুড়ে দিত। সেটা কিছু আশ্চর্য নয়। এই সোনার বাংলাতেই "পশুপতি খান" গয়রহ আছেন।

আইয়ুবের পতনে পূর্ব বাংলায় যে মহরমের চোখের পানি ঝরেনি সেটা বলা বাহুল্য। একে তো তিনি আহাম্মুখের মত কতকগুলো মিলিটারি ইডিয়টের পাল্লায় পড়ে শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে একটা সম্পূর্ণ মনগড়া ষড়যন্ত্রের মামলা খাড়া করার হুকুম দেন, তদুপরি বিশ্বাসভাজন এক মার্কিন পত্রিকা হাটের মধ্যিখানে একটি প্রকাণ্ড বিষ্ঠাভাণ্ড ফাটিয়ে দিয়ে প্রকাশ করে দেয় যে মাত্র সাত বছর রাজত্বকালের মধ্যেই (১৯৬৫) তিনি কুল্লে পঁচিশ কোটি টাকার ধনদৌলত, ইতালির একটা দ্বীপে বিশাল জমিদারি (ওই অঞ্চলে ট্যুরিজম-এর জন্য ইতালীয় সরকারের বিস্তর কড়ি ঢালার মতলব ছিল যার ফলে ধূলি-মুষ্টি রেডিয়াম-মুষ্টিতে পরিণত হত) সাপটে নিয়েছেন আর ইওরো-মার্কিন ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে কত ডলার পাউন্ড, সুইস ফ্রাঁ জমা আছে তাব হিসেব বের করা অসম্ভব। কোনো কোনো দেশের ব্যাঙ্ক সে-দেশের ইনকাম ট্যাক্স বিভাগ, অর্থাৎ স্বয়ং সার্বভৌম সরকাব জানতে চাইলেও ঠোঁট সেলাই করে বসে থাকে।..ইয়েহিয়া রাজা হযে আইয়ুবের দৌলতের খোঁজে বেরিয়েছিলেন বলে কোনো খবর অন্তত আমি পাই নি। এটা পশ্চিম পাকের একটা সাদা-কালিতে লেখা আইন; ইসকন্দর মির্জাকে গদিচ্যুত করার পর আইয়ুব তাঁর ধনদৌলতের সন্ধান নেন নি। ইয়েহিয়াও আইয়ুবের হাঁড়ির চাল হাঁড়িতেই রাখতে দিলেন। শুধু তাই নয়। আগা-পাস্তলা হাতের কব্জায় পোরা পাকিস্তানী প্রেসকে জবানি হুকুম দেওয়া হল, আইয়ুব খানের খেলাপে যেন উচ্চবাক্য না করা হয়। ইনি মিলিটারির জাঁদরেল উনিও মিলিটারি জাঁদরেল—কাকে কাকের মাংস খায় না—বাংলা কথা।

ইয়েহিয়া জাতে কিজিলবাশ। তিনি দাবি ধরেন, তিনি নাদিরের বংশধর। ওই নিয়ে গবেষণা করার মত দলিল-দস্তাবেজ আমার নেই। তাঁর আদত পিতৃভূমি নাকি নাদিরের দেশে। ভুট্টোর বাস্তুভিটে লারখানাতে। তার অতি কাছে মোন-জো-দড়ো।[২] তিনি যদি আজ দুম করে দাবি জানান মোন-জো দড়োতে গলকম্বল দাড়িওলা যে রাজপানা চেহারাব মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়েছে তিনি তাঁর বংশধর, তবে ওই মোন-জো দড়োর আবিষ্কর্তা স্বয়ং রাখালদাস বাঁড়ুয্যে কি ধরাতলে অবতীর্ণ হয়ে বুক ঠুকে প্রমাণ করতে পাববেন তিনি আর পাঁচটা সিন্ধির মত সাড়ে বত্রিশ ভাজার বর্ণসঙ্কর।

---

(২) টীকা-পাঠ-নীতি উপেক্ষা কবে যাঁবা এটি পড়ছেন তাঁদের জানাই, শব্দটা এমনি ভিন্ন ভিন্ন বিদকুটে ঢঙে উচ্চারিত হয যে তার শুদ্ধ উচ্চাবণ নিয়ে আলোচনা সম্পূর্ণ অবান্তর নয। সিন্ধী ভাষায় "মো"="মৃত" (সংস্কৃত "মৃ" বাংলা "মৃত") "মোন"-এব "ন" বহুবচন বোঝায়। "জা"="—দের" ('S)। "দড়ো"="টিলা"। একুনে "মৃতদেব টিলা"। এক অত্যুৎসাহী সংস্কৃতজ্ঞ এটা লিখেছেন "মহেন্দ্রদ্বার"॥

কিন্তু কিজিলবাশ শব্দটি বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়। ভারতচন্দ্র লিখেছেন, রাজা বসে আছেন; তাঁর চতুর্দিকে কিজিলবাশ। টীকাকার ভেবেছেন "কিজিল" কথাটা 'কাজল' হবে—লিপিকারের ভুল। আর 'বাস' মানে তো 'কাপড়'। কালো পর্দার মাঝখানে রাজা বসে আছেন। আসলে কিজিল-বাশ মানে লাল টুপি (আমি যদ্দুর জানি, চুগতাই তুর্কী ভাষায়)। কিজিল-বাশরা লাল টুপি পরতো এবং ভারতবর্ষে প্রধানত দেহরক্ষী বা দরোয়ানের কাজ করতো। আজ আমরা যেরকম ভোজপুরী বা নেপালী দরওয়ান রাখি, বিদেশী বলে এ-দেশের চোর-চোট্টারা চট করে এদের সঙ্গে দোস্তী জমাতে পারবে না বলে। কিজিল-বাশরা শীয়া। এ দেশের সুন্নীদের ঘেন্না করে। ষড়যন্ত্রকারী বা চোর-চোট্টাদের পাত্তা দেবে না।

ইয়েহিয়া বাপ-পিতেমর ব্যবসাটি ডোবালেন। পাকিস্তানের রক্ষক ভক্ষক হলেন। বদহজমী হল। কবরেজ ভুট্টো তাকে প্যাঁজ পয়জারের জোলাপ বড়ি দিলেন ঠেসে। ইয়েহিয়ার ব্যক্তিগত চরিত্র বয়ান একটু পরে আসছে।

ইয়েহিয়া অবতীর্ণ হলেন মূর্তিমান কল্কিরূপে। একহস্তে গণতন্ত্র অন্যহস্তে পূব বাংলার প্রতি বরাভয় মুদ্রা। পূর্বেই নিবেদন করেছি, তিনি স্বীকার করলেন, পূব বাংলার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে তাবৎ মুশকিল আসান করে দেবেন। যে-সব মিলিটারি পিচেশ তাঁকে গদিতে বসিয়েছিল তারা ঘেন্নার সুরে বললে, 'বটে'!

বহুলোকের বিশ্বাস ইয়েহিয়া সেপাই; সেপাই মাত্রই বুদ্ধু হয়, অন্তত সরল তো বটে। তদুপরি তিনি মদ্যপান করেন প্রচুরতম। একবার নাকি সন্ধ্যাবেলা তার একটা বেতার ভাষণ দেবার কথা ছিল। ইংরেজ বলে, গড় মেড্ সিক্স ও ক্লক ফর হুইস্কি। সে সিক্স সন্ধ্যার ছটা। ইয়েহিয়া ঘুলিয়ে ফেলে সেটা সকাল ছটায় সরিয়ে এনেছেন। তদুপরি তখন বাস করেন পাঞ্জাবে এবং পঞ্চনদভূমি যে পঞ্চমকারের পীঠস্থল সে-কথা ক্রমে ক্রমে ঢাকা চাটগাঁ ধর্মভীরু মুসলমান পর্যন্ত জেনে গিয়েছিল ক্লাবে ক্লাবে পাঞ্জাবী সিভিলিয়ান অফিসারদের মেয়েমদ্দে হইহই বেলেল্লাপনা করা দেখে। বিস্ময় মেনে একে অন্যকে শুধিয়েছে "এরাও মুসলমান?" সে-কথা উপস্থিত থাক। সাঁঝের ঝোঁকে ইয়েহিয়ার বেতার ভাষণ দেবার কথা। কিন্তু তিনি তখন এমনই বে-এক্তেয়ার যে কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। মুলতবী করা হল ঘণ্টা দুয়েকের তরে। তখনো অবস্থা তদবৎ। শেষটায় রাত দশটা না বারোটায়, বার দুই মুলতবী রাখার পর—আমি সঠিক জানিনে—মাই-ডিয়ার-মাই-ডিয়ার জড়ানো গলায় তিনি লিখিত ভাষণের পঠন কর্মটি সমাধান করে পাক বেতার কর্তৃপক্ষকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধন করলেন।

অথচ লোকটা অতিশয় ঘড়েল, কুচক্রী, বিবেকহীন এবং পাশবিকতম অত্যাচারের ব্যবস্থা করাতে অদ্বিতীয়। আমি ভেবে-চিন্তেই "অদ্বিতীয়" বললুম। একাধিক ফ্রয়েডিয়ান ঐতিহাসিকের মুখে আমি শুনেছি—আর নিজে তো পড়েছি ভুরি ভুরি—তাঁদের জানা মতে, কিংবদন্তীর উপর বরাত না দিয়ে, কেবলমাত্র প্রামাণিক ইতিহাসের উপর নির্ভর করে বলতে গেলে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় হাইনরিষ হিমলাব অদ্বিতীয়। ১৯৭১-এর পর এঁদের সঙ্গে দেখা হয়নি। আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই, এখন তাঁরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবেন ইয়েহিয়ার তুলনায় হিমলার দুগ্ধপোষ্য—শিশু—শিশু—শিশু।

কারণ হিমলারের বিরুদ্ধে কি ন্যুর্নবের্গ, কি হল্যান্ড বেলজিয়ম বা অন্যত্র এ অভিযোগ

কস্মিনকালেও উত্থাপিত হয়নি যে তার চেলাচামুণ্ডারা নারীধর্ষণ করেছে। তাদের স্তনকর্তন, দেহে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা লাঞ্ছন-অঙ্কন এবং অবর্ণনীয় অন্যান্য অত্যাচারের কথাই ওঠে না।

ইয়েহিয়ার পৈশুন্য প্রগ্রামে এ-আইটেম ছিল। এবং সর্বপ্রকার পৈশাচিক ক্রূরতায় দক্ষতা লাভের জন্য কোনো এক দেশে বিশেষ একটা প্রতিষ্ঠান আছে। ইয়েহিয়া তার জোয়ান এবং অফিসারের বাছাই বাছাই স্যাডিস্টদের সেখানে পাঠায়।

কিছুদিন পূর্বে ভুট্টো প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন, "বাংলাদেশে ইয়েহিয়ার মিলিটারি বলপ্রয়োগে আমার সম্মতি ছিল তবে অ-ত খানি না।"

ইস্তের

পূর্ব-পশ্চিম উভয় পাকিস্তানের পয়লা নম্বরী নটবর ছিলেন—এখানে সীমিত ভাবে আছেন—ইয়েহিয়া খান। তিনি তাঁর হারেমের জন্য জড়ো করেছিলেন দেশ-বিদেশে থেকে হরেক রকম চিড়িয়া। এ-রকম একটা আজব কলেকশন কে না এক বারের তরে নয়ন ভরে দেখতে চায়? ইয়েহিয়ার কাবেল ব্যাটাও দেখলেন, এবং একটিতে মজেও গেলেন। কুলোকে বলে বাপ-ব্যাটাতে নাকি তাকে নিয়ে রীতিমত ঝগড়া-কাজিয়া হয়। আখেবে বাপই নাকি জিতেছিলেন। এই নিয়ে পাকিস্তান বাংলাদেশ উভয় মুল্লুকের সংবাদপত্রে মেলা রগরগে কেচ্ছা বেরোয়। আমাকে এক সাংবাদিক শুধোলেন, "মেয়েটা এ-লড়ায়ে নিল কোন্ পক্ষ?" আমি বললুম "দুটো কুকুর যখন একটা হাড্ডির জন্য লড়ে তখন হাড্ডিটা তো কোন পক্ষ নেয় না। এটা আপ্তবাক্য, আমার আবিষ্কার নয়।" সাংবাদিক তখন আরো বিস্তর নযা কেচ্ছাকাহিনী শোনালেন।

তবে হ্যাঁ, এ-কথা নাকি কেউই অস্বীকার করেনি যে তাঁর হারেমের মুকুটমণি নাকি পূব বাঙলার একটি মেয়ে। তিনি শ্যামা। তাই তাঁর পদবী "ব্ল্যাক বিউটি"—"কালো মানিকও" বলতে পারেন। তাঁর স্বামী একদা পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ আপিসাব ছিলেন এবং ইয়েহিয়া একবার সে-শহর পরিদর্শন করতে গেলে তাঁব গৌরবে চিরপ্রথানুযায়ী বিরাট এক পার্টি দেওয়া হয়—কিংবা তিনিই দেন। সে পার্টির "প্রাণ" ছিলেন ব্ল্যাক বিউটি। বর্ণনাতীত স্মার্ট। ইয়েহিয়া মুগ্ধ হলেন। উভয়কে ইসলামাবাদে বদলী করা হয়। পুলিশম্যানকে অস্ট্রিয়া না কোথায় যেন রাজদূতরূপে পাঠানো হল। এটা কিছু নূতন পদ্ধতি নয়। তিন চার হাজার বছর পূর্বে ইহুদীদের রাজা ডেভিড এক বিবাহিত রমণীতে মুগ্ধ হয়ে তাকে গর্ভদান করেন। এবং যে রণাঙ্গনে তখন যুদ্ধ চলছিল সেখানে (বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি) "দায়ুদ যোয়ারের নিকটে (সেনাপতিকে) এক পত্র লিখিয়া ঊরিয়ের (ঐ রমণীর স্বামীর) হাতে দিয়া পাঠাইলেন। পত্রখানিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, তোমরা এই ঊরিয়কে তুমুল যুদ্ধের সম্মুখে নিযুক্ত কর, পরে ইহার পশ্চাৎ হইতে সরিয়া যাও, যেন এ আহত হইয়া মারা পড়ে।" (শমুয়েল ১১: ৮-২৪)।

ইয়েহিয়া উপরে উল্লেখিত চালের দ্বিতীযার্ধ সুসম্পন্ন করেননি, তবে এস্থলে কালো মানিক কাহিনীর কালানুক্রমিক ক্রমবিকাশ ছিন্ন করে পরবর্তী একটি ঘটনার উল্লেখ করলে কাহিনীটির পরম্পরা অক্ষুণ্ণ থাকে · ভুট্টো রাজা হয়ে ইয়েহিয়ার চরিত্রদোষ নিয়ে গবেষণা করার জন্য পরশ্রীকাতরদের যে-সময় লেলিয়ে দিলেন ঠিক সেই সময়ে ব্ল্যাক

বিউটির কাবিন-নামা-সম্মত স্বামী অস্ট্রিয়ার পদস্থলে অকস্মাৎ হার্টফেল করে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেন। বিধির উপর সে ঘটনা কি প্রকারের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল সে-বিষয়ে সমসাময়িক ইতিহাস নীরব।

তবে তিনি তাহার বহু পূর্বেই ইয়েহিয়ার গৌরবসূর্যের মধ্যগগনকালে মাদাম পম্পাদুরে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছেন।

যে-বাড়ির উপরের তলায় বসে ইয়েহিয়া দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করতেন তার নিচের তলায় বসতেন আর্মির হোমরা-চোমরারা। তাঁরা সরকারি তাবৎ কাগজপত্র, বিশেষ করে সরকারি বেসরকারি স্পাইদের রিপোর্ট পড়তেন, আপোসে আলোচনা করে সিদ্ধান্তগুলো পেশ করতেন হুজুরের কাছে দোতলায়, তাঁর শেষ হুকুমের জন্য—সে বাবদে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। নিচের তলার জাঁদরেলদের মোড়ল ছিলেন ইয়েহিয়ার সর্বোচ্চ পদধারী স্টাফ অফিসার লেফটেনেন্ট-জেনারেল পীরজাদা। ইনিই ছিলেন রাজা ইয়েহিয়ার চাণক্য—কদর্থে।

কিন্তু যে-ই হোন, আর যা-ই হোন সব্বাইকে প্রথম যেতে হত কালো মানিকের খাস-কামরায়—এস্তেক পীরজাদাকেও। সে-যাওয়াটা নিতান্ত একটা লৌকিকতা ছিল বলে মনে হয় না। তবে কি তিনি ইয়েহিয়াকে ততখানি গ্রাস করতে পেরেছিলেন, যতখানি সেক্রেটারি বরমান নাটকের শেষাঙ্কে হিটলারকে কব্জায় এনেছিলেন? এ-বিষয়ে আমার অসীম কৌতূহল। কারণ যে বাইবেল থেকে আমি অল্পক্ষণ আগে একটি উদাহরণ দিয়েছি সেই বাইবেলেই আরেকটা উদাহরণ আছে যেটা কালো মানিকের সঙ্গে টায় টায় মিলে যায়। পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হতে পারে, কিন্তু আমি নিরুপায়। রগরগে কেলেঙ্কারি কেচ্ছার কাহিনী লেখার জন্য আমার চেয়ে যোগ্যতর অনেক গুণী আছেন। অধম সর্বক্ষণ সর্ব ঘটনার পূর্ব উদাহরণ খোঁজে ধর্মের তুলনাত্মক ইতিহাসে।

ইরাণের দিগ্বিজয়ী সম্রাজ অহশ্বেরশ—Artaxerxes—আপন রানীর ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে অন্য রানীর সন্ধানে রাজপ্রাসাদে অসংখ্য সুন্দরী সমবেত করলেন তাঁর বিশাল রাজত্বের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে। এঁদেরই একজন ইহুদি তরুণী সুন্দরী ইস্তের। নম্র স্বভাব ধরে ও অল্পে সন্তুষ্ট। রাজা স্বয়ং বিশুদ্ধ আর্য বংশীয়; পক্ষান্তরে ইহুদিদেরও জাত্যাভিমান কিছুমাত্র কম নয়—তারা "সদাপ্রভু য়েহোভার স্বনির্বাচিত সর্বশ্রেষ্ঠ জাত।" ইস্তেরের সৌন্দর্যে ও আচরণে মুগ্ধ হয়ে রাজা স্বহস্তে তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন।

রাজার প্রধানমন্ত্রী হামন য়িহুদিদের প্রতি এতই বিরূপ ছিলেন যে সে জাতকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে রাজার সম্মুখে নিবেদন করলেন :

(বাইবেলের ভাষায়) "আপনার রাজ্যের সমস্ত প্রদেশস্থ জাতিগণের মধ্যে বিকীর্ণ অথচ পৃথককৃত এক জাতি আছে ("বাঙালরা" সর্বত্র "বিকীর্ণ" না হলেও তারা যে অত্যন্ত "পৃথককৃত" সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই—লেখক); অন্য সকল জাতির ব্যবস্থা হইতে তাহাদের ব্যবস্থা ভিন্ন (পাঞ্জাবী পাঠান বেলুচদের "ব্যবস্থা" থেকে বাঙালির ব্যবস্থা যে ভিন্ন সে কথা তারাও জানে, আমরাও জানি। হামন বলেননি, কিন্তু এ-স্থলে আমরা, বাঙালিরা বলি, এবং তাই নিয়ে আমরা গর্ব অনুভব করি—লেখক); এবং তাহারা মহারাজের ব্যবস্থা পালন করে না।" হামনের মতে এইটেই তাদের সর্বপ্রধান পাপ। আমরা বাঙালিরা বলি, "পালন করেছি, পালন করেছি,—সাধ্যমত পালন করেছি,

ঝাড়া তেইশটি বছর ধরে। নিতান্ত যখন সহ্যের সীমানা পেরিয়ে গিয়েছে তখন আপত্তি জানিয়েছি অত্যন্ত অহিংসভাবে; খানরা তখন নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালিয়েছে।"

হামন তাই সর্বশেষে সম্রাট অহশ্বেরশের সামনে নিবেদন করলেন :

"যদি মহারাজের অভিমত হয়, তবে তাহাদিগকে বিনষ্ট কর:ত লেখা হউক।"

সম্রাট সেই আদেশ দিলেন। এবং যেহেতু তিনি সম্রাট তাই লুকোচুরির ধার ধারেন না। তাই তাঁর লিখিত আদেশ—"ধাবকগণ দ্বারা রাজার অধীন সমস্ত প্রদেশে প্রেরিত হইল যে একই দিনে, অদর মাসের ত্রয়োদশ দিহে যুবা ও বৃদ্ধ, শিশু ও স্ত্রী সুদ্ধ সমস্ত য়িহুদী লোককে সংহার, বধ ও বিনাশ এবং তাহাদের দ্রব্য লুট করিতে হইবে।"

ইয়েহিয়া রাজা নয়। দারওয়ান বংশের দাস। সে ২৫ মার্চ শেখ মুজিব এমন কি তার ইয়ার ভুট্টোকে না জানিয়ে—ভুট্টোকেও বিশ্বাস নেই, পাছে সে ফাঁস করে দেয়—ঢাকা থেকে পালিযে যাবার সময় তার কসাই টিক্কা খানকে আদেশ দিয়ে যায়, "আমি নির্বিঘ্নে কবাচী গিয়ে পৌঁছই—বলা তো যায় না, 'দ্যাট উয়োমেনের' হুকুমে ইন্ডিয়ানরা আমার প্লেনে বঙ্গোপোসাগরে বা আবব সাগরে হামলা করতে পারে। করাচী গিয়ে মাত্র তিনটি শব্দের একটি কোড রেডিয়োগ্রাম পাঠাবো—'সর্ট দেম আউট'—টেনে টেনে বের করো বাছাই বাছাই মাল।" বাকিটা যথাস্থানে হবে। ইস্তেরের কাহিনীতে ফিরে যাই।

বলা বাহুল্য, যিহুদিদের ভিতর হাহাকার পড়ে গেল।

ইস্তেরের পিতৃব্য তখন বাজাব কঠোর আদেশ তাঁকে জানালেন এবং "তিনি যেন বাজাব নিকটে প্রবেশ করিযা তাহাব কাছে বিনতি ও স্বজাতিব জন্য অনুরোধ কবেন, এমন আদেশ করিতে বলিলেন।"

ইস্তের বাজাব সম্মুখে উপস্থিত হলেন। বাজা বললেন, "ইস্তেব বানী. তোমাব নিবেদন কি? বাজ্যের অর্ধেক পর্যন্ত হইলেও তাহা সিদ্ধ কবা যাইবে।" ইস্তের বললেন, "যদি মহারাজেব ভাল বোধ হয তবে য়িহুদীদিগকে বিনষ্ট কবণার্থে যে সকল পত্র লিখিত হইযাছে সে সকল ব্যর্থ করিবাব জন্য লেখা হউক। কেননা আমার জাতির প্রতি যে অমঙ্গল ঘটিবে, তাহা দেখিয়া আমি কিরূপে সহ্য করিতে পারি?"

রাজা তদ্দণ্ডেই য়িহুদীদিগকে অভয় দিলেন। তাঁব সে-পত্র "অহশ্বেরশ রাজার নামে লিখিত ও রাজার অঙ্গুরীয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল, পরে দ্রুতগামী বাহনারূঢ় অর্থাৎ বড়রাজার বাজকীয় অশ্বে আরূঢ় ধাবকগণের হস্তদ্বারা সেই সকল পত্র প্রেরিত হইল।" (ধর্মপুস্তক অর্থাৎ পুরাতন ও নূতন নিয়ম, এষ্টের, ১—৮; ২—১৩)।

দুষ্ট মন্ত্রীর চক্রান্ত বুঝতে পেরে রাজা গণনিধনের মত মহাপাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হন। বাংলাদেশের এই ন-মাস-জোড়া গণনিধন প্রচেষ্টা বিশ্বজন শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল—সাহায্য করলো একমাত্র ভারত। সে তার ধর্মবুদ্ধি বাইবেল থেকে সংগ্রহ করে না। শুনেছি রাষ্ট্রপতি নিকসন খৃষ্টান; তাই বিবেচনা করি তিনি বাইবেল পড়েন নি। কিন্তু এহ বাহ্য।

আমাব মনে প্রশ্ন জাগে, ইয়েহিযা যখন ব্ল্যাক বিউটির স্বজাতি, জ্ঞাতি কুটুম্বের সর্বনাশ করেছিলেন তখন তিনি কি একবারের তরেও ভাবেননি—ইস্তেরের আপন ভাষায়—"আপন জাতি কুটুম্বের বিনাশ দেখিয়া কি করিয়া সহ্য করিতে পারি?"

এ-কাহিনীর একটি ঘটনার উল্লেখ আমি এতক্ষণ করিনি।

পিতৃব্য যখন ইস্তেরকে আদেশ দেন "তিনি যেন রাজার নিকটে প্রবেশ করেন", তখন ইস্তের প্রথমটায় ভয় পেয়েছিলেন কারণ "প্রজারা সকলেই জানে, পুরুষ কি স্ত্রী, যে কেহ আহূত না হইয়া ভিতরের প্রাঙ্গণে রাজার নিকট যায়, তাহার জন্যে একমাত্র ব্যবস্থা এই যে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।"

পিতৃব্য ইস্তেরের ভীতির কথা শুনে তাঁকে জানান :—

"সমস্ত য়িহুদীর মধ্যে কেবল তুমি রাজবাটিতে থাকাতে রক্ষা পাইবে, তাহা মনে করিয়ো না। ফলে যদি তুমি এ সময়ে সর্বতোভাবে নীরব হইয়া থাক তবে অন্য কোনো স্থান হইতে য়িহুদীদের উপকার ও নিস্তার ঘটিবে (বাংলাদেশের বেলা তাই হল—লেখক), কিন্তু তুমি আপন পিতৃকুলেব সহিত বিনষ্ট হইবে; আর কে জানে যে, তুমি এই প্রকার সময়ের জন্যই রাজ্ঞীপদ পাও নাই (এ-স্থলে রাজবল্লভা হও নাই!)"

বাঙালির "উপকার ও নিস্তার" ঘটেছে, এখন প্রশ্ন ব্ল্যাক বিউটি কি নিস্তার পেয়েছেন? কিন্তু এই সর্ব বাক্য বাহ্য।

ব্ল্যাক বিউটি গৌণ, তাঁর বৈধব্যপ্রাপ্তি গৌণ, তাঁর সর্বৈব গৌণ।

পৃথিবীর গণনিধন ইতিহাসে "ইস্তেরে" তার প্রথম প্রামাণিক উল্লেখ।

অধম যখন তার প্রথম অবতরণিকায় বলেছিল, এ-ন মাসের বহু বিচিত্র ঘটনা থেকে সৃষ্ট হবে পুরাণ, এপিক, রূপকথা, লোকগীতি তখন সে ক্ষণতরে বিস্মৃত হয়েছিল যে রচিত হবে সর্বোপরি নবীন শাস্ত্রগ্রন্থ।

শেখের জয়

সাধারণ নির্বাচন তথা গণতন্ত্রের আশ্বাস দিয়ে পরে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে কেউ যে কখনো, এমন কি এ-যুগে, ডাঁটে রাজত্ব করেন নি এমন নয়। কিন্তু ইয়াহিয়া জানতেন, রাজত্ব তিনি করতে পারবেন তবে সে-রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হবে না—অতখানি দূরদৃষ্টি তাঁর ছিল। তদুপরি উভয় পাকিস্তানের লোক ঝাড়া সাড়ে দশটি বচ্ছর ধরে স্বাধিকারপ্রমত্ত ডিকটেটরি শাসনের চাবুক খেয়ে খেযে হন্যে হয়ে উঠে আইয়ুবের পতন ঘটিয়েছে; ইয়াহিয়াও যদি ডিকটেটরি করতে চান তবে তাঁকেও মোটামুটি আইয়ুবের প্যাটার্নই বুনতে হবে এবং জোলাপ দিতে হবে আরো বড়া এবং কড়া ডোজে। কারণ ইতিমধ্যে জনসাধারণ ডিকটেটরির ফন্দিফিকির খাসা বুঝে গিয়েছে এবং সেগুলোকে কি কৌশলে বানচাল করতে হয় সেটাও বিলক্ষণ রপ্ত করে নিয়েছে। একটি সামান্য সরেস উদাহরণ দি। যারা সুদ্দুমাত্র আলা ভিনসেন্ট স্মিৎ এবং তাঁর গুরুকুল মোগল অ্যাডমিনিসট্রেশনের ওয়াকেআ-নবীস (waknis) পর্চা-নবীস সম্প্রদায়ের নিছক সন তারিখসহ ঘটনার ফিরিস্তি সর্বোৎকৃষ্ট পাঠ্যবস্তু বলে বিশ্বাস করেন আমি তাঁদের সেবা করাব মত এলেম পেটে ধরিনে। আমি বরঞ্চ সেই সব মোগল লেখকেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করি যাঁরা ইতিহাসের বাহানায় গালগল্প শোনাতেন, মাঝেমিশেলে গুল তক্ মারতেন! অর্থাৎ ঘুমন্ত ইতিহাসের হাত দিয়ে গাঁজা খেয়ে নিতেন।

লোকটি আমার ভায়রা। গাব্দাগোব্দা ইয়া লাশ। রসবোধ প্রচুর। তিনি তখন মৈমনসিংয়ের সিভিল সার্জান। কি একটা ছোট্ট চাকরি খালি পড়েছে। এমন সময় আইয়ুবের প্যারা গবর্নর মোনেম খান করলেন ডাক্তারকে ট্রাঙ্ক কল। হুঙ্কার দিয়ে

বললেন, 'অমুককে চাকরিটা দেবে।' পরিচয় যৎসামান্য কিন্তু সুবেদার মোনেম বাপের বয়সী লোককেও তুমি তুই করতেন।

ডাক্তার ফোনের ক্রেডলকে বাও বাও করতে করতে সবিনয় বললেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

পরের দিনেই ফাইনাল ডিসিশন। ডাক্তার গবর্নরেব প্যারাকে নোকরী দিলেন না।

সন্ধ্যার সময় ঢাকা থেকে ফের ট্রাঙ্ক কল।

"কী, তোমার এত আস্পদ্দা! আমার হুকুম অমান্যি করলে? জানো, আমি তোমার চাকরি খেতে পারি—"

এইটে ছিল তাঁর হট্‌ফেভ্‌রেট হুমকি! জাতে ছিলেন মাছি-মারা বটতলীয়া সিকি কড়ির উকীল। কাজ ছিল আদালতকে 'হুজুর হুজুর'-এর প্রচুর তৈলমর্দন করে দু-চারটে জামিন মঞ্জুর করিয়ে নিয়ে হুমা গাঁয়ের বাড়িতে হাঁড়ি চড়ানো কড়ি কামানো। এ-সব আমার শোনা কথা। তবে মোনেম সম্বন্ধে দশের মুখ যা বলছে তার থেকে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, স্বয়ং হিটলারও এমন তাঁবেদার খিদমৎগার মোসায়েব কপালে নিয়ে ডিকটেটর হন নি—আইয়ুবের কপালে যা নেচেছিল।

সুবেদাবের হুঙ্কার শুনে ডাক্তার বললেন, "একশ বাব পারেন, সার, একশ বার পারেন। কিন্তু লোকটা—"

"আমি কিছু জানতে চাইনে—"

"আমার কথাটা শুনুনই না, স্যর। ছেলেটাকে আমি শুধালুম, 'আমাদের লাট সায়েবের নাম কি?' বলে কি না, 'মুহম্মদ মুফিজ চৌধুরী!' তারপর—"

ডাক্তাব বললেন, "দড়াম করে শব্দ হল। ডেড্‌ কট্‌ অফ্‌ফ!"

আমি অবাক হয়ে বললুম, "আপনার বুকের পাটা তো কম নয!"

ডাক্তার অতিশয় সবিনয় : "কী যে বলেন, ভাই সায়েব। আপনি জানেন না যে যত ছোটা হিটলারের ক্ষুদে বাচ্চা হয় তার দেমাক-রওয়াব তত টনটনে। সেখানে মোকা মাফিক খোঁচা মারতে পারলেই তিনি বন-ফাযার! কী! আমার নামটা পর্যন্ত জানে না যে বুড়বক—ইত্যাদি।"

এ-রকম আরো বিস্তর কায়দা রপ্ত করে নিয়েছিল বাংলাদেশের অতিশয় নিরীহজনও—তবে হিউমার দিয়েও যে হিটলাবী হুকুম বানচাল করা যায়, আমার কাছে এই তার প্রথম ও শেষ উদাহরণ।

তাই ইয়েহিয়া স্থির করলেন, ভিন্ন মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করতে হবে। দাও গণতন্ত্র, হাতে রাখো কলকাঠি।

বয়স্ক পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, ইংরেজের কাছে স্বরাজের কথা তুললেই সে বলতো, 'আলবাৎ স্বরাজ দেব। হিন্দু চায় অখণ্ড ভারত, মুসলমান চায় পাকিস্তান, আর নেটিভ স্টেটের মহাবাজারা চান, যেমন আছে তেমনি থাক, তোমাদের সঙ্গে সন্ধির শর্ত ছিল, আমরা তোমাদের ব্রিটিশ ইন্ডিয়াব স্বার্থে হাত দেব না, আর তোমরা আমাদের রক্ষা করবে। তোমরা চলে গেলে আমাদের রক্ষা করার জিম্মেদারী নেবে কে? তাই তোমরা তিন দল এক মত হয়ে এক গলায় বলো, কোন্ ঢঙের, কোন্ সাইজের কোন্ রঙের স্বরাজ চাও তোমরা। একমত হলেই আমবা খালাস।'

এটা ডিভাইড অ্যান্ড রুল নয়, এটা 'ডিভাইড অ্যান্ড ডোন্ট কুইট ইন্ডিয়া'।

ইয়েহিয়া সেই মৎলবই আঁটলেন। ইংরেজ তাঁর ফাদার মাদার গর্ভস্রাব জারজ-সন্তানও প্রকৃত পিতার হদিস পেলে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। আর কে না জানে, তাবৎ নৃতত্ত্ববিদ এক বাক্যে বলেন, ইয়েহিয়ার যে অঞ্চলে জন্মভূমি সেখানে বিস্তর জাত-বেজাত এসে মিশেছে—দেদার বর্ণসঙ্কর।

ইয়েহিয়া হিসেব করে দেখলেন, গণনির্বাচনে কোনো দলই সংখ্যাগুরু হবে না। পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তান তো এক হতেই পারে না। এক পশ্চিম পাকিস্তানী ওয়াকিফহাল সজ্জন বলেছেন, 'পাকিস্তানের দুটো ডানা (উইং)—পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান। আমি দুটো পাখাই দেখেছি, কিন্তু পাখিটাকে কখনো দেখতে পাই নি।' তাই যে পাখিটা আদৌ নেই তার দুটো ডানা পলিটিকাল পার্টি মাফিক টুকরো টুকরো করতে কোনো অসুবিধা তো নেই। ইংরেজের মত তিনিও বহুধা বিভক্ত উভয় পাকিস্তানের উপর বহুকাল ধরে রাজত্ব করে যাবেন। ইনশাল্লা সুবহানাল্লা!

গুপ্তচরদের শুধোলেন, 'পাকা খবর নিয়ে বলো দেখি, কোন্ পার্টি কত ভোট পাবে বলে অনুমান করা যায়।'

এ-স্থলে ওয়াকিফহাল মহলে নানা মত প্রচলিত। এক দল বলেন, ডিকটেটরদের সঙ্গে যারাই কাজ-কারবার করেছে তারাই জানে, ডিকটেটররা শুনতে চান সেই রিপোর্ট যেটা আপন মনের মাধুরীর সঙ্গে মিশে যায়। ডিকটেটররা চিরকালই দাবি করেন তাঁবা এক অলৌকিক ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা দেখতে পান। গুপ্তচরের বিপোর্ট যদি সেই ভবিষ্যৎকে সায় দেয় তবে উত্তম, নইলে সেটা গডড্যাম অবজেকটিভ, বাস্তব—কিন্তু বর্তমানেব বাস্তব। আখেরে ভোটের ফলাফল কি হবে সেটা এ-রিপোর্ট প্রতিবিম্বিত করছে না। তবে গুপ্তচরদের কাছ থেকে রিপোর্ট চাওয়ার প্রয়োজনটা কি? সেটা শুধু সন্দেহপিচেশ দু-একটা মূর্খ জেনরেলদের বোঝাবার জন্য যে কোনো পার্টিই মেজরিটি পাবে না।

১৯৭০-এর মাঝামাঝি—আমার মত—কিংবা হেমন্তে শীতে যাঁরাই এ দেশে বেড়াতে এসেছেন তাঁহাদের মনে কোনো সন্দেহ হয় নি যে শেখ নাও জিততে পারেন। তবে তিনি যে আখেরে গণতন্ত্রের ইতিহাসে অভূতপূর্ব—এ-রকম একটা থান্ডারিং মেজরিটি পেয়ে যাবেন সেটা বোধ হয় কেউই কল্পনা করতে পারেন নি। তৎসত্ত্বেও ইয়েহিয়ার টিকটিকিরা নির্বাচনের শেষ ফল কি হবে সে-সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ—রাশি গণনা পাঠালেন সেটা ইয়েহিয়ার দোস্ত দুশমন উভয়কেই আজ অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে বেকুব বানিয়ে দেবে।

অ্যাসেমব্লিতে সীট ৩০০টি। তদুপরি আরো তেরোটি সীট বেগমসায়েবাদের জন্য সংরক্ষিত; ইয়েহিয়ার স্টাটিসটিশিয়ান বা বৈজ্ঞানিক গণৎকার টিকটিকিরা নিম্নের ছক কেটে দিলেন। উভয় পাকিস্তান মিলে সীট পাবেন—

আওয়ামি লীগ	...	৮০
কয়ুমের মুসলিম লীগ	...	৭০
মুসলিম লীগ (দৌলতনা দল)	...	৪০
ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি (ওয়ালি দল)	...	৩৫
পাকিস্তান পিপল্স্ পার্টি (ভুট্টো)	...	২৫

বাদবাকি সীটগুলো মোটামুটি এই হারেই হবে—আভাস দিলেন ফলিত জ্যোতিষীরা।

ইয়েহিয়া উর্দু বলার সময় হনুকরণ[১] করেন যুক্তপ্রদেশের (সেটা ইন্ডিয়ায়—তওবা, তওবা!) উর্দুভাষীদের। সেই উচ্চারণে সানন্দে হুঙ্কার ছাড়লেন ইয়েহিয়া "ইয়েছ!" নামের সঙ্গে আনন্দসূচক বিস্ময়বোধক ধ্বনি হুবহু মিলে গেল।

কিন্তু হায়, কাশীরাম দাস এই গৌড়ভূমিতেই আপ্তবাক্য বলে গিয়েছিলেন :

কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে?
কতক্ষণ থাকে শিলা শূন্যেতে মারিলে?

ভোটাভুটির শেষ ফল যখন বেরুলো তখন দেখা গেল :—

আওয়ামি লীগ	...	১৬০
ভুট্টোর পাকিস্তান পিপল্স্ পার্টি	...	৮১
কয়ুমেব মুসলিম লীগ	...	৯
মুসলিম লীগ (দৌলতনা দল)	...	৭
ন্যাশন্যাল আওয়ামি পার্টি (ওয়ালি দল)	..	৬
পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন পার্টিতে সর্বসাকুল্যে	...	২১
ইনডিপেনডেন্ট	..	১৬
		৩০০

দুই হিসেব মেলালে কার না চক্ষু স্থির হয়!

মহিলাদেব সংরক্ষিত তেরোটা সীট থেকে আওয়ামি লীগ পেল আবো সাতটি সিট—একুনে ১৬৭। পূর্ব বাঙলায় সীট ছিল সর্বসমেত ১৬৯; অর্থাৎ মাত্র দুটি সীট আওযামি লীগ পায়নি।

বিগলিতার্থ অ্যাসেমব্লিতে ভুট্টোকে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সব দল এক গোযালে ঢুকলেও আওয়ামি লীগকে হারাতে পারবেন না।

লেগে গেল ধুন্দুমার। ইয়েহিয়া স্পষ্ট দেখতে পেলেন অ্যাসেমব্লিতে এখন তিনি গোটা পাঁচেক দলকে বাঁদর নাচ নাচিয়ে আপন ডিকটেটবি অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতের সঙ্গে "হাজার বছ্ব ব্যাপী মোকাবেলা" করে যেতে পারবেন না।

আইনত ভুট্টো কেবলমাত্র বিরোধী দলের নেতৃত্ব করতে পারেন। কিন্তু তিনি উচ্চকণ্ঠে বলে বেড়াতে লাগলেন, মুজীব যে-রকম পূর্ব পাকিস্তানের নেতা তিনিও তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা। এখন এসে গেছে দুই পাকিস্তানের মোকাবেলার লগ্ন।

এ-স্থলে প্রথমেই বলতে হবে, উভয় পাকিস্তানের মোকাবেলা বা সংঘর্ষের আশা বা আশঙ্কার কথা শেষ সাহেব কখনো তোলেন নি। ভোটাভুটিতে বিরাট সংখ্যাধিক্য পাওয়াব পবও তিনি কখনো বলেন নি—এইবারে আমরা তাবৎ সমুচা পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের উপর বাজত্ব করবো—যদিও সেটা বলার আইনত ধর্মত সর্ব হক্ক আওয়ামি লীগের ছিল। ভুট্টো যদি এখনো বলেন "পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়নি, জিন্দাবাদ অখণ্ড পাকিস্তান" তবে আওয়ামি লীগের এখনো সে কথা বলার হক্ক আছে।

বস্তুত জনাব ভুট্টো যদি নিজের জীবন্ত-সমাধির তামাসা নিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে চান, তবে অখণ্ড পাকিস্তান সরকারের কানুন অনুযায়ী তিনি ন্যাশনাল

(১) ববীন্দ্রনাথেব সর্বাগ্রজ দ্বিজেন্দ্র একদা লেখেন : টু ইমিটেট=অনুকরণ : টু এপ্ (ape)= হনুকবণ। ইংরিজি ধ্বনি তাত্ত্বিকরা এই ককনি H হ-টি লক্ষ্য করবেন।

অ্যাসেমব্লির অধিবেশন ডাকুন ঢাকায়, যেটা ৩রা মার্চ ১৯৭১ হওয়ার কথা ছিল। তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কি না সেটা সংবিধানিক আইনে যদিও বিতর্কাধীন—আমরা না হয় তাঁকে আবু হোসেনের মত একদিনের তরে খলিফে বানিয়ে দিলুম। ভয় নেই পাঠক, পশ্চিম পাকিস্তানের বিস্তর মেম্বরও গুড়ি গুড়ি হামাগুড়ি দিয়ে আসবেন—সে-ব্যবস্থা সেই হারাধনের একুশটি পরিবার পরমানন্দে করে দেবেন। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, ৩রা মার্চের অধিবেশনে পশ্চিম পাক থেকে কোনো সদস্য যদি ঢাকা আসার চেষ্টা করেন, তবে ভুট্টো তাদের "ঠ্যাং ভেঙে দেবার" হুমকি দেন। তৎসত্ত্বেও বেশ কয়েকজনা অক্ষত ঠ্যাং নিয়েই এসেছিলেন। বাকিরা আসতে পারেন নি—প্লেনে সীট পান নি বলে। বস্তুত বঙ্গবন্ধু ওই সময়ে, ৩রা মার্চ ১৯৭১-এ বলেন, "এটাকে ট্র্যাজিক বলতে হয় যখন প্লেনগুলো (মিলিটারি প্লেন নয়—লেখক) পশ্চিম পাকের সদস্যদের নিয়ে আসার কথা তখন সেগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে মিলিটারি আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসাতে।" আসবেন আসবেন, মেলা সদস্য আসবেন। ওখানে তো প্রাণের ভয়ে কাঁপছেন। এখানে সদস্য হিসেবে অন্তত জান-মাল সেফ্। চাকরির তরে তদ্বিরও করা যাবে। সত্য বটে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, "এখন আর তদ্বির চলবে না। অধম সকলের কাছে মাপ চেয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে একটি সমসাময়িক নীতিবাক্য স্মরণ করে : একদা বসুন্ধরা ছিলেন বীরভোগ্যা—এখন তিনি তদ্বির-ভোগ্যা।"

এবং বিশেষ করে দর্শক হিসেবে নিমন্ত্রণ জানাতে হবে "বমার অব বেলুচিস্থান" "বুচার অব বেঙ্গলকে"। তার যথেষ্ট কারণ আছে। মুক্তিযুদ্ধ যখন চরমে, তখন টিক্কা খান ফরমান জারী করে স্বাধীন বাংলাদেশের কমান্ডার-ইন-চীফ জেনরেল আতা-উল্ গনী মুহম্মদ ওসমানীকে তাঁর সম্মুখে ঢাকাতে উপস্থিত হবার হুকুম ঝাড়েন। ওসমানী সাহেব ভদ্রসন্তান। অতিশয় ভদ্র ভাষায় উত্তর দেন—যদ্দূর মনে পড়ে—"কে কাকে ডেকে পাঠাবে সেটা না হয়...(অর্থাৎ বিতর্কাধীন, কিংবা ওসমানীরই বেশী, কিংবা উপস্থিত সেটা মুলতুবী থাক; আমার সঠিক মনে নেই বলে দুঃখিত—লেখক)। তবে আমি ঢাকা আসছি, কিন্তু প্রশ্ন, মহাশয় কি সে সময় ঢাকায় থাকবেন?"

এই উত্তরটি গেরিল্লারা ঢাকার দেয়ালে দেয়ালে সেঁটে দেয়।

বলা বাহুল্য জেনরেল ওসমানি এক কথার সেপাই। তিনি ঢাকা এসেছিলেন, কিন্তু টিক্কা তখন সেখানে নেই।

বেধড়ক মার খেয়ে ইংরেজ সৈন্য যখন ডানকার্ক থেকে নিম্নপুচ্ছ হয়ে সবেগে পলায়ন করে তখন বি বি সি-র পাঠান সংবাদদাতা বুখারী বলেন, "হমারে সিপাহী বাহাদুরীকে সাথ হট গয়ে।" "বাহাদুরীর সঙ্গে হটনা"—সোনার পাথর বাটি।

টিক্কা খান বাহাদুরীকে সাথ হট্‌তে হট্‌তে পৌঁছে গেলেন রাওলপিণ্ডি।

রাঁদেভুটা মিস্ করার জন্য টিক্কার ক্ষোভ থাকতে পারে। যাঁদের নিমন্ত্রণ করা হবে তার মধ্যে টিক্কা একজন মাস্ট্ বই কি!

অধিবেশনের কর্মসূচী (আজেন্ডা) এবং সেটা কিভাবে রূপায়িত হবে তার ভার, কল্পনাবিলাসী পাঠক, তোমার হাতে ছেড়ে দিলুম। কিন্তু এটা শুধু কল্পনা-বিলাসই হবে না। পাঠক পরের সংখ্যায় দেখতে পাবেন, ভুট্টো সাহেব এই যে মুসলিম জগতে সফর করে এলেন সেখানে কোন্ পুরোনো কাসুন্দী ঘেঁটে শেখ সাহেবের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে এলেন। এক দিকে নিদারুণ হাহাকার, আওয়ামি লীগ একটি বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র

নষ্ট করেছে; অন্যদিকে নিদারুণতর হাহাকার, যে বাইশটি ধনপতির অর্থানুকূল্যে তিনি ছোটা হিটলার দি থার্ড হলেন তাদের দোকানপাট বন্ধ। তারা যে রদ্দিমাল পূর্ব বাঙলায় চড়া দরে ডাম্প্ করতো সেগুলো এখন করাচীর পেভমেন্টে নেমেছে; আরবরা যদি দয়া করে কেনে।

যে অধিবেশনে ভুট্টো শেষের আইটেম না বললেও প্রথমটা বলবেনই বলবেন। তা তিনি যা-বলুন যা-করুন কোনো আপত্তি নেই। শুধু একটা শর্ত যেন থাকে। তিনি গত বছর ইউনাইটেড নেশনে যেরকম গোসসাভরে কাগজপত্র ছিঁড়ে দুমদুম করে সভাস্থল ত্যাগ করেছিলেন, এখানে যেন সেরকমটা না করেন।

ইয়েহিয়া-ভুট্টো

আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের ৩১শে। কাজেই আষাঢ়স্য প্রথম দিবস বলতেও বাধ্য নেই। অন্তত আষাঢ়ের প্রথম দিবসে বর্ষা আগমনের যে সব লক্ষণ নিয়ে আবির্ভূত হয় আজ ঢাকাতে সেই বর্ষা এসেছেন প্রাবৃষ্য সর্বলক্ষণসম্পন্না শ্যামা সুন্দরীর ন্যায়। তাহাজ্জুদ নমাজের ওয়াকৎ থেকেই শুনতে পাচ্ছি বাড়ির পাশের নিম গাছ, বাংলাদেশ রাইফেলসের চাঁদমারি ঘিরে যে ঘন বাঁশবন, গ্রীষ্মের অত্যাচারে ফিকে বেগুনী রঙের পুষ্পরিক্ত জারুল এবং কৃষ্ণের চূড়ার পর অবিরল রিমঝিম রিমঝিম বারিপতনের মৃদু মর্মরধ্বনি। আর

"মেঘের ছায়া অন্ধকারে
রেখেছে ঢেকে ঢাকা-রে—"

এতদিনে ঢাকা ছিল খোলা—রৌদ্রতপ্ত বিবর্ণ আকাশের নিচে। আজ ক্ষীণ বরিষণে জলকলকলে নাম তার সার্থক হল।

এমন দিনে নমো ইলিশায়
খিচুড়ি তার সাথে এ-ঢাকায়॥

গত বৎসর এইদিনে কার সাধ্য ছিল এ-বাড়িতে বসে জানালা দিয়ে তাকিয়ে "কবিত্ব" করে? বাড়িব বাগানের শেষ প্রান্তে ছোট্ট একটি নালা বয়ে গিয়ে একটু দূরে একটা ঝিল-এর রূপ নিয়েছে। গজ তিনেক চওড়া নালার পরেই খাড়া উঁচু টিলার উপর বাঁশবন ঘেরা চাঁদমারির পাঁচিল। এ-বাড়ি থেকে ধানমণ্ডী নিবাসিক অঞ্চলের আরম্ভ। ধানমণ্ডীর ঘন বসতিতে "মুক্তির" দু-পাঁচজন হেথা হোথা সর্বত্রই আত্মগোপন করে থাকতো। চাঁদমারি ঘিরে টিক্কার না-পাকদের অহরহ ছিল ভয়, রাতের অন্ধকারে মুক্তি-রা হঠাৎ কখন না পাকিস্তানের রাইফেলসের হেড-কোয়ার্টারের উপর হামলা চালায়। নালার পাশেই তাই খুঁড়েছিল বিরাট এক বাঙ্কার। তার ভিতরে বিজলী বাতি ফ্যান রেডিয়ো, রমণী, উত্তম উত্তম শয্যা সবকিছুই ছিল। আর টিলাটার সানুদেশে বাঁশবনের .ভিতরে আড়ালে সুবো-শাম রাইফেল হাতে পাহারা দিত না-পাকরা। সামান্যতম প্রদীপ-বশ্মি দেখতে পেলেই সঙ্গে সঙ্গেই ফায়ার! এমন কি দূরের কোনো মিলিটারি জিপের হেড-লাইট বাড়ির কোনো শার্সির উপর অতি সামান্য চিলিক মারলেই জাস্ট টু বি শ্যোর, চালাও ধনাধন গোলী—কাপুরুষের লক্ষণ ঐ, বুকের ভিতর "বলা তো যায় না; ক্যা মালুম ক্যা হ্যায়-এর" ধুপুস-ধাপুস ছুঁচোর নৃত্য, ঘামের ফোঁটায় দেখে সোঁদরবনের কেঁদো কুমির!

এই বাড়ির ঘরের ভিতরে দুটো বুলেটের ইঞ্চি তিনেক গভীর ফুটো। জানালার শার্সি পর্দা ফুটো করে থানা গেড়েছে। আরেকটা জানালার চৌকাঠে লেগে সেটার ইঞ্চি দুয়েক উড়িয়ে টাল খেয়ে কঁহা কঁহা মুল্লুকে চলে গিয়েছে।

কোথায় গেল সেসব রোয়াব, বড়-ফাট্টাই!

এ-বাড়ির বাগানের কোণে কিন্তু নববরিষণের সঙ্গে সঙ্গে ফুটছে লাজুক জুঁই!

ইংরেজের অত্যাচারের সময় রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন,

"টুটল কত বিজয় তোরণ, লুটল প্রাসাদ চূড়ো,
কত রাজার কত গারদ ধুলোয় হল গুঁড়ো।
আলিপুরের জেলখানাও মিলিয়ে যাবে যবে
তখনো এই বিশ্ব-দুলাল ফুলের সবুর সবে।
রঙিন কুর্তি, সঙিন মূর্তি রইবে না কিছুই,
তখনো এই বনের কোণে ফুটবে লাজুক জুঁই।"

মাত্র তিন গজের তফাৎ। এদিকে ফুটছে লাজুক জুঁই। ওদিকে কোথায় "রঙিন কুর্তি সঙিন মূর্তি হেইয়া খানের ভুঁই?"

অবিবড় বৃষ্টিধাবা ঝরছে।

এ-বাড়ির নিচের তলাটা জোরদখল করেছিল এক পাঞ্জাবী মেজর। আমার ছোট ছেলে বললে, 'মেজর হুজুব বাড়ি ফিরবেন কখন ঠিক নেই। তার ব্যাটমেনের মাথাব টুপিতে পড়েছিল প্রথম আষাঢ়ের আড়াই ফোঁটা জল। কোঁকাতে কোঁকাতে চারপাইয়ে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে শুয়ে পড়ে বলে তার বহুৎ জুকাম (সর্দি) হুয়া, জোরসে খাসি হুই এবং জবরদস্ত বুখার চড়হা। কিন্তু তখনো তিনি এ-দেশের রাজা। পুনর্মূষিক হলেন কি প্রকাবে সে কাহিনী অন্য অনুচ্ছেদে আসবে এ-"ইতিহাসের" শেষ অধ্যায়ে—ততদিন এ পরিবারের সসর্প-গৃহে বাস, সে-কাহিনী তার সঙ্গে বিজড়িত।

আমার পরিকল্পিত এসেমব্লির সেশনটা উপস্থিত মুলতুবী আছে। কারণ ভুট্টো এখন অন্তত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। শুনলুম, হিটলার ডিনেস্টির চতুর্থ ছোটা হিটলার তাঁকে যখন গদিচ্যুত করবেন তখন তাঁর কপালে অবশিষ্ট রইবে শুধু ঐ এসেমব্লির সদস্যপদ। তারই হক্কে তিনি দাবি জানাবেন তখন এসেমব্লির সেশন। এখনো তিনি রাজা। তবে হিটলার নাটকের সর্বশেষ অঙ্ককে যেমন বলা হয়, "দি কিং উইদাউট হিজ রোব্স্"। সেই যে হুলুধ্বনি মুখরিত জনতার মাঝখান থেকে পুঁচকে একটা ছোঁড়া চেঁচিয়ে উঠেছিল, "কিন্তু রাজামশাইয়ের পরনে যে কিচ্ছুটি নেই!"

পূর্বেই বলেছি, ডিসেম্বরের গণ-নির্বাচনের ফলে ইয়েহিয়া যখন দেখতে পেলেন যে এসেম্ব্লিতে তিনি গোটা পাঁচ-সাত দলকে একে অন্যের বিরুদ্ধে নাচাতে পারবেন না তখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, আওযামি লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো সীট পায়নি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ভুট্টো পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে কোনো সীট পায়নি।

অতএব পাঁচ-সাতটা পার্টি না নাচিয়ে তিনি নাচাবেন—দুই পার্টিকে নয—দুই উইংকে। দুই পাকিস্তানে লাগিয়ে দেবেন মোষের লড়াই। অতএব তাঁর হাতের কাছে আছে যে পশ্চিম পাকিস্তান সেটাকে তৎপূর্বে বেশ ভালো করে তাতাতে হবে।

দুই পাক-এর সাধারণজন ইয়েহিয়ার কূটবুদ্ধির খবর রাখতো না। তাই তারা অবাক হল যখন গণনির্বাচনের পরই ইসলামাবাদ ছেড়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন শীতের মবসুমী

হিমালয় সাইবেরিয়াগত হংসবলাকা নিধনে। বলা বাহুল্য, এ ধরনের রাজসিক শিকারে তিনি জনসাধারণের সংস্রবে আসবেন না—তা তিনি চানও না। তাঁকে আপ্যায়িত করবেন বড় বড় জমিদার যেন জ্যাক অব কেন্ট বা নবাব খপ্পা খা এবং কেঁদো কেঁদো টাকার কুমির আদমজী ইসপাহানীদের পাল—এঁদের একজনের নাম আবার ফাঁসী! ইয়েহিয়া বাগাবেন এঁদের।

পয়লা প্রেমের শিকার ছোঁড়াটা যেরকম নাক-বরাবর প্রিয়া-রাঁদেভু পানে সবেগে ধাওয়া করে না, এদিকে টুঁ ওদিকে টক্কর খাওয়ার কামুফ্লাজ করে মোকামে পৌঁছয়, ইয়েহিয়া শিকারী সেই রীতিতে হেথা হোথা শিকার কবতে করতে পৌঁছলেন তাঁর বল্লভ ভুট্টোভবনে। সেখানে তিনি যা খাতির-যত্ন পেলেন সে শুধু হলিউডেই হয়ে থাকে। কিংবা আইয়ুব যে-রকম প্রফুমো সকাসে মিস "কীলার" সান্নিধ্যে পেয়েছিলেন। আইয়ুব তখন গদিতে; তাই সে-সময়ে সদাশয় ব্রিটিশ সরকার আইয়ুবের সেই নিশাভিসারও বার্থডে-সুট পরে মধ্যযামিনীতে হুরি-পরিদের সঙ্গে সন্তরণকেলি তার পরিপূর্ণ বাহার অসদ্-ব্যবহারসহ প্রকাশ করেন নি।

ইয়েহিয়া ভুট্টোতে নিঃসন্দেহে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু খবরের কাগজে সেটা কামুফ্লাজ করে প্রকাশিত হল, "নিতান্ত যোগাযোগবশত উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভাবেব আদান-প্রদান হয়।" তা সে যে ভাষাতেই প্রকাশ করা হক, গণনির্বাচনের পরই রাষ্ট্রপ্রধান সংখ্যাগুরু আওয়ামি নেতার সঙ্গে সর্বপ্রথম আলাপ-আলোচনা না কবে নিজের থেকে প্রথম গেলেন সংখ্যালঘুর বাড়িতে। এটা কূটনৈতিক জগতে সর্ব প্রটোকল-বিবোধী, সখৎ বেআদবী। এতে করে আওয়ামি লীগের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হল না, তিনি হলেন হাস্যাস্পদ এবং বিড়ম্বিত। বলা বাহুল্য, এ মস্করাটা আওয়ামি লীগের দৃষ্টি এড়ায়নি, কিন্তু লীগজন যে বিচলিত হয়েছেন সে-রকম কোনো লক্ষণই দেখা গেল না।

একটা বিষয়ের প্রতি আমি কিন্তু পাঠকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

পূর্ববঙ্গেব সুদীর্ঘ ইতিহাসের এই অধ্যায়ের প্রধান নায়ক তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রেব তিনজন লোক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, (বর্তমান) পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং প্রেসিডেন্ট পদচ্যুত, লাঞ্ছিত আগা মুহম্মদ ইয়েহিয়া খান।

১৯৭১ অগস্ট/সেপ্টেম্বরে জনাব ভুট্টোর আপন জবানেই পূর্ববঙ্গের অবস্থা যখন অত্যন্ত সঙ্কটজনক, অখণ্ড পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয তখন তিনি একখানি চটি বই লেখেন।[১]

এই বইখানি কত শত বৎসর ধরে ঐতিহাসিক মাত্রেবই গবেষণার প্রামাণিক কাঁচামালরূপে গণ্য হবে, আজ সে কথা বলা কঠিন।

আগস্ট মাসেই ভুট্টো বুঝে গিয়েছিলেন, পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত হওয়া থেকে আর বাঁচানো প্রায় অসম্ভব। ওদিকে পশ্চিম পাকে আবও বহু লোক বিশেষ করে ধনপতিরাও সে তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছিলেন এবং এই সঙ্কটের জন্য ইয়েহিয়া এবং তাঁর দুষ্টবুদ্ধিদাতা ভুট্টো যে তাঁর চেয়েও বেশী দায়ী সে অভিমত প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতে আরম্ভ করলেন।

---

(১) ZULFIKAR ALI BHUTTO, The Great Tragedy, Sept, 71, pp 107, Karachi

তখন আপন সাফাই গাইবার জন্য ভুট্টো এ-বই লেখেন।

আজ পর্যন্ত এমন কোনো সাংবাদিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক বলতে কসুর করেননি যে, ভুট্টোর প্রতিটি রক্তবিন্দুতে, তাঁর ধ্যানে স্বপ্নে সুষুপ্তিতে সদাজাগ্রত থাকে মাত্র একটি রিপু—উন্মত্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেটাকে প্রায় নীতিবিগর্হিত জনসমাজ বিনাশী পাপাভিলাষ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

তাই সাফাই গাইতে গিয়েও আগা-পাশ-তলা জুড়ে বার বার তাঁর একই আবদারের ধুয়ো, একই সদম্ভ জিগির :

"এখনো সময় আছে। এখনো ত্রাণ আছে। আমাকে রাজ্যচালনা করতে দাও। মন্ত্র উচ্চারণ করো হে প্রতি পাপী তাপী পাকী :

"ভুট্টোং শরণং গচ্ছামি॥"

ভুট্টাঙ্গ পুরাণ

রবীন্দ্রনাথ মূলটা বাংলায় না ইংরিজিতে লিখেছিলেন, সেটা এ-স্থলে না জানলেও চলবে, কারণ ইংরিজিটাও অটোগ্রাফের খাতাতে লেখা, "স্ফুলিঙ্গটি" উতরেছে অত্যুৎকৃষ্ট রূপ নিয়ে।

"হোয়াইল দি রোজ সেড টু দি সান 'আই শ্যাল রিমেন ইটার্নেলি ফেৎফুল টু দী', ইটস পেটালস ড্রপ্ট্‌!"

ইতিমধ্যে আপনাদের আশীর্বাদে বাংলাটাও মনে পড়ে গেল—

"চাহিয়া প্রভাত রবির নয়নে
গোলাপ উঠিল ফুটে।
'রাখিব তোমারে চিরকাল মনে'
বলিয়া পড়িল টুটে।"

সমসাময়িক প্রায়-ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার বেলা ওই একই বিপদ। কালি শুকোতে না শুকোতেই অন্য আরেকটা ঘটনা এসে সেটাকে বাতিল করে দেয়—গোলাপবালার অনন্তকালীন প্রেমাঙ্গীকার বলা শেষ হওয়ার পূর্বেই ঝুরঝুর করে পাপড়িগুলো ঝরে পড়ে গেল।

"ভুট্টোং শরণং গচ্ছামি"

বলা শেষ করতে না করতেই তাঁরই কণ্ঠে শুনি, "উহুঁ। হল না। তার চেয়ে বরঞ্চ বলো,'

"সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।"

অর্থাৎ তিনি ইন্দিরাজীর সঙ্গে যদি কোনো ফৈসালা করে ফেলেন (আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস তিনি কোনো ফৈসালাই চান না, কারণ 'অবগাহি কল্পনার সীমান্ত অবধি' আমি এমন কোনো সামান্যতম ফৈসালার সন্ধান পাচ্ছিনে যেটা যুগপৎ পাকিস্তানের জনগণমন প্রসন্ন করবে এবং তিনিও গদি-নশীন থাকবেন) তবে তিনি সেটি "এসেমব্লির" সম্মুখে পেশ করবেন। ওদিকে আসন্ন মুলাকাতের পূর্বাহ্ন পর্যন্ত তিনি অখণ্ড পাকিস্তানের জিগির লাগাতার গেয়ে যাচ্ছেন।

এসেমব্লি শব্দের সংস্কৃত বলুন, পালি বলুন, প্রতিশব্দ সঙ্ঘ।

ওদিকে তিনি গত এপ্রিলে যে একটা টেম্পরারি জো-শো সংবিধান নির্মাণ করেছেন সেটাতে "পূর্ব পাকিস্তান" নামক একটি রাষ্ট্রাংশের হাওয়ার কোমরে রশি বেঁধে সেটাকে আটকে রেখেছেন। আমি সে 'একটিনি' সংবিধান পড়িনি; তাই আন্দেশা করে ঠাওরাতে পারছিনে সে-এসেমব্লিতে আওয়ামি লীগের সাবেক ১৬৭ জন সদস্যকে আমন্ত্রণ জানানো হবে কি না, এবং রাঁদেভু হবে কোথায়? ঢাকার রুকেয়া হল হস্টেলে, যেখানে ইয়েহিয়ার পিশাচরা মিলিটারি অ্যাকশন নিয়ে, যে অ্যাকশনে ভুট্টোর সম্মতি ছিল, অসহায় ছাত্রীদের নির্যাতিত ও পরে নিহত করে? না ইসলামাবাদের সেই 'আইয়ুব-হল'-এর বারান্দায় যেখানে গণতান্ত্রিক জুলফিকার আলী সুবো-শাম ডিকটেটর প্রভু আইয়ুবের কলিংবেলের সুমধুর টিং টিংয়ের জন্য টুলে বসে ঢুলতেন?

গত সপ্তাহে আমি এসেমব্লি নাকচ করতে না করতেই আমার পাপড়ি খসে গেল! আবার সেই এসেমব্লি! সমস্ত রাত এস্থলে পুরো পাক্কা একটি হপ্তা—নৌকা বেয়ে ভোরে দেখি সেই বাড়ির ঘাটে। খুঁটি থেকে বাঁধা নৌকোব দড়ি খুলতে ভুলে গিয়েছিলুম।

আবার ভুট্টো সায়েবের কেতাবখানার কথা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিই। সে পুস্তিকা এমনই তুলনাহীন যে খুদ বইয়ের তো কথাই নেই, আমার অক্ষম লেখনী মারফত তার সামান্য যেটুকু আমি প্রকাশ করতে পারবো সেটা পড়ে পাঠক রোমাঞ্চিত হবেন, তাঁর দেহ মুহুর্মুহুঃ শিহরিত হবে, তিনি ক্ষণে ক্ষণে দিশেহারা হবেন এবং সর্বশেষে কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা, কোনটা গণ্ডমূর্খের জড়ত্ব, কোনটা অতি ধূর্তের কপটতম ধাপ্পা সেগুলো বুঝতে গিয়ে কঠিন শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হবেন—হয়তো বা অর্ধোন্মাদ হয়ে যাবেন। ঈশ্বব রক্ষতু!

আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, এ-পুস্তক একাধিকবার অধ্যয়ন না করে স্বয়ং চিত্রগুপ্তও "ছাব্বিশ (মার্চ) থেকে ষোল (ডিসেম্বর)র" খতিয়ান লিখতে পারবেন না। দুই শরীক ইয়েহিয়া এবং ভুট্টো। কার পাপ কোন খাতে লিখবেন সঠিক ঠাউরে উঠতে পারবেন না। সান্ত্বনা এইটকু : পুণ্যের মূল তহবিলে স্রেফ ব্ল্যাঙ্কো! সেখানে তিনি নিশ্চিন্দি!

পূর্বেই নিবেদন করেছি, কেতাবের ধুয়া "ভুট্টোং শবণং গচ্ছামি"। (এদানির : "সংঘং শরণং গচ্ছামি") তাই এ-কেতাবের বৃহদংশ নিয়েছে ভুট্টোদেবের গুণ-কীর্তনে বা সাফাই গাওয়াতে। বস্তুত এটা পড়ে সরল বিদগ্ধ তাবজ্জন তাজ্জব মেনে মাথা চুলকোবেন : "তাই তো! এমন সত্যবাদী, নিরহঙ্কার, আত্মত্যাগী, পরদুঃখকাতর দয়ার সাগর, যিনি ভাজা মাছটি উল্টে খেতে পারেন না তাঁকে নিয়তি রাজনীতিতে নামালেন কেন? কূটনীতির দাবা খেলা তো তাঁর জন্য নয়—তাঁর কথা বিশ্বাস করলে তো নিঃসন্দেহে বলা যায় এই প্রাপ্ত বয়সেও তিনি যদি লারখানার রাস্তার ছোঁড়াদেব সঙ্গে মার্বেল খেলতে নাবেন তবে তারা তাঁকে বেমালুম বোকা বানিয়ে পকেটের সব কটা মার্বেল গ্যাঁড়া মেরে দেবে।"

তবে কি না, নিতান্ত আপন-ভোলা সজ্জন এই লোকটি। মাঝে মিশেলে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ সত্য কথা বলতে তিনি ভুলে যান—ইস্তক ইতি গজঃটুকু। পূর্ববর্তী সংখ্যায় বলেছিলুম কি কৌশলে এদিক ওদিক বুনো হাঁস শিকার করতে করতে ইয়েহিয়া

তাঁর রাঁদেভু ভুট্টোর মোকামে পৌঁছে সেখানে তাঁর সঙ্গে ভবিষ্যতের প্ল্যান কষলেন। এই "পিয়া মিলনকো" অবশ্যই হানিমুন অব দি টু—"দুজনার মধুচন্দ্রিমা" বলা যেতে পারে। 'হানিমুন অব্ দি টু" বাক্যটি আমি শ্রীভুট্টোর গ্রন্থ থেকে নিয়েছি। তিনি লিখেছেন "আমাতে মুজীবেতে (ঢাকাতে, পরবর্তীকালে—লেখক) বারান্দায় কথাবার্তা বলার পর আমি যখন ইয়েহিয়াকে সেটার রিপোর্ট দিতে গেলুম তখন তিনি সবিস্ময়ে আমাদের ভেটকে হানিমুন বিটউইন দি টু অব ইউ, বলে উল্লেখ করলেন।" কিন্তু এহ বাহ্য।

আসল কথা এই : ভুট্টো তাঁর কেতাব আরম্ভ করেছেন লেট জিন্নার পাকিস্তান স্থাপনা করা থেকে। তারপর অনেকানেক ঘটনার কালানুক্রমিক নির্ঘণ্ট তথা বিবৃতি দেওয়ার পর তিনি বলছেন "তেসরা জানুয়ারি ১৯৭১-এ শেখ মুজীবুর রহমান তাঁর বিখ্যাত ভাষণ দেওয়ার অল্প কিছুদিন পর প্রেসিডেন্ট ইয়েহিয়া তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলী সহ ঢাকা গেলেন। ঢাকা থেকে ফেরার পর প্রেসিডেন্ট ইয়েহিয়া ও তাঁর কিছু উপদেষ্টা ১৭ই জানুয়ারি তারিখে আমার হোম টাউন লারখানাতে এলেন। প্রেসিডেন্ট আমাকে মুজীবের সঙ্গে ঢাকাতে তাঁর আলোচনার বিষয় জানালেন...ইত্যাদি।"

আশ্চর্য এই সত্য গোপন! ইয়েহিয়ার সঙ্গে প্রায় মাসখানেক পূর্বে, অর্থাৎ ইয়েহিয়ার সঙ্গে ঢাকাতে মুজীবের মোলাকাৎ হওয়ার পূর্বেই যে তিনি (ভুট্টো) ইয়েহিয়ার সঙ্গে ওই লারখানাতেই দুহুঁ দুহুঁ কুহুঁ কুহুঁ করেছেন সেটা একদম চেপে গেলেন।

কেন চেপে গেলেন?

কারণ ওই সময়েই সেই শয়তনী প্ল্যান আঁটা হয়, কি পদ্ধতিতে বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রচেষ্টা (অটোনমি—স্বাধীনতা নয়) নস্যাৎ করা যায়। (কে কাকে কতখানি দুষ্টবুদ্ধি যুগিয়েছিলেন সেটা আজো আমরা জানিনে—একদিন হয়তো প্রকাশ পাবে) এই প্রাথমিক প্ল্যান নির্মাণ কাহিনী যাতে করে ধামাচাপা পড়ে যায় তার জন্যই এই সত্য গোপনের প্রয়োজন।

ওদিকে ইয়েহিয়াই তার তিনদিন পূর্বে, ১৪ জানুয়ারিতে ঢাকা শহরে ফাঁস করে বসে আছেন যে মুজীবের সঙ্গে তাঁর প্রথম মোলাকাতের পূর্বেই ভুট্টোর সঙ্গে তাঁর আলাপচারি হয়ে গিয়েছে!

ঘটনাটি এইরূপ : পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, নানাবিধ হাঁস, তন্মধ্যে ভুট্টো চিড়িয়া শিকার করার পর তিনি রওয়ানা হলেন ঢাকা। এ সম্বন্ধে ভুট্টো মন্তব্য করেছেন, গণ-নির্বাচনের পর মুজীবকে বার বার আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের কোথাও যেতে রাজী হননি। জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, "গেলে ভালো হত। তিনি অতি অবশ্য সেখানে বিস্তর লোকের চিত্তজয় করতে সমর্থ হতেন ও ফলে ডবল জোরে ভুট্টো-ইয়েহিয়া-আঁতাৎ-এর মোকাবেলা করতে পারতেন।" আমি নগণ্য প্রাণী, আমার মতের কিবা মূল্য! তবু বলি (আহা, বেড়ালটাও কাইজারের দিকে তাকাবার হক্ক ধরে) না গিয়ে ভালোই করেছেন। শেখ সাহেবেরও জান মাত্র একটি!

তা সে যাই হোক—শেখ-ইয়েহিয়া ভেটের পর পিণ্ডি প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে ১৪ই জানুয়ারী তারিখে, ঢাকা এ্যারপোর্টে সাতিশয় সদাশয় চিত্তে ইয়েহিয়া সাংবাদিকদের নানাবিধ প্রশ্নের দিল-দরিয়া উত্তর দিলেন!

তন্মধ্যে সেই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ উত্তর আছে : "শেখ মুজিবুর রহমান দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন।"

এ-উত্তরে কতখানি আন্তরিকতা ছিল বিচার করবে ইতিহাস। কিন্তু এহ বাহ্য।

এক সাংবাদিক শুধালেন, "আপনি কি এবারে (দিস টাইম) মি. ভুট্টোর সঙ্গে দেখা করবেন?" এই "দিস টাইম"টি পাঠক লক্ষ্য করবেন। যেন ইঙ্গিত রয়েছে, "আমরা তো ভালো করেই জানি, একবার তার সঙ্গে আপনার কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে। এখন যখন শেখ সায়েবকে প্রধানমন্ত্রী করবেন বলে মনস্থির করে ফেলেছেন, এ-বা—রেওকি তার সঙ্গে দেখা করবেন?"

উদার-হৃদয় ইয়েহিয়া বললেন,—"আমি প্রত্যেক জনের সঙ্গে দেখা করি। তার (ভুট্টোর) সঙ্গে আমার অলরেডি একবার দেখা হয়ে গিয়েছে। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। আমি পাখি শিকার করতে যাচ্ছি সিন্ধু দেশে—ওটা ভুট্টোর এলাকায়। তিনি সেখানে থাকলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।"

ন্যাকরা। "তিনি সেখানে থাকলে—"। ইয়েহিয়া তো ওয়াইলড ডাক খ্যাদাতে বেরুবেন না। এবং ভুট্টোও একদম সিটিং ডাক।

অগস্ট মাসে বই লেখার সময় ভুট্টো আশা করছেন, ডিসেম্বরের ভেট লোকে স্মরণে নাও আনতে পারে। এ বাবদে সর্বশেষ মন্তব্য এই করা যেতে পারে যে ভুট্টো উকিল। তিনি জানেন, আসামী তার সাফাই গাইবার সময় এমন কিছু বলতে বাধ্য নয় যা তার বিরুদ্ধে যেতে পারে!

এ ধরনের বিস্তরে বিস্তরে সত্যগোপন, মিথ্যাভাষণ, গুজোবের আড়াল থেকে কুৎসা বটনা অনেক-কিছু আছে এই মহামূল্যবান ভুট্টাঙ্গ-পুরাণে। এবারের মত শেষ একটি পেশ করি :

"(শেখ মুজিবের) ছয় দফার নির্মাতা কে, সে নিয়ে প্রচুর কৌতূহল দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, আইয়ুব খানের ঘনিষ্ঠ কোনো বুরোক্রেট এই ফরমূলাটি বানিয়ে দেন (ফ্রেমড দ্য ফরমূলা)। উদ্দেশ্য ছিল, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকে দুইভাগে বিভক্ত করে আইয়ুবকে বাঁচানো তথা জনগণের দৃষ্টি তাশকন্দ প্রহসন থেকে অন্যদিকে সরানো।"

দুই পাকিস্তানকে লড়িয়ে দিয়ে ইয়েহিয়া গদিচ্যুত হলেন, আর আইয়ুব বাঁচতেন এই পন্থায়? এ যুক্তি শুধু উকিলের "উর্বর" মস্তিষ্কেই স্থান পেতে পারে!

এবং তারপর ভুট্টো বলছেন, "একটা জনবব এখনো প্রচলিত আছে যে ঐ ছয় দফা মুশাবিদা করাতে একটা বিদেশী হাতও ছিল।"

দুষ্ট বুদ্ধি প্ররোচিত প্যাঁচালো দলিলের মুশাবিদা করার জন্য ঘড়েল নায়েব ঝানু উকিলের শরণাপন্ন হয়। আওয়ামি লীগের ছয় দফাতে আছে স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের মৌলিক সরল দাবি। এর মুশাবিদা করতে পারলেন না জনাব তাজউদ্দীন বা রহমান সুব্‌হান? এই সাদামাটা দাবির কর্মসূচী তৈরী করার জন্য দরকার হল 'ফরেন হ্যান্ড'! "পেটের ভাত আর গায়ের কাপড় চাই" এ কথা কটি তো গাঁয়ের চাষাও জমিদারের সামনে আকছারই বলে—আপন সবল গাঁইয়া ভাষায়। তবে কি মি. ভুট্টো বলতে চান, এ দুটো যে তার চাই-ই চাই সে কথাটা পূব বাঙলার লোকের মাথায় খেলেনি? সেটা টুইয়ে দেবার জন্য কুটিলস্য কুটিল 'ফরেন হ্যান্ডের' প্রয়োজন হয়েছিল? আল্লায় মালুম, মি. ভুট্টোর মাথায় কি খেলে?

হিটলার ডিকটেটর হওয়ার পর একাধিকবার আপসোস করেছেন, তাঁর 'মাইন

কাম্‌প্‌ফ্‌' প্রকাশ না করলেই সুবিবেচনার কাজ হত। মি. ভুট্টো ছোটা হিটলার দি থার্ড হওয়ার পর সে-আপসোস করেছেন কি না, বলা যায় না। তবে ভবিষ্য যুগের কাষ্ঠরসিক পাঠক হয়তো বইখানার নাম 'দি গ্রেট ট্রাজেডি' পাল্টে 'দি স্মল কমেডিয়ান' নয়া নামকরণ করতে পারে॥

"বিচিত্র ছলনাজাল"

মৃগয়া সমাপনান্তে প্রেসিডেন্ট ইয়েহিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। সেই সুবাদে একটি প্রাচীন চুটকিলা পুনর্জীবন পেল।

জনৈক পেশাদার শিকারী হুজুরকে শিকারের ফন্দি-ফিকির বাৎলাবার জন্য সঙ্গে গিয়েছিল। তাকে তার এক চেলা শুধালো, শিকারী হিসেবে হুজুর কি রকম? ওস্তাদ আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মাশাল্লা! একদম উম্‌দাসে উম্‌দা, বেনজীর। কিন্তু হুজুরের ব্যাগ খালি রইল, আল্লা পাখিদের প্রতি মেহেরবান ছিলেন।"

প্রচুরতম মদ্যপান করার পর উষস্‌দেবীর প্রথম আলোয় চরণধ্বনির শুভলগ্নে হস্তযুগল নিষ্কম্প প্রদীপ শিখাবৎ ধীর স্থির অচঞ্চল থাকে না।

প্রেসিডেন্ট ঢাকা যাত্রা করলেন।

এদিকে পূর্ব বাঙলা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ চঞ্চলিত হয়ে উঠেছে। দেশের লোক দলে দলে শেখ সায়েবের পতাকার তলে জমায়েত হচ্ছে কিন্তু ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যুরোক্রেসি ধনপতির গোষ্ঠী এবং সর্বোপরি মিলিটারি জুন্টা উঠেপড়ে লেগেছে, কি করে আওয়ামি লীগের সর্বনাশ করা যায়, গণতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত না হয়। কাঁড়া কাঁড়া টাকা আসতে লাগল সোনার বাংলায় স্পাই, গুণ্ডা এবং ভ্রষ্ট রাজনৈতিক কেনার জন্য। অবাঙালিরা তাদের সাহায্য করেছে প্রকাশ্যে। গায়ের জোরে বাহানা তৈবী করে পেটাচ্ছে আওয়ামি লীগের কর্মীদের। আওয়ামি লীগের পাবনার এম এল এ এবং খুলনার একজন লীগ কর্মীকে গুমখুন করা হল। স্বয়ং শেখকে গুপ্তহত্যা করার চেষ্টা করা হল—সে-চেষ্টা চালু রইল।

অবাঙালিদের জিঘাংসা চরমে উঠলো। গণনির্বাচনে তাদের "ইসলামী" লীডারদের শোচনীয় পরাজয় তারা ভোলবার, ঢাকবার চেষ্টা করছে তাদের দম্ভ ঔদ্ধত্য চরমে চড়িয়ে, প্রকাশ্যে নিরীহ বাঙালীমাত্রকেই মৃত্যুভয় দেখাচ্ছে। উচ্চকণ্ঠে বলে বেড়াচ্ছে, "দেখি তোমরা কি করে তোমাদের স্বায়ত্তশাসন পাও। মিলিটারি আমাদের পিছনে। তোমাদের ঠেঙিয়ে লম্বা করে ছাড়বে পয়লা, তারপর অন্য কথা।" ওদেরই প্ররোচনায়—ওনারাও তৈরী ছিলেন—পশ্চিম পাকের একাধিক কাগজে শেখ সায়েবের প্রচুর কুৎসাসহ "খবর" বেরুতে লাগলো—শেখ এমনই দম্ভী, ছলেবলে নির্বাচনে জয়লাভ করে এমনই উদ্ধত হয়েছে যে, সে বলে বেড়াচ্ছে যে সে পশ্চিম পাকে তো আসবেই না, এমন কি আমাদের সদর-উস-সদর জিল্লুল্লা (এ দুনিয়ার আল্লার ছায়া) সুলতান-ই-আজম (কাইদ-ই-আজম জিন্নার পদবী মিলিয়ে তিনি "সর্বশক্তিমান সুলতান") নিতান্ত যদি কর্তব্যের দায়ে অখণ্ড পাকিস্তানের একখানা ডানা যাতে কাটা না যায় যে, "ইসলাম ইন ডেনজার" সে-ইসলামকে ত্রাণ করতে এবং সর্বোপরি জান্‌-কা দুশমন ইন্ডিয়াকে প্রাণের ভয়ে

থরহরি কম্পমান করার জন্য তিনি যদি সেই রদ্দি ওচা ঢাকা শহরে যান (আল্লাতালার অসীম করুণা যে সুবুদ্ধিমানের মত অধুনা প্রলয়ঙ্কর বন্যাবিধ্বস্ত পূব পাকের না-পাক অঞ্চল তিনি পরিদর্শন করতে গিয়ে তার দূষিত বায়ু এবং বিষাক্ত পানি সেবন করে অকালমৃত্যু বরণ করে শহীদ হন নি), তবে নাকি ঐ গুমরাহ্ শেখ তাঁর পূর্ণেন্দু-বদন দর্শন করে অক্ষয় বেহেশৎ হাসিল করার জন্য জনাব ইয়াহিয়ার বাসস্থল লাটভবনে যাবে না, সে বলেছে, প্রেসিডেন্টকে তার বাড়িতে যেতে হবে, তবে সে কথা কইবে। ওয়াস্তাগফিরুল্লা!

মিথ্যা নিন্দা প্রচার করার নানাবিধ পন্থা বিশ্বের ইতিহাসে ভূরি ভূরি মেলে। এ যুগের দুই ওস্তাদ দুটি ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে যশস্বী হয়েছেন। একজন ড. গ্যোবেলস। তিনি ধূলিপরিমাণ সত্যকথা নিয়ে তার উপর নির্মাণ করতেন অভ্রংলিহ্ "অকাট্য" মিথ্যার এ্যাফেল-স্তম্ভ। এক্ষেত্রেও তাই : গণ-নির্বাচনের পব থেকেই পশ্চিম পাকের সর্বত্র শেখের বিরুদ্ধে যেসব চক্রান্ত করা হয়েছিল তার থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে সেখানে যেতে তাঁর অনিচ্ছা ছিল। ধরে নেওয়া যাক এটুকু সত্য, কিংবা তিনি সত্যই সেখানে যাবার অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তার উপর মিথ্যা গড়ে তোলা কঠিন নয়, ইয়েহিয়া স্বয়ং যদি ঢাকা আসেন তবে শেখ তাঁর সঙ্গে আদৌ দেখা করবেন না। সে-মিথ্যার উপব আরেকটা মিথ্যা চাপানো মোটেই কঠিন নয়। ইয়েহিয়াকে শুধু-পায়ে দাঁতে কুটা কেটে যেতে হবে শেখ-ভবনে (এ স্থলে দুই প্রকারের প্রোপাগাণ্ডা করা যায় (ক) জরাজীর্ণ জলঝড় দুর্গন্ধময় বস্তিঘরে খেতে হবে মহামহিম বাষ্ট্রপতিকে কিংবা (খ) প্রাসাদোপম রাজসিক বিরাট অট্টালিকা ভবনে—যেটা নির্মাণের অফুরন্ত ঐশ্বর্য তিনি পেয়েছেন ইন্দিরা-বিড়লার কাছ থেকে)। শেষোক্ত অংশটি পশ্চিম পাকবাসীব জন্য : সেখান থেকে কে ঢাকায় এসে যাচাই করতে যাচ্ছে, সত্য কোন্ হিরণ্ময় কিংবা মৃন্ময় পাত্রে লুক্কায়িত আছে?

তাই বোধ হয় কবি বায়রন গেয়েছিলেন :

"শেষ হিসেবেতে তবে
মিথ্যাই বা কি?
মুখোশ পরিয়া সত্য
যবে দেয় ফাঁকি।"
And, after all, what is a lie?
'Tis but
The truth in masquerade"

পক্ষান্তরে হিটলার "মারি তো হাতি—" পন্থায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ মাইন কাম্‌প্‌ফে তিনি বলেছেন :

"ক্ষুদ্রাকার মিথ্যার চেয়ে বিরাট কলেবর মিথ্যাকে জনসাধারণ অনেক অনায়াসে মেনে নেয়।"

তার আড়াই হাজার বছর পূর্বে রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্বন্ধে আত্মচিন্তা করতে গিয়ে প্লাতো প্রশ্ন শুধোচ্ছেন, "এমন একটা জাজ্জ্বল্যমান মহৎ মিথ্যা কি কৌশলে নির্মাণ করা যায় না যেটা এমনই স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হবে যে সমাজের তাবজ্জন সেটা মেনে নেবে।"

ইয়েহিয়া ডিকটেটর। হিটলারের তুলনায় যদিও তাঁর উচ্চতা 'ব্যাঙের হাতে সাত

হাত'। তাই তিনি হিটলারী পন্থায় গণনিধন পর্ব আরম্ভ হওয়ার পর তাঁর নীতির সাফাই গাইতে গিয়ে একাধিক কারণের সঙ্গে এটাও উল্লেখ করেন যে, তিনি ঢাকাতে থাকাকালীন শেখ মুজিব তাঁকে বন্দী করার চেষ্টা করেছিলেন। সাধারণজন এ বাক্যটি লেখার পর অতি অবশ্যই বিস্ময়বোধক চিহ্ন দেবেন। আমি দিইনি কারণ বুদ্ধিমান হয়েও নিতান্ত যোগাযোগবশত আমি হিটলারী কায়দা-কেতার সঙ্গে সুপরিচিত। এমন কি এ-রকম একটা প্লীহাচমকানিয়া বম্‌ব্‌শেল ফাটানোর পর আরো এক কদম এগিয়ে গিয়ে ইয়েহিয়া যে আধুলি দামের টিকটিকির উপন সকে টেক্কা মারার জন্য বলেন নি, "তারপর আওয়ামি লীগের কসাইরা আমাকে নিয়ে কি করতো সেটার কল্পনাতেই আমার গা শিউরে উঠে; আমি অতিশয় বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হই, শেখ ঢাকেশ্বরী মন্দিরে হিন্দু গডেস-এর সামনে কিরে কেটেছে সে আপন আঙ্গুল দিয়ে আমার চোখ দুটি ওপড়াবে, বেঙ্গলি উয়োমেনস মাছকাটার বিগ নাইফ দিয়ে আমার কলিজা বের করে গয়রহ, ইয়াল্লা আল্লা বাঁচানেওলা"—এসব যে বলেন নি তাতেও আমি বিস্মিত হইনি। কারণ আমি জানি, ইয়েহিয়া নিতান্তই একটা ছ্যামড়া ডিকটেটর, এবং সেও নির্জলা ভেজাল ডিকটেটর। হত হিটলার, হত মুস্‌সোলিনী তবে জানতো কি করে মিথ্যের পুরা-পাক্কা মনোয়ারি জাহাজ বোঝাই করতে হয়, আলিফ বে থেকে ইয়া ইয়ে তক।

সন্দেহপিশাচ পাঠক এস্থলে আপত্তি জানিয়ে বলবে, "এও কখনো হয়? ঢাকাতে তাঁর লোক-লশকর গিসগিস করছে। কমপক্ষে ষাট হাজার খাস পশ্চিম পাকের সেপাই রয়েছে। সর্বোপরি টিক্কা খানের পাক্কা পাহারা।"

ঘড়েল সব-জান্তা : "ঐখানেই তো সরল রহস্য। এত শতের মধ্যেখান থেকে যদি ইয়েহিয়া হাওয়া হয়ে যান তবে সন্দেহটা অর্সাবে সর্বপ্রথম এবং একমাত্র মিলিটারী জুন্টার উপর। ওরা মুজিবের সঙ্গে ইয়েহিয়ার ঢলাঢলিতে তখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মার্চের পয়লা থেকে পঁচিশ অবধি পূর্ব পাকের রাজা ছিল কে? ইয়েহিয়া না, টিক্কা না—রাজা তখন কে? মুজীব।"

কিন্তু বৃথা তর্ক। মোদ্দা কথা এই, পশ্চিম পাকের লোক ইয়েহিয়ার রহস্য-লহরী সিরীজের নবতম অবদান বিশ্বাস করেছিল।

বস্তুত ব্যাপারটা ছিল ঠিক উল্টো। প্লট করা হয়েছিল ২৫ মার্চ সন্ধ্যার পর মুজীব ভুট্টোতে মোলাকাৎ হবে আলাপ-আলোচনার জন্য। পরদিন ২৬ মার্চ সকালে তাঁরা দুজন যাবেন গভর্নর ভবনে ইয়েহিয়ার সঙ্গে সে-আলোচনার ফলাফল জানাতে। ভুট্টোর "শকুনি মামা" মি. Khar[১] নানা অজুহাতে শেখকে রাজী করাবেন, এবারের (শেষবারের মত?) তিনি যেন ভুট্টোর আস্তানা ইন্টেরকন্টিনেনটলে আসেন। পথমধ্যে টিক্কার গেরিল্লা স্কোয়াডের গুপ্তঘাতকরা তাঁকে খুন করবে। ওদিকে ইয়েহিয়া বেলা পাঁচটায় সঙ্গোপনে প্লেনে উড়বেন করাচি বাগে। যদি প্ল্যানটা উৎরে যায় তবে ইয়েহিয়ার নিষ্ক্রমণক্ষণ সাড়ম্বরে প্রচার করে তাঁর জন্য নিরন্ধ্র "এলিবাই" স্থাপনা করা যাবে। ওদিকে বলা হবে মুজিব-বিরোধী কোন রাজনৈতিক দল তাঁকে খুন করেছে।

এ প্ল্যান তো খাঁটি হিটলারী প্ল্যানের ঝাঁ চকচকে পয়লা কার্বন কপি।

---

(১) শব্দটার উচ্চারণ যদি "খার্" হয় তবে অর্থ "কাঁটা"; যদি "খর্" হয় তবে অর্থ "গর্দভ"। বাংলা "খড়" হওয়ার সম্ভাবনা কম।

গ্যোরিং হিটলারে মিলে পোড়ালেন রাইষসটাগ। পুরো দোষটা চাপালেন কমুনিস্‌টদের স্কন্ধে।

গ্যোরিং হিটলার হিমলারে মিলে রোম, এর্নসট আদি, ব্রাউনশার্টকে করলেন খতম। প্রচার করলেন ব্রাউন শার্টরা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করেছিল, হিটলার এবং নাৎসি পার্টিকে খতম করে চতুর্থ রাইষ প্রতিষ্ঠা করার।

তবে কিজিলবাশ দারওয়ান আর অস্ট্রিয়ান করপরলে পার্থক্য কোথায়? করপরল হিটলার দুশমনকে ঘায়েল করে, তারপর কেচ্ছা রটায়। দারওয়ান সেটা আদৌ করে উঠতে পারেনি। কেন? কারণ সে প্রোমোশন পেযে ডিকটেটব হয়। ক্লিনার যে রকম প্রোমোশন পেয়ে হ্যান্ডিমেন হয়। আইয়ুবের শূন্য গদিতে জুন্টা তাকে প্রোমোশন দিয়ে ডিকটেটর বানিয়েছিল। হিটলার, মুসোলিনী, স্তালিন বিস্তর যুঝে, প্রচুর আত্মত্যাগ করে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে তবে তারা ডিকটেটর হযেছিল। আর্ম-চেয়ার পলিটিশিয়ানের মত ইয়াহিযা আর্ম-চেয়ার ডিকটেটর। কদু কুমড়াব কুববানী হয় না।

ভেজাল, ভেজাল, কুল্লে মাল ভেজাল। ইয়েহিয়া ভেজাল হিটলাব, টিক্কা ভেজাল হিমলার, পীরজাদা ভেজাল গ্যোবিং।

কিন্তু কি ভেজাল কি খাঁটি মাল এদের পরমাগতি একই:

ঐ হেরো, ঘৃণ্য শব
    পাপাচাবী দুরাত্মাব
রোস্ট কবে শযতান
    খাবে তার গোস্তেন ডিনাব।

Here lies the carcass
    of a cursed sinner.
Doomed to be roasted
    for the Devil's dinner.

"বীরের সবুর সয়।"

মহাড়ম্বরে প্রেসিডেন্ট ইয়েহিয়া খান ঢাকায পৌঁছলেন।

শেখ সাহেব ইতিপূর্বেই প্রকাশ্যে একাধিকবাব বলে বেখেছিলেন, প্রেসিডেন্ট পূব বাঙলায় আসছেন সম্মানিত মেহমান রূপে।

কাজেই উভয়ের মধ্যে মত-বিনিময এবং ছয় দফা নিয়ে আলোচনা হার্দিক বাতাবরণের ভিতব দ্রুতগতিতে এক দিনের ভিতব সুসম্পন্ন হল। এ স্থলে স্মরণ রাখা ভালো যে এ-মোলাকাতেব প্রায় দু-মাস পব ইয়েহিয়া যখন ফের শেখের সঙ্গে "আলোচনা" কবার জন্য ৮/৯ মার্চে ঢাকা আসেন তখন "আলোচনার" সময় লেগেছিল প্রায় ষোল দিন। পুরো পাক্কা পক্ষাধিক কাল। এই বৈষম্যেব কাবণটি অতি সরল। প্রথম ভেটে ইয়েহিয়ার উদ্দেশ্য ছিল শেখ মুজিবকে মাত্র একটি সরল ধাপ্পা দেওয়া: "আমি আপনার ছয় দফা কর্মসূচিতে আপত্তিকব কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে তবে কি না ভুট্টোর সঙ্গে...ইত্যাদি।" অর্থাৎ আওয়ামি লীগকে ভুট্টোর সঙ্গে একটা ফয়সালা করে নিলে ভালো হয়।

এটা ১৩/১৪ জানুয়ারি ১৯৭১-এর ঘটনা।

১৪ তারিখে ইয়েহিয়া রওয়ানা দিলেন পিণ্ডিপানে। ঢাকা এ্যারপর্টে তিনি যে, "খোলাখুলি দিলদরিয়া" মেজাজে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটালেন তার একটুকরো—ভুট্টো সংক্রান্ত—পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বাকির আরো কিছুটা এ স্থলে কীর্তনীয়। যথা :

ইয়েহিয়া : "শেখ সাহেব আমাদের আলোচনা সম্বন্ধে যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে (এবসল্যুটলি) সত্য। তিনিই এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন।"

জনৈক সাংবাদিক : "আপনি এখন দেশের প্রেসিডেন্ট। শেখ মুজিবের সঙ্গে আপনার যে আলোচনা হল, সে সম্বন্ধে আপনার ধারণার কিছুটা আমরা শুনতে চাই।"

ইয়েহিয়া : "শেখ সাহেব যখন কর্মভার গ্রহণ করবেন (টেক্স্ ওভার) আমি তখন থাকবো না (আই উন্‌ট্ বী দ্যার)। শিগগিরই এটা তার গভর্নমেন্ট হবে।"

জনৈক রিপর্টার : "শেখ মুজীব বলেছেন, আপনার সঙ্গে আলোচনা করে তিনি সন্তুষ্ট। আপনিও কি সন্তুষ্ট?"

ইয়েহিয়া : "হ্যাঁ।"

এ সখী-সংবাদ পড়ে যে-কোনো গৌড়ীয় বৈষ্ণবজন উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করবেন। তাই বলা একান্তই নিষ্প্রয়োজন যে পূব বাঙলার লোক তখন উল্লাসে আত্মহারা। দু'শ বছরের পরাধীনতা শেষ হতে চললো। জয় বাংলা, জয় আওয়ামি লীগ।

এই উদ্দাম আনন্দনৃত্য দেখে কেমন যেন মনে হয়, আওয়ামি লীগের কর্তাব্যক্তিরা যেন ঈষৎ বিচলিত হন। তাঁরা তো রাতারাতি ভুলে যাননি, পশ্চিম পাকের শকুনি মামারা কি প্রকারে শের-ই-বাঙালা ফজলুল হককে পর্যন্ত বিড়ম্বিত করেছে। আর আজ? হঠাৎ?

পরবর্তীকালে এটা পরিষ্কার হল। ইযেহিয়া পঁচিশে মার্চ তার মুখোস খুলে উৎকট প্রেতনৃত্য আরম্ভ করার পর যে "বাংলাদেশ" সরকার নির্মিত হল তার প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ সেদিনই, ১৭ এপ্রিল এক প্রেস কনফারেনসে ইয়েহিয়া-মুজীব ভেট বাবদে যা বলেন তাব একাংশের মোটামুটি সারমর্ম এই :—

লীগের ছয় দফা বাবদে ইয়েহিয়ার যে বিশেষ কোনো গুরুতর আপত্তি আছে তার আভাসও তিনি দেননি। লীগ কিন্তু প্রত্যাশা করেছিল, (ছ-দফাতে ইয়েহিয়া যখন কোনো আপত্তি তুলছেন না, এবং এই ছ-দফার ভিত্তির উপরই লীগ অ্যাসেমব্লিতে পাকিস্তানের নূতন সংবিধান নির্মাণ করবেন তখন) ইয়েহিয়া ভবিষ্যৎ সংবিধানের স্বরূপ সম্বন্ধে আপন ধারণা প্রকাশ করবেন। তা না করে তিনি শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করলেন লীগ যেন ভুট্টোর পার্টির সঙ্গে একটা সমঝোতা করে নেয়।

তাজউদ্দীন সাহেবের এই বিবৃতিটি উল্লেখযোগ্য। ভবিষ্যৎ যুগের ঐতিহাসিকরা স্থির করবেন, "হে আওয়ামি লীগ, ভুট্টোর সঙ্গে একটা সমঝোতা কবো—" ইয়েহিয়ার এই নির্দেশের মধ্যে 'তোমারে মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে'-র মারণাস্ত্রটা লুকিয়ে রেখে গেলেন কি না?

কারণ মোটামুটি ওই সময়েই, খুব সম্ভব ১২ জানুয়ারি, জনৈক সাংবাদিক ইয়েহিয়াকে জিজ্ঞেস করেন, পূব পাকিস্তান যদি অ্যাসেমব্লিতে এমন একটা সংবিধান নির্মাণ করে যেটা পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে না হয় তবে ইয়েহিয়া কি সে-সংবিধানে

সম্মতি দেবেন? ইয়েহিয়া উত্তরে বলেন, এটা একটা কাল্পনিক (হাইপথেটিকাল) প্রশ্ন; এর উত্তর তিনি দেবেন না।

মোটেই হাইপথেটিকাল প্রশ্ন নয়।

আজ যদি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কেউ প্রশ্ন শুধোয়, "কাল যদি রাশা বিনা নোটিশে ব্রিটেন আক্রমণ করে তবে প্রধানমন্ত্রী তার জন্য কোন্ কোন্ প্রস্তুতি কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন" তবে প্রধানমন্ত্রী স্মিতহাস্য সহকারে বলবেন, "এটা কাল্পনিক প্রশ্ন?" কারণ বিশ্বসংসার জানে, রাশার সঙ্গে ব্রিটেনের এমন কোনো দুর্বার শত্রুতা হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনি, বা রাশার কি দোস্ত কি দুশমন কেউই হালফিল ঘুণাক্ষরে এ-কথা বলেননি যে রাশা গোপনে গোপনে এমনই প্রস্তুতি করেছে যে দু-একদিনের ভিতর বিলেতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অতএব এ-প্রশ্নটা অবাস্তব—হাইপথেটিকাল।

কারণ যদিও মি. ভুট্টো তখন পর্যন্ত তাঁর সব কটা রঙের তাস টেবিলের উপর বিছিয়ে দিয়ে হুমকি ছাড়েন নি যে যারা অ্যাসেমব্লিতে যাবে তিনি তাদের ঠ্যাং ভেঙে দেবেন তথাপি কোন্ রাজনৈতিক, বিশেষ করে ইয়েহিয়া জানতেন না যে ভুট্টো আওয়ামি লীগের বিরুদ্ধে তীব্রতম বৈরীভাব অবলম্বন করেছেন? নইলে স্বয়ং ইয়েহিয়াই বা কেন ওই সময়েই লীগকে নির্দেশ দিতে গেলেন, ভুট্টোর সঙ্গে একটা ফয়সালা করে নিতে? তাহলে পূর্বোক্ত প্রশ্নটি হাইপথেটিকাল আকাশকুসুম গোত্র লাভ করলো কি করে?

তবু যদি ইয়েহিযা জেদ ধবে বলেন, না, তিনি ভুট্টোর কোনো বৈরীভাবের কথা জানেন না, তাহলে তো জনাব তাজ অনায়াসে বলতে পারেন, "তবে তো হুজুরের নির্দেশ একদম খাঁটি 'হাইপথেটিকাল নির্দেশ'। আপনি যখন বলতে পারছেন না, ভুট্টো দুশমনীর অমুক অমুক স্টেপ নিয়েছেন (পূর্বেব উদাহরণ অনুযাযী কেউ যখন আদৌ কোনো খবর পায়নি যে রাশা কাল ব্রিটেন আক্রমণ করবে) তা হলে আমরা, মেজরিটি পার্টি অযথা কান-না-লেনেওয়ালা চিলের পিছনে ছুটে ছুটে শেষটায় মিনরিটির হাওয়াই কোমরে রশি বাঁধতে যাবো কোন্ হাইপথেটিকাল ত্রাসের তাড়নায়? ও করে কাল আমার চারখানা হাতও গজাবে না, তাব জন্য আজ চারখানা দস্তানাও কিনবো না।"

ওদিকে বাংলাদেশেব যুব-সমাজ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে—বিশেষ করে যখন বার বার প্রশ্ন করা সত্ত্বেও ইয়েহিয়া ঢাকাতে কখন অ্যাসেমব্লি ডাকবেন সে সম্বন্ধে কোনো উত্তর দিতে কিছুতেই সম্মত হলেন না। ওদের বক্তব্য তাদের ছয় পয়েন্টের বিরুদ্ধে ইয়েহিয়া যখন কোনো আপত্তি তোলেননি—আর এ-খ-ন তুললেই বা কি—তবে অ্যাসেমব্লি ডাকতে এত দেরি হচ্ছে কেন?

যুগ যুগ ধরে ইতিহাসে বার বার এ-ঘটনা ঘটেছে। জনতা অসহিষ্ণু; নেতারা দেখছেন, আঘাত করার মত সময় এখন আসেনি। বিকল্পে : নেতা আহ্বান করছেন, ওঠো, জাগো; জনতা তন্দ্রাচ্ছন্ন।

মূল কথা, মূল তত্ত্ব টাইমিং। বহু ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে পরিষ্কার ধরা পড়ে, সমস্ত পরিকল্পনাটা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল টাইমিঙের গোলমালে।

ইংরাজিতে তাই বলে :

লোহা গনগনে থাকতে থাকতেই মারো হাতুড়ির ঘা।

সংস্কৃত সুভাষিত বলে :

যৌবন থাকতেই করো বিয়ে। পিণ্ডি চটিয়ে খেঁয়ো না।

কিন্তু যে নেতার মনে দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে তাঁর কাছে অগ্নি নির্মাণের যথেষ্ট সামগ্রী সঞ্চিত আছে, যদৃচ্ছ লৌহখণ্ডকে তপ্তাতিতপ্ত করতে পারেন তাঁর তন্মুহূর্তেই হাতুড়ির আঘাত হানবার কি প্রয়োজন?

এবং বিজ্ঞজন মৃদু হাস্য করে বলেন, তড়িঘড়ি মামেলা খতম করাই যদি সব চাইতে ভালো কায়দা হত তবে (বাইবেলে) সদাপ্রভু সৃষ্টি নির্মাণে পুরো ছটি দিন খর্চা করলেন কেন? তিনি তো আঁখির এক পলকে শতলক্ষ গুণে বৃহত্তর লক্ষ কোটি সৃষ্টি নির্মাণ করতে পারতেন।

কিন্তু প্রবাদ, ঐতিহাসিক নজীর, গুণীজনের জ্ঞানগর্ভ উপদেশবাণীর উপর নির্ভর করেই তো জননেতা সব সময় আপন পথ বেছে নেন না। তবে এ স্থলে আমরা একটি উত্তম "কাব্য-কমপাস" পাচ্ছি।

যাকে বলে "ডে টু ডে পলিটিকস", তার কোনো গাইড-বুক শেখ-গুরু কবিগুরু রেখে যান নি। তবে যখন চিরন্তন রাষ্ট্রনীতিতে বাহুর দম্ভ, ক্রুদ্ধ প্রভু, রাজার প্রতাপ চিৎকার করে দুঃখ দেবার বড়াই করে তখন তিনি তাঁর সর্বাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র, তাঁর "গানের ভাণ্ডারী" দিনেন্দ্রনাথকে "বেঙ্গল অর্ডিনেনসের" জুলুম মদোন্মত্ত জনের আস্ফালনেব মত কত যে হেয়-বিড়ম্বিত ক্ষণস্থায়ী, পক্ষান্তরে সত্য যে "নিত্যকালের সোনার রঙে লিখা তিলক ধারণ করে আছেন" সে বাণী ছন্দে প্রকাশ কবে বলেন :

"জানি, তুমি বলবে আমায়
থামো একটুখানি,
বেণুবীণার লগ্ন এ নয়,
শিকল ঝমঝমানি।
শুনে আমি রাগবো মনে,
করো না সেই ভয়,
সময় আমার কাছে বলেই
এখন সময় নয়।"

তাই দেখতে পাই,

"সময়েরে ছিনিযে নিলে
হয় সে অসময়
ক্রুদ্ধ প্রভুর সয় না সবুর
প্রেমের সবুব সয়।
রাজপ্রতাপের দম্ভ সে তো
এক দমকের বায়ু
সবুর করতে পাবে এমন
নাই তো তাহার আয়ু।
ধৈর্য বীর্য ক্ষমা দযা
ন্যায়ের বেড়া টুটে
লোভের ক্ষোভের ক্রোধের তাড়ায়
বেড়ায় ছুটে ছুটে।"

ইয়েহিয়া আর তার জুন্টা জানে পূব বাঙলায় তাদের আয়ু প্রায় শেষ,

"আজ আছে কাল নাই বলে তাই
তাড়াতাড়ির তালে
কড়া মেজাজ দাপিয়ে বেড়ায়
বাড়াবাড়ির চালে।
পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে
দুঃখীর বুক জুড়ি[১]
ভগবানের ব্যথার পরে
হাঁকায় সে চার-ঘুরি।"

পূব বাঙলার লোকের সঙ্গে তারা তো কখনো মৈত্রীর ডোর বাঁধতে চায় নি, তারা চেয়েছিল পলে পলে তিলে তিলে রক্তশোষণ করতে :

"তাই তো প্রেমের মাল্যগাঁথার
নাইকো অবকাশ।
হাতকড়ারই কড়াক্কড়ি,
—দড়াদড়ির ফাঁস।
রক্ত রঙের ফসল ফলে
তাড়াতাড়ির বীজে,
বিনাশ তারে আপন গোলায়
বোঝাই করে নিজে।
কাণ্ড দেখে পশুপক্ষী
ফুকরে ওঠে ভয়ে,
অনন্তদেব শান্ত থাকেন
ক্ষণিক অপচয়ে।"

আদি কবি বাল্মীকি রাবণেব রাক্ষস-রাজ্যের বীভৎসতা মূর্তমান করার জন্য কাব্যলোকেব প্রথম প্রভাতে কাঠবেরালি মোতিফ অবতারণা করেছিলেন, কবিগুরু তাই সেই পন্থায় চললেন "রাজেন্দ্রসঙ্গমে"।

কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আত্মপ্রত্যয় যার আছে সে আত্মসংযম করতেও জানে বলে, শেখজী এক মাস সময় দিলেন ইয়েহিয়াকে। এক মাস পরে ডাকো এসেমব্লির অধিবেশন।

---

(১) এ যেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষির বাণী : ঢাকার রাস্তায় নিরীহজনের বুকের উপর দিয়ে পিশাচপাল ট্যাঙ্ক চালাবে।

এইবারে সেই বিষয়টির অবতারণা করতে হয় যেটি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ আমরা পাইনি।

কোনো সন্দেহ নেই, ভবিষ্যৎকালের ঐতিহাসিকরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে এই গুরুতর বিষয়টি নিয়ে বিস্তর মাথা-ফাটাফাটি করবেন। খৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য য়িহুদিরা দায়ী, না অন্য কেউ, সে নিয়ে যেরকম দু হাজার বছর ধরে শব্দার্থে প্রাচ্যে প্রতীচ্যে পণ্ডিতে পণ্ডিতে অকৃপণ মাথা-ফাটাফাটি হয়েছে এবং হবে, তথা পরোক্ষভাবে হিটলারের গ্যাস চেম্বার নির্মাণে যার পরিণাম। এস্থলে সমস্যা, একাত্তরের মধু ঋতুতে বাংলাদেশকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য দায়ী কে? এস্থলে লক্ষণীয় প্রায় ওই একই ঋতুতে খৃষ্টকে হত্যা করা হয়। এবং চরম লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশটাকে জবাই করা হয় মহরম মাসে—যে-মাসে তের শ' বছর পূর্বে, হজরৎ ইমাম হুসেনকে ইয়েজিদের জল্লাদরা কারবালাতে জবাই করে। বস্তুত আমার আচারনিষ্ঠ ছোটবোনকে ২৫শে মার্চের উল্লেখ করতে বললে, "আমাদের মধ্যে তখন বলাবলি হয়েছিল, ইয়েহিয়া শীয়া। শীয়ারা আপ্রাণ চেষ্টা দেয় পাক মহরমের চাঁদে যেন কোনো প্রকারের অপকর্ম, গুনাহ্ না করে আর ইযেহিয়া শীয়া হয়ে এই পবিত্র মাসেই যে কবীরা গুনাহ্ (মহাপাপ) করলেন সেটা যে সুন্নী ইয়েজিদকেও নৃশংসতায় ছাড়িয়ে গেল।"

অবশ্য সে-সময়ে সামান্যতম মুষ্টিমেয় বাঙলাবাসী জানতো যে ইয়েহিয়া শীয়া এবং ভিতরে ভিতরে কট্টরতম শীয়া।

কিন্তু ৭১-এর ২৫ মার্চে ঐ বৎসর সূর্য ও চন্দ্রের এক বিপরীত যোগাযোগের ফলে উভয়ের মধ্যে এক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সে-সংঘাতের কাহিনী অতি সংক্ষেপে এই ·

ধর্মকর্মের পালপার্বণ, তাবৎ অনুষ্ঠান ইরান-তুর্কমান মাত্রই চান্দ্রমাস পঞ্জিকা অনুযায়ী সুন্নীদের মতই পালন করে। কিন্তু নিত্যদিনের ঘৃত লবণ তৈল তণ্ডুল বস্ত্র ইন্ধন সমস্যার সমাধান করে সৌর গণনা অনুসারে। ফলে চান্দ্রমাস, শোকাশ্রুসিক্ত মহরম, বছর তিরিশেকের মধ্যে একবার না একবার মোটামুটি একই সময়ে হাজির হবেন ইরানীদের জাতীয়, দ্বিসহস্র বৎসরাধিক কালের ঐতিহ্য-সম্বলিত নওরোজ=নববর্ষ পর্বের সময়। সেটা আসে মোটামুটি ২১ মার্চ নাগাদ। সেদিন ইরানতুরানে যা আনন্দোৎসব হয় তার সঙ্গে বড়দিন বা হোলি পাল্লা দিতে পারে না। বিশেষ করে তামাম দেশটা জুড়ে সেদিন যে শরাবের বান জাগে তার মুখে দাঁড়ায় কোন পরবের সাধ্যি!

সর্বশেষে, প্রকাশ থাকে যে—ইয়েহিয়ার চেলাচামুণ্ডা টিক্কা নিয়াজী, এস্তেক তেনার এক ভাঁড়ের ইয়ার মিস্টার ভুট্টো জগঝম্পসহ হুহুঙ্কারে যেটিকে ঘোষণা করতেন সর্বপ্রথম —ঠিক ২৫ মার্চ তারিখে, দু-বৎসর পূর্বে ১৯৬৯ সালে আইয়ুবের স্থলে "কাফির" নিধনার্থে কল্কিরূপে ইসলামাবাদ সিংহাসন আরোহণ করেন শীয়া পোপ ইয়েহিয়া। অকৃপণ প্রসাদপ্রাপ্ত ওয়াকিফহাল মহল আজো সে মহালগনের স্মরণে বলেন, "সেদিন পাক ইসলামাবাদে যে পাকনাপাক পীত শ্যামপেন বুদ্বুদ উত্থিত হয়ে আসমান-জমীন ত-র্-র্-র্ করে দিয়েছিল তারই ফলে রাউলপিণ্ডির আবহাওয়া দফতর সবিস্ময়ে প্রচার করে যে নর্মাল ১০% থেকে সে-রাত্রে বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা ৯৯%-এ পৌঁচছিল এবং পূর্বাভাসে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে আগামী চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে শ্যামপেন-বৃষ্টির

সম্ভাবনা আছে। এটা অবশ্য ১৯৬৯-এর ২৫ মার্চের কথা।

১৯৭১-এর ২৫ মার্চে কিন্তু ইয়েহিয়া খান যখন পিণ্ডি যাবার জন্য বেলা পাঁচটায় ঢাকা বিমানবন্দরে প্লেনে ওঠেন, তখন সে-প্লেনের দরজা বন্ধ হতে না হতেই প্লেন টেক্-অফের কড়া কানুন হেলাভরে উপেক্ষা করে এ্যার হোসটেস প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দিলেন হুইস্কি সোডা। ঝটপট দ্বিতীয়টা। এবারে শ্যামপেন নয়। সে-সুধা মোলায়েম। এবারে রুদ্রাগ্নি হুইস্কি।

শুনেছি, রোম ভস্মীভূত করার আদেশ দেবার সময় নীরোর এক হাতে ছিল বেয়ালা অন্য হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পদনিম্নের ভূমির দিকে অবনত করে প্রচলিত রুদ্রমুদ্রা দেখান, যার অর্থ "ভস্মীভূত করো রোম"!

কিন্তু এখন যেটা বলছি সেটা শোনা কথা নয়। নিরেট সত্য।

ইয়েহিয়ার এক হাতে ছিল হারাম শরাব, অন্য হাত দিয়ে কৃতান্ত মুদ্রা দেখালেন জল্লাদকে—"কৎল-ই-আম্ চালাও বাঙ্গালমে। সট দেম আউট।"

কোথায় গেল শোকাশ্রুসিক্ত মহরমের অশৌচ, কোথায় গেল ধর্মের বিধিনিষেধ? হে হবু পলিটিশিয়ান, শিখে নাও তবে দক্ষযজ্ঞের উচাটন মন্ত্রারম্ভের পূর্বে ইয়েহিয়ার নর্ম ললিতা গীতি।

বিধিবিধানের শীত-পরিধান
ফাগুন আগুনে দহন করো
বিহঙ্গযানে মোরা দুই জান্
ফাগুন আগুন দহন করো

ইরানের শীতকালে প্রকৃতি অতিশয় অকরুণ—অসংখ্য প্রাণী মৃত্যুবরণ করে। তাই ধর্মের "বিধিবিধানকে" দুর্বিষহ শীতবস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তারপর আসে নবজীবনদায়িনী "ফাগুন আগুন"। তাই নিবন্ধারম্ভে চিন্তা করেই বলেছি, "মধু ঋতুতে বাংলাদেশকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়"।

বাংলাদেশের ৯৯% নরনারীর দৃঢ়বিশ্বাস এই ক্রুশপর্বের কাপালিক ইয়েহিযা এবং তার মিলিটারি জুন্টা। পাকিস্তানেব ওয়াকিফহাল মহলের এক নাতিবৃহৎ অংশ ভিন্ন মত পোষণ করে।

নিরপেক্ষ জনৈক ভারতীয় চিন্তাশীল সেনাপতি গত এপ্রিলে পরলোকগত লেফটেনেন্ট জেনরেল ব ম কল (B. M. Kaul) সদ্যোক্ত ওয়াকিফহালদের মতই ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন জুলাই ১৯৭১-এ প্রকাশিত তাঁর উত্তম গ্রন্থ "কনফ্রনটেশন উইৎ পাকিস্তান"-এ। পিণ্ডি ইসলামাবাদের মিলিটারি জুন্টাব বহু সিনিয়ারতম শিকরে পাখিকে তিনি অতি ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন। তিনি বলেন·

১৯৭০-এর গণনির্বাচনেব পর একাধিক বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা গেল শেখ মুজীব এবং ইয়েহিয়া খানের মধ্যেই এই মর্মে একটি রাজনৈতিক সমঝোতা হয়ে গিয়েছে যে, শেখ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণ করবেন এবং ইযেহিয়া পূর্বের ন্যায় প্রেসিডেন্ট থাকবেন।

সেনাপতি কল তারপর বলছেন, "কিন্তু যখন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তখন দুই নেতার কেউই ভুট্টোর দুষ্ট চক্রান্ত করার সামর্থ্য যে কতখানি সেটা হিসেবে ধরেন নি (মেক এলাওয়েন্স্ ফর দি মিস্চিফ-মেকিং কেপাসিটি অব ভুট্টো!)।"

কি সে মিসচিফ বা নষ্টামি? তার পটভূমি কি?

গণ নির্বাচনের প্রায় দুই মাস পূর্বে, অক্টোবর ১৯৭০ সালেই পশ্চিম পাকবাসী অবসরপ্রাপ্ত পাকিস্তান এ্যারফর্সের প্রধান, এ্যার মার্শাল নূর খান লাহোরের নিকটে এক জনসভায় বলেন, "মি. ভুট্টো দীর্ঘকাল ধরে সরকারি মহলের সঙ্গে দহরম মহরম জমিয়ে এখন চেষ্টা করছেন পাকিস্তানে যেন ডিক্টেটরী শাসন কায়েম থাকে এবং চালবাজি মারফত তিনি যাতে করে খিড়কির দরজা দিয়ে ক্ষমতা লাভ করে ফেলেন।" একদম খাঁটি কথা। কিন্তু এরপর নূর খান যে প্রশ্ন শুধোচ্ছেন সেটির দিকে আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

" 'ভূতপ্রাপ্ত' এক ডিক্টেটরের এই শাগরেদ ভুট্টো যবে থেকে তাঁর প্রভুকে গুত্তা মেরে নর্দমায় ফেলে দেওয়া হল সেই থেকে নাগাড়ে ঝাড়া আঠারোটি মাস ইয়েহিয়া শাসনের সব-কিছু ধৈর্যসহ বরদাস্ত করার পর এখন আচমকা কেন আর কুছভী বরদাস্ত করতে চাইছেন না?—এ প্রশ্ন শুধোবেন যে কোনো স্থিরধী জন।"

নূর এ-প্রশ্নের উত্তর জানতেন।

আমরাও কিছুটা জানি।

আইয়ুবের পতনের পর এক পশ্চিম পাকী কাষ্ঠরসিক ঠোঁট-কাটা মন্তব্য করেন, বহুবার কোটিপতি, সার্ডিনিয়ার গোপন গহ্বর—ধনপতি "আলিবাবা তো গেল, কিন্তু চল্লিশটে চোর রেখে গেল যে।" এরা ছড়িয়ে আছেন সর্বত্র। ব্যুরোক্রেট ব্যাঙ্কপতি সদাগর ইত্যাদি করে করে খুদ আর্মি তক্। এই গেল পয়লা নম্বর।

দোসরা : সর্বদেশ-প্রেমী দ্বারা অভিশপ্ত বাইশটি শোষক পরিবার।

হরেদরে গলাজল হয়ে একুনে দাঁড়ায় কিন্তু এক বিকট ত্রিমূর্তি।

যক্ষ (ধনপতি—বিশেষ করে সেই ২২), রক্ষ (আর্মি) এবং চিত্রগুপ্ত (আমবা পাল)।

ইয়েহিয়া আসনে বসা মাত্রই ভুট্টো মারলেন ডুব। তাঁর লক্ষ্য ছিল দুটি : আয়ুবকে সবিয়ে জিন্না দি সেকেন্ড হওয়ার পথ সুগম করা। দুই : কিন্তু জিন্না ছিলেন পূব-পশ্চিম দুই পাক-ডানার উপর সওয়ার ফাদার অব দি নেশন। এর একটি ডানা অটনমি পেয়ে গেলে তিনি হয়ে যাবেন এজমালি জুনিয়ার ফাদার অব দি নেশন। অতএব ঘায়েল করতে হবে আওয়ামি লীগকে। মূলত ভুট্টো-পার্টির একটা শাখা পূর্ব পাকেও ছিল। তাব চেয়ারম্যান ছিলেন মুসলিম শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বাঙালি মৌলানা নূরজ্জমান। ভুট্টো দেখলেন, বাংলা দেশের সর্বনাশ করে তাকে পশ্চিম পাকের চিরন্তন ক্রীতদাস বানাতে হলে তাঁর পার্টিতে পূব পাকের কোনো সদস্য রাখলে সে তাঁর হুকুমমত নেমকহারাম কুইজলিং সাজতে রাজী নাও হতে পারে। তাই তিনি তাঁর পার্টিকে নবরূপে দিলেন—আপন প্রদেশ সিন্ধুর কোনো নগরে নয়, তাঁর আরাধ্যা বল্লভা নগরী পাঞ্জাবী লাহোরে। মৌলানা নূরজ্জমান তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ভুট্টোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বললেন, ভুট্টো লাহোরে তাঁর পার্টিকে নবরূপ দেবার সময় পূব পাকের কোনো নেতা বা সাধারণ জনকে আহ্বান জানান নি; তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা।

ভুট্টোর যে নিষ্ক্রিয় আঠেরো মাস সম্বন্ধে অর্থপূর্ণ কুটিল প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন এ্যার মার্শাল নূর খান সে-আঠারো মাস ভুট্টো ছিলেন "নীরব কর্মী"; তিনি তখন ষোড়শোপচারে পূর্বোক্ত ত্রিমূর্তির পূজার্চনায় নিরতিশয় নিমগ্ন। ভুল করলুম, ষোড়শ নয় সপ্তদশ—বোতলবাসিনী তবলা-ভৈরবী। আর কে না জানে, সপ্তদশেই বঙ্গজয় সম্ভবে।

প্রথমেই নমো যক্ষায়। ধনপতিদের বোঝাতে রত্তিভর সময় লাগলো না—"পূব পাক হাতছাড়া হয়ে গেলে তুমি খাবে কি? কা তব কান্তা নয়—কা তব পন্থা হবে তখন?"

যে অর্থপ্লাবন ধেয়ে এল ভুট্টো ব্যাঙ্কের দিকে, কোথায় লাগে তার কাছে হিমাদ্রি শৃঙ্গ থেকে নেবে আসা পঞ্চনদের বন্যা!

এখানে হিটলারের সঙ্গে ভুট্টোর একটা সাদৃশ্য আছে। এদিকে হিটলারের পার্টির নাম ওয়ার্কারস্ পার্টি, ওদিকে কড়ি ঢাললে কলোনের যক্ষ ব্যাঙ্কাররা। ওয়ার্কারস্‌দের বুঝিয়েছেন, তোমাদের বাঁচাবো ধনপতিদের শোষণ থেকে, আর ধনপতিদের সমঝালেন, তোমাদের বাঁচাবো শ্রমিকদের ইউনিয়ন-নামক নুইসেন্স্ থেকে। ভুট্টো কি দিয়ে না-পাক ধনপতিদের বাগালেন সে তো বলেছি, তাঁর পীপলস পার্টির "পীপল"কে বোঝালেন হুবহু হিটলারী কায়দায় গরম গরম লেকচার ঝেড়ে। পীপলকে অবহেলা করা চলে না, কারণ তাঁর পার্টি—ইষ্টমন্ত্র।

'ইসলাম আমাদের ধর্ম।
গণতন্ত্র আমাদের রাষ্ট্রনীতি।
সমাজতন্ত্র আমাদের অর্থনীতি।
সর্বপ্রভুত্ব জনগণের।"

হায় রে পূর্ব বাংলার জনগণ!

ব্যুরোক্রেটদেব বললেন, "ইংরেজ আই সি এসের চেয়েও রাজার হালে আছ পূর্ব পাকে। পশ্চিম পাকেব কড়িটাও আসে পূব পাক থেকে। বাঙালরা অটনমি পেলে যাবে কোথায়?"

আর্মিকে শুধোলেন, "তোমাদের সৌরী-সেনীয় শ্বেতহস্তীর মিলিটারি বাজেটের টাকাটা যে পূবালী চিড়িয়া সোনার ডিম পেড়ে সামলায় তার যে উড়ূক্কু উড়ূক্কু ভাব! সে পালালে পট্টি মারবে কি দিয়ে?"

এবং এদের আরো মোলায়েম করার জন্য তাদের পদপ্রান্তে রাখলেন পঞ্চমকারের বঢ়হীয়া বঢ়হীযা সওগাৎ। ধনপতিগণ প্রসাদাৎ পূর্বলব্ধ অর্থদ্বারা।

ঝাড়া আঠোরোটি মাস ভুট্টো করলেন এই তপস্যা। এবারে এ্যার মার্শাল নূর (=জ্যোতি)-এর রহস্যান্ধকারময় বঙ্কিম প্রশ্নের উপর সরল জ্যোতি বর্ষিত হল।

তপস্যান্তে যক্ষ রক্ষ গুপ্ত সমন্বিত ত্রিমূর্তি বদ্ধমুষ্টিতে ধারণ করে তিনি বেরুলেন জয়যাত্রায়।

যে সম্প্রদায় মনে করেন বাঙলাদেশকে ক্রুশে চড়াবার চড়ক-বাদ্যে ইয়েহিয়া মূল গায়েন নন তিনি মাত্র দোহার, বিলিতি বাদ্যে সেকন্ড ফিড্‌ল্ তাঁরা বলেন ভুট্টো যখন আজ হেথায় ব্যুরোক্রেস্ট হুতোমদের ব্যানকুয়েট খাওয়াচ্ছেন, কাল হোথায় জাঁদরেল কর্ণেলদের নৃত্য সম্বলিত ককটেল পার্টি দিচ্ছেন, পরশু খোজা-বোরা-মেনন ধনপতিদের গোপন জলসাতে তাঁর পিপ্‌ল্স্ পার্টির পিপলদের কুরবাণী দিচ্ছেন যক্ষদের দরগাহতে—ইয়েহিয়া তখন এ-সব পূজা-আচ্চা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। কারণ এসব গুণীনদের মতে ইয়েহিয়ার তখনো সঙ্কল্প আওয়ামি লীগকে তার ন্যায্য প্রাপ্য যথাসময়ে দিয়ে দেবেন। অর্থাৎ কূটনৈতিক ভুবনে তাঁর তরে তখন গভীর নিস্তব্ধ তৃতীয় যাম। তিনি গভীর নিদ্রায় সুষুপ্ত চতুর্দিকে অবশ্য হুরী পরীরা তাঁর সেবাতে লিপ্ত।

এহেন সময়ে ভুট্টো দেবের আবির্ভাব।

জেনরেল কল-এর পুস্তকখানি প্রধানত রণনীতি সম্বন্ধে। তাই সেখানে রাজনীতির উল্লেখ কম—নিতান্ত যেটুকু পটভূমি হিসাবে বলতেই হয়, আছে মাত্র সেইটুকু। কারণ রণপণ্ডিত ক্লাউজেভিৎস তাঁর প্রামাণিক গ্রন্থে বলেছেন, "পলিটিকস যখন আর এগোতে না পেরে অন্য বস্তুর সাহায্যে এগিয়ে চলে তখনই তার নাম যুদ্ধ।"

কল বলছেন ইয়েহিয়া মুজিবে মিলে গণতন্ত্রের যে কচি কোমল চারাটি পুঁতলেন সেটাকে উপড়ে ফেললেন ভুট্টো। তিনি তখন পশ্চিমা সেনাবাহিনীর আদরের দুলাল। তাঁর আপন ক্ষমতার নেশা তখন মাথায় চড়েছে। তিনি এখন আর এসেমব্লিতে বিরোধী দলের পাণ্ডা সেজে মুজীব মূল গায়েনের পিছনে পিছনে দোহার গাইতে রাজী নন।

তবু তিনি এলেন ঢাকায়। তার একমাত্র কারণ, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, শেষটায় রাষ্ট্রের কর্ণধার হবেন তিনি—এদ্দিন যা ছিল, ঠিক তেমনি, পূব পাক থাকবে তাঁর তাবেতে কলোনি রূপে। ইংলন্ডের রাজা যে-রকম "সমুদ্রের ওপারের ডমিনিয়নসেরও সম্রাট"। এবং দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা যে-রকম কখনো সখনো ভারতে এসে রাজানুগ্রহ দেখাতেন, ভুট্টোকেও তো সে-রকম ঢাকাতে আসতে হবে মাঝেমিশেলে। তখন যেন তাঁব পূর্ব পাকিস্তানের কোনো বেয়াড়া প্রজা না বলতে পারে, তিনি মুজীবকে তাঁব মুখারবিন্দ দর্শন লাভ থেকে অকারণ তাচ্ছিল্যে বঞ্চিত করেছিলেন।

ভুট্টোদেব ঢাকা এলেন বিস্তর সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে নিয়ে। প্রিন্স অব ওয়েলস যে-রকম পাত্রমিত্র নিয়ে দিল্লি আসতেন।

ইয়েহিয়া যখন ভুট্টোর পূর্বে ঢাকা আসেন তখন তাঁর সে-আসাটা আন্তরিক শুভেচ্ছাবশত ছিল কি না সে-বিষয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু এ-বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই যে ভুট্টোর আগমনটা ছিল নির্ভেজাল ধাপ্পা। কোনো প্রকারের সমঝোতাই তাঁর কাম্য ছিল না। তাই মারাত্মক রকমের সিরিয়াস কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার ভড়ং চালালেন তিনি পাক্কা তিনটি দিন ধরে—যে আলোচনা তিন মিনিটেই শেষ হয়ে যাবার কথা। একবার তো তিনি সে থিয়েডারিটাকে প্রায় ফার্সের পর্যায়ে নাবিয়ে আনলেন একটানা ঝাড়া আটটি ঘণ্টা শুধু তিনি আর শেখ "সলা পরামর্শ" করে। ও হো হো! সে কী টপমোস্ট সিক্রেসির ভান! মিঞা তাজ, নজরেরও সেখানে প্রবেশ নাস্তি। ভাবখানা এই, ভুট্টোদেব এমনই প্রলয়ঙ্করী প্রস্তাব প্রতিপ্রস্তাব পরিকল্পনা সুপারপ্ল্যানিং পেশ করবেন যে তার সামান্যতম রেশও যদি তৃতীয় ব্যক্তি শুনে ফেলে তবে ইন্ডিয়া সেই রেশের উপর নির্ভর করে তদ্দণ্ডেই পাকিস্তান এটাক করবে, ওয়ালস্ট্রীট ফট করে কলাপস করবে, ইংলন্ডের মহারাণী তাঁর চাচা উইন্ডসরকে কোল-পাঁজা করে তুলে এনে তাঁর হ্যাটে কোহ-ই-নুরটি পরিয়ে দেবেন।

"কিবা হবে, কেবা জানে
সৃষ্টি হবে ফট্‌
সংক্ষেপে বলিতে গেলে
হিং টিং ছট।"

বিশেষ বিবেচনার পর আমি এস্থলে হিং টিং ছট-টি ব্যবহার করেছি কবিগুরু যে অর্থে

ব্যবহার করেছিলেন ঠিক সেই অর্থে। আপাতদৃষ্টিতে অসাধারণ রহস্যময় কতকগুলো বুজরুকিকে যখন গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বময় তান্ত্রিক ধ্বনির মুখোশ পরানো হয় তখন সেটা হিং টিং ছট; সায়েবী ভাষায় আবরাকাডাবরা মাম্বোজাম্বো হাকাস পোকাস।

ভুট্টো শেখের এ-রাঁদেভুতে লাভবান হলেন কে?

নিঃসন্দেহে ভুট্টো।

চাঁড়াল ভুট্টো শেখের সঙ্গে একাসনে বসতে পেয়ে পৈতে পেয়ে গেলেন।

ইয়েহিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন তিনি আইয়ুবের স্বৈরতন্ত্র হটিয়ে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করবেন। তার প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল শেখ মুজীব নিরঙ্কুশ সংখ্যাগুরুত্ব লাভ করেছেন। তিনি স্বচ্ছন্দে একটি নিষ্কণ্টক সরকার নির্মাণ করতে পারেন। ইতিমধ্যে ময়দানের এক কোণ থেকে একটা লোক সার্কাসের ক্লাউন যে-রকম ওস্তাদের কেরামতি খেল দেখে চেঁচাতে আরম্ভ করে, "আমি পারি, আম্মো আছি—আমাকে ভুললে চলবে না", ঠিক সেই রকম একটা লোক হাত পা ছুঁড়ে বিকট চেল্লাচেল্লি আরম্ভ করলে, "শেখের পরেই আমি, আমাকে ছাড়া চলবে না।" সার্কাসের ম্যানেজার সদয় মস্করার মুচকি হেসে হেসে "তো, আও বেটা, বাতাও তুমহারা খেল।" ম্যানেজার ইয়েহিয়া বললেন, "শাবাশ বেটা ভুট্টো!"

কিন্তু দীর্ঘ তেইশ বৎসর ধরে সর্বপ্রকারের অত্যাচার অবিচারের পর এই হয়েছে গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন। তাই গোড়া থেকেই চলতে হবে অত্যন্ত সন্তর্পণে, আইনের পথে ন্যায়ের পথে—গণতন্ত্রের নাতিদীর্ঘ ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে-সব উদাহবণ সৃষ্ট হযেছে, নজির নির্মিত হযেছে, সেগুলো প্রতি পদে সসম্ভ্রমে মেনে নিয়ে। এটা তো সার্কাস নয়। গণতন্ত্রে ভাঁড়ামির স্থান নেই—সে ছিল আইয়ুবের "বেসিক ডেমোক্রাসিতে"।

"কে এই লোকটা?"

"আমি ভুট্টো; গণনির্বাচনে আমি দুই নম্বরের সংখ্যাগুরু। মুজিবের পরেই আমি। আমার সঙ্গে একটা রফারফি না করে সংবিধান বানালে চলবে না।"

"বা—রে—! এ তো বড়ী তাজ্জবকী বাত! মুজীবের পরেই তুমি! তা—সৃষ্টির ইতিহাস পড়লেই দেখি সদাপ্রভুর পরেই শয়তান। তাই বলে গড যখন সেরাফিম্ চেরাবিম্, গেব্রিয়েল নিয়ে ভগবানবাদে তাঁর ক্যাবিনেট নির্মাণ করলেন সেখানে তো শয়তানকে ডাকা হয়নি। এসব তাবৎ জঞ্জাল জড়ো করে তিনি বানাতেন কি? ঢাকা মীরপুরের চিড়িয়াখানা?

আর, বাই দি উয়ে, তোমার পর তো সংখ্যাগুরুতে ইনডিপেনডেন্ট ক্যানডিডেটস। তাদের সঙ্গে একটা সমঝোতা করে নিয়ে তার পর এখানে এসেছ তো? তুমি যেমন আমার ঠিক ঠিক নিচে বলে আমার সঙ্গে একটা রফারফির দাবী জানাচ্ছ, ঠিক তেমনি ওরাও তোমার উপর সেই দাবী চাপাচ্ছে না তো? করে করে তার পরের দলের দাবী তার উপরের দলের উপর চাপাবে এবং লিস্টের সর্বনিম্নে যে চোর উল্-আমিন লিক্ লিক্ করছে তাকে পর্যন্ত ভজতে পূজতে হবে। তার নামখানা থেকেই বুঝতে পারছো, ওর খাঁই মেটানো তোমার আমার কম্ম নয়—থুড়ি, আমার কম্ম নয়, কিন্তু তুমি পারবে! তুমি যখন মহামান্য সুচতুর ইয়েহিয়াকে বোঝাতে পেরেছ যে, গণতন্ত্রের পয়লা আইন হচ্ছে, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগুরুর প্রথম কর্তব্য সে যেন সংখ্যালঘুর ন্যাকরা বয়নাক্কার তোয়াজ করে করে কাজকর্মের ভার নেয়, ক্লাসের ফার্স্ট বয় যেন সেকেন্ড বয়ের সঙ্গে আলোচনা

করে তার মর্জিমাফিক আসছে পরীক্ষায় (সংবিধান নির্মাণে) অ্যানসার বুক লেখে—এ-রকম ভেল্কিবাজি যখন দেখাতে পেরেছো, তখন না হয় বলে দিয়ো চোর উল্-আমিনকে যে তুমি তাকে তোমার বাড়ির পাশের মোনজোদড়োর সুলতান বানিয়ে দেবে। হ্যাঁ, আরেকটা কথা। তুমি এরকম হ্যাংলার মত ট্যাংস ট্যাংস করে ঘস্টাতে ঘস্টাতে ঢাকা এলে কেন? ঐ যে, তোমার হয় তো, বাপু, চেনা, শয়তান—সেও তো ভগবানবাদে গিয়ে গডের কাছে বায়না ধরেনি, আমাকে তোমার কেবিনেটে নাও। সে জানে হোয়াট ইজ হোয়াট। সে তার আপন শয়তান বাদে (মাস তিনেক পরের ঘটনা জানা থাকলে এস্থলে অক্লেশে বলা যেত, "টিক্কা বাদে") দিব্য তার মিতা ডেভিল, ইবলীস, বী এল জেবাব্ নিয়াজী, ইরফানকে নিয়ে তার আপন সংবিধান বানিয়ে নিয়েছে এবং বললে নিশ্চয়ই পেত্যয় যাবে, তার সরকার তেমন কিছু মন্দ চলছে না। তুমি বানাও না তোমার সংবিধান তোমার প্যারা ত্রিমূর্তি নিয়ে—যক্ষ রক্ষ গুপ্ত দিয়ে। এরা এক এক খানা আস্ত আস্ত চীজ। ওদের ঠেলায় দেখতে হবে না, শয়তান বাবাজীকে রাতারাতি ব্যবসা গুটিয়ে লারকানার হাইকোর্টে দেউলে হওয়ার নোটিশ টাঙাতে হবে।"

মস্করাটার বাড়াবাড়ি হচ্ছে? মোটেই না। পাঠক, একটু পরেই বুঝতে পারবেন! আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে কতখানি জীবন-মরণ সিরিয়াস। আচ্ছা, তা হলে না হয় আমি একটা সিরিয়াস উদাহরণ নিচ্ছি। মনে করুন, বছর কয়েক পূর্বে উইলসনের পরিবর্তে মি. ভুট্টো ছিলেন বিলেতের প্রধানমন্ত্রী। উইলসন-ভুট্টো নির্বাচনে হেরে গেলেন মি. হীথের কাছে। বিশ্বসংসার জানে চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে উইলসন প্রধানমন্ত্রী ভবন ১০নং ডাউনিঙ স্ট্রীট থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে সরে পড়লেন। ভুট্টো সে-স্থলে কি করতেন? নিশ্চয়ই আবদার ধরতেন, "হীথের পরেই আমার ভোটাধিক্য। ও পেয়েছে ইংলন্ডে সব চেয়ে বেশী ভোট, আমি পেয়েছি স্কটল্যান্ডে সবচেয়ে বেশী ভোট (ইংলন্ড স্কটল্যান্ড আমি কথার কথা কইছি)। আমার সঙ্গে একটা সমঝোতা না করে দেখি হীথ কি করে ১০ নম্বরে ঢোকে? আমি বলছি কি, সে যদি নেয় ডাইনিংরুম আমি নেব ড্রইংরুম, তাকে দেব গাইয়ের মুখের দিকটা আমি বাঁটের দিকটা, সে নেবে কল্কে সাজানোর দিকটা আমি মুখে পুরবো গড়াগড়ার নলটা। সে কি! পূর্ব পাক কি আমার পর—একেই বলে সত্যকারের অনেস্ট ব্রাদারলি ডিভিশন।"

ভুট্টো জানতেন, বিলক্ষণ জানতেন, গণতন্ত্রে কি আইনত (ডি জুরে) কি কার্যত (ডি ফাক্টো) আওয়ামি লীগের গণদরবারে (ভিজা আ ভি) পয়লা সারিতে তাঁর কোনো আসন (লকাস স্টেন্ডি) নেই। তাই তাঁর ছিল আপ্রাণ চেষ্টা, কোনো-গতিকে আওয়ামি লীগের দরবারের এক কোণেও যেন একটা আসন যোগাড় করে নিতে পারেন। তাই যদিও তিনি এলেন ঢাকঢোল বাজিয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে নিয়ে, ভিতরে ভিতরে তিনি এলেন আতুর ভিখিরির মত হামাগুড়ি দিতে দিতে।

পাঠক, আপনি যতই অতিষ্ঠ হয়ে থাকুন না কেন আমি এই লিগেল, মরাল, সাংবিধানিক প্রতোকলীয় পয়েন্টটি কেচে ধুয়ে ইস্ত্রি চালিয়ে ভাঁজ করে পকেটে না ঢোকানো পর্যন্ত ছাড়ছিনে। কারণ এটা বাঙলা দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক অশিব মূর্তি নিয়ে বার বার দেখা দেবে। যাঁরা বাংলাদেশের মঙ্গল কামনা করেন তাঁদের এ-বিষয়ে পরিপূর্ণ সচেতন হওয়া উচিত। আমাব অজানা নয়, বিষয়টি অত্যন্ত নিরস

কিন্তু সে কারণে আমি যদি এটা এড়িয়ে যাই তবে উভয় বাঙলার যে দু-একজনের সঙ্গে আমি এ নিয়ে তুমুল তর্কাতর্কি করেছি তারা আমাকে "আস্তো একটা এসকেপিস্ট ভাঁড়ামি ভিন্ন অন্য কোনো সিরিয়াস বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চায় না।" বলে আমাকে প্রাগুক্ত সার্কাসের ঐ ক্লাউনের সঙ্গে তুলনা করে বাকিস্তানে নির্বাসিত করবেন। আমি যে ভাঁড় ক্লাউন সেটা আমি অতীব শ্লাঘার বিষয় বলে মনে করি, কিন্তু একটি নিবেদন এস্থলে আমাকে পেশ করতেই হল : সার্কাসের ক্লাউন তো এসকেপিস্‌ট হয় না—সে তো কুল্লে ওস্তাদের তাবৎ কেরামতি দেখাবার জন্যে সদাই শশব্যস্ত।

তা সে-কথা থাক। আমি এ প্রস্তাবনা উত্থাপন করেছি গুণীদের মুখ থেকে শুদ্ধমাত্র শোনবার জন্য, গণনির্বাচনে নিষ্কণ্টক সংখ্যাগুরুত্ব লাভ করার পর বিজয়ী পার্টির কি কোনো দায় আছে, দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় পার্টির সঙ্গে সলাপরামর্শ করার—জাহান্নমে যাক তাদের সঙ্গে সমঝোতা করার। অতি অবশ্য এ-কথা সত্য, ভুট্টো যদি তাঁর পার্টির প্রতিভূ হিসেবে—'আমি ভোটে দুই নম্বরী হয়েছি বা আমি সমুচা পশ্চিম পাকিস্তানের মোড়ল' সে হিসেবে নয়—আওয়ামি লীগ প্রধানের কাছ থেকে একটা ইন্টারভিউর প্রার্থনা জানান তবে—শেখ-চরিত্র আমরা যতখানি চিনতে পেরেছি তার থেকে বলতে পারি—তিনি বদান্যতার সঙ্গে সেটা মঞ্জুর করবেন।

কিন্তু সেটা হবে শেখের ব-দা-ন্য-তা।

মি. ভুট্টোর হ-ক্ নয়॥

পিণ্ডির পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

রোমান সেনাপতি কুইনটুস্ ফাবিয়ুস যখন হানিবালের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত তখন তাঁর রণকৌশল ছিল সম্মুখযুদ্ধে মরণ বাঁচন লড়াই না লড়ে ক্রমাগত সুযোগের অপেক্ষায় দেরী করে করে যখন সুযোগ আসতো তখনো মুখোমুখি না লড়ে শত্রু-সেনার বাজুতে যেখানে সে দুর্বল সেখানে আঘাত হানা—কিন্তু সে আঘাতটা হত মোক্ষমতম। তাই সুযোগের অপেক্ষা করে আখেরে দুশমনকে ঘায়েল করার চাল বা স্ট্রাটেজিকে আজও বলা হয় "ফেবিয়ান" পদ্ধতি। মারাঠারা হুবহু, ঐ একই পদ্ধতিতে ঔরংজেবকে রণক্লান্ত ও পরবর্তীকালে মোগলবাহিনীকে পরাজিত করে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা ঐ নীতি অবলম্বন করে সফলকাম হন।

এস্থলে কিছুটা অবান্তর হলেও ইংলন্ডের "ফেবিয়ান সোসাইটি"র উল্লেখ করতে হয়। মার্কস-এঙ্গেল্‌স্ যখন আসন্ন "রক্তাক্ত শ্রেণীসংগ্রামের" প্রোপাগান্ডা করে যাচ্ছেন তখন তার শেষের দিকে বিলেতে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে (১৮৮৪) ঐ নাম নিয়ে। এঁদের নীতি নির্দেশ আছে : "হানিবালের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সময় ফাবিয়ুস যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন তোমাকে অসীম ধৈর্যসহকারে সুযোগের সেই শুভ লগ্নের জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে—যদিও বহু লোক তখন ফাবিয়ুসের সেই দীর্ঘসূত্রতাকে নিন্দাবাদ করেছিল; কিন্তু সে লগ্ন যখন আসবে তখন হানবে বেধড়ক মোক্ষম ঘা—নইলে তোমার সর্ব প্রতীক্ষা সবরের (সবুরতার) সমাপ্তি ঘটবে হাহাকার ভর নিষ্ফলতায়।

আওয়ামি লীগের গোড়াপত্তন থেকে ২৫শে মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত তার রণনীতি ছিল ফেবিয়ান—এ কথা বললে মোটামুটি ঠিক কথাই বলা হয়। বিশেষ করে ১৯৭০

ডিসেম্বরে নিষ্কণ্টক মেজরিটি পাওয়ার পর থেকে ১৯৭১-র ২৫ মার্চ পর্যন্ত।

আরেকটি নীতিতে ফেবিয়ানরা দৃঢ় বিশ্বাস ধরতেন। "গণতন্ত্রের গর্ভে থাকে সমাজতন্ত্র। গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক রূপ সমাজতন্ত্র (সোসালিজম)।"

আওয়ামি লীগ চিরকালই এ-নীতিতে বিশ্বাস করেছে—আজও করে। তবে সেখানেও সে ফেবিয়ান। আকস্মিক শ্রেণী-সংগ্রামের মাধ্যমে সে-সমাজতন্ত্র (অর্থ বণ্টনের সাম্য) রূপায়িত হবে না—হবে প্রগতিশীল সংবিধান নির্মাণ, আইনকানুন প্রণয়ন দ্বারা ক্রমবিকাশমান সমাজচেতনার শুভ বুদ্ধিকে উৎসাহিত করে, সমাজবিরোধী শোষণ নীতিকে পলে পলে নিষ্পেষিত করে।

সোসালিস্ট মাত্রই বিশ্বাস করে মানবসমাজ ক্রমশ সর্বপ্রকার সাম্যের দিকে এগিয়ে চলেছে—ধনবণ্টনে সাম্য, রাষ্ট্রচালনায় সাম্য, ধর্মকর্মে সাম্য, ভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে পদমর্যাদায় সাম্য (নেশনালিজম)—দুর্বল রাষ্ট্রকে যখন বৃহত্তর, বলীয়ান পশুরাষ্ট্র শোষণ-উৎপীড়ন করে, তাকে তার ন্যায্য সাম্য থেকে বঞ্চিত করতে চায়, তখন তাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করে দেওয়া তার রাষ্ট্রসাম্য—। প্রকৃত সোসালিস্ট মাত্রই সেই আগ্রাসী গতিবেগকে সংবিধানসম্মত নিরস্ত্র পদ্ধতিতে সাহায্য করে।

আজকাল আমরা মোক্ষ, নিজাৎ, ফান-বাক্য, নির্বাণ ইত্যাদিতে বড় একটা বিশ্বাস করিনে। তবু একটা সমান্তরাল উদাহরণ দেখালে তথাকথিত "সংস্কারমুক্ত ন-সিকে রেশনাল" জনও হয়তো কিঞ্চিৎ বিস্মিত তথা আকৃষ্ট হতে পারেন। খৃষ্টান মিশনারি, যাঁরা প্রচার করেন, মুসলমান নারীর আত্মা নেই, তাঁরা বলেন, প্রভু বুদ্ধ নৈরাশ্যবাদী। আমরা বিশ্বাস করি তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ আশাবাদী। তিনি বলেছেন, "বিশ্বমানব এগিয়ে চলেছে নির্বাণের দিকে। আখেরে নির্বাণ পাবে সর্বজন—সর্ব মানব থেকে আরম্ভ করে সর্ব কীটপতঙ্গ। এরা চলেছে যেন নদীর ভাটার স্রোত ধেয়ে। তাকে উজানে চালানো অসম্ভব। কিন্তু স্রোতগামী কাঠের টুকরোটাকে বৃহত্তর কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা যেরকম সেটাকে কিঞ্চিৎ ডাইনে-বাঁয়ে সরানো যায় কিংবা তার গতিবেগ বাড়ানো যায়, মানুষ ধর্মসাধনা দ্বারা ঠিক সেই রকম নির্বাণের দিকে তার গতিবেগ বাড়িয়ে দিতে পারে।" এককথায়. কি ফেবিয়ান, কি কম্যুনিস্ট, কি বৌদ্ধ সকলেই চরম গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে আশাবাদী।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, শেখ সাহেব এবং আওয়ামি লীগের প্রধানগণ ফেবিয়ান ঘেঁষা সোসালিস্ট। পক্ষান্তরে প্রকৃত বামপন্থী ছিলেন মৌলানা ভাসানী। ওদিকে লেফটেনেন্টে কমান্ডার মুয়াজ্জম হুসেন যে মতবাদ পোষণ করতেন সেটা অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়—"ছয় দফা বনাম এক দফা।" তিনি বলতেন, "আমি পশ্চিম পাকীদের খুব ভালো করেই চিনি। ওদের সঙ্গে বাঙালির কস্মিনকালেও মনের মিল স্বার্থের ঐক্য হবে না। ছয় পয়েন্টের ধানাই-পানাই না করে সোজাসুজি এক দফায় বলে দাও, "চাই স্বরাজ, পূব বাঙলায় সম্পূর্ণ স্বাধীন সবশক্তির স্বতন্ত্র রাষ্ট্র।" আইয়ুব এবং ইয়েহিয়া দুজনাই মুয়াজ্জমের এককাট্টা জাতীয়তাবাদের কথা ভালো করেই জানতেন। "তাই কুখ্যাত আগরতলা মামলার" যে নথিপত্র আইয়ুবের আদেশে স্বয়ং ইয়েহিয়া তৈরী করেন তার আসামীর ফিরিস্তিতে অন্যতম প্রধান ছিলেন মরহুম মুয়াজ্জম। টিক্কা খানও সেকথা ভোলেননি। তাই ২৬ মার্চ ভোরবেলা তাঁকে নৃশংসভাবে, তাঁর স্ত্রীর চোখের সামনে হত্যা করা হয়। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী সে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের কথা আমার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই

সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন। সে কাহিনী এমনই পাশবিক যে তার বর্ণনা দেবার মত শক্তি আমার নেই। যেটুকু পারি যথাসময়ে দেব।

অথচ মি. ভুট্টোর বিবরণী মাফিক শেখ পয়লা নম্বরী ফ্যাসিস্ট। মনে হয়, ভুট্টো প্রথম একখানি প্রামাণিক অভিধান খুলে ফ্যাশিস্‌মো শব্দটির অর্থ দফে দফে টুকে নিয়েছেন। তারপর মুসোলিনী এবং হিটলার দুই পাঁড় ফ্যাসির কর্মপন্থার তসবিরের নিচে রেখেছেন একখান আনকোরা কার্বন পেপার। উপরে বুলিয়েছেন একটা দড় বলপয়েন্ট। হো প্রেস্তে!—ভানুমতীকা খেল—তলার থেকে বেরিয়ে এল, মুজিবের ছবি।

যথা :

হিটলার ধনপতিদের কাছ থেকে পেতেন টাকা।

মুজিব পেতে লাগলেন অঢেল টাকা এবং অন্যান্য উপাদান। (ম্যাসিভ মানিটারি অ্যান্ড মেটিরিয়াল এসিস্‌টেন্‌স্‌)—ব্যাঙ্কার এবং ধনপতিদের কাছ থেকে (ব্যাঙ্কারস অ্যান্ড বিগ বিজনেস)। উবাচ ভুট্টো।

এই একটিমাত্র বাক্য যেন একটি জুয়েল। ন্যাড়খানাগত উজ্জ্বল নীলমণি।

যেন এক্কেবারে খাঁটি যোগশাস্ত্রের সূত্রে বাঁধা আস্ত একটি কণকমঞ্জরী :

যক্ষকুবের প্রসাদাৎ অর্থং চ বিত্তং চ।

ন্‌-ন্‌-নাঃ। যে ভুট্টো মিঞা বাঙলাভাষার নামেই ফ্যাকচুরিয়াস তাঁর পাক জবানে কাফেরী কালাম! তওবা, তওবা!

বরঞ্চ সিন্ধীভাষা ফার্সীর হনুকরণ করে। যেমন মি. ভুট্টোর সম্পূর্ণ অপরিচিত নয় এমন এক সম্প্রদায়কে আহ্বান করতে গিয়ে ইরানী কবি যে চারিটি শব্দ ব্যবহার করেছেন সিন্ধী ভাষাতে সেগুলো সুবো-শাম—বিশেষ করে শাম সন্ধেবেলা—এস্তেমাল হয়—রিন্দ্‌, মস্ত্‌, দেওয়ানা, শরাবী। তাই ফার্সীতেই না হয় দোহা গাঁথি :—

অম্‌দ জর্‌ ওরা আমদ সরঞ্জাম,
আজ সর্‌রাফ্‌ ওয়াজ নিমকহারাম।
ভাণ্ড ভাণ্ড স্বর্ণ আর সর্ব অবদান।
ঢেলে দিন সুদখোর আব বিত্তবান॥

পাঠান্তর

ঢেলে দিল ব্যাঙ্কার, নেমকহারাম॥

এ তো হল সূত্র নির্মাণ কিন্তু এই আজব ভুটাঙ্গপুরাণের মল্লিনাথ হবার মত পেটে এলেম ধরেন হেন জন তো এ ঘোর কলিকালে দেখতে পাচ্ছিনে। অতঃ মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ।

(ক) ব্যাঙ্করা নাকি টাকা দিত, আওয়ামি লীগকে—ভুট্টো বলেছেন, শেখকে পার্সনেলি।

এব স্য অবতরণিকা : শেখের পূর্বপুরুষ সর্ব শুযুখ নিশ্চয়ই বহু পুণ্য সঞ্চয় করে গিয়েছিলেন যে সিন্ধুর কল্কি ভুট্টাবতার শেখকে "সিন্ধী" 'কলমা' পড়িয়ে ভুট্টো ইয়েহিয়া গোত্রে অন্তর্ভুক্ত করে এ আপ্তবাক্য ঝাড়েননি যে, তাঁরা যে কায়দায় পঞ্চমকারের সাধনায় পয়সা ওড়ান শেখও ঐ প্রাণাভিরাম পদ্ধতিতে পার্টি ফন্ডের কড়ি উড়িয়েছেন!

বলা বাহুল্য, শেখের জেবে ক-কড়ি ক-ক্রান্তি ছুঁচোর নৃত্যের কেত্তন চালাচ্ছে সে তত্ত্ব ভুট্টো তাঁর ভুবন-জোড়া টিকটিকি প্রসাদাত উত্তমরূপেই জানতেন। সেখানে কানাকড়ির

গড়বড় থাকলে ব্যারিস্টার ভুট্টো কি ছেড়ে কথা কইতেন? ঢাকার "বাঙাল" হাইকোর্টের চিলকোঠায় উঠে চিল-চ্যাঁচানোর কর্কশ কণ্ঠে সে কেলেঙ্কারিটা প্রচার করতেন না?

মূল টীকা : "ব্যাঙ্কারেরা শেখকে টাকা দিয়েছিল।" এস্থলে সেই প্রাচীন প্রবাদ মনে আসে "মোটেই মা দ্যায় না খেতে—তার আবার কাঁড়া-আকাঁড়া।" উভয় পাকিস্তান মিলিয়ে বাঙালি ব্যাঙ্ক ছিল সর্বসাকুল্যে কটা? দুটো! তাদেরই বা রেস্ত ছিল কতটুকু যে রাজনীতির ঘোড়দৌড় ব্যাক করতে যাবে? আওয়ামি লীগের মত ডার্ক হর্সকে—বিশেষ করে সবজান্তা সরকারি মহল থেকে ফিসফিসেনি কানাঘুষো যখন চতুর্দিকে চক্কর খেয়ে বেড়াচ্ছে "শেখ মেরে-কেটে ৮০টা ভোট পায় কি না পায়"?...আর পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যাঙ্কগুলো টাকা দেবে লীগকে? এর উত্তরে শুধু ঢাকাইয়া উত্তর একমাত্র সম্বল : "আস্তে কয়েন কর্তা—ঘোরায় হাসবো।"

কতকগুলো লোফার বোম্বেটে পিক-পকেট একদা কলকাতায় এসে নেমেছিল বাণিজ্যের নামে হয় মুর্শিদাবাদ-দিল্লীতে ভিখ মাঙতে নয় শান্ত সরল অতিথিবৎসল বাঙালির সর্বস্ব লুট করতে। তারপর কিস্মৎ, পতন-অভ্যুদয়ের অলঙ্ঘ্য বিধানই বলুন, পূর্বজন্মের কর্মফলেই বলুন,

"বণিকের মানদণ্ড
পোহালে শর্বরী
দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে।"

যে দাঁড়িপাল্লার ঘামে ভেজা তেলচিটে ডাঁটটায় হাত দিতে গা ঘিন ঘিন করে সেটা দেখি আঁধারে গুড়িগুড়ি সিংহাসন বেয়ে উঠে রাজদণ্ডরূপ ধরে বেনের "পোলাডার" হাতে তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে।

যে বোহরার পো পর্শুদিন তক্ বোম্বায়ের রাস্তায় রাস্তায় ভাঙা ছাতা মেরামত করে দিনগুজরান করতো যে খোজার ব্যাটা বটতলায় ইটের উপর খদ্দের বসিয়ে "নোয়ার উ্যাটার" "ইটালিয়ান" চশমা বেচত, যে যেমন উদয়াস্ত কেনেস্তরার তৈরী ঝাঁঝারি বদনা ফেরি করে বেড়াত আর যে কচ্ছী ভৃগুকচ্ছের গলিতে গলিতে "তালা কুঞ্জিনা ধান্দা" করে চাপাতী শাক খেত তারা ফাদার অব দি নেশনের কেরপায় ঢাকায় এসে রাতাবাতি হয়ে গেল শেঠিয়া, মালিক, শিল্পপতি, আঁতরপ্রবর, চেম্বার অব্ কমার্সের চেয়ারমেন এবং সর্বোপরি বিশ্বজুটের সর্বাধিকারী হর্তা-কর্তা বিধাতা। আর ছাপরা ইস্টিশানের বেহারী মুটে হল ট্রাফিক ম্যানেজার।

এবং এদের তুলনায় ইসপাহানী গোষ্ঠী তো রীতিমত খানদানি মনিষ্যি, শরীফ, আশরাফ। এদের ঠাকুর্দার বাবা এসেছিলেন ঘোড়া খচ্চর বিক্রী করতে ইরান থেকে শ্রীরঙ্গপট্টমে, টিপ্‌পু[১] সুলতানের আস্তাবলে।

তালাকুঞ্জির ফেরিওলা থেকে ইঁটে বৈঠানওলা পরকলা বেচনেওলার দাপট তখন দেখে কে?—নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা-টঙ্গী জুড়ে। দম্ভে দেমাকে যব চার্নক থেকে গ্লাস্টনকে তারা তখন তুড়ি দিয়ে নাচাতে পারে। সুবে পাকিস্তানের ফাদার মাদার পি এ এস (সিভিল সার্ভিস) তাদের নাম স্মরণে এনে ঢাকার সেকেন্ড ক্যাপিট্যাল "আইয়ুব নগরে" প্রবেশ কবে।

---

(১) ঢাকা শহরে একটা "টিপু রোড" আছে। উচ্চারণটা টিপ্‌পু।

সুবে পাকিস্তানের এইসব শাহ্-ইন্-শাহরা দাঁতে কুটো কেটে, ভেটের ডালি মাথায় করে যাবেন কোথাকার সেই ফরিদ-পুরা গাঁইয়া মছলিখোরকে পাস্?

আর এঁদের তল্পিদার, যদ্যপি জমিদার তথাপি মন্ত্রণাদাতা জুলফিকার ভাই-আলীজী-ভুট্টোওয়ালা তখনো কি তাঁদের হুশিয়ার করে দেন নি, "ওরে, তোরা যাচ্ছিস কোন্ বাগে? ওই লোকটাই তো কসম খেয়েছে, বাঙালিকে ফিন্ বাঙলার রাজা বানাবে।"

আর টাকা দিয়েই যদি দেশের দশের সম্মতি মহব্বত কেনা যেত তবে টাকার কুমির ভুট্টো তাঁর আপন দেশ সিন্ধুর দক্ষিণাঞ্চলের ভোটগুলো পাইকিরি হিসেবে কিনলেন না কেন? বেলুচিস্তানে ব্লাঙ্কো, আর সীমান্তে কুল্লে একটা ভোট পেলেন কেন?

গাঁয়ের ছেলে মুজিবের তরে ছিল দেশের দশের দরদ মহব্বৎ। তাঁকে তো "কড়ি দিয়ে কিনলেম" রেওয়াজ নিরিখে শুঁটকি হাটের কায়দাকেতায় ভোট কিনতে হয় না।

মি. ভুট্টোর আরেক কুৎসা : সদাগরদের কাছ থেকে যে টাকা পায় তাই দিয়ে মুজিব অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল।

হায়, হায়, হায়! মাথা থাবড়াতে ইচ্ছে করে। তাহলে পশ্চিম পাকী পিশাচেরা এদেশে ন-মাস ভূতের নাচ না নেচে ন-দিনেই খতম হত।

কুৎসার কত ফিরিস্তি দেব? এ যে অন্তহীন।

ভুট্টো যে আজো ভুবনময় দাবড়ে বেড়াচ্ছেন সেটা বহু পূর্বেই উবে যেত যদি এই শেষ মেছোহাটার বদবোওলা গালটার এক কড়িও সাচ্চা হত : মুজিব ভাড়াটে গুণ্ডাদের মদদ দ্বারা ঘায়েল করতেন নিরীহ নাগরিককে।

পুনরপি হায়, হায়। তাই যদি হত তবে স্বয়ং ভুট্টো সাহেব ২৬ মার্চ মুক্তকচ্ছ হয়ে, পড়িমড়ি করে, ইয়েহিয়ার পাইলটদের কোমর জাবড়ে ধরে ঢাকা থেকে পালিয়ে জানটি বাঁচাবাব ছোটাসে ছোটা মোকাটা পেতেন কি?

এবং এটা যে কতবড় নির্লজ্জ মিথ্যা সেটা আর সবার চেয়ে স্বয়ং ভুট্টোই জানেন সবচেয়ে বেশী। নইলে তিনি দু-দুবার পা ঘষ্টাতে ঘষ্টাতে ঢাকা আসতেন না, নিছক মুজিবের উঠোনে কল্কেটা পেতে।...আসলে টাকাটা সাপটেছিলেন কোন্ গোঁসাই? ভুট্টো মিঞা। তাই লোকে বলে, "খেলেন দই রমাকান্ত, বিকেরের বেলা গোবদ্দন।"

কিন্তু এ-সবের সব কিছু ছাড়িয়ে যায় যে ঘৃণ্য, ন্যক্কারজনক আচরণ যেটা মানুষ জীবনভর ভুলতে পারে না সেটা :—

সবাই জানতো, ভুট্টো জানতেন মুজিব তখন পশ্চিম পাকে কারারুদ্ধ। তিনি কোনো কুৎসা, কোনো নিন্দা, কোনো অভিযোগ, কোনো অবমাননার উত্তর দিতে পারবেন না। তাঁর প্রাণবায়ু অনিশ্চয।

নিতান্ত ইতরজনও এ অবস্থায় তার দুশমনকেও গাল দেয় না।

কিন্তু বিলেতের ব্যারিস্টার, ল' একসপার্ট ভুট্টো জানেন আইনে সেটা বাধে না।

তাই ভাবি, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হতে হলে কত না এলেমের প্রয়োজন॥

মধুঋতু। ২৭ জানুয়ারী ১৯৭১ সালে জমিদার ভুট্টো অবতীর্ণ হলেন ঢাকা নগরীতে। নেমেই নাকি বললেন, "আমি আমার বড়দার সঙ্গে কথা কইতে এসেছি।"

সুবে পূব পাকিস্তান পরিতৃপ্তি সহকারে উচ্চধ্বনি করলে, "ওহো হো, হো, কি বিনয়, কি বিনয়। জুনাগড় রাজ্যের পরম প্রতাপশালী ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রীর ঔরসে তথা বহু কলায়, বিশেষত সঙ্গীতে পারদর্শিনী অনন্যা প্রিয়দর্শিনীর গর্ভে যাঁর জন্ম তিনি কিনা আমাদের গাঁয়ের সাদামাটা মুসল্লি মিয়া সাবের "পোলাডারে" বড় ভাইসাব কইলেন। খানদানী ঘরের মনিষ্যি অইব না ক্যান?"

আসলে কিন্তু এটা কি সেই "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ"-র নায়েবজীব উদয়াস্ত "নারায়ণ নারায়ণ। হরি হে তুমিই সত্য" বুলি আওড়ানোর মত নয়? দুটোই আগাপাশতলা নির্ভেজাল ভণ্ডামির প্রহসন।

এ তামাশার দশ বারো বৎসর আগের থেকেই পশ্চিম বাঙলায় প্রকাশিত পুঁথি-কেতাব পূব বাঙলায় আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে—মায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য। তাই সেই বহুল প্রচারিত কবিতাটির নীতিবাক্য যদি ঢাকাইয়ারা ভুট্টোর "দাদা, দাদা" সম্বোধনের সময় স্মরণে না এনে থাকেন তবে উষ্মা প্রকাশ করা অনুচিত।

কুটুম্বিতা বিচার

কেরোসিন-শিখা বলে
মাটির প্রদীপে
ভাই বলে ডাক যদি
দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে
উঠিলেন চাঁদা—
কেরোসিন বলি উঠে,
এস মোর দাদা!

পূর্বেই বলেছি মি. ভুট্টো আমাদের শেখের বর্ণে উঠতে চেয়েছিলেন, এখন তিনি তাঁর ভাই হতে চান! তিনি এদানির আশমানে ওড়ান "ইসলামী" ঝাণ্ডা; ইসলাম অনুযায়ী ভাইয়ে ভাইয়ে সমান বখরা। পশ্চিম পাকের জন-সংখ্যা পূব বাংলার চেয়ে কম। অতএব ভুট্টো-ভাই পূব বাংলারও একটা হিস্যে পাবেন।

দীর্ঘ তিন দিন ধরে শেখ সম্প্রদায় আপ্রাণ চেষ্টা দিলেন ভুট্টো কি চান সেটা জানতে। বাংলাদেশ কি চায় সে তো জানা কথা। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। ভুট্টোও তাতে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাহলে গেরোটা কোথায়?

ভুট্টোর মনের গভীরে দৃঢ়তর বিশ্বাস, আওয়ামি লীগ ভিতরে ভিতরে শুধু তক্কে তক্কে আছে, কি করে আখেরে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সর্ব সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র নির্মাণ করতে পারে। ভুট্টো তাঁর কেতাবে স্বীকার করেছেন

যে, ঐ সময়ের কিছু আগে ইয়েহিয়ার প্রধান উপদেষ্টা পীরজাদা যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন "আওয়ামি লীগ চায়টা কি?" তখন তিনি মাত্র একটি শব্দে তার উত্তর দেন, "সিসেশন"। কেটে পড়তে চায়।....পশ্চিম পাকিস্তান বাংলাদেশকে না দেয় খেতে না দেয় পরতে, অথচ তিনি কিল মারার গোঁসাই। সেই খসমের কাছ থেকে সে চায় তালাক—এইভাবে বললে পূব পশ্চিম উভয় বাংলার হিন্দু মুসলমান তত্ত্বটা স্পষ্ট বুঝতে পারবে।

এ কথা অতিশয় সত্য, সেই বখতিয়ার খিলজির আমল থেকে—এবং আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস তার পূর্বে বৌদ্ধ হিন্দুযুগে, এক কথায় অনাদি অনন্তকাল থেকে বাংলাদেশ কস্মিনকালেও দিল্লির বশ্যতা স্বীকার করতে চায়নি। বার বার স্বাধীন হওয়ার জন্য সংগ্রাম করেছে। বাজারে চালু ইতিহাসে কিন্তু পাবেন, বুদ্ধু ঐতিহাসিকরা প্রতি অনুচ্ছেদে লিখছেন, "এরপর বেঙ্গল রেবেলড্ এগেনস্ট দি (দিল্লি) এমপেরর।" যেন ঐতিহাসিক দিল্লি রাজদরবারের বেতনভোগী, হিজ মেজেস্টিজ মোস্ট অবিডিয়েন্ট স্লেভ, দিল্লির হুজুরের সাম্রাজ্যলোভী ইমপিরিয়ালিস্ট কলনিয়ালিস্ট চশমা পরে সত্যমিথ্যা ন্যায়-অন্যায় বিচার করে ইতিহাস লিখছেন—ইংরেজ যে-রকম ১৯৫৭-র স্বাধীনতা সংগ্রামকে যতখানি অপমান করতে পারে সেই বদ মতলব নিয়ে তার নাম দিয়েছে "সিপয় ম্যুটিনি"। ইন্ডিয়ান রেবেলিয়ান নাম দিলেও যে আন্দোলনেব খানিকটে ন্যায্যতা স্বীকার করে নেওয়া হয়!

মোটেই ধান ভানতে শিবের গীত নয়।

এই বেলাই আমরা যেন এই নমাসের দুঃখদহনেব মূল তত্ত্বটি পবিপূর্ণৰূপে হৃদয়ঙ্গম করে নি। এই তত্ত্বটিই একমাত্র তত্ত্ব—অখণ্ড শাশ্বত সত্য। রাজনীতির ক্ষেত্রে একমাত্র কলমা, একমাত্র ইমান। এটা সর্বক্ষণ হৃদয়ে পোষণ না করলে কোনো দরকার নেই ঐ নমাস নিয়ে বিন্দুমাত্র কালির অপব্যয় করা। আমরা যেন ঘুণাক্ষরেও আমাদের আরাম-পিয়াসী মনকে এই বলে সান্ত্বনা দি, এ নমাস একটা দুঃস্বপ্ন, স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মাঝখানে একটা উটকো ব্যত্যয়—এটা গেছে, এখন থেকে আমরা চলবো গোলাপের পাপড়ি বিছানো শস্যশ্যামল সোনার বাংলার জনপদভূমির উপর দিয়ে এবং পথের শেষে পাবো কোরমা-পোলাওয়ের খুশবাই ভরা পদ্মাসাইজের ইয়া বিরাট দাওয়াত-বাড়ি, ভোজনান্তে তার চেয়েও বিরাট জলসাঘর, সেখানে অন্তহীন সঙ্গীত, নৃত্য, মধুচন্দ্রিকা।

না, না, না।

স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন তার চরমে তখন কে একজন জেনারেল আতা উলগনী উসমানিকে শুধিয়েছিলেন, "এ-লড়াই আর কতদিন চলবে?" ক্ষণতরে চিন্তা না করে তিনি বলেছিলেন, "ফর ডিকেডস",—দশাধিক বৎসর, দশং দশং বৎসর—তারপর তিনি "মে বী" 'হতেও পারে' বলেছিলেন কি না সেটা নিতান্তই বাহ্য।

কারণ জেনারেল (এর চেয়ে কত অল্পে কত সেপাই ফিল্ড মার্শাল হয়েছে।) ওসমানি বাংলাদেশের "সামরিক ইতিহাস" উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেছেন। তিনি খাঁটি বাঙাল। তাই তিনি শুধু জর্মন ক্লাউজেভিৎসের "বণনীতি", আউস্টরলিৎস, ওয়াটারলু, স্তালিনগ্রাদ, নরমাদিই পড়েন নি—তাঁর স্মৃতিতে আছে বাংলাদেশের পৌনঃপুনিক শতশত বর্ষব্যাপী মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস। যে কারণে পশ্চিমপাকের মিলিটারি বড়কর্তারা তাঁকে সামনাসামনি বলেছেন তিনি শভিনিস্ট; পেরোকিয়াল।

তিনি জানতেন, যে দেশ সাতশ' বছর ধরে—সেটুকুর ইতিহাস তো দিল্লীতে লেখা

একচোখো ফার্সী কেতাবেই আছে—ক্রমাগত স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছে তার পক্ষে "এক ডিকেড, দু ডিকেড"-ই তো স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী। কে জানে, আরো বেশী হতে পারে।

আজ না হয় বাংলাদেশের দুঃখদৈন্য চরমে পৌঁছেছে কিন্তু এটা তো এমন কিছু নিত্যকালের তত্ত্বকথা নয়। প্রাচুর্য আর সৌন্দর্য এদেশের সর্বত্র। সেই তার চিরন্তন স্বরূপ। তাই তার দিকে সকলেরই লোলুপ দৃষ্টি। পাঠান মোগল বাদশাদের তোষাখানাতে দুপয়সা জমে গেলেই তাঁদের নজর যেত এই উপমহাদেশের পূর্বাচলের দিকে—সে রমণী সুজলা সুফলা। এ স্থলে ধর্ম নিয়ে বাদানুবাদ করা ধর্মকে বিড়ম্বিত করা মাত্র। দিল্লির বাদশারা ছিলেন মুসলমান; গোড়ার দিকে না হোক, পরে বাংলার অধিবাসীর অধিকাংশই ছিল মুসলমান। এদের কতল করতে তবু তাদের বাধেনি। তাদের কিন্তু কিছুটা শালীনতাবোধ ছিল। বিংশ শতাব্দীর লাহোরী মোল্লাদের মত দিল্লীর মোল্লারা অতখানি জাহান্নমের অধঃপাতে যায় নি; তারা বাংলাদেশের "বিদ্রোহ" দমনের সময় 'ইসলাম ইন ডেঞ্জার' জিগির তুলে বাঙালী মুসলমানকে "কাফির" ফাৎওয়া দিয়ে, জাল "জেহাদ" চালিয়ে নিজেদের পরকাল খোওয়ায় নি। রাজ্য বিস্তারে কলোনি শোষণের সময় ধর্ম অবান্তর,—দেশটার প্রাচুর্য বাস্তব সত্য।

বাংলাদেশের ছিল। যেমন এককালে ইতালির সৌন্দর্য ও প্রাচুর্য দুই-ই ছিল বলে তাব দিকে ছিল বহু জাতের লুব্ধ দৃষ্টি। তাই ইতালির কবি ফিলিকাজা একদা কেঁদেছিলেন ঃ

ইতালি, ইতালি, এত রূপ তুমি
কেন ধরেছিলে, হায়!
অনন্ত ক্লেশ লেখা ও ললাটে
নিবাশায় কালিমায়!

নইলে কবিগুরুই বা বাঙালীর জন্য এমন মর্মান্তিক প্রার্থনা করতে যাবেন কেন?

প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে
দুঃখ দেবার বড়াই, (১)
জেনো মনে, তখন তাহাব
বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখ সহার তপস্যাতেই
হোক বাঙালীব জয়!

কী বাঙালীকে চিরকাল করতে হবে দুঃখের তপস্যা! এ কি আশীর্বাদ, না অভিসম্পাত!

সাতশ' বছবেব ঐতিহ্য তোমার, হে বাঙালী স্বাধীনতার জন্য বার বার বিদ্রোহ কবা, রক্তাক্ত সংগ্রামে আত্মবিসর্জন দেওয়া—না হয তুমি সে ঐতিহ্য সম্বন্ধে আজ সচেতন নও, কিন্তু ঐ যে নয় মাসেব সংগ্রাম—মাতার অশ্রুজল, বধূর হাহাকার—সে কি তুমি

---

(১) এ স্থলে "টিক্কা যখন চেঁচিয়ে করে/দুঃখ দেবাব বড়াই"
বললে "টিক্কা" ও "দুঃখ"-এর একটা/মধ্যানুপ্রাস পাই।

কখনো ভুলতে পারবে?

তোমার কি মুহূর্তের তরে মনে হয়, অদ্বিতীয় এই পাশবিক নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করলেও চলতো?

তোমার কি চিত্তদৌর্বল্য দেখা দিয়েছিল কভু ক্ষণতরে, এ দুঃসহ সংগ্রাম আর কতকাল ধরে লড়বো?

তুমি কি ভয় পেয়েছিলে?

না।

দুঃখ সহার তপস্যাতেই
হোক বাঙালীর জয়।
ভয়কে যারা মানে
তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।

আর সর্বোত্তম অমূল্য কি শিক্ষা তুমি লাভ করলে?

তোমার দেশকে যখন সর্বসমক্ষে ক্রুশবিদ্ধ করা হল তখন বিশ্বনায়কগণ ক্লীব নপুংসকের মত কী ঘৃণ্য আচরণ করলেন। তাঁরা তোমার মৃত্যুযন্ত্রণা পলে পলে দেখলেন। কিন্তু তুমি যে প্রভু খৃষ্টের মত দুঃখ সহার তপস্যা দ্বারা নবজীবন লাভ করবে সে আশঙ্কা তাঁরা করেন নি।

কিন্তু তুমি যে একবারে হতভাগ্য মিত্রহীন নও সে অপ্রত্যাশিত বৈভবও তুমি লাভ কবলে সংগ্রামের অপরাহ্নবেলা।

এইবারে মূল সত্য, শেষ সত্য।

আবার আসবে নব দুর্যোগ। ঐসব ক্লীব নপুংসকদেব শবদেহেই সঞ্চারিত হবে প্রেতাত্মা বেতাল। আবার আসবে দুঃখের তপস্যা। তাই জযধনি করো :

দুঃখ সহার তপস্যাতেই
হোক বাঙালীর জয়।।

—আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে—

পলাশির যুদ্ধের পর বাংলাদেশের জীবন-মরণ সঙ্কট আসে ২৫ মার্চ ১৯৭১-এ। তার পূর্বের দু মাস—ফেব্রুয়ারি ও মার্চ ধরে—পূর্ব পশ্চিম উভয় পাকিস্তান যেন গ্রীক ট্র্যাজেডির নিযতির অলঙ্ঘ্য নির্দেশে দুর্বার গতিতে ধাবমান হল কোন এক করাল অস্তাচলের দিকে। আবার সেই নিয়তিরই প্রসন্ন নির্দেশেই এক শুভ প্রভাতে জয়ধ্বনি উঠলো,

হোক, জয় হোক
নব অরুণোদয়।
পূর্ব দিগঞ্চল
হোক জ্যোতির্ময়।।

আর্য সভ্যতাব পূর্বতম প্রান্ত, পূর্বাচল পূর্ব দিগঞ্চল বাংলাদেশ।

ভাবতের জাতীয় সঙ্গীতের সর্বশেষ শ্লোকেও আছে ঃ

রাত্রি প্রভাতিল,
উদিল রবিচ্ছবি
পূর্ব-উদয়গিরি বালে—

বাংলাদেশই পূর্ব উদয়গিরি। সে তার ভালে যে টিকা এঁকেছে সেটি "রবিচ্ছবি", কবি রবির আঁকা ছবি, বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত—আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।

কবি আরো বলছেন, "ওরা বেরিয়ে পড়েছে; ওদের কপালে লেগেছে সকালের আলো, ওদের পারানির কড়ি এখনো ফুরোয় নি; ওদের জন্য পথের ধারের জানলায় জানলায় কালো চোখের করুণ কামনা অনিমেষে চেয়ে আছে : রাস্তা ওদের সামনে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খুলে ধরলে, বললে, 'তোমাদের জন্য সব প্রস্তুত।'

ওদের হৃৎপিণ্ডের রক্তের তালে তালে জয়ভেরী বেজে উঠলো।"

আর পশ্চিম পাকিস্তান? তার জন্য নিয়তি কি নির্ধারিত করছেন? আমি তো দেখছি, তাদের সম্মুখে অন্ধকার। বিপাকের বিভীষিকা রজনীর পরে ওদের জন্য কোনো শুভ্র উষার শুকতারা আমি তো দেখতে পাচ্ছিনে।

কবি যেন ওদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিচ্ছেন মাত্র :—

"এখানে সবাই ধূসর আলোয় দিনের শেষে পান্থশালার আঙিনায় কাঁথা বিছিয়েছে; কেউ বা একলা, কারো বা সঙ্গী ক্লান্ত; সামনে পথে কী আছে অন্ধকারে দেখা গেল না, পিছনের পথে কী ছিল কানে কানে বলাবলি করছে; বলতে বলতে কথা বেধে যায়, তার পরে চুপ করে থাকে।"

সেই দুমাসের কাহিনী; জানুয়ারী ২৯ থেকে মার্চ ২৫।

২৯-১-৭১ ভুট্টো ঢাকা থেকে বিদায় নেবার সময় "গুডবাই" "ফেয়ার-ওয়েল" না বলে যে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন সেটাকে ফরাসিতে বলা হয় "ও-রভোয়া" অর্থাৎ "আবার দেখা হবে"। আরো বললেন, "আমাদের ডিফিকালটিজ আছে বই কি? ২৩ বৎসরের সমস্যাগুলো তো তিন দিনে সমাধান করা যায় না। তাই বলে আলোচনার দ্বার তো বন্ধ হয়ে যায়নি। যখন প্রয়োজন হবে আমি আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাবার জন্য আবার আসবো।"

সাংবাদিক শুধোলেন, শেখ মুজীব যে এসেমব্লির তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারির জন্য প্রস্তাব করেছেন সে সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য কি? উত্তরে তিনি সোজাসুজি রামগঙ্গা কোনো কিছু না বলে (রিমেনড নন-কমিটল) মন্তব্য করলেন, "অন্তত ফ্রেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত যদি আমাদের সময় লাগে তবে তাতেও তো কোনো দোষ নেই।"

এবং বললেন, "সংবিধান বাবদে সব কিছু আগেভাগে ফৈসালা করে নিয়ে তারপর সংবিধান এসেমব্লিতে প্রবেশ করবো তার তো কোনো প্রয়োজন নেই! এসেমব্লির বৈঠক চালু থাকাকালীনও ওই নিয়ে আলোচনা (নিগোসিয়েশন) চলতে পারে।"

প্রশ্ন : "আপনি কি এসেমব্লির বৈঠক-তারিখ পিছিয়ে দিতে চান?"

উত্তর : "না।"

সাংবাদিকদের আরো বিস্তর প্রশ্নের বিস্তব "উত্তর" দিয়ে আবেকটি মোক্ষম কথা কইলেন রাজনৈতিক ভুট্টো।

"শেখ আমার দৃষ্টিবিন্দু বুঝতে পেরেছেন, আমিও তাঁর দৃষ্টিবিন্দু বুঝতে পেরেছি।"

ভুট্টো যে বুঝতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভুট্টো কেন, উভয় পাকের সবাই জানতো শেখ এবং আওয়ামি লীগ কি চান এবং আজও সেটা পড়ে শোনালে স্কুল বয়ও সেটা বুঝতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন, শেখ তাজ/নজর কি বুঝতে

পেরেছিলেন ভুট্টোর দৃষ্টিবিন্দু কি? কারণ পাকা 'পোকার' জুয়াড়ির মত তিনি তাঁর তাস চেপে ধরে রেখেছিলেন তাঁর টাইয়ের উপর। আর সঙ্গে সঙ্গে ছয় দফার এটা ওটা সেটার মূল তাৎপর্য কি, এটা মানলে ওটার সঙ্গে যে তার দ্বন্দ্ব বাধে, ঐ যে আরেকটা, সেটা—সেটা কি পশ্চিম পাকের লোক মানবে ইত্যাদি ইত্যাদি দুনিয়ার কুল্লে হাবিজাবি প্রশ্নতে আনুষঙ্গিক যত প্রকারের সেই সনাতন হাইপথেটিকাল মার্কা অবাস্তব আকাশকুসুম সওয়াল!

কিন্তু তিনি একবারের তরেও তাঁর আপন দৃষ্টিবিন্দুর একটি মলিকুলও এক লহমার তরেও দেখতে দেননি। অন্য জনের বোঝা তো দূরের কথা! শেখের ঝানু ঝানু বিচক্ষণ জনেরা বার বার—যখনই ভুট্টো কোনো আপত্তি তুলেছেন তখনই—ভালো করে আগাপাস্তলা বুঝিয়ে দিয়ে শুধিয়েছেন, বার বার শুধিয়েছেন, "আচ্ছা এতেও যদি আপনার মনে ধোঁকা থাকে, এটা গ্রহণ করতে যদি আপনার কোনো আপত্তি থাকে তবে আপনি বলুন আপনি কি চান, আপনার প্রস্তাব কি? আমাদের ছদফা কাঠামোর ভিতর আমরা তো সর্বদাই রদবদল করতে প্রস্তুত আছি। নইলে আপনিই বা এত তকলীফ বরদাস্ত করে আসবেন কেন এখানে আর আমরাই বা বসতে যাবো কেন বৈঠকের পর বৈঠকে?"

একদম হক কথা।

আওয়ামি লীগের ছদফা কর্মসূচী কেনার তরে লাবখানার তালুকমুলুক ডকে তুলতে হয় না এবং সেগুলো বোঝাব জন্যে ধানমণ্ডীব গুরুগৃহে প্রবেশ করতঃ চতুর্দশ বর্ষব্যাপী কঠোর আত্মসংযমসহ ব্রহ্মাচর্য পালনও করতে হয় না।

আলোচনার সময় নিতান্ত কোণঠাসা হয়ে গেলে হরবকতই মি. ভুট্টোব পেটেন্ট উত্তর ছিল, "হেঁ হেঁ হেঁ, বিলক্ষণ বিলক্ষণ! আমি দেশে ফিরে গিয়ে পার্টি মেম্বারদেব সঙ্গে সলাপবামর্শ না করে পাকা উত্তর দি কি করে?"

সেন্ট পীটারের স্বর্গ আর শয়তানের নরকের মধ্যিখানে ছিল একটি এজমালি পাঁচিল। চুক্তি ছিল পাঁচিল এ বছব সারাবেন ইনি ও-বছর সারাবেন শয়তান। ঐ মাফিক পীটার তো সাবালেন প্রথম বছর পাঁচিলটা, তাবপর এক বছর নেই নেই করে ঝাড়া তিনটি বছর শয়তানের আর দেখা নেই। পীটার তো শয়তানকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। শেষটায় হঠাৎ একদিন পথিমধ্যে উভয়ের কলিশন। পীটার তো শয়তানকে চেপে ধরলেন, "পাকা কথা দাও, পাঁচিল মেরামত করবে কবে?" শয়তান দণ্ডাধিককাল ঘাড় চুলকে শেষটায় বললে, "তা-তা-তা আমি ঝটপট উত্তর দি কি প্রকারে? আমি নরকে ফিরে যাই, আমার উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ করি, তবেই না পাকা উত্তব দিতে পারি।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পীটাব খেদোক্তি করলেন, "ঐখানেই তো তুই ব্যাটা মেরেছিস আমাকে। সাকুল্যে স-কটাই যে পেয়ে গেছিস তুই।"

উকিলরা আমার উপব গোসসা করবেন না। আমি মুর্শিদমুখে যে-ভাবে আপ্ত বাক্যটি শুনেছি হুবহু সে-ভাবেই নিবেদন কবলুম।... ভুট্টো যদিও স্বয়ং উকিল তবু তাঁরও তো একসপার্ট অপিনিয়নের দরকার। মুর্দফরাস মরে গেলে থোড়াই আপন লাশ টানে।

কিন্তু মোদ্দা কথা এই যে বুট্টো নানাবিধ কীর্তন গাইলেন, "পূর্ব পাক-এর প্রতি অনেক অবিচার করা হয়েছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, নীতিগতভাবে আমি শেখের অধিকাংশ দফাই মেনে নিচ্ছি, বাদবাকীগুলো দেশে ফিরে গিয়ে আলোচনা করে ফের

আসবো, আমাদের সলাপরামর্শের দোর তো আর বন্ধ হয়ে যায়নি (নো ডেডলক!)। তাবৎ বাতের ফৈসালা করে ধোপদুরস্ত একটা রেডিমেড সংবিধান বাট্‌ম্‌-হোলে না পরে যে সংবিধান-মনজিলে প্রবেশ করবো না—এমন মাথার দিব্যি তো কেউ দেয়নি, এসেমব্লির বৈঠক চলাকালীনও তো লবি-তে আমরা বিস্তর কাচা কাপড় ইস্ত্রি করে নিতে পারবো—রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না—এসেমব্লির বৈঠক কবে শুরু হবে? সে তো এমন কোনো একটা বড় কথা নয়। হতে হতে ধরো, এই ফেব্রুয়ারির আখের তকই যদি হয়ে যায় তাতেই বা দোষ কি?"—এগুলোর কতখানি আওয়ামি লীগের কর্তারা বিশ্বাস করেছিলেন? কারণ হয় মানতে হয়, তাঁরা ভুট্টোর ধূর্তামি ধরতে পেরেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী এমন সব কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন যাতে করে ম্যাজিশিয়ান ভুট্টো শেষমুহূর্তে যেন তাঁর হ্যাট থেকে এমন কোনো মারাত্মক পিচেশ না বের করতে পারেন যার বিষ্ঠা নিক্ষেপে এসেমব্লি সংবিধান নির্মাণ, স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে ক্ষমতা হস্তান্তর সবকিছু রসাতলে যায়। নয় বিশ্বাস করতে হয়, জেনরেল কল-এর রোগ-নির্ণয়ই ঠিক : ইয়েহিয়া এবং মুজীব যখন ক্ষমতা হস্তান্তর সম্বন্ধে একমত হচ্ছিলেন তখন তাঁদের কেউই মি. ভুট্টোর নষ্টামি (মিসচিফ) করার দক্ষতাটা হিসেবে নেন নি। বাংলাদেশের এক অতিশয় উচ্চপদস্থ ফৌজী অফিসারও আমাকে সংক্ষেপে বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন ইয়েহিয়া গোড়ার দিকে সত্যই গণতন্ত্র প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। এই অফিসারও কল-এর মত টিক্কা, পীরজাদা গয়রহ মিলিটারি হনুমানদের ব্যক্তিগতভাবে উত্তমরূপেই চেনেন।

এস্থলে আগামী কালের সন্দেহপিচেশ ঐতিহাসিক হয়তো বলবেন, "ইয়েহিয়া মিলিটারির গণ্যমান্য ব্যক্তি। কল ও উপরে উল্লেখিত বাংলাদেশের ফৌজী অফিসার দুজনাই আর্মির লোক। তাঁরা যে মিলিটারি রাষ্ট্রপতি ইয়েহিয়ার কলঙ্কভার যতখানি পারেন কমাতে চেষ্টা করবেন সেটাই তো স্বাভাবিক।"

নিরপেক্ষ হরিপদ কেরানী তার স্বভাবজাত সরলতাসহ বলবে, "পশ্চিমপাকের মিলিটারি কলঙ্কভার লাঘব করা কি আদৌ সম্ভব? হিটলারের ফৌজী জাঁদবেলরা বর্বরতায় ইয়েহিয়া ও তার পাষণ্ডদের তুলনায় 'দানো মলি' শিশুখাদ্য। এবং তাঁর পূর্বেকার, স্বনামধন্য না বলে স্বনির্বাচিত স্বউপাধি "ফিল্ড মার্শাল" প্রাপ্ত। আইয়ুব যিনি মার্শাল ল চালিয়ে হলেন ফিল্ড মার্শাল, তিনি তো একটা আস্ত চোর। ককোটি টাকা জমিয়েছেন তার খোঁজ নিতে এক কাকের ভাই আরেক কাক ইয়েহিয়া কিছুতেই রাজী হল না। পশ্চিম পাকিস্তানের আর্মি সম্বন্ধে যত কম কথা কওয়া যায় ততই বুদ্দু পাঠান-বেলুচ সেপাইদের ভক্তি তাদের প্রতি বাড়বে।"

এসব কেলেঙ্কারি ধূর্তামি ভণ্ডামির পাঁক কে ঘাঁটতে চায় অথচ না ঘেঁটেও উপায় নেই। হিমালয়ের বর্ণনা দিতে হলে শুধু গৌরীশঙ্কর আর কাঞ্চনজঙ্ঘার অভ্রংলিহ সৌন্দর্য বর্ণনা করলে চলে না, তার গভীর উপত্যকা এমন কি কণ্টকাকীর্ণ গুহাগহ্বর খানাখন্দেরও বয়ান দিতে হয়।

এ দুমাসের বয়ান দফে দফে না দিলে কোনো বাঙলার পাঠকই সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না, পূর্ব বাঙলার নেতারা ছাত্রসমাজ-বেঙ্গল রেজিমেন্ট-পাকিস্তান রাইফলস্ পুলিশ সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে চিন্তাশীলজন কতখানি ধৈর্য ধারণ করে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হয়েছিলেন।

তাঁদের মোকাবেলা করতে হয়েছে মৌলানা ভাসানীর মত প্রাচীন তথা জনপ্রিয় নেতার সঙ্গে। এঁরা কোনো প্রকারের ঢাকঢাক গুড়গুড় না করে সরাসরি যা বলতেন তার সারার্থ এই, "১৯১৯। ১৯২০ থেকে আমরা ধূর্ত ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছি কংগ্রেস-খিলাফতের সঙ্গে যোগ দিয়ে। সেই সময় থেকেই আমরা পরোক্ষভাবে পাঞ্জাবী সিন্ধী বেলুচ পাঠানকে চিনতে শিখেছি। আদর্শ এক হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে আমাদের মতানৈক্য ঘটেছে, এদের এবং কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কখনো দোস্তী কখনো বা দুশমনী হয়েছে এবং সর্বশেষে চিনেছি, হাড়ে হাড়ে চিনেছি আইয়ুবের আমল থেকে পাঞ্জাবী মিলিটারি জুন্টাকে। এদের মত পাজীর পা-ঝাড়া হাড়েটক হা—জা ইহসংসারে নেই। এদের সঙ্গে কস্মিনকালেও জয়গুরু দিয়েও রফারফি করতে পারবে না। কষে প্যাঁদানো ছাড়া এদের জন্য অন্য কোনো ওষুধ নেই। এবং যত তুরনৎ সেটা নির্মমতমভাবে প্রয়োগ করা যায় ততই মঙ্গল। খুদ পশ্চিম পাকেই সুপ্রচলিত প্রবাদ আছে, একই গুহায় তুমি যদি দৈবাৎ সঙ্গ পাও এক ব্যাটা পাঞ্জাবী আর একটা গোখরোর, তবে ক্ষণতরে চিন্তা না করে প্রথম গলা কাটবে পাঞ্জাবীটার তারপর ধীরেসুস্থে মারবে গোখরোটাকে।"

পাঠান্তর : গোখরোটাকে ছেড়ে দিলে দিতেও পারো।

এবং লীগের মধ্যেই ছিল একদল ফায়ার-ঈটিং ছাত্রছাত্রী যারা কালবিলম্ব না করে চেয়েছিল সম্মুখসংগ্রাম। বিশেষ করে ছাত্রীদের যেন কেউ না ভোলে। গত সংগ্রামে স্বাধীনতার জন্য যে চরম মূল্য এরা দিয়েছে তার তুলনা পৃথিবীর সভ্য অসভ্য প্রাচীন অর্বাচীন কোনো দেশে কোনো সমাজে পাবেন না। একমাত্র তারাই এখনো শব্দার্থে রক্তবিন্দু ক্ষরিয়ে ক্ষরিয়ে সে মূল্য শোধ করে যাচ্ছে—লোকচক্ষুর অন্তরালে, নির্বাসনে কোন্ দানবের অশোকবনে—কি ভাবে?

বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে ভয়াবহ অত্যাচারে জর্জরিতা জীবন্মৃতাদের যেন দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়ে ব্যথিত কবিগুরু নির্দেশ দিচ্ছেন কি দিয়ে তারা চরম মূল্য শোধ করছে সে উত্তর আসছে কোথা থেকে :

"শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হাহা করে উত্তব আসছে আব্রু দিয়ে ইজ্জৎ দিয়ে ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়েও।"

না, ইমান তাদের আছে। আর সবকিছু দিয়ে ইমান তারা বাঁচিয়েছে!

রক্ষী বনাম নর্তকী

বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়, ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সালে যখন পূর্ব পশ্চিম উভয় পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে কি পদ্ধতিতে পার্লামেন্টকেন্দ্রিক গণতন্ত্র স্থাপিত হবে সেই নিয়ে আলাপ আলোচনা হচ্ছিল ঐ সময় একদিন তিনটি বাজপাখি দুম দুম করে ঢুকলো প্রেসিডেন্ট ইয়েহিয়ার খাস কামরায়। এই শিকরে পাখিগুলো পাকিস্তানি ফৌজের পয়লা কাতারের জাঁদরেলের পাল। লেফটেনেন্ট জেনরেল পীরজাদা, কার্যত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, লেফটেনেন্ট জেনরেল গুল্ হাসন এবং মেজর জেনরেল আববর খান। টেবিল থাবড়াতে থাবড়াতে তাঁরা দাবী জানালেন, "৩রা মার্চ ১৯৭১ সালে ইয়েহিয়া যে ঘোষণা দ্বারা

ঢাকাতে পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছেন সেটা অ-নি-র্দি-ষ্ট কালের জন্য মুলতুবি করে দিতে হবে।"

লিখেছেন জেনরেল কল জুলাই ১৯৭১ সালে তাঁর "কনফ্রনটেশন উইদ পাকিস্তান" পুস্তকে।

এবং এর পর কল যে মন্তব্যটি করেছেন, পাকিস্তানের পঁচিশ বৎসরের ইতিহাসে সেইটে সবচেয়ে গুরুত্বব্যঞ্জক ভাগ্য পরিবর্তন নিয়ে।

"এবং ত্রিনটে শিকরেই ইয়েহিয়াকে বাধ্য করালে পূব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করার জন্য কঠোরতম ব্যবস্থা মেনে নিতে।"

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে ঐ দিনই

আকাশে বিদ্যুৎ বহ্নি

অভিশাপ গেল লেখি—

ঐ দিনই মিলিটারি জুন্টা স্থির করলেন পূববাংলাকে এমনই একটা শিক্ষা দিতে হবে, যে-শিক্ষা আত্তিলা, চেঙ্গিস, নাদির, এ-যুগের হিটলার কেউই কখনো বাংলার যে কটা "মানুষের নামে পশু" বেঁচে থাকবে তারা যেন "এক হাজার বৎসরের ভিতর" মাথা তুলে খাড়া না হতে পারে। কারণ জুন্টার মুনিব বলুন, চাকর বলুন, শিখণ্ডী বলুন মি. ভুট্টো একাধিক বার বলেছেন, তিনি এক হাজার বৎসর ধরে ভারতের সঙ্গে লড়াই করে যাবেন। কিন্তু ঐ পূববাংলাটার কোনো প্রকারের রাজনৈতিক অস্তিত্ব যদি বজায় থাকে তবে "বাঙালরা" নিশ্চয়ই সেই ভারত বিজয়ে বাধা দেবে, বিশেষ করে তাদের ছদফা দাবী নামঞ্জুর করার পর।

এ-স্থলে ভবিষ্যৎ কালের ঐতিহাসিক প্রশ্ন তুলবেন, বাঙলাদেশের সর্বনাশ সাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কি একমাত্র মিলিটারি জুন্টাই দায়ী?

আপাতদৃষ্টিতে আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু একথা তবুও সত্য যে বাংলাদেশের সাধারণজন আজ আর এ-সব বিষয়ে বিশেষ কৌতূহলী নয়। এটা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে আমার ইতালির তথা জর্মন বন্ধুদের বিস্তর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ডিকটেটরদ্বয় সম্বন্ধে খবর বের করতে হয়। ওরা কেটে যাওযা দুঃস্বপ্নের প্রসঙ্গ তুলতে চাইত না। তবু বাংলাদেশের খবরের কাগজ মাঝে মাঝে যে-সব রহস্য পশ্চিম পাকে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে তার খবর দেয়।

জেনরেল কল প্রভৃতি বিশেষজ্ঞরা যে প্রকৃত সত্যের অনেকখানি সন্ধান দেবেন এ তো জানা কথা, কিন্তু যখন কোনো নর্তকীও নিতান্ত বাধ্য হয়ে নিঃস্বার্থ সে সব সত্যের সমর্থন জানায় তখন সত্য নিরূপণ অনেকখানি সহজ ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে যায়।

গত ১৫।২০ বছর ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বোচ্চ সরকারী বেসরকারী নেতারা এমনই বর্বর পশ্বাচারে লিপ্ত থাকাকালীন দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন যে সে-সব পুরীষাবর্তের নিকটবর্তী হতে কোনো ঐতিহাসিক বা সত্যান্বেষীজন সহজে রাজী হবেন না। পৃথিবীর ইতিহাসে নারীজাতি অনেক ক্ষেত্রেই যবনিকান্তরালে শিবাশিব রাজনৈতিক কর্ম সমাধান করেছেন। তাঁদের মধ্যে মাদাম পঁপাদুর, লোলা মনতে (জ) বিদগ্ধা রোমান্টিক রমণী। এঁদের ললাটে পঙ্কতিলকের লাঞ্ছন আছে বটে কিন্তু সেখানে অশ্লীলতার নোংরামি নগণ্য। এঁদের বুদ্ধিমত্তা রাজনৈতিক মতবাদ পর্যবেক্ষণ করে ঐতিহাসিক অনেক ক্ষেত্রেই উপকৃত হন ও শুষ্ক ইতিহাস কিঞ্চিৎ সরস হয়ে ওঠে।

কিন্তু পশ্চিম পাকে নিছক নোংরামি। তাই সংক্ষেপে সারছি।

ইয়েহিয়া সিপাহ-সলার, প্রেসিডেন্ট হওয়ার বহু আগের থেকেই নর্তকী আকলীম আখ্‌তরকে রক্ষিতারূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে তিনি বেসরকারী "জেনরেল" উপাধি দেন ও তিনি সুরে সিন্ধু পাঞ্জাবে "জেনারেল রাণী" রূপে সুপরিচিতা ছিলেন। সম্প্রতি লাহোরের শব্দার্থে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে পুলিস তাঁকে গ্রেফতার করে। কিন্তু অল্প পরেই লাহোরের দায়রা জজ তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছেন—মি. ভুট্টোর শাসন যে নিরঙ্কুশ নয় একথাটা এ-স্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর নয়। আখতর সাংবাদিকদের বলেন, ইয়েহিয়ার উত্থান পতন সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করার জন্য তিনি এক প্রকাশকের সঙ্গে মৌখিক চুক্তি করেছেন; তিনি যে-পুস্তকে পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হওয়ার প্রকৃত কারণ উল্লেখ করবেন। তিনি আরো বলেন দ্বিখণ্ডিত হওয়ার জন্য সামরিক জুন্টারাই একমাত্র দায়ী নয়, এর পিছনে বর্তমানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কতিপয় ব্যক্তির ষড়যন্ত্র আছে; তাঁর কাছে এ ষড়যন্ত্রের প্রমাণ আছে।

প্রেসিডেন্ট ভুট্টো সম্বন্ধে মন্তব্য উহ্য রেখে তিনি বলেন, তাঁকে গ্রেফতার করার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে সর্বোচ্চ সরকারী ক্ষমতায় আসীন কয়েকজনের আতঙ্ক ও ভয়ের জন্যই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কারণ তাঁরা মনে করেন, তাঁর কাছে তাঁদের অপকীর্তি ও গোপন কার্যকলাপের এমন সব তথ্য-প্রমাণ ও ছবি আছে যা প্রকাশিত হলে তাঁদের সুনাম নষ্ট হবে এবং দেশে তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হবে।

উপসংহাবে তিনি বলেন, "কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি যে, আমি তা প্রকাশ কববো না। কারণ তা প্রকাশিত হলে দেশের সম্মান বলতে আর কিছুই থাকবে না।"

এবপর মহিলাটি—আমি ইচ্ছে করেই "মহিলা" বলছি, কারণ পাকিস্তানের অতিশয় অল্প "ভদ্র" পুরুষও এ-তত্ত্ব বলতে সাহস ধরেন, যা এ নর্তকী বলেছে—

"এমনিতেই দেশের সম্মানের আজ যা অবনতি ঘটেছে তাই যথেষ্ট।"

মি. ভুট্টো যে বেইমানি করেছিলেন তার ফল পরে শাপে বর হয়েছিল। বাংলাদেশ দুশো বছর পব পুনরায় স্বাধীন হল। কিন্তু সে-স্বাধীনতা পাওয়াব জন্য তার যে রক্ত ক্ষয় হল, "আব্রু দিয়ে ইজ্জত দিযে" কোনো গতিকে ইমান বাঁচালো তারা, তার জন্য দায়ী কে? সে অনুসন্ধান আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে করতেই হবে। আমি মনে করি এটা আমার কর্তব্য। পাঠক যদি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন তবে আমি নাচার। আমি আমার আইষমানকে চাই-ই চাই!

মি. ভুট্টো বিলক্ষণ অবগত ছিলেন বাংলাদেশে পশ্চিম পাকের শোচনীয় পরাজয়ের জন্য তাঁর আপন দেশের লোক একদিন তাঁকে দায়ী করবে। বিশেষ করে এই কারণে যে, ডিসেম্বব ১৯৭০-এর গণ-নির্বাচনে তিনি পশ্চিম পাকে সবচেয়ে বেশী ভোট পাওয়ার গৌরবে দুহাত দিয়ে কিং কং-এর মত সর্বত্র বুক দাবড়ে প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন, তিনি তাবৎ পশ্চিম পাকের প্রতিভূ—ফরাসি রাজার মত "লেতা সে মোওয়া (আমি যা, রাষ্ট্রও তা)"। পূব বাঙলায পরাজয়ের পর তিনি হঠাৎ করে চটসে পালাবেন কি করে? তাই তিনি স্থির করলেন, এখন আমি প্রেসিডেন্ট, এই বেলা একটা অনুসন্ধান কমিটি বসিযে আমি সর্বদোষ চাপাবো ইয়েহিয়ার স্কন্ধে। দরকার হলে মিলিটারি জুন্টাকেও তার সঙ্গে জড়াবো।

সতেরো বছরের স্বৈরাচারের পর দিনকে রাত, রাতকে দিন করা সবকিছুই সম্ভব। কিন্তু সতেরো বছর বলি কেন? পাকিস্তানের জন্মদিন থেকেই তো স্বৈরতন্ত্র। ক-ইদ-ই আজম মুহম্মদ আলী ভাই ঝিঁভাড়াই (জিন্নাহ্) পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপতি। তিনি ছিলেন সর্বত্র বিরাজমান, সর্বশক্তির আধার। তাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে ইংরেজ ক্যামবেল-জনসন বলেছেন, "এখানে এইখানে পশ্য, পশ্য, পাকিস্তানের রাজাধিরাজ ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ একাধারে পার্লামেন্টের সভাপতি তথা প্রধানমন্ত্রী—সর্ব ভিন্ন ভিন্ন সত্তা এক কেন্দ্রে সম্মিলিত করে বিরাটকার এই ক্বাইদ-ই-আজম।" "Here indeed is Pakistan's King Emperor, Archbishop of Canterbury, Speaker and Prime Minister concentrated into one formidable Quaid-i-Azam." পাকিস্তানের জন্মকালে ও মরহুম জিন্নার জীবিতাবস্থায় কোনো প্রকারের পার্লামেন্টি "বিরোধী দল" ছিল না, থাকলে অতি অবশ্যই তিনি আরও বড় নেতা হতেন।

সেই শুভ ঐতিহ্যের গোড়াপত্তন থেকে সর্ব-মরহুম কি লিয়াকত আলী, কি ইসকনদার মির্জা সবাই ছিলেন এক একটি চোটা হিটলার। এমন কি আইয়ুবের ন্যাজ, পূর্ব পাকের গবর্ণর মোনায়েম খান পর্যন্ত সার্কাসের ক্লাউনের মত মুনিবের কীর্তিকলাপের ভড়ং করে যেতেন রাত দুটো তিনটে অবধি—তাঁর ছিল অনিদ্রা রোগ। আশ্চর্য! দুই প্রত্যন্ত—একসট্রীম কি জানি কি করে দোহাদুঁহু হয়ে যায়—হিটলারের ছিল ইনসমনিয়া, দুজনারই ছিল মদ্যে অনীহা।

এদের তুলনায় ভুট্টো কম যান কিসে?

বস্তুত তিনি প্রথম রাউন্ড তাঁরই আদেশমত করিয়ে নিয়েছেন। পূর্বোক্ত কমিশন অগস্টের মাঝামাঝি নির্দেশ দিয়েছেন—অবশ্য প্রভু ভুট্টোর অনুমোদন সাপেক্ষে—ইয়েহিয়াকে আসামীরূপে মিলিটারি ট্রাইবুনালের সমুখে দাঁড়াতে হবে।

মিলিটারি ট্রাইবুনালের কাজকারবার হয় সাতিশয় গোপনে। জনসমাজে যেটুকু মি. ভুট্টোর ফেবারে যায় মাত্র ঐটুকুই প্রকাশ পাবে।

কিন্তু ভয় নেই পাঠক, আমরা আখেরে সবকিছুই জানতে পাবো। মূল তত্ত্বগুলো 'নিশ্চয়ই বহুকাল' ধরে জানি। অবশ্য নর্তকী জানেন অনেক বেশী।

মুজিব আউট!

ভুট্টোর স্বগতোক্তি

যেথা যাই সকলেই
  বলে, "রাজা হবে?"
"রাজা হবে?"—এ বড়ো
  আশ্চর্য কাণ্ড। একা
বসে থাকি, তবু শুনি
  কে যেন বলিছে—
রাজা হবে? রাজা হবে?
  দুই কানে যেন
বাসা করিয়াছে দুই
  টিয়ে পাখি, এক

বুলি জানে শুধু—

রাজা হবে। রাজা হবে।

সেই ভালো বাপু, তাই হব।

কবিগুরুর "বিসর্জন" থেকে। হ্যাঁ, বিসর্জন বই কি? এর তিন পক্ষ পরেই আইনানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান সরকার বিসর্জন দিল সর্ব আইন, জলাঞ্জলি দিল সর্ব ধর্মাচার, ন্যায়বিচার।

এস্থলে অবশ্য দুটি নিরীহ টিয়ে নয়। এখানে তিনটে ঘৃণ্য গৃধ্র—পীরজাদা, গুল আর আকবর। তাঁরা ভুট্টোকে বললেন, "তুমিই রাজা হবে।"

এই 'ই'টার অর্থ কি?

অর্থ এই : ইয়েহিয়া যখন সব রকমের রাজনৈতিক ক্ষমতা মুজিবকে হাতে তুলে দেবেন বলে স্থির করেছিলেন তার বিগলিতার্থ এই, তিনি ডিক্‌টেটর রূপে অখণ্ড ক্ষমতার অধিকারী হয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব কবতে চান না। তিনি চান সুদ্দুমাত্র দুটি জিনিস—মদ্য এবং মৈথুন। এবং পাকেচক্রে নিতান্তই যখন ডিকটেটর হয়েই গিয়েছেন তখন অন্তুতপক্ষে তিনি প্রেসিডেন্টরূপে বিরাজ করতে চাইবেন বই কি। কিন্তু ক্ষমতালোভী যখন নন তখন রাষ্ট্রচালনার ভার মুজিবকে দেওয়া যা তোমাকে দেওয়াও তা।

অতএব "তুমিই রাজা হবে"।

জেনারেল কল-এর ভাষ্যে যাঁরা বিশ্বাস কবেন তাঁরা স্বচ্ছন্দে মেনে নিতে পাবেন যে উপরেব সব কটি যুক্তিই দ্ব্যথহীন সত্য। বাদশা জাহাঁগীর একাধিকবার বলেছেন, আমার কয়েক পাত্র মদ্য আর রুটি-মাংস মিললেই ব্যাস,—রাজত্ব চালান না মহারানী নূরজঁহা। বিস্তরে বিস্তরে এ-হেন দৃষ্টান্ত আছে। বস্তুত আমি জনৈক পাকিস্তানীর মুখে শুনেছি, ১৯৬৮-৬৯-এ আইয়ুব যখন যমের (আজরাইলের) সঙ্গে যুঝছেন তখন জাঁদরেলকুল ইয়েহিয়ার সমুখে প্রস্তাব করেন, তিনি যেন তদ্দণ্ডেই রাজ্যভার গ্রহণ করেন, পাছে আইয়ুব হঠাৎ গত হলে কোনো সিভিলিয়ান না প্রেসিডেন্ট হয়ে পুনরায গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে মিলিটারি শাসনের অবসান ঘটায়, তখন ইয়েহিয়া স্রেফ কবুল জবাব দেন। ...তাই বলে পাঠক অবশ্য অন্য একসট্রীমে গিয়ে ভাববেন না যে রাষ্ট্রপতি হওয়ার লোভ তাঁর আদৌ ছিল না। নিশ্চয়ই ছিল। আর কিছু না হোক, ঐ পদে অধিষ্ঠিত হলে তাঁর যে দুটো জিনিসে শখ সেগুলো তিনি নির্ভাবনায় পর্যাপ্ত পরিমাণে আমৃত্যু উপভোগ করতে পারবেন।

১১/১২ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো পিণ্ডিতে উড়ে এসে ইয়েহিয়ার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা ধরে দীর্ঘ আলোচনা করেন। বিবেচনা করি তাঁকে বোঝাবার শেষ চেষ্টা দিলেন মুজিবকে তার প্রস্তাবমত সবকিছু যদি দিয়ে দাও তবে তোমার, আমার, পাকিস্তানের সর্বনাশ হবে। খুব সম্ভব এ প্রস্তাবও করেছিলেন, টাল-বাহনা দিয়ে অ্যাসেমব্লিটা অন্তত মুলতুবি রাখো।

অনুমান করা যেতে পারে ইয়েহিয়া তখন ভুট্টোকে কোনো পাকা কথা দেননি।

ভুট্টো নিশ্চয তখন তাঁর নিষ্ফলতার কাহিনী মিলিটাবি জুন্টার পীরজাদা গুল ইত্যাদিকে বলেছিলেন।

১৩।২।৭২—ইয়েহিয়া ঘোষণা করলেন, ৩রা মার্চ অ্যাসেমব্লির অধিবেশন হবে। সরকারি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি বেরুল,

"The President, General A.M. Yahya Khan, has been pleased to summon the National Assembly of Pakistan to meet on Wednesday, March 3, 1971, at 9 a.m. in the Provincial Assembly Building, Dacca, for the purpose of forming a Constitution for Pakistan."

অনুমান করি ঐদিনই জুন্টা গিয়ে থাবড়ালেন ইয়েহিয়ার টেবিল। দাবি করলেন অনির্দিষ্ট কালের জন্য অ্যাসেমব্লি মুলতুবি রাখতে হবে। ইয়েহিয়াকে সম্মতি দিতে হল বাধ্য হয়ে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট তো ঝটপট সে মত-পরিবর্তন আরেকটা গেজেট একসট্রা-অরডিনারিতে রাতারাতি প্রকাশ করতে পারে না। তাই সে-কর্ম করা হল ঠিক এক পক্ষ পরে।

সেই দিনই বিজয়গর্বে উৎফুল্ল জুন্টা মি. ভুট্টোকে জানালেন,

"তুমি রাজা হবে।"

অর্থাৎ "মুজিব আর লীগের নেতাদের জেলে পুরবো। লীগ পার্টিকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করার ফলে তোমার পার্টিই হবে সংখ্যাগুরু। তুমিই হবে প্রধানমন্ত্রী।"

ভুট্টো উল্লাসে নৃত্য করতে করতে ফ্লাই করলেন পেশোয়ারবাগে। এবারে পশ্চিম পাকের বাকি পার্টিগুলোকে বশে আনা যাবে অতি সহজে। তাঁর কেবিনেটে তিনি নেবেন অন্য পার্টি থেকে কিছু মন্ত্রী, উপমন্ত্রী গয়রহ, গয়রহ। সেই প্রলোভনই যথেষ্ট।

১৩।২।৭১—১৪।২।৭১ টেবিল থাবানোর দিন সন্ধেবেলা পেশওয়ারের বিশ্ববিদ্যালয় নগরীর এক বাঙলোতে বসলো জমজমাট জাঁদরেল ককটেল পার্টি। তিনি যে অখণ্ড পাকিস্তানের রাজা হতে চললেন সে-সুসমাচার তিনি কি অত সহজে চেপে যাবেন—অতি অবশ্যই দু-চারজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে সে আনন্দেব হিস্যেদার করেছিলেন। কিন্তু অল্পে সুখ কোথায়? সুখ ভূমাতে। ইতিমধ্যে পিপলস পার্টির রাজা হয়ে গিয়েছেন ককটেল পার্টির রাজা। পাকিস্তানের পলিটিক্যাল পার্টি এবং ককটেল পার্টিতে অবশ্য কোনো কালেই বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না এমন উপবাসের মাস রমজানের দিনে (!), লাঞ্চ পার্টিতেও না।

প্রখ্যাত সাংবাদিক এন্টনি বলেছেন, গেলাস—পাঠক, নিম্বুপানির গেলাস ভেবে আপন কল্পনাশক্তিকে বিম্বিত করো না—হাতে করে সে-ককটেল পার্টির চক্রবর্তী হবু-রাজা মি. ভুট্টো রসে নিমজ্জ সর্বজনকে ইলেকট্রিফাই করলেন মাত্র কয়েকটি ঐতিহাসিক লবজো মারফৎ "ভুট্টো আবার ঘোড়ার জিনে সোয়ার। এ-ঘটনা ঘটলো যারা শক্তিধর তাদেরই মীমাংসা দ্বারা। মুজিব আউট (মুজিব ইজ আউট!)! আমি প্রধানমন্ত্রী হব।"

মুজিব আউট! লেট বিফোর উইকেট? সেইটেই তো ধাপ্পার হেডাপিস। ইয়েস, অ্যান্ড নো। টসে (গণনির্বাচনে) জিতেছিলেন লীগের ক্যাপটেন শেখজী। তিনিই ওপনিং বেটস্‌মেন। কি এ ক্রিকেট খেলাতে কুদরতে কী খেল! ফার্সট ইনিংসে নামবার পূর্বে পেভিলিয়নে যখন শেখ লেগিং পরছেন তখনই তিনি "লেগ বিফোর উইকেট, ইন দি পেভিলিয়ন"।

বাকি খেলোয়াড়দের যে কটিকে আমপায়ার—বুচারের দু আসলা ঘেঁটা টিক্কা পাকড়াতে পেরেছিলেন তাদের নিয়ে সেই টিক্কা-এলেভন হানড্রেড-হানড্রেডের ব্লাডি ইনিংস-এ আমরা এখনো পৌঁছইনি।

প্রেসিডেন্ট ইয়েহিয়া, জুন্টা আর ভুট্টোতে ফেব্রুয়ারি ১৯৭১-এর মাঝামাঝি থেকে আর কোনো মতভেদ রইল না—ভুট্টো সামলাবেন সিভিলিয়ান দিক অর্থাৎ পশ্চিম পাকের যে-কটা রাজনৈতিক দল আছে তার যে-কজন লীডারকে তিনি পারেন আপন দলে টানবেন, প্রলোভন দেখিয়ে।

পলিটিশিয়ান আর স্টেটসমেনে তফাত কি? পলিটিশিয়ান জনগণকে একত্র করে পার্টি বানিয়ে তাদের চালায় আর স্টেটসম্যান সেই ব্যক্তি যে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের ভিন্ন ভিন্ন পলিটিশিয়ানকে একজোট করে রাষ্ট্র নির্মাণ কর্মে অগ্রসর হয়। কাষ্ঠরসিকরা বলেন, পলিটিশিয়ান ম্যাস (জনগণকে) বুদ্ধু বানায় আর স্টেটসম্যান পলিটিশিয়ানদের বুদ্ধু বানায়।

এইবারে পালটিশিয়ান ভুট্টো পরলেন স্টেটসম্যানের মুখোস। সেটা যে কতখানি বেমানান বদখদ বেঢপ হল সেটা জানেন মি. ভুট্টো সবচেয়ে বেশী। যাঁকে পশ্চিমপাকের জনগণ ডিকটেটর আইয়ুবের ডেমোক্রাটিক ন্যাজ খেতাব বহু পূর্বেই দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছে, যাঁর কাজ—পূর্বেই উল্লেখ করেছি, দীর্ঘ আঠারো মাস ধরে ছিল পর্দার আড়ালে গুড়িগুড়ি হামাগুড়ি দিতে দিতে একে ভজা ওকে প্যার করা, মাঝে মাঝে চিত্রিতা গর্দভীর ন্যায় ক্ষণতরে আত্মপ্রকাশ করা, সে রাতারাতি পেয়ে গেল ডবল প্রমোশন (এদানির ঢাকার অটোপ্রমোশনের চেয়ে দু কাঠি সরেস); পলিটিশিয়ান না হয়েই সরাসরি স্টেটসমেন!

দিগ্বিজয়ে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই পয়লা মনজিলেই খেলেন পয়লা থাপ্পড়।

প্যাভিলিয়নে বসে বসেই মুজিব এলবি ডাবলু হওয়ার ইলেকট্রিক শকসন্দেশ দেওয়ার পরদিন বীর ভুট্টো গেলেন ফ্রন্টিয়ার নেতা খান ওয়ালি খানের কাছে। তাঁকে খবর দিলেন, "পাকিস্তান টাট্টুর পিঠে ভুট্টো আসওয়ার। এসো, ভাই, দুই বেরাদরে মিলে লঙ্কাটা ভাগ করে নি।" ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝাণ্ডু সিন্ধু-পাণ্ডা ভুট্টো পোশতুভাষীর সঙ্গে কুশতি লড়লেন জুডোর সর্ব প্যাঁচ চালিয়ে কিন্তু ওয়ালি খালি এক কথা বলে "না"। পলিটিকস ব্যাপারটা ধোয়া তুলসী পাতা নয় সে-তত্ত্বটা পেশাওয়ারেও অজানা নয়, কিন্তু এতখানি হীন হবার মত পাঠান ওয়ালি খান নন। শেষটায় ভুট্টো সঙ্গোপনে ওয়ালিকে জানালেন, এসেমব্লি অধিবেশনে আমি ঢাকা যাবো না। আমার এ সিদ্ধান্ত আমার পার্টি মেম্বাররা পর্যন্ত জানে না। এটা ১৪ ফেব্রুয়ারির কথা।

তার পরদিন ১৫।২-এ সর্বজনসমক্ষে বম ফাটালেন মি ভুট্টো—ভাবার্থে। এরই ফলে ঠিক চল্লিশ দিন পরে হাজার হাজার বম ফাটলো ঢাকাতে সশব্দে, শব্দার্থে রাত এগারোটায়। এ বমটা তিনি কেন ফাটালেন, কার নির্দেশে ফাটালেন তার আলোচনা হবে ১ মার্চের পরিপ্রেক্ষিতে যেদিন ইয়েহিয়া জুন্টার আদেশ মাফিক ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবি করে দিলেন।

পনরো তারিখের তাঁর সেই দীর্ঘ বিবৃতি এতই পরস্পরবিরোধী, দ্ব্যর্থসূচক, ঝাপসা এবং ইংরিজিতে যাকে বলে বীটিং এবাউট দি বুশ যে তার সারমর্ম দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। এতে আমার লজ্জিত হওয়া উচিত, কিন্তু যখন দেখি, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক

পার্টির (এর কার্যকলাপ পশ্চিম পাকিস্তানেই ছিল বেশী) নসরুল্লা খান মি. ভুট্টোর বম মারার দু দিন পর নিম্নের বিবৃতিটি দিচ্ছেন তখন মন সান্ত্বনা মানে :—

মি. ভুট্টোর পরিষদ বয়কট করার সিদ্ধান্ত যে গণতন্ত্রবিরোধী সে মন্তব্য করার পর খান সাহেব বলেছেন : "মি. ভুট্টোর পরিষদ বয়কট করার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যতে (এর ফলস্বরূপ—লেখক) কি হবে সে সম্বন্ধে কোনো কিছু একটা বলা শক্ত। কারণ পিপলস্ পার্টির চেয়ারম্যানের স্বভাবই হচ্ছে অতিশয় দ্রুতবেগে তাঁর মল্লভূমি পরিবর্তন করা (চেনজিং হিজ স্ট্যানস, উইদ গ্রেট রেপিডিটি। মাত্র কয়েক দিন আগে তিনি বলেছিলেন যে, পরিষদ অধিবেশনে সভা মধ্যে তিনি আওয়ামি লীগের সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন।"

পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে আমরা ২রা সেপ্টেম্বরের 'দেশ' পত্রিকায় মি. ভুট্টোব একটি বিবৃতি থেকে তার সারাংশ উদ্ধৃত করি। তিনি তখন (১৯।১।৭১) বলেছিলেন, "ইট ইজ নট নেসাসারি টু এনটার ইনটু দি কনসটিচুয়েন্ট এসেমব্লি উইদ অ্যান এগ্রিমেন্ট অন ডিফারেন্ট ইস্যুজ, বিকজ নিগোসিয়েশনস কুড কন্টিন্যু ঈভন হোয়েন দি হাউস ইজ ইন সেশন।"

তা হলে এক পক্ষকাল সময় যেতে না যেতে আজ (১৫-২-৭১) হঠাৎ ভুট্টোজী এ বোমাটা ফাটালেন কেন?—যে, আমার সঙ্গে আগেভাগে সমঝোতা না করলে আমরা এসেমব্লি করতে ঢাকা যাবো না।

ঠিক এই প্রশ্নটিই শুধোলেন নসরুল্লার সঙ্গে সঙ্গে ভুট্টো-বিবৃতি পাঠমাত্র পশ্চিম পাকের নেতা সলাহ উদ্দীন খান, "ভুট্টো এসেমব্লি বয়কটের ঘোষণা করার জন্য যে সময়টা বেছে নিলেন সেটা ভারি হেঁয়ালিভরা (ভেরি ইনট্রিগিং)। তিনি ঢাকাতে যখন শেখ মুজীবের সঙ্গে দফে দফে চুলচেরা (থ্রেডবেয়ার) আলোচনা করেছিলেন তখনই তো শেখের মতিগতি তিনি অতি অবশ্যই বুঝে নিয়েছিলেন। কারণ শেখ তো তখন তাঁর সাকুল্যে তাস টেবিলের উপর রেখে সর্বসংশয় নিরসন করেছিলেন।"

এটা তো প্রহেলিকা (ব্যাফলিং) যে, মি. ভুট্টো সেই সময়ই তাঁর আপন মনের গতি বুঝিয়ে বলেননি কেন?

এই এক পক্ষকাল মধ্যে তো আওয়ামি লীগ তার প্রোগ্রামে কণামাত্র রদবদল, কাটাই-ছাঁটাই, ডলাই-মলাই কিছুই করেননি তবে কেন আজ মন্থরার মুখে যেন নবান্নের বিন্নে-ধানের খই ফুটতে আরম্ভ করল?

কিচ্ছু না। সেই টেবিল-থাবানোর ফলশ্রুতি যেন জুন্টা কর্তৃক মি. ভুট্টোর পিঠ থাবড়ানোর সামিল। যেন পিতামহ ভীষ্ম শঙ্খধ্বনি ফুঁকলেন—দুর্যোধনের মন থেকে সর্ব দ্বিধা অন্তর্ধান করেছে—কার সৈন্য পর্যাপ্ত, কারই বা অপর্যাপ্ত, কে নেয় তার খবর!

জনাব ভুট্টোর বক্তব্য এতই দীর্ঘ যে, যে-ছেলে তার প্রেসি লিখতে পারবে সে হেসে খেলে বি, এ, এম, এ-তে ফার্স্ট হবে। সংক্ষেপে যতখানি পারি তারই নিষ্ফল চেষ্টা দেব। না করে উপায় নেই। কারণ হিটলারের মত মি. ভুট্টো ইতিহাসের বিচার-সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করেন। মি. ভুট্টোর কেতাবে আছে—"একদা শেখ মুজীব আমাকে হুঁশিয়ার করে বলেন, আমি যেন মিলিটারিকে বিশ্বাস না করি। শেখ বলেন, মিলিটারি যদি তাঁকে (মুজীবকে)

প্রথম বিনষ্ট করে তবে আমাকেও তারা বিনষ্ট করবে (১)। আমি বললাম, মিলিটারি বরঞ্চ আমাকে বিনষ্ট করে করুক, কিন্তু ইতিহাসের হাতে আমি বিনষ্ট হতে চাইনে।"

উপস্থিত তিনি যতখানি পারেন ইতিহাস বিনষ্ট করছেন। অন্তত বিকৃত করছেন তাঁর আপন তাঁবেতে 'নিরপেক্ষ' কমিশন বসিয়ে। এ কর্মে তিনি "বুচার অব বেঙ্গল"-এর পরিপূর্ণ সহায়তা পাবেন। তিনি এখন পাকিস্তানের জঙ্গীলাট। কুলোকে বলে, যে টিক্কা প্রভু ইয়েহিয়ার আদেশে বাঙলাদেশ দহন-ধর্ষণ করলেন তাঁকে খাস করে জঙ্গীলাট বানালেন মি. ভুট্টো, ওকীবহাল টিক্কা একস-প্রভুর সর্বাঙ্গে যেন উত্তমরূপে কর্দম লেপন করতে পারেন।

তা তাঁরা ইতিহাস নিয়ে যা খুশী করুন, প্রামাণিক সমসাময়িক ইতিহাস কবলেন :—

( ) মুজীব আমার সঙ্গে সমঝোতা না করলে আমার পার্টি ঢাকা যাবে না।

সাংবাদিকের প্রশ্ন : আপনি কি তবে এসেমব্লি বয়কট করছেন?

ভুট্টো : (দৃঢ়কণ্ঠে) না।

এ ঘটনার আটমাস পরে মি. ভুট্টো অক্টোবর ১৯৭১-এ আপন পুস্তিকা "দি গ্রেট ট্র্যাডেজিতে" লিখেছেন, তিনি এসেমব্লিতে যাবার পূর্বে যে শর্ত দিয়েছেন সেটা না মানা হলে তিনি ঢাকা যাবেন না, জানালে পর, "হুয়েন আস্কড বাই করেসপনডেনটস হুয়েদার পিপলস পার্টি উয়োজ বয়কটিং দি এসেমব্লি আই কেটেগরিক্যালি ডিনাইড ইট।" (২)

পাঠক চিন্তা করে নিজেই মনস্থির করে নিন, এটাকে বয়কট না করলে বয়কট বলে কাকে?

এ-তথ্য কি বলার প্রয়োজন আছে যে পূর্ব-পশ্চিম উভয় পাকেব রাজনীতিক নেতারা—মি. ভুট্টোর দোস্ত দুশমন দুইই—ভুট্টোব এই আচরণকে 'বয়কট' নাম দেন, কেউ কেউ এটাকে 'ব্ল্যাকমেল'ও বলেন।

কট্টর মুসলিম অখণ্ড পাকিস্তান বিশ্বাসী জমাৎ-ই-ইসলামীর আমির (খলিফা) মৌলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী কড়া ভাষায় ভুট্টোর এই মনোভাবকে অসংগত আচরণ বলে নিন্দা করেন। এমন কি এসেমব্লির বাইরে ভুট্টো মুজিবে সংবিধান বাবদে সমঝোওতা করার প্রচেষ্টাকেও তিনি নিন্দনীয় মনে কবেন। যা-কিছু হবার তা হোক এসেমব্লির ভিতবে—এই তাঁর সুচিন্তিত মত।

অথচ এর দু-তিন দিন পূর্বেই স্বয়ং ভুট্টোই এই মওলানাব সঙ্গে সাক্ষাৎ করে

---

(১) ১২।১২।৭১ নাগাদ শ্রীভুট্টো আমেরিকায় নিরাপত্তা পরিষদে বক্তৃতা দেন। ইযেহিয়া তাঁকে আমেরিকা পাঠাবাব পূর্বে হুকুম দিযেছিলেন তিনি যেন ফেবার পথে প্লেনে করে প্রথম কাবুল আসেন। সেখানে থেকে মোটবে করে পেশাওয়ার। ইযেহিয়ার প্ল্যান ছিল পথমধ্যে ভুট্টোকে গুমখুন করা, কারণ ইযেহিয়াব সিংহাসন তখন টলমল। তিনি "বিশ্বস্তসূত্রে" অবগত হযেছিলেন, দেশে ফিবে ভুট্টা তাঁকে আসন থেকে সবাবেন। কিন্তু ভুট্টোকে ডেকে নিয়ে নিকসন তাঁকে বলেন, ইয়েহিয়াকে দিযে আব কিছু হবে না। তিনি (নিকসন) হুকুম দিয়েছেন, ইয়েহিযা যেন বিনাবাধায ভুট্টোকে আসন ছেড়ে দেন। ভুট্টো তাই সবাসবি করাচি পৌছন। যাঁরা ভুট্টোর মহানুভবতায় পঞ্চমুখ তাঁরা শুনে বেজার হবেন, নিকসনেব হুকুম মাফিক মি. ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেন।

(২) দি গ্রেট ট্র্যাজেডি, পৃঃ ২৮।

সর্বজনসম্মত সংবিধান নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন।

মওলানা ছাড়া পশ্চিম পাকের অন্যান্য নেতারাও একবাক্যে এই বয়কট-এ প্রতিবাদ নিন্দা অসম্মতি জানান—নিতান্ত সরকারের ধামাধরা কাইয়ুম জাতীয় দুটি দল ছাড়া। আর 'পূর্ব পাকের' আওয়ামি লীগবিরোধী নেতারাও ভুট্টোর সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের পক্ষে ক্ষতিকর বলে দৃঢ়মত প্রকাশ করেন।

পাকিস্তান-প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর বর্তমান ভাইস-প্রেসিডেন্ট 'পূব পাকের' ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী বাঙালী নুরুল আমিন (৩) ভুট্টোর আচরণ 'হেস্টি' এবং 'আনহেলপফুল' আখ্যা দিয়ে পূর্ব বাঙলার প্রতি ভুট্টোর আচরণের নিন্দা করেন। তথা ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান বলেন, ভুট্টো এসেমব্লি বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন পাকিস্তানকে দুখণ্ডে বিভক্ত করার জন্য!

এখনো মাঝে মাঝে কানে আসে ভুট্টোর স্তুতিগান—তিনি চেয়েছিলেন অখণ্ড পাকিস্তান! তা হলে বলতে হয়, আওয়ামি লীগ থেকে আরম্ভ করে ওয়ালি খান, নসরুল্লা, সলাহ্ উদ্দীন, চোর উল আমিন এস্তেক মৌলানা মওদুদী—সব্বাই সব্বাই লিপ্ত হয়েছিলেন গভীর এক ষড়যন্ত্রে, পাকিস্তানকে কি প্রকারে দ্বিখণ্ডিত করা যায়! সামনে উজ্জ্বল উদাহরণ, লেট জিন্নাহ্ ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করেন।

"সাত জর্মন
এক জগাই
তবু জগাই লড়ে!"

গয়নার নৌকা চেনে না কে? বিশেষ করে পূব বাঙলায়। বারোইয়ারি নৌকা পাঁচো ইয়ারে ভাড়া করে গুষ্টিসুখ অনুভব করতে করতে যে যার আপন মনজিলে নেমে যান। অবশ্য পাঁচো ইয়ার নৌকো ইশটিশন ঘাটে পৌঁছনো মাত্রই হুড়মুড়িয়ে একে অন্যের ঘাড়ে পড়ে চড়ে, নৌকোর ভেতর ঢোকেন—নৌকোর গর্ভ থেকে আগের যাত্রীদেব নামবার পূর্বেই। অবশ্য তখনো তারা পাঁচো ইয়াব নয়, বরঞ্চ পঞ্চভূত বলতে পাবেন। জাযগা দখল করার তরে তখন ভূতের নৃত্য। তারপর ধীরেসুস্থে জিরিয়ে-জুরিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ হয়। যথা :

"মহাশয়ের নাম?"

"এজ্ঞে, নেতাই হালদার। মহাশয়ের?"

"এজ্ঞে, হরিপদ পাল।..ঐ যে কত্তা, আপনার?"

"আমার নাম? নেপালচন্দ্র গুণ।"

তারপর নানাবিধ অভিজ্ঞান জিজ্ঞাসা। এমন সময় একজনের খেয়াল গেল, ছইয়ের

---

(৩) অধুনা যে কয়েকজন বাঙালী পাকিস্তান থেকে কাবুল হয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা কাগজে প্রকাশ করেছেন, তন্মধ্যে আমার এক আত্মীয় আমাকে বলেছেন, নূর মিঞা বন্দী বাঙালীদের জন্য কড়ে আঙ্গুলটি পর্যন্ত তো তুলছেনই না, তদুপরি বাঙালীরা যাতে করে দেশে ফিরতে না পারে সে ব্যাপারে 'দারুণ' উৎসাহী। বস ভুট্টো সমীপে আপন কিমৎকদর বাড়াবার জন্য। ফোনে বাংলা শুনলে আঁতকে ওঠেন।

বাইরের ঐ ঠা ঠা বোদ্দুরে একটা লোক উদাস মুখে বসে আছে। চাষাভূষা হবে। এর তো পরিচয় নেওয়া হয় নি। উনিই গলা চড়িযে মুরুব্বি মেকদারে জিজ্ঞাসিলেন, "তোমাব পবিচয়টা তো জানা হল না হে।" অতি বিনয়নম্রকণ্ঠে লোকটি, "আইগা, আমাব নাম আব্দুব বহিম বৈঠা।" গয়নার পাঁচো ইয়াব তাজ্জব। তাবপব কলবব। "বৈঠা। সে কি, হে? মুসলমানেব এ পদবীও হয় নাকি?"

সবিনয উত্তব . "আইগা, অয় না, অখন অইছে। ঠেকায পইড়া আপনাবা কেউ হালদাব, কেউ পাল, কেউ গুণ। বেবাক গুলাইন যদি ছইযেব মধ্যে বইয়া থাহেন তয নাও চলবো কেমতে? তাই আমি "বৈঠা' অইয়া একলা একলা নাও বাহিতেছি।"

তা সে একা একাই 'নাও বাইযা যাউক' কোনো আপত্তি নেই, কাবণ কবিগুরুও গেযেছেন,

> 'হেবো নিদ্রাহাবা শশী
> স্বপ্ন পাবাবাবেব খেযা
> একলা চালায বসি।'

তবে কিনা আব্দুব বহিম বৈঠা না হযে লোকটাব নাম জুলফিকাব (দ্বুলফিক্কাব) আলী বৈঠা হলেই ১৫।১৬।৭১ ফেব্রুযাবিব হালটা বিস্মিত হযে মানাতো ভালো।

এই সুবাদে "জুলফিকাব" শব্দসমাসটিব কিঞ্চিৎ অর্থনিরূপণ কবলে সেটাকে বহু পাঠক দীর্ঘসূত্রতারূপে অগ্রাহ্য কববেন না। কাবণ যত দিন যাচ্ছে, ততই দেখতে পাচ্ছি, বহু হিন্দু প্রতিবেশী মুসলমানদেব কাযদা-কানুন বীতিবেওযাজ সম্বন্ধে কৌতূহলী হযে উঠেছেন। কেচ্ছা-সাহিত্যে আছে,

> আলীব হিম্মৎ দেখ্যা
> নবী চমৎকাব।
> আদবে দিলাইন তানে
> তেজী জুলফিকাব।।
> হজবৎ আলীব দস্তে
> ঠাটা(১) তলওযাব।
> আসমানে বিজুলি পাবা
> নাচে চাবিধাব।।

পযগম্বব হজবৎ আলীকে যে জুলফিকাব নামক তববাবি দেন সেটি খুব সম্ভব সীবিযা দেশেব দিমিশকে (ডামাস্কস নগবে) তৈবী। কিন্তু অতখানি এলেম আমাব পেটে নেই যে তাব পাকা খবব সবজান্তা পাঠকেব পাতে দিতে পাবি।

তা সে যাই হোক, ১৫।১৬।১৭ ফেব্রুযাবি তাবিখে জুলফিকাব আলী বৈঠা সগর্বে তথা সকরুণ কণ্ঠে প্রচাব কবলেন, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকাব নেশনেল এসেমব্লি অধিবেশনে যে যাক সে যাক, তিনি যাবেন না, তিনি জুলফিকাব আলী বৈঠা নিমজ্জমান পশ্চিম পাকিস্তানেব তবণী একাই বৈঠা চালিযে অগ্রগামী হবেন। কাবণ তিনি পাকা খবব পেযেছেন, উত্তব কাশ্মীবেব হিন্দুকুশ থেকে আবম্ভ কবে কচ্ছেব বান অবধি দুশমন ইন্ডিযা সৈন্য সমাবেশ করছে এবং সেটা "বেইমান" ইন্ডিযানবা এমনই সুচতুবতাসহ

---

(১) ঠাটা ডাট্টা দৃঢ=বজ্র

সমাধান করছে যে অতি অল্প লোকই তার খবর রাখে। এখানে বরঞ্চ সুচতুর ভুট্টো এমন একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিলেন যার ভাবার্থ "তোমাদের কেউ কেউ তো অন্তত জানো, মিলিটারির সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ দোস্তী হেঁ হেঁ—হেঁ হেঁ" অর্থাৎ তিনি, ভুট্টো, খবরটা পেয়েছেন নিতান্তই মিলিটারি প্রসাদাৎ। কিন্তু প্রশ্ন, ইন্ডিয়া ঠিক এই সময়ই সৈন্য সমাবেশ করছে কেন? কারণ ধুরন্ধর ইন্ডিয়া জানে, পশ্চিম পাকের বিস্তর রাজনৈতিক নেতা মার্চের পয়লা সপ্তাহে ঢাকা গিয়ে জড়ো হচ্ছেন। সেই সুযোগে ইন্ডিয়া পাকিস্তান আক্রমণ করলে তাঁরা সবাই আটকা পড়ে যাবেন ঢাকায়। দেশের জনগণকে লীডারশিপ দিয়ে মাতৃভূমি রক্ষার্থে "জিহাদ" লড়বার জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারবেন না।

এই ইন্ডিয়া জুজুর বিভীষিকা দেখানো—যখন তখন, মোকা বেমোকায়—ঐটেই মি. জুলফিকার আলী ভুট্টোর জুলফিকার তলওয়ার। তাঁর সম্মানিত নামে (ইসমে শারীফে) "আলী" যখন রয়েছে তখন এই জুলফিকার তলওয়ারে তাঁবই হক্ক সর্বাধিক। এই বেতাল-অসিতে ভানুমতী মন্ত্র আউড়ে ইন্দ্রজাল-রাজ ভুট্টো দিবা দ্বিপ্রহরে প্রাণসঞ্চার করতে সক্ষম।

সাতিশয় মনস্তাপের বিষয়, এই পোড়ার সংসারে আর যে অভাব থাক থাক, সন্দেহপিশাচের অভাব হয় না। তাদেরই দুএকজন মৃদুকণ্ঠে আপত্তি জানালে পর ভুট্টো যে উত্তর দিলেন সেটি পরশুরাম ক্লাসিকস পর্যায়ে তুলে লিপিবদ্ধ করে গেছেন :

"তারিণী (স্যান, কববেজ)। প্রাতিক্কালে বোমি হয়?

নন্দ। আজ্ঞে না।

তারিণী। হয়, Zানতি পার না।"

কিন্তু এহ বাহ্য।

এরপর মি. ভুট্টো যে ভয় দেখালেন সেটা আরো প্রাণঘাতী। তিনি বললেন, "আমি আমার পার্টি সদস্যদের ঢাকা পাঠিয়ে সেখানে ওদেরকে ডবল হস্টেজে পবিণত করতে পারিনে।" এক দিকে তাঁরা পশ্চিম পাকে ফিবতে পারবেন না (ইন্ডিয়া ফিরতে দেবে না)—অতএব তাঁরা হয়ে যাবেন ইন্ডিয়ার হস্টেজ, এবং তাঁরা আওয়ামি লীগের ছদফা মানতে পারবেন না বলে তাঁরা হয়ে যাবেন লীগেরও হস্টেজ। অর্থাৎ ইন্ডিয়া যুদ্ধঘোষণা করে কতকগুলো অপমানজনক দাবী তুলবে পাকিস্তানের কাছে এবং সেগুলো না মানা পর্যন্ত সেই "আমানতী" সদস্যদের জলপথে, শূন্যমার্গে পশ্চিমপাকে ফিরতে দেবে না। আর আওয়ামি লীগও তাদের পূব পাক থেকে বেরুতে দেবে না।

সর্বনাশ! তাহলে এই দুধের ছাওয়ালদের হালটা হবে কি?

সব জেনেশুনে সদস্যরা যদি ঢাকা যান তবে, তবে কি আর হবে—এসেমব্লি হল কসাইখানাতে (মি. ভুট্টোর আপন জবানীতে 'স্লটাব হাউস"-এ) পরিবর্তিত হবে!

সাংবাদিকরা যে সাতিশয় বিদগ্ধাত্ত (হার্ড বয়েলড এগস্) সে তত্ত্বটি বিশ্বজন সম্যকরূপে অবগত আছে। তথাপি তাঁরাও নাকি আঁতকে উঠেছিলেন। শকটা সামলে নিয়ে সমস্বরে তাঁরা নানান প্রশ্ন শুধালেন। কিন্তু মি. ভুট্টো চুপ মেরে গেলেন। "হি ডিড নট এলাবরেট অন দিস পয়েন্ট"—সবিস্তর স্বপ্রকাশ হতে সম্মত হলেন না।

কি জানি? কে জানে? হয়তো তিনি তখন বৃহত্তর ব্যাপকতর স্লটার-ভূমির স্বপ্ন দেখছিলেন।

বুড়ীগঙ্গা

ঢাকা শহরের সৌন্দর্য আর মাধুর্য শুধু এ-শহরের আপনজনই হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারে। ঢাকার আবহাওয়ার সঙ্গে, ধরুন বর্ধমানের কণামাত্র সাদৃশ্য নেই—যদিও দুটিই বিশাল বঙ্গের দুই নগর। বর্ধমান বীরভূমের সৌন্দর্যে রুদ্রের প্রচণ্ড প্রখরতা—ঢাকার সৌন্দর্য তার লাবণ্যে।

ঢাকা, মৈমনসিং, সিলেট খাঁটি বাংলা কিন্তু তার আস বাঁশ তার আমজাম তার রিম ঝিম বারিপাত তার একান্ত নিজস্ব। অথচ এও জানি এ দেশের লতা-পাতা ফল-ফুল পশু-পক্ষী কেমন যেন মণিপুর, আরাকান, বর্মার সঙ্গে সম্পর্ক ধরে বেশী। এসব দেশের সঙ্গে ঢাকা চাটগাঁর পরিচয় বহুদিনের কিন্তু আমার মনে হয় মাত্র এক শতাব্দী হয় কি না হয় ঢাকার শৌখিন লোকের খেয়াল গেল, বর্মা মালয় থেকে অচেনা গাছপালা, তরুলতা এনে এখানে বাঁচানো যায় কিনা। কারণ এতদিন এরা পশ্চিম থেকেই এনেছে এসব, এবং এদেশের বড্ড বেশী স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়াতে সেগুলোর অনেকেই মারা যেত কিংবা মুমূর্ষুরূপে মানুষের হৃদয়ে করুণা জাগাতো মাত্র। পক্ষান্তরে আশ্চর্য সুফল পেল ঢাকার তরুবিলাসীজন বর্মা মালয়ের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করে। তারপব এল আবো নানান দেশ থেকে নানান রকমের গাছ।

বসন্তকাল। মিটফর্ড পাড়ার বারান্দায বসে আছি সন্ধেবেলা। বাঁশের ফ্রেমে লতিয়ে উঠেছে পল্লবজাল। ম্লান গোধূলিটি অন্ধকারে গা-ঢাকা দিতে না দিতেই অচেনা এক মৃদু গন্ধ যেন ভীরু মাধবীর মত "আসিবে কি থামিবে কি" করে কবে হঠাৎ সমস্ত বারান্দাটায় যেন জোয়ার লাগিয়ে দিলে। হায়, আমি বটানির কিছুই জানিনে। গৃহলক্ষ্মী ক্ষণতবে বাইরে এসেছিলেন। নামটা বললেন। সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেলুম।

অন্ধকার ঘনিয়ে এল। বুড়ীগঙ্গার জল আর দেখা যাচ্ছে না। ওপাবে একটি দুটি তারাও ফুটতে আরম্ভ কবেছে—যেন সমস্ত রাত ধরে এপারের ফুলকে সঙ্গ দেবে বলে। একমাত্র ওই তারাগুলিই তো সব দেশের উপর দিয়ে প্রতি রাত্রে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি পাড়ি দেয়। তারা চেনে সব ফুল, সব গাছ, সব মানুষ। মনে পড়ল, একদা বহু বহু বৎসর পূর্বে কাবুলের এক পান্থশালায় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল প্রায় প্রথম আলোব চরণধ্বনির সঙ্গে, একবুক অচেনা ফুলের গন্ধ নিয়ে ঝাপসা ঝাপসা দেখেছিলুম অচেনা গাছ, অজানা পল্লব, বিচিত্র ভঙ্গীর ভবন অলিন্দ, সম্পূর্ণ অপরিচিত পাখির কুহু কেকার অনুকরণ। আমার অধঃচেতন একাধিক ইন্দ্রিয়ের উপর অচেনার এই আকস্মিক অভিযান যেন বিহ্বল বিকল করে দিয়েছিল আমাকে। দেশেব কথা মায়ের কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে এল। ঠিক এই সময়ে দেশের বাড়িতে ঘুম ভাঙলে শুনতে পেতুম মা আঙ্গিনায় গোলাপ ঝাড়ের নিচে জলচৌকিতে বসে বদনার পানি ঢেলে ঢেলে ওজু করছে। কখনো সখনো চুড়ির ঠুংঠুংও শুনেছি। একেবাবে অবশ হয়ে গেল সমস্ত দেহমন।

এমন সময় আল্লার মেহেরবাণীতে চোখ দুটি গেল ঊর্ধ্বাকাশের দিকে। দেখি, অবাক হয়ে দেখি, সেই পরিচিত অতি পরিচিত এ-জীবনে আমার প্রথম কৈশোরের প্রথম পরিচয়ের নক্ষত্রপুঞ্জ—কৃত্তিকা। সেটা কিন্তু তোলা নাম। তার আটপৌরে ডাকনাম সাতভাই চম্পা। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই পেয়েছি সে জনপদবধূর প্রিয় নাম,

"—ওবে, এতক্ষণে বুঝি
তাবা ঝবা নির্ঝবেব স্রোতঃপথে
পথ খুঁজি খুঁজি
গেছে সাত ভাই চম্পা"—

সাত ভাই চম্পা চলেছে ছাযাপথ বা আকাশগঙ্গাব পিছে পিছে—তাবই উল্লেখ কবলেন কবি "তাবা ঝবা নির্ঝবেব স্রোতঃপথ" বর্ণনা দিযে। আব এই যে দেশে এসেছি গ্রহ তাবকাব যোগাযোগে, সে দেশেব বাজা আমানুল্লাব বানীব নাম সুবাইয়া, কৃত্তিকাব আববী নাম। তাঁকে ধববে বলে পিছনে ছুটেছে বোহিণী, আববদেব জ্যোতিষশাস্ত্রে আল্-দাববান। কাবুলে সে দেখা দিল দু বৎসব পবে।

সাত ভাই চম্পা আমাকে চেনে আব বুড়ীগঙ্গাব পাবে নির্বাসিতা ওই বিদেশী ফুলকেও চেনে।

না, ভুল কবেছি। দু একটি তাবা যে নডতেচডতে আবম্ভ কবেছে। এগুলো ওপাবেব নৌকোব আলো। অথচ ওই আলোগুলোব একটু উপবেব দিকে তাকালেই দেখি, আকাশেব তাবা। অন্ধকাব এত নিবিড যে ওই মাটিব আলো আব আকাশেব আলোব মিতালী ছাডা আব-কিছু চোখে পডে না।

এ পাড থেকে মাঝে মাঝে কানে আসছে কে যেন কাকে ডাকছে। সাডাও পাচ্ছে। বাত ঘনিযে আসছে। হাটবাজাব শেষ হতে চললো। এইবাবে বাডি ফেবাব পালা। চাবদিকে গভীব নৈস্তব্ধ্য।

"দিনেব কোলাহলে
ঢাকা সে যে বইবে
হৃদযতলে।"

কবি এখানে "ঢাকা" অন্য অর্থে ব্যবহাব কবেছেন, কিন্তু নগব অর্থে নিলেও কোনো আপত্তি নেই। কাবণ তাব পবই কবিব কথামত।

'বাতেব তাবা উঠবে যবে
সুবেব মালা বদল হবে"

ওই তো হচ্ছে, ঐ ওপাবে, তাবা প্রদীপেব মালাব বদল। স্বর্গেব দেযালীব গন্ধে পৃথিবীব দেযালীতে মিলে আলোক শিখীব আলিম্পন।

নিবিড অন্ধকাবে যখন মানুষ ভবা চোখ টাটিযেও কিছুই দেখতে পায না, এমন কি পাকা মাঝিব ছুঁচেব মত ধাবালো চোখও হাব মানে, তখন নদীব ঘাটে-অঘাটে একে অন্যকে খুঁজে পাওযাব জন্য ক্ষণে ক্ষণে যে ডাকাডাকি কানে আসে, সেটা ছেলেবেলা থেকেই আমাব কাছে অত্যন্ত অকাবণে অজানা বহস্যভবা রূপে ধবা দিত। তাব সঙ্গে থাকতো কিছুটা অহেতুক ভীতিব ছোঁযাচ। যদি এবা একে অন্যকে খুঁজে না পায। ওই যে মাঝিব গলা মিলিযে যাবাব আগেই যেন কাতব এক নাবীকণ্ঠ—তবে কি মা তাব ছেলেকে ডাকছে? তাকে যদি না পায।

পববর্তীকালে বুঝেছি ওই একই ডাক অন্যরূপে

পথে যেতে ডেকেছিলে মোবে
পিছিযে পডেছি আমি,
যাব যে কী কবে॥

এসেছে নিবিড় নিশি,
পথরেখা গেছে মিশি—
সাড়া দাও, সাড়া দাও
আঁধারের ঘোরে॥

এই তো বুড়ীগঙ্গার পাড়। এখানে জলরেখা গেছে মিশি। কতজন কাতর কণ্ঠে বার বার মিনতি জানাচ্ছে, 'সাড়া দাও, সাড়া দাও।'

তারপর এক দিন আসে যখন আর সে সাড়া দেয় না।

কতশত নিরীহ প্রাণী অকালে এই বুড়ীগঙ্গায় তলিয়ে গেল—মাত্র সেদিন।

এখনো কত শত পাগলিনী মাতা, "সাড়া দাও, সাড়া দাও" রবে ডাকছে।

আরো কত মাতা গৃহকোণে বসে আশায় আশায় আছে, একদিন সাড়া পাবে।

আমি খুব ভালো করেই জানি, কোন্ দিন কোন্ প্রহরে তাকে গুলি করে মেরে বুড়ীগঙ্গার গভীরে তাকে জানাজার নামাজ না শুনিয়ে গোর দেয়।

কিন্তু কি করে সে-কথাটা তার মাকে বলি?

আর না বলে কি করে প্রতিদিন তার সাড়ার আশাটা মায়ের বন্ধ চোখে দেখি?

উভয় বাঙলা

উভয় বাঙলা—রিপ ভান উইঙ্কল

হুস করে দুটো মাথার উপর দিয়ে পঁচিশটি বছর কেটে গেল। উভয়ের তন্দ্রাতুর, নিদ্রামগ্ন। কিন্তু নিদ্রাভ্যাস রিলেটিভ—কোনো কোনো ক্ষেত্রে। গীতাও বলেছেন, "যা নিশা—ইত্যাদি।" পূব বাঙলা এবং পশ্চিম বাঙলা দুজনাই ছিলেন একে অন্যের সম্বন্ধে অচেতন সুষুপ্তি-দুঃস্বপ্ন মিশ্রিত নিদ্রাতুর অবস্থায়। অথচ যে যার আপন কাজকর্ম করে গিয়েছে আপন মনে। পঁচিশ বৎসর ধরে।

ঘুম ভেঙেছে। রিপ ভান উইঙ্কলের ঘুম ভেঙেছিল এক মুহূর্তেই কিন্তু তাঁর ঘরবাড়ি আত্মজন এবং গোটা গ্রামকে চিনে নিতে তাঁর সময় লেগেছিল অনেকটা। কিন্তু তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ। যতটা সময়ই লাগুক সেটা ছিল মাত্র একজনের সমস্যা।

দুই বাঙলা বিরাট দেশ। জনসংখ্যা প্রচুরতম। একে অন্যের চেনবার জানবার জিনিস বিস্তর! সুতরাং সে-কর্ম সমাধান করতে কবৎসর লাগবে সেটা বলা কঠিন। এবং সেটাও যে রুটিন মাফিক মসৃণ পন্থায় অগ্রসর হবে সে সত্যও শপথ গ্রহণ করে বলা চলে না। আমরা প্রতিবেশী। খৃষ্ট আদেশ দিয়েছেন, "প্রতিবেশীকে ভালোবাসো।"

কারণ তিনি জানতেন, প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে পারাটা দূরে থাক, বহু ক্ষেত্রে সহ্য করাটাই সুকঠিন। দূরেব জন আমার বাড়িব শখের বাগানটাকে ডিমের খোসা কাঁঠালের ভূতি ফেলে ফেলে তাঁব প্রাইভেট আঁস্তাকুড়ে রূপান্তরিত করতে পারে না, আমার অর্ধাঙ্গিনীর দ্বিপ্রহরাধিক স্বতশ্চল বিকট বেতাবেব উৎকট চিৎকার দূর-জনের পরীক্ষার্থী পুত্রের অধ্যয়ন প্রচেষ্টাকে লণ্ড-ভণ্ড করতে পারে না। প্রতিবেশীর ঝি পারে, গৃহিণীর বেতাব পাবে। অতএব গোড়ার থেকেই কিঞ্চিৎ সচেতন সমঝোতা মেনে নিয়ে পুনঃপরিচয়ের ভিত্তিস্থাপনা করতে হবে। আর এও তো জানা কথা।

"নূতন করে পাবো বলে
হারাই ক্ষণে ক্ষণ"।

এক্কেবাবে সর্বক্ষেত্রে যে হারিয়েছিলুম তা নয। এখানকার বিশেষ সম্প্রদায় এই পঁচিশ বৎসর ধরে যে কোনো সমযে বলে দিতে পারতেন নারায়ণগঞ্জে এই মুহূর্তে শেয়ার-বাজারে জুট মিলের তেজীমন্দীর গতিটা কোন্ বাগে। এ পারের বিশেষ সম্প্রদায়ও তদ্বৎ বলতে পারতেন এ-পারে টেণ্ডুপাতার চাহিদা রফতানীর ওজনটা কোন্ পাল্লায় বেশী।

কিন্তু হায়, দেশ পত্রিকাব সম্পাদক, ১০০% পাঠককুলের ৯৯% পাট ও টেণ্ডু সম্বন্ধে উদাসীন। বহু গুণীন তাই বলেন বাঙালীর এই উদাসীনতাই তার ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করে দিয়েছে।

যতদিন সে শুভবুদ্ধির উদয় না হয় ততদিনও কিন্তু বর্তমান সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। "দেশ" পত্রিকার পাঠক চায় জানতে ওদেশে উত্তম উত্তম উপন্যাস গল্প কি বেরল এই পঁচিশ বৎসরে? যদিও তারা লেখে বাঙলাতেই তবু তাদের সুর ভিন্ন, সেটাতে নতুন কিক থাকে, বীরভূমের খোয়াইডাঙা গোরুব গাড়ি, ওদিককার নদী-বিল নৌকো দুটোর রং তো এক হতে পারে না। এক রবীন্দ্রনাথে ব্যত্যয়। তাঁর জীবনের প্রথমাংশ কাটে জলচরের দেশে নদীপাড়ে, শেষাংশ কাঁকড়ধুলোর দেশে খোয়াইয়ের পাড়ে। কিন্তু

তিনি তাঁর অলৌকিক প্রতিভা দিয়ে করেছেন দুটোরই সমন্বয়। অন্য লেখকদের বেলা দুটোর রঙ আলাদা আলাদা থাকে।

অন্যরা চান ওপারের কাব্য নাট্য ও বিভিন্ন রসসৃষ্টি। পণ্ডিতরা চান প্রাচীন কবিদের ছাপাতে প্রথম আত্মপ্রকাশ, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো জিনিস যা পুস্তকের মাধ্যমে জ্ঞান ও তথ্য বিতরণ করে। বললে পেত্যয় যাবেন না, কলকাতারই এক যুবা আমাকে একদা জিজ্ঞেস করছিল, পূব বাঙলায় যে "ইরি" (ইন্টারনেশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটুট না কি যেন পুরো নাম) ধান ফলানো হচ্ছে সে সম্বন্ধে আমার কাছে মুদ্রিত কোনো-কিছু আছে কিনা? (এ স্থলে যদিও অবান্তর তবু একটা খবর অনেককেই রীতিমত বিস্মিত করবে : বাঙলাদেশের একাধিক বিশেষজ্ঞজন বলছেন, "বর্ষাকালের আউশ ধান আমাদের বৃহত্তম পরিমাণে উৎপন্ন খাদ্য। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল অতিবৃষ্টি বন্যা এবং অনাবৃষ্টির উপর। পক্ষান্তরে হেমন্তের আমন যদিও আউশের তুলনায় উৎপাদন অনেক কম তবু তার একটি মহৎ গুণ যে পূর্বোক্ত ঐ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপর নির্ভর করে না। অতএব আমাদের উচিত আউশের তুলনায় প্রচুরতম আমন ফলানো—এক কথায় পূর্ব ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ পাল্টে আমন হবে আমাদের প্রধান চাষ ও আউশ নেবে দ্বিতীয় স্থান। অবশ্য তার জন্য দরকার হবে লক্ষ লক্ষ ট্যুবওয়েল।" শেষ পর্যন্ত তাই যদি হয়, তবে হাজার হাজার বৎসরের প্রাচীন প্রাকৃতিক ব্যবস্থা মানুষ দেবে পাল্টে—সেটাতেই জাগে আমাদের মত অজ্ঞজনের বিস্ময়!)

বাঙলাদেশের লোক কি পড়তে চায়, তাব ফিরিস্তি অবশ্যই দীর্ঘতর।

যে কমাস ঢাকায় কাটালুম তার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সে-দেশে সব চেয়ে বেশী কাটতি "দেশ" পত্রিকার। তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলে রাখা ভালো যে বিশাধিক বৎসর কাল তারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় সর্ববাবদে বিচ্ছিন্ন ছিল বলে "দেশ"-এর গল্প উপন্যাস ভ্রমণকাহিনী আধুনিক কবিতা, কিছুটা খেলাধুলোর বিবরণ এবং এদিক ওদিক দুএকটি হাল্কা লেখা ছাড়া অন্যান্য রচনা, বিশেষ কবে গবেষণামূলক প্রবন্ধের প্রতি নবীনদেব চিত্তাকর্ষণ অপেক্ষাকৃত কম। তার প্রধান কারণ বাঙলাদেশেই খুঁজতে হয়। এই বিশাধিক বৎসর ধবে তাদের আপন দেশেই সিরিয়াস রচনা গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে অত্যল্প। কাজেই এ-সব বিষয়ে নবীনদের রুচি সৃষ্টি ও অভ্যাস নির্মিত হবে কোথা থেকে? যুবজনের জন্য "দেশ"-এর মত একটি পাঁচমেশালী পত্রিকা তাদের ছিল না যাতে করে কথাসাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো সাময়িক কৌতূহল বশত দুএকটি তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধাদি পড়ে ধীরে ধীরে ওদিকে রুচি বৃদ্ধি পেত এবং শেষ পর্যন্ত দুপাঁচজন প্রবন্ধ-পাঠক অবশেষে নিজেরাই গবেষক হয়ে যেত।...."দেশ" পত্রিকার প্রবন্ধ-পাঠক একেবারেই নেই, সে-ধারণা ভুল। কিন্তু যাঁরা পড়েন তাঁদের বয়স ৫০/৫৫-র উপরে। এঁরা কলেজে, পরে পূর্ণ যৌবনে তাঁদের চিত্তাব খাদ্য আহরণ করেছেন "প্রবাসী" "ভারতবর্ষ" ও পরবর্তীকাল থেকে পার্টিশেনের পরও কয়েক বৎসর "দেশ" থেকে। এঁরা আবার নূতন করে পশ্চিম বাঙলার ঐতিহ্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঝালিয়ে নিচ্ছেন। আশা করা যায় যুবক যুবতীবা ধীরে ধীরে এ-দলে ভিড়বেন।

বলা একান্তই বাহুল্য "রঙ্গজগৎ" অংশটি তরুণ-তরুণীরা গেলে গোগ্রাসে এবং ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অতুষ্ণ্য তাদের মনস্তাপ—"হায় কবে আসবে সে সুদিন যখন এ ফিল্মগুলো দেখব?" যে-সব স্টার গান গাইতে পারেন এবং প্লে-ব্যাক গাইয়েদের নাড়ী-

নক্ষত্র তাবা নিজেদেব হাতেব চেটোব চাইতে বেশী চেনে—কলকাতা বেতাবেব কল্যাণে।

বস্তুত বলতে গেলে ঢাকা ও কলকাতা বেতাব এই দুটি প্রতিষ্ঠান মাত্র দুই বাঙলাকে একে অন্যেব খবব দিযেছে, গল্প গান কথিকা শুনিযেছে নানাপ্রকাব ব্যানেব উপব দিযে, হাওয়ায় হাওযায় পঁচিশটি বছব ধবে।

তাব পূর্ণ ইতিহাস লিখতে গেলে পুবো একখানা কেতাব লিখতে হয॥

উভয বাঙলা—বিসমিল্লায গলৎ

গত পঁচিশ বৎসব ঢাকা এবং কলকাতা কে কতখানি বসসৃষ্টি কবেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানেব পুস্তক প্রকাশ কবেছে সে নিযে তুলনা কবা নিতান্তই অসঙ্গত। এই পঁচিশ বছব ধবে পূর্ব বাঙলাকে একসঙ্গে চালাতে হযেছে লডাই এবং পুস্তক লেখন। অদ্ভুত সমন্বয বা দ্বন্দ্ব। সেপাই কলম জিনিসটাকে বিলকুল বেফাযদা জানে বলে টিপসই দিযে তনখা ওঠায, আব কবি, যদিও বা তিনি বীববস সৃষ্টি কবাব সময তববাবি হস্তে বিস্তব লম্ফঝম্প কবেন তবু তিনি জানেন, ও জিনিসটা একদম বেকাব—ওটা দিযে তাঁব পালকেব কলম মেবামত কবা যায না। বাঙলাদেশেব লেখক, চিন্তাশীল ব্যক্তি, এমন কি পাঠককেও লডাই কবতে হযেছে অবক্ষণীযা বাঙলা ভাষাকে বাঁচিযে বাখতে, এবং প্রথম দুইশ্রেণীব লোককে সঙ্গে সঙ্গে লিখতে হযেছে পাঠ্যপুস্তক থেকে আবম্ভ কবে হিউ এন সাঙ বর্ণিত মযনামতী লালমাই সম্বন্ধে গবেষণামূলক পুস্তক—পূর্ব পাকিস্তান জন্ম নেবাব প্রথম প্রভাত থেকে। একই ব্যক্তি কভু বণাঙ্গণে, কভু গৃহকোণে।

প্রথম দিন থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান স্লোগান তুলেছে, এক বাষ্ট্র, এক ভাষা, এক প্রভু (কাঈদ-ই-আজম=জিন্নাহ্)। অর্থাৎ পূব বাঙলায চালানো হবে উর্দু এবং বাঙলাকে কবা হবে নির্মূল। আমেবিকাব নিগ্রোবা যে বকম তাদেব মাতৃভাষা ভুলে গিযে ইংবিজি গ্রহণ কবেছে, পূর্ব বাঙলাব তাবল্লোক হুবহু সেই বকম বাঙলা সর্বার্থে বর্জন কবে উর্দু গ্রহণ কববে। জানিনে, পূব বাঙলাব মাঝিব প্রতি তখন পশ্চিম পাক থেকে কি ফবমান জাবি হযেছিল—তাবা ভাটিযালি সুবে উর্দু ভাষায গীত গাইবে, না "কির্সূদ্দ উর্দু গজল কসীদা" গাইবে উর্দু ঢঙে?

কিন্তু মাঝিব উর্দুই হোক, কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযেব ভাইস চেনসেলাবেব উর্দুই হোক, সে উর্দু শেখাবে কে? নিশ্চযই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে? কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু কই?

বাঙালী পাঠক এ স্থলে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হবেন। কিন্তু তাব সঙ্গে সঙ্গে আমি বেশ বুঝতে পাবছি, পূব বা পশ্চিম পাকেব এ সব ইতিহাসেব প্রতি আমাব নিত্যদিনেব সবল পাঠকেব বিশেষ কোন চিত্তাকর্ষণ নেই। কিন্তু তবু আমাকে বেহাযাব মত এসব বসকষহীন কাহিনী শোনাতেই হবে। (যতদিন না সম্পাদক মহাশযেব মিলিটাবি হুকুম আসে হ-ল্-ট্। দীর্ঘ বাইশ বছব ধবে তিনি এ ফবমান কখনো জাবি কবেন নি, কিন্তু তাঁবও ধৈর্যেব সীমা আছে, তিনি হল্ট্ হুঙ্কাব ছাডা মাত্রই আমি হুশ কবে আমাব জীবনব্যাপী সাধনাব ধন গাঁজা-গুল-কেচ্ছাব ঊর্ধ্বস্তবে পুনবপি উডতে আবম্ভ কববো)। কাবণ আমাব দৃঢ বিশ্বাস দুই বাঙলা ক্রমে ক্রমে একে অন্যেব কাছে আসবে। পঁচিশ বৎসবেব বিচ্ছেদেব পব নূতন কবে একে অন্যকে চিনতে হবে। এই দীর্ঘকালব্যাপী তাবা

যে দুঃখ দুর্দৈবের ভিতর দিয়ে গিয়েছে তার কাহিনী আমাদের জানতে হবে। নইলে ব্যাপারটা হবে এই : আমার যে বাল্যবন্ধু পঁচিশ বৎসর ধরে আমার অজানাতে অর্থাভাবে অনাহারে অল্পাহারে অকালবৃদ্ধ হয়ে হয়ে গিয়েছে, তাকে পথ মধ্যে হঠাৎ পেয়ে যতই না দরদী গলায় শুধোই, তবু শোনাবে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মত, 'হ্যাঁ রে, অ্যদ্দিন ধরে স্বাস্থ্যের কি অবহেলাটাই না করেছিস? একবার ঘুরে আয় না দার্জিলিং।' ঠিক তেমনি হবে, আজ যদি বাংলাদেশের কোনো সাহিত্যসেবীকে বলি, 'কি সায়েব, পঁচিশ বৎসর পাঞ্জাবীদের সঙ্গে দোস্তি দহরম মহরম করে বাঙলা ভাষাটাকে করলেন বেধড়ক অবহেলা। এইবারে শুরু করে দিন বাঙলার সেবা কোমর বেঁধে। গোটা দুই 'সাহিত্য পরিষদ' গড়ে তুলতে আর কমাস লাগবে আপনাদের? গোটা তিনেক 'দেশ'—একটাতে আপনাদের হবে না। আর আনন্দবাজারের বিক্রী সংখ্যা ছাড়িয়ে যেতে পারেন আপনারা তুড়ি মেরে। আপনাদের দেশ বিরাট, জনসংখ্যা এন্তের।'

পূর্বেই প্রশ্ন করেছি, পশ্চিম পাকে উর্দু কই? এটার উত্তর দফে দফে বয়ান করি।

পূব বাঙলার বেদনা আরম্ভ হয় পয়লাই জিন্না সায়েবকে নিয়ে। স্বাধীনতা পাওয়ার কয়েক মাস পরে তিনি স্বয়ং এলেন বাঙলাদেশে, ঐ "বেকার; বরবাদ" বাংলা ভাষা আন্দোলনকে ঠেকাবার জন্য—সেটি তখনো অঙ্কুরে। ঢাকার বুদ্ধিজীবীরা তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে করতে তাদেব চক্ষু স্থির হতে স্থিরতর হতে লাগল। ভাষা বাবদে এ-হেন বেকুব (কটু বাক্যার্থে নয় : ওকীবহালের বিপরীত শব্দ বেকুবহাল বা বেকুব) তাঁরা উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে কস্মিনকালেও দেখেননি। বাংলা ভাষা ক্রমবিকাশের পথে কতখানি এগিয়ে গিয়েছে, বাংলা ভাষা কতখানি সমৃদ্ধ, ঐ ভাষা ও সাহিত্য দিয়েই পূব বাঙলার মুসলমানের হাড়মজ্জা মগজ হিয়া নির্মিত হয়েছে এবং এর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী মুসলমান এখন পূর্ণ যুবক—এ সম্বন্ধে জিন্নার কণামাত্র ধারণা নেই। তিনি ধরে নিয়েছেন, ভাষা ও সাহিত্য বাবদে বাঙালী মুসলমান ছমাসের শিশু · তাকে নিয়ে যদৃচ্ছ লোফালুফি কবা যায়। তাঁর চোখের সামনে রযেছে মার্কিন নিগ্রোদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, স্বয়ং জিন্নার এবং তাঁর পবিবারে ভাষা বাবদে কোনো প্রকারের পটভূমি বা ঐতিহ্যের ছিটেফোঁটাও নেই। তাঁর পরিবারের মাতৃভাষা কাঠিয়াওয়াড়ি—সে উপভাষা গুজরাতীর বিকৃত উপচ্ছায়া। তাঁব বাল্যকাল কাটে করাচীতে। সেখানকার ভাষা যদিও সিন্ধী তবু রাস্তাঘাটের ভাষা বহু ভাষা মিশ্রণে এক বিকট জগাখিচুড়ি। তদুপরি করাচীবাসী কাঠিওয়াড়ি গুজরাতী, খোজা, বোরা, মেমনরা পঠন-পাঠনে সিন্ধীকে পাত্তাই দেয় না। জিন্না ছেলেবেলা থেকেই তাই দেখে আসছেন এই বত্রিশ জাতের যে-কোনো ছেলেকে যে-কোনো ইস্কুলে পাঠিয়ে যে-কোনো ভাষা শেখানো যায়। যে-রকম কলকাতার যে-কোনো মারওয়াড়ি বাচ্চাকে তামিল ইস্কুলে পাঠিয়ে দিব্য তামিলাদি শেখানো যায়। ভাষাগত ঐতিহ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ছবি এহেন পরিস্থিতিতে জিন্নার চোখের সামনে ফুটে উঠবে কি করে? সর্বোপরি তিনি বুদ্ধিমান; কিশোর বয়সেই সম্যক হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছিলেন, তাঁর ভবিষ্যৎ যে ভাষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি বিজড়িত সে ভাষা ইংরিজি। তিনি মনপ্রাণ ওতেই ঢেলে দিয়েছিলেন এবং সে ভাষায় নৈপুণ্য লাভ করেছিলেন।

ছেলেবেলায় করাচীর আর পাঁচটা মুসলমান ছেলের মত তাঁরও খানিকটে উর্দু শেখার কথা। কিন্তু তিনি কট্টর শীয়া, খোজা পরিবারের ছেলে। উর্দুর প্রতি খোজাদের কোনো চিত্তদৌর্বল্য নেই।· কাজেই বলতে পারিনে ছেলেবেলায় অন্তত কিছুটা উর্দু শিখেছিলেন কিনা। তাঁর পরিণত বয়স কাটে বোম্বাইয়ে। বলা বাহুল্য, কি করাচী, কি বোম্বাই উভয় জায়গারই উর্দু সাতিশয় খাজামার্কা।

বেতার মারফত তাঁর একটি উর্দু ভাষণ আমি শুনি পাকিস্তান-জন্মের পর। সেটা শুনে আমি এমনই হতবুদ্ধি বিমূঢ় হই যে, আমি তখন শেল্-শক্-খাওয়া সেপাইয়ের মত নিজের আপন মাতৃভাষা ভুলে যাই, সে-হেন অবস্থায় এমনেজিয়া অর্থাৎ আচম্বিতে স্মৃতিভ্রংশতা রোগে। শেষটায় বিস্ময় বোধ হয়েছিল, যে লোক এতখানি ইংরিজি শিখতে পেরেছেন তিনি মাত্র ছমাস চেষ্টা দিলেই তো অল্পায়াসে নাতিভদ্র চলনসই উর্দু শিখে নিতে পারেন। ইনি এই উর্দু নিয়ে উর্দুর প্রপাগান্ডা করলে বাঙলা-প্রেমী মাত্রই বলবে, "উর্দু এ-দেশে চালানোর বিপক্ষে আরেকটি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল।' উর্দুপ্রেমী পশ্চিমা পূববীয়া উভয়ই তখন লজ্জায় অধোবদন হয়েছিলেন।

ঢাকা, সিলেট সর্বত্রই তাঁর উর্দু ভাষণের ফল হল বিপরীত।

ঢাকা, সিলেটের লোক অত্যুত্তম উর্দু জানে না, মেনে নিচ্ছি। পাঠক, রাগ করো না, আমি যদি ধরে নি, তুমি অক্সফোর্ডের ইংরিজি অধ্যাপকের মত সর্বোচ্চাঙ্গের ইংরিজি জানো না; কিন্তু যদি ধরে নি, তুমি এ-দেশের ক্লাস সিক্সের ছোকরার ইংরিজি আর অক্সফোর্ড অধ্যাপকের ইংবিজিতে তাবতম্য করতে প'রো না তবে নিশ্চয়ই তুমি উথ্মাভরে গোসসা করবে। ন্যাযত, ধর্মত॥

উভয় বাংলা—বর্বরস্য পূর্বরাগ

পূর্ব পাক পশ্চিম পাকের কলহ যখন প্রায় তার চরমে পৌঁচেছে তখন পশ্চিম পাকের জনৈক তীক্ষ্ণদ্রষ্টা বলেছিলেন, 'আমি পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূব পাক পশ্চিম পাক দুই উইংই দেখেছি কিন্তু গোটা পাখিটাকে এখনো দেখতে পাইনি।

এরই সঙ্গে একই ওজনে তাল মিলিযে আবেকটি পরস্পর-বিরোধী নিত্য ব্যবহারযোগ্য প্রবাদপ্রায় তত্ত্বটি বলা যেতে পাবে :

'উভয় পাকেরই রাষ্ট্রভাষা উর্দু। কোনো পাকেই, এমন কি পশ্চিম পাকেরও কোনো প্রদেশবাসীর মাতৃভাষা উর্দু নয়।'

পাঠকমাত্রই অন্তত বিস্মিত হবেন। কথাটা গুছিয়ে বলার প্রয়োজন আছে।

পশ্চিম পাকের চারটি প্রদেশের বেলুচিস্তানের ভাষা বেলুচ, ফ্রন্টিয়ার প্রদেশের ভাষা পশতু (বা পখতু), সিন্ধু প্রদেশের ভাষা সিন্ধী। সিন্ধী ভাষা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ধারণ করে।

বেলুচ ও পশতু ভাষায় ছাপা বই বা/এবং পাণ্ডুলিপি শতাধিক হবে না। কারণ এর অধিকাংশই আছে, লোকগীতি। শুধুমাত্র লোকগীতি দিয়ে একটা সম্পূর্ণ সাহিত্য তৈরী হয় না। এবং এগুলোও ছাপা হযেছিল ইংরেজি নৃতত্ত্ববিদঘাঁযা অফিসারগণ দ্বারা— কৌতূহলের সামগ্রী রূপে। মধ্য ও উচ্চ শিক্ষিত বেলুচ, পশতুভাষী পাঠান এগুলোকে অবহেলা করে, বেশীর ভাগ এসব সঙ্কলনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অচেতন। নিতান্ত পাঠশালার

পড়ুয়া পড়ে কিনা বলতে পারবো না। আমাদের বটতলার সঙ্গে এদের কোনো তুলনাই হয় না। বটতলা শতগুণ বৈচিত্রধারী ও সহস্রগুণ জনপ্রিয়।

তাই ফ্রন্টিয়ার বেলুচিস্তানের নিম্ন ও মধ্য স্তরের রাজকার্য ব্যবসাদি হয় উর্দুতে। সেই কারণে উভয় প্রদেশের মাতৃভাষা উর্দু, এ-বাক্য বদ্ধ উন্মাদও বলবে না। পাঠানকে শুধু প্রশ্নটি মাত্র শুধোলে তার মাতৃভাষা উর্দু কি না সে রীতিমত অপমানিত বোধ করবে, মোকা পেলে রাইফেল তুলবে। বেলুচের বেলাও মোটামুটি তাই। তবে বেলুচ জাত অপেক্ষাকৃত নম্র এবং শান্ত। লোকমুখে শুনেছি ১৯৭১ সালে পূব বাঙলায় যে পাশবিক অত্যাচার হয়েছিল তাতে পাঞ্জাবী পাঠানের তুলনায় বেলুচরা ছিল অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ। পশ্চিম পাক বর্বরতার প্রধান পুরোহিত টিক্কা খান একবার বা একাধিকবার বেলুচিস্তানে শান্ত জনতার উপর প্লেন থেকে বোমা ফেলেছিলেন বলে তিনি লোকমুখে যে উপাধি পান সেটা টিক্কাজাতীয় অফিসারকুলের পক্ষে সাতিশয় শ্লাঘার খেতাব—'বমার (বম্বার) অব বেলুচিস্তান'। পরবর্তীকালে বাঙলাদেশে তিনি পান লক্ষগুণে উচ্চ পর্যায়ের খেতাব 'বুচার অব বেঙ্গল'।

এ-ছাড়া বেলুচিস্তানের একটা ক্ষুদ্র অংশের লোক ব্রুহি উপভাষা বলে থাকে। ভাষাটি জাতে দ্রাবিড়। সুদূর দ্রাবিড়ভূমি থেকে এ ভাষার একটা পকেট এখানে গড়ে উঠলো কি করে এ নিয়ে ভাষাবিদরা এখনো মাথা ঘামাচ্ছেন। এরা উর্দু শেখে ঢাকাবাসীর চেয়েও শতাংশের একাংশ।

সিন্ধীদের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাদের ভাষা বিকশিত, সাহিত্য সমৃদ্ধ। উত্তর ভারতেব উর্দুর সঙ্গে সে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে। তাই উর্দু শেখার জন্য তাবা কখনো কোনো প্রয়োজন বোধ করেনি—নিতান্ত কয়েকজন মোল্লা মৌলভী ছাড়া এবং যেহেতু বহুকাল পূর্বে আরবদের সঙ্গে সিন্ধুবাসীর সমুদ্রপথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ও ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধী ভাষা সোজাসুজি বিস্তর আরবী শব্দ গ্রহণ করেছিল (পক্ষান্তরে উর্দু তার তাবৎ আরবী শব্দ গ্রহণ করেছে ফারসী মারফৎ, অতএব কিছুটা বিকৃতরূপে) তাই মোল্লামৌলবীরাও উর্দুর নামে অযথা বে-এক্তেয়ার হতেন না—গুজরাতী, মারাঠী, এমন কি কোনো কোনো বাঙালী মুসলমান যে রকম হয়ে থাকেন।

আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, নাতিবৃহৎ পশ্চিম পাকিস্তানের ভিতর ঐ সিন্ধীবাই একমাত্র ভদ্র, বিদগ্ধ আপন ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি।

এই যে ১৯৭১ নয় মাস ব্যাপী পশ্চিম পাকের সেপাই অফিসার রাজকর্মচারী পূব বাঙলাকে ধর্ষণ করে গেল, এর ভিতরে কোনো সিন্ধী ছিল বলে আমি শুনিনি। বিস্তর পূর্ববঙ্গবাসীদের আমি এ প্রশ্ন শুধানোর পরও। বস্তুত গত পঁচিশ বৎসর ধরে আমি প্রায়ই রাজশাহী, ঢাকা, সিলেট, চাটগাঁ, যশোর, খুলনা গিয়েছি কিন্তু কোনো সিন্ধী আর্মি অফিসার দূরে থাক, ছোট বা বড় কোনো চাকুরের সঙ্গে পরিচয়তক হয় নি। পূব বাঙলাকে সিন্ধীরা কস্মিনকালেও কলোনির মত শোষণ করেনি।

সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল এবং এখনো আছে পাঞ্জাবীরা।

ব্যত্যয় নিশ্চয়ই আছে, তথাপি মুক্তকণ্ঠে বলবো, এ-রকম তথাকথিত শিক্ষিত অথচ বর্বর জাত বহুদেশ ভ্রমণ করার পরও আমি কোথাও দেখিনি।

এদের সবাই বলবে তাদের মাতৃভাষা উর্দু। বরঞ্চ আমি যদি বলি আমার 'মাতৃভাষা ঋগ্বেদের ভাষা, তবু আমি ওদের চেয়ে সত্যের অনেক কাছাকাছি থাকবো।

উর্দু ভাষা জন্মগ্রহণ করে উত্তর প্রদেশের আগ্রা ও তার সংলগ্ন দিল্লীতে। ঐ সময়কার পাঞ্জাবের বৃহৎ নগর লাহোর বা অমৃতসর উর্দুর কোনো সেবা করেনি। এবং এস্থলে এ তথ্যটাও স্মরণ করয়ে দেওয়া উচিত যে উর্দুতে হরিয়ানা অঞ্চলের দিল্লীর প্রাধান্য, সেটা রাজধানী ছিল বলে। সর্বোত্তম উর্দু এখনো উত্তর প্রদেশের মলিহাবাদ অঞ্চলে উচ্চারিত হয় এবং সাহিত্য গড়ে উঠেছে দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌয়ের প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার ফলে। পরবর্তীকালে এলাহাবাদ উর্দুর অন্যতম পীঠভূমি হয়ে দাঁড়ায় এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীর পিতামহ উর্দু সাহিত্যের যে সেবা করে গিয়েছেন সেটা অবিস্মরণীয়।

উর্দু জন্ম নেয় উত্তর প্রদেশের প্রাকৃত মায়ের কোলে। পাঞ্জাবে যে প্রাকৃত প্রচলিত সে এ-প্রাকৃতের অনেক দূরের। লাহোর অঞ্চলে সে প্রাকৃতকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নামে ডাকতে হয়। সিলেটী বাঙল্য এবং রাঢ়ের বাঙলা একই প্রাকৃত থেকে। তাই সিলেটী উপভাষা সাধু বা চলিত বাঙলার ডায়লেক্ট। লাহোরের আচণ্ডাল নিজেদের মধ্যে যে 'পাঞ্জাবী' বুলিতে কথা বলে সেটা উর্দুর ডায়লেক্ট নয়।

লাহোর অমৃতসর অঞ্চলগত প্রাকৃতের প্রকৃত মূল্য দিয়েছিলেন মাত্র একটি মহাজন। উত্তব প্রদেশে যে যুগে হিন্দী রীতিমত উন্নত সাহিত্য ধারণ করতো, উর্দুর ক্বচিৎ জাগরিত বিহঙ্গকাকলি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, সেই যুগে আমাদের এই মহাত্মা এসব কিছু সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আপন পাঞ্জাবের প্রাকৃত দৃঢ়ভূমির উপর নির্মাণ করলেন অজরামর 'গ্রন্থসাহেব'।

তাবৎ পাঞ্জাবভূমি, পাকিস্তানী পাঞ্জাব হিন্দুস্থানী পাঞ্জাব সব মিলিয়ে দেখি যে এখানে মাত্র একটি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য আছে। শিখ সম্প্রদায়। আপন মাতৃভাষায় রচিত হয়েছে তাদের শাস্ত্রগ্রন্থ। শুনে বিস্মিত হয়েছি, শিখদের প্রতি বিরূপ বাদশা ঔরঙ্গজেব নাকি 'গ্রন্থসাহেব' থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারতেন।

মোদ্দা কথা : পশ্চিম পাঞ্জাববাসীর মাতৃভাষা উর্দু তো নয়ই, তাদের মধ্যে যে ভাষায় কথাবার্তা হয় সেটা উর্দুর ডায়লেক্টও নয়। অর্থাৎ তাদের 'মাতৃভাষা' এখনো সাহিত্যের পর্যায়ে ওঠেনি। বরঞ্চ মার্কিন নীগ্রোদের অবস্থা ঢের ভালো, ইংরিজি ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা বা উপভাষা তারা আদৌ জানে না, নিজেদের মধ্যেও ইংরিজি বলে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বাধ্য হয়ে বলতে হয়, মাতৃভাষাহীন সদম্ভস্ফীত, অজ্ঞতামদমত্ত এই একটা বর্বর জাত রাজত্ব করার ছলে শোষণ করতে এসেছিল পূব বাঙলায় এমন একটা জাতকে যার ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ এবং সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে উল্লেখ করি, সে সাহিত্যের স্বীকৃতি দিয়েছে নোবেল প্রতিষ্ঠান যাকে বিশ্বস্বীকৃতিও বলা যায়॥

উভয় বাঙলা—পুস্তকসেতুভঙ্গ

বঙ্গভূমিতে যদি কস্মিনকালেও সংস্কৃতের কোনো চর্চা না থাকতো, তবে আজ বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য, বিশেষ করে গদ্য-সাহিত্য, নিশ্চয়ই এতখানি বিকাশ ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারতো না। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র হয়ে হয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সর্ব গদ্য লেখকই অত্যুত্তম সংস্কৃত জানতেন এবং ঐ সাহিত্য থেকে কী যে গ্রহণ করেন নি, তার নির্ঘন্ট দেওয়া বরং সোজা। বস্তুত এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকও মধ্যম

শ্রেণীর সংস্কৃত জানতেন। এবং একালেও একাধিক সাহিত্যিক অনায়াসে সংস্কৃতের অধ্যাপক হতে পারেন। এবং বঙ্গসাহিত্যসেবী সংস্কৃত অধ্যাপকদের কথা তোলাই বাহুল্য। সংস্কৃতের সাহায্য না নিয়ে বাঙলা গদ্যের ক্রমবিকাশ আমরা কল্পনাই করতে পারিনে।

উর্দু ঠিক সেই রকম নির্ভর করেছে প্রধানত অতিশয় সমৃদ্ধ ফার্সী সাহিত্য ও অল্পবিস্তর আরবীর উপর। তাই উর্দুর লীলাভূমি উত্তরপ্রদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে পাক-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দুটি মাদ্রাসা বহুকালের ঐতিহ্য নিয়ে, ও প্রধানত ধর্ম ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা ও শিক্ষাদান করেছে। এদের আরবী ফার্সী চর্চা উর্দুর জন্মকাল থেকে সে-সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছে। মাইকেল যেরকম অত্যুত্তম সংস্কৃত জানতেন, গালিবও তদবৎ উচ্চাঙ্গের ফার্সী জানতেন। এমন কি পাঞ্জাবের সবে-ধন নীলমণি কবি ইকবালও ফার্সী দিয়ে আপন ঈষৎ কষ্টসাধ্য উর্দুকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

কিন্তু তাবৎ পাঞ্জাবের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি, এমন কি যে লাহোর পাঠান মোগল আমল থেকে সমৃদ্ধশালিনী নগরী, পাঞ্জাবের মুকুটমণি, মুসলমানদের সংখ্যাগুরুত্ব যেখানে অন্যান্য সম্প্রদায়কে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছিল সেখানেও কস্মিনকালেও পূর্ণাঙ্গ একটি মাদ্রাসা ছিল না—উর্দুকে রসদ-খোরাক যোগাবার জন্য, কারণ পূর্বেই বলেছি, পাঞ্জাবীর মাতৃভাষা উর্দু নয়। পার্টিশেনের সঙ্গে সঙ্গে যে-সব মৌলবী মৌলানা উত্তর প্রদেশ থেকে শরণার্থীরূপে লাহোর পৌঁছলেন তাঁরা লাহোরের মাদ্রাসাটি দেখে বিস্ময়ে নৈরাশ্যে মূক হয়ে গেলেন। তুলনা দিয়ে বোঝাতে গেলে বলি, সে-মাদ্রাসাটি ক্লাস সিকস অবধি পড়াতে পারে, অর্থাৎ মাইনর স্কুলের মত মাইনর মাদ্রাসা। সম্পূর্ণ অবান্তর নয়, তাই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন করি, পাঞ্জাবের তুলনায় যদিও পূব বাঙলা অতিশয় দীন, তবু সেই পূব বাঙলাতেই আছে, বহুকাল ধরে তিনটি পূর্ণাঙ্গ মাদ্রাসা—ফের তুলনা দিয়ে বলি, পি এচ ডি মান পর্যন্ত! ওদিকে মাইনর স্কুল এদিকে ডকটরেট! মাদ্রাসার সিকস অবধি কতখানি ইসলামী শাস্ত্রচর্চা হওয়া সম্ভবে! উর্দুর সেবাই বা করবে কতখানি? তারই ফলে পাঞ্জাবীদের কোনো দিক দিয়ে কোনো প্রকারের বৈদগ্ধ্যের ঐতিহ্য নেই।

তারই দ্বিতীয় বিষময় ফল, যে-পাঞ্জাবে মাদ্রাসার অভাবে শাস্ত্রীয় ইসলামের কোনো আবহাওয়া নেই সেখানকার পাঞ্জাবী সিভিল, মিলিটারি অফিসাররা, তিনটে সমৃদ্ধশালী মাদ্রাসা এবং অগুণিত মাইনর মাদ্রাসার উপর দণ্ডায়মান, ইসলামী আবহাওয়া দ্বারা পরিবেষ্টিত পূব বাঙলায় এসে দম্ভভরে সর্বত্র দাবড়াতে দাবড়াতে প্রচার করতে লাগল, তারাই পাক-ভারতের ইসলামী ঐতিহ্যের সর্বোত্তম মুসলমান, পূব বাঙলার মুসলমানরা মেরে কেটে আধা মুসলমান,—কিংবা মুসলমানী নাম এরা ধরে বটে, কিন্তু আসলে কাফির! গত যুদ্ধের সময় পাঞ্জাবী পাঠান সেপাইদের লাহোর পেশাওয়ারে শেখানো হয়েছিল, "পূব পাক-এ মসজিদের ঢঙে নির্মিত এমারত দেখতে পাবে। সেগুলো একদা মসজিদ ছিল। পরবর্তীকালে ওদেশের লোক ইসলাম বর্জন করে, এবং বর্তমানে নমাজের অছিলা ধরে ভারতাগত কাফের এজেন্টদের সঙ্গে ঐ সব এমারতে মিলিত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বনাশ সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করে।"

এ-সব তথ্য তত্ত্ব আমার মূল বক্তব্যের পক্ষে কিছুটা অবান্তর কিন্তু এগুলো থেকে বিশেষ করে হিন্দু পাঠকের বিস্ময় কথঞ্চিৎ প্রশমিত হতে পারে—মুসলমান সেপাই কি করে তাদেরও ধর্মালয় মসজিদে ঢুকে নামাজরত তাদের ধর্মভ্রাতা নিষ্ঠাবান মুসলমানদের

মেশিনগান চালিয়ে মারলো? নিশ্চয়ই কলকাতার বিস্তর হিন্দু স্বচক্ষে দেখেছেন পাঠান, পাঞ্জাবী, কাবুলী, বাঙালী সর্বদেশের মুসলমান চিৎপুরের একই নাখুদা মসজিদে ঢুকছে।

কিন্তু আমার মূল বক্তব্য : পূব বাঙলায় পশ্চিম বাঙলার বই ব্যান হল কি ভাবে? তার অবতরণিকাতেই যদি বলি, লাহোরের ঐ যে ক্ষুদে মাদ্রাসাটি লিক লিক করছিল, সে-ই এ-লড়াইয়ের পয়লা বুলেট ফায়ার করেছিল, তবে বাঙালী পাঠকমাত্রই বিস্মিত হবেন, সন্দেহ কি!

উত্তর প্রদেশ থেকে লাহোরাগত মৌলবী মৌলানারা নিজের স্বার্থেই হোক—মাইনর মাদ্রাসার তনখা তাঁদের পক্ষে হাস্যাস্পদ—কিংবা ইসলামী চর্চা উচ্চতর পর্যায়ে তোলার জন্যই হোক, তাঁরা উঠে পড়ে লেগে গেলেন পুঁচকে ঐ মাদ্রাসাটিকে উচ্চমানে তোলার জন্য।

উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক কোথায়? এ-স্থলে স্মরণে আনি, সুইটজারল্যান্ড দেশের বের্ন শহরে সর্বপৃথিবীর লেখকদের স্বার্থ রক্ষার্থে সমাগত বিভিন্ন দেশ কপিরাইট সম্পর্কে কতকগুলি আইন প্রণয়ন করেন। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল, যে-সব দেশ এসব আইনে (সংক্ষেপে বের্ন কনভেনশন) দস্তখত দেবেন তাঁরা একে অন্যের কপিরাইট মেনে চলবেন। যেমন কোনো ভারতীয় প্রকাশক বিনানুমতিতে গত মাসে লন্ডনে প্রকাশিত, সর্বস্বত্বরক্ষিত কোনো পুস্তক ছাপতে পারবেন না। কত বৎসর পরে মূলগ্রন্থ, কত বৎসর পরে তাব অনুবাদ বিনানুমতিতে ছাপতে পারা যায়, সে-বিষয়ে মূল আইনকে কিঞ্চিৎ সীমাবদ্ধ, প্রসারিত, সংশোধিত করা হয়েছে।

পাকিস্তান বের্ন কনভেনশনের মেম্বার হল না। বাংলাদেশ হয়েছে কিনা জানিনে।

তার কারণ অতি সরল। পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু বই না হলে পাঞ্জাবের চলে না। সেগুলো ছাপা হয় ভারতে, কপিরাইট ভাবতীয় লেখকেব। কাঁড়ি কাঁড়ি ফরেন কারেনসি চলে যায় ভারতে, ওগুলো কিনতে গিয়ে। সে-বইগুলো যাতে নির্বিঘ্নে, ভারতীয়দের কোনো প্রকারের রয়েলটি না দিয়ে লাহোরে ছাপানো যায় সেই মতলব নিয়ে পাকিস্তান বের্ন কনভেনশনের মেম্বার হয় নি।

কিন্তু বললেই তো আর হয় না। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, লাহোর কোনোকালেই উর্দুর পীঠস্থান ছিল না। তাই ফাউন্ডারি ছাপাখানা, কাগজ নির্মাণ, প্রুফ রীডার ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো বকমের জিনিস এবং মানুষ লাহোরে আছে অতি অতি অল্প, বহু বস্তু আদৌ ছিল না। এগুলো তো আর রাতারাতি গড়ে তোলা যায় না।

ঢাকাও সঙ্গে সঙ্গে সেই বিপদেই পড়লো। কিন্তু লাহোরের তুলনায় সে কিছুই নয়। কারণ ঢাকার ভাষা বাংলা, সাহিত্য বাংলা। লাহোরে বাস করে যদি একজন উর্দু লেখক, তবে ঢাকায় অন্তত দশজন বাঙলা লেখক। বর্ধমান যেমন কলকাতার আওতায় ছিল, ঢাকাও তাই ছিল। লাহোব সেরকম উর্দুভূমির আওতায় কোনো কালেই ছিল না। গোড়ার দিকে ঢাকাব কুমতলব ছিল না, বের্ন কনভেনশনের পুটাশ্রয়ে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ফাঁকি দিয়ে তাদের বই ছাপানো। তাদের প্রধান শিরঃপীড়া ছিল, আপন পাঠ্যপুস্তক রচনা করা, ছাপানো ইত্যাদি। তদুপরি পাঠ্যপুস্তকে প্রবন্ধ কবিতা সঞ্চয়নে ঢাকার ভাবনা অনেক কম। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, মাইকেল, হেমচন্দ্র ইত্যাদি বিস্তর ক্লাসিক লেখকের কপিরাইট ততদিনে শেষ হয়ে গিয়েছে কিংবা যাবো যাবো করছে। বের্ন থাক আর না-ই থাক—ঢাকা তার পা পুস্তকে এঁদের লেখা তুলে ধরলেই তো যথেষ্ট।

উপস্থিত না-ই বা থাকলেন শরৎচন্দ্র বা তারাশঙ্কর। উঠে পড়ে লেগে গেল ঢাকা—পিছনে কবি, গল্পলেখক অসংখ্য না হলেও নগণ্য নয়, তদুপরি ঢাকা বিরাট পূর্বপাকের রাজধানী। লাহোর পশ্চিম পাকের রাজধানী তো নয়ই, যে-পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রধান নগর সেও তেমন কিছু বিরাট প্রদেশ নয়।

লাহোর কোনো উন্নতি করছে পারছে না দেখে তাকে কৃত্রিম পদ্ধতিতে উৎসাহিত করার জন্য এক ঝটকায় ব্যান করে দেওয়া হল তাবৎ ভারতীয় পুস্তকের আমদানী। পাঞ্জাবী কর্তাদের অনুরোধে করাচীর বড় কর্তারা অবশ্য ব্যান করার সময় ভেবেছিলেন উর্দু বইয়ের কথা। কিন্তু ফাঁদে পড়ে গেল পশ্চিম বাংলার বইও। অর্ডারটা অবশ্য খুব খোলাখুলি দেওয়া হয়েছিল কিনা জানিনে।

কিন্তু সেটা ফাঁস হয়ে গেল সেই যে ছোট্ট মাদ্রাসাটির কল্যাণে। তারা পড়লো সমূহ বিপদে। তাদের আরবী ফার্সী পাঠ্যপুস্তক ছাপবার জন্য আরবী অক্ষরের ফাউন্ডারি, প্রেস, প্রুফরীডার কোথায়? যে উত্তর প্রদেশের সর্বোচ্চ মাদ্রাসাদ্বয় প্রচুর আরবী বই কিনতো সেই উত্তর প্রদেশে মাড় একটি আরবী প্রেসের নাম সর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। "নওলকিশোর প্রেসের" মালিক ছিলেন আরবী-ফার্সী-উর্দুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল জনৈক হিন্দু। এ-অধম শৈশবে ঈশ্বর নওলকিশোরের ছাপা পুরাণ দিয়েই পাঠারম্ভ করে। খুদ মক্কাশরীফে একদা তাঁরই কুরান বিক্রী হত।

আরবী পুস্তক ব্যান কবার বিরুদ্ধে মোল্লারা করলেন তীব্র প্রতিবাদ। সেটা প্রকাশিত হল এক উর্দু সাপ্তাহিক-এ। করাচীর ইংরিজি "ডন" করলো সেটার অনুবাদ। সেটা খবর হিসেবে প্রকাশিত হল কলকাতায়। তখন আমরা জানতে পারলুম, পশ্চিম বাংলার বই কেন ঢাকা যাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে জুট চা একসপ্লয়েটকারী লাহোরের চা-ব্যবসায়ীরা চিন্তা করছে, পূব বাঙলার বুক-মার্কেট কিভাবে একসপ্লয়েট করা যায়। সে-ও এক মজাদার কেচ্ছা।

উভয় বঙ্গে—আধুনিক গদ্য কবিতা

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ পাঠক গদ্য কবিতা (গবিতা ও গবি বিপ্রকর্ষণ অসৌজন্যবশত নয়) সম্বন্ধে সবিশেষ কৌতূহলী না হলেও গবিকুল ও তাঁদের চক্র যে প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে গবিতা রচনা করেন, সাপ্তাহিক রবিবাসরীয় ছয়লাপে ভাসিয়ে দেন, সর্ববিধ ব্যঙ্গ কৌতুক চরম অবহেলাসহ উপেক্ষা করে এলিয়ট, পাউন্ড নিয়ে গভীর আলোচনা, তুমুল তর্কবির্তকে মত্ত হন, এ-সব গ্র্যান্ড মাস্টারদের গবিতা বাংলায় অনুবাদ করেন এবং বহু ক্ষেত্রে কষ্টার্জিত কার্ষাপণ ব্যয় করে ওইসব মহামূল্যবান রত্নরাজি রসিক বেবসিক সকলের সামনে তুলে ধরেন, এসব কাণ্ডকাবখানা দেখে সবিস্ময়ে মন ধায় একাধিক সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করে তুলনীয় একটা বিবাট আন্দোলন আবিষ্কার করতে। বহুতর প্রচেষ্টার পর দেখি, পঞ্জিকার ভাষায় "সর্বদিকে যাত্রা নাস্তি"। বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় ঝাঁকে ঝাঁকে কবি জমায়েত হতেন, গজনীব মাহমুদ বাদশা ধনদৌলত লুট করার সময় দুচারটে কবি লুট করতে কুণ্ঠিত হতেন না, মঙ্গোলদের সর্বনাশা দিগ্বিজয়ের ফলে হাজার দুত্তিন ইরানী কবি মোগল দরবারে আশ্রয় পান। একসঙ্গে একই দরবারে দু—ই তি—ন হাজার কবি। তৎসত্ত্বেও পরিষ্কার দেখতে পাই, এঁরা স্থায়ী অস্থায়ী কোনো

প্রকার আন্দোলনের সূত্রপাতটুকু পর্যন্ত করতে পারলেন না। পক্ষান্তরে এই দীন পশ্চিমবঙ্গ সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ, পাঠক-সাধারণ কর্তৃক অবহেলিত গবিকুল কী প্রচণ্ড তেজে নয়া এক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তস্মাৎ প্রণমা-প্রণিধায় কায়ং। অতিশয় সত্য যে "ন তৎসমোৎস্তৎ ভ্যধিকঃ কুতোৎনো।"

বাঙলাদেশেও একই হাল। হয়তো পরিসংখ্যা বৃহত্তর। তবে তাঁদের চক্রটির পরিধি কতখানি বিস্তৃত সেটা জরীপ করা সুকঠিন কর্ম। অবশ্য এ-কথা অতীব সত্য, ঢাকার অসংখ্য দৈনিকের প্রায় সব কটিই রবিবাসরীয় তথা সাহিত্য সংখ্যায় ভুরি ভুরি গবিতা ছাপে। যে কটি বিখ্যাত অখ্যাত গবির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে তাঁদের উৎসাহ উদ্দীপনা, গবিতার তরে কলিজার খুন দিয়ে শহীদ হবার জোশ পশ্চিমবঙ্গের গবিকুলকে দস্তুরমত ভেল্কিবাজি দেখাতে পারে। পূর্ববাঙলাব বাজাবে পশ্চিমবঙ্গের পুস্তক মাসিকের নিদারুণ অনটন সত্ত্বেও ঢাকার গবি সম্প্রদায় এ-বাঙলার গবিদের নাম জানেন, ও একাধিকজনের রচনা মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছেন, এঁদের সম্বন্ধে তত্ত্ব ও তথ্য সহ উচ্চাঙ্গের আলোচনা করতে পারেন এবং সহৃদয় পরিবেশ পেলে করেও থাকেন। এঁদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যে তাঁরা আমাদের মত গবিতাউদাসী এবং যাঁরা আগাপাস্তলা গবিতাবৈরী "কাফের" তাঁদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য অবলম্বনে একাধিক গবির ন্যায় "তাচ্ছিল্যি" প্রকাশ প্রায কবেনই না এবং আমরা যে নিতান্তই হতভাগ্য গৈবলানন্দ থেকে বঞ্চিত, অশিক্ষিত জড়ভরত সে কথা আভাসে ইঙ্গিতে স্মরণ করিয়েও দেন না। কলকাতা ফিরে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলুম, এ-বঙ্গের একাধিক গবিও ও-বাঙলার বেশকিছু গবি সম্বন্ধে ওকীবহাল এবং আশ্চর্যের বিষয় নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম কবে ও-বাঙলাব গবিতার বই বেশ কিছু পরিমাণে এ-দেশে এসে পৌচেছে। আমার মনে হয়, কথাসাহিত্যের জনপ্রিয়তা স্মরণে রাখলে দেখা যাবে, গবিতার ন্যায্য হিসেবে যা পড়ার কথা তার চেযে ঢের বেশী গাব্য পুস্তিকা দুই বাঙলাই পাচার ও লেনদেন কবেছে। অবশ্য গবিতার প্রতি কালাপাহাড়ী মনোবৃত্তিসম্পন্ন বিশ্বনিন্দুকেরা বলে, এই গদ্য কবিতা বিনিময় নির্ভেজাল গাব্য রসাসক্তি বশত নয়, এর মূল কারণ অন্যত্র ও সন্তর্পণে লুক্কায়িত। উভয় বঙ্গেব গবিকুলের অনেকেই কমুনিস্ট এবং তাঁরা একে অন্যের সঙ্গে রাজনৈতিক ভাব বিনিময় লেনদেনের সময় গবিতা-রস এপিটাইজিং ফাউ রূপে এস্তেমাল করেন।

বাঙলাদেশের অপেক্ষাকৃত বয়স্ক গবিদের এ-বাঙলার অনেকেই চেনেন—আমাদের মত অপাংক্তেয় অরসিকদেরও দুএকজন। কবি আবুল হোসেনের শিক্ষা-দীক্ষা কলকাতায়। দেশ বিভাগের পূর্বেই তাঁর প্রতিভা উভয় বাঙলার অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভাষার উপর দখল, স্পর্শকাতর হৃদয় দিয়ে বিষয়বস্তু চয়ন, অনাড়ম্বর পদ্ধতিতে সৃষ্টরস পরিবেশন তাঁর অধিকাংশ রচনাতেই যেন আধা-আলোতে লুকিয়ে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি দক্ষিণপূর্ব-এশিয়ায়। সে-যুদ্ধ তাঁর অন্যতম সঙ্কলনে প্রকাশ পেয়েছে। নয়টি মাসের ইয়েহিয়া নৃত্য কিন্তু এখনো তাঁকে নব সৃষ্টির জন্য তাড়না লাগাতে পারেনি। কিংবা হয়তো তাঁর পিতার অকারণ, মর্মান্তিক পরলোকগমন তাঁর চৈতন্যলোকে ট্রাউমা হয়ে সেখানে সর্বরসধারা আসুরিক পদ্ধতিতে রুদ্ধ করে দিয়েছে। আশা রাখি, এ-ট্রাউমা দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

রাজনীতির প্রতি পূর্ণ উদাসীন, আচারনিষ্ঠ বৃদ্ধ পিতা খবর পেয়েছিলেন যে খানসেনা তাঁদের গ্রামে প্রবেশ করছে। হয়তো ভেবেছিলেন—সেইটেই স্বাভাবিক—সর্বপ্রকারে রাজনৈতিক কর্মে সম্পূর্ণ অক্ষম এই অথর্ব বৃদ্ধের প্রতি কি খানসেনা, কি লীগ এমন কি পেশাদার খুনী গুণ্ডারও বৈরীভাব পোষণ করার মত কোনো স্বার্থ, দ্বেষ বা অন্য হেতু থাকতে পারে না। গ্রামের সদর রাস্তা দিয়ে মার্চ করে যাবার সময় খানরা তাঁকে দেখতে পেল বৈঠকখানায়। বাক্যব্যয় না করে তাঁকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারে।

আবুল হোসেনের সমসাময়িক আরো উত্তম উত্তম কবি আছেন। তাঁদের পরতীকালের রচনা হাতে আসেনি—যোগাযোগ ছিল না বলে।

সর্বাধুনিক গবিদের ভিতর বাহ্যত কিশোরসম, আমার তথা সর্ব বয়স্কজনের স্নেহের পাত্র মিএগ শম্‌সর্ রহমানের রচনা সরল ও সরস, ছত্রে ছত্রে যেন নতুন নতুন ডাক দিয়ে যায় বাঁকে বাঁকে, দেখায় অপ্রত্যাশিত বিচিত্র ছবি; যদিও একাধিকবার আমার মনের কোণে জেগেছে একটি ধারণা : মিএগ শমস্-এর গবিতার বিষয়বস্তু এত বেশী রোমান্টিক যে এগুলো সাবেক পদ্ধতির কবিতায়—চিত্রাঙ্কন একাডেমিক স্টাইল নামে যে টেকনিক পরিচিত—রচিত হলে তাঁর বিচিত্র অনুভূতি সুডৌল নিটোল রূপে ব্যাপকতর আত্মপ্রকাশ করতে পারতো।

মননশীল প্রবন্ধ, বিশেষত সাহিত্যের ইতিহাসবিষয়ক তথা পূর্ববঙ্গীয় লেখিকাদের সৃষ্টি নিয়ে তাঁর রচনা কয়েক বৎসর পূর্বেই বানু সালমা চৌধুরীকে তথাকার সাহিত্য জগতে সম্মানের আসন দিয়েছিল। সম্প্রতি তিনি একখানি চটি গবিতা পুস্তিকা প্রকাশ করে ইতিমধ্যেই তাঁর সৃষ্টির বহুমুখীধারা, বহুবিচিত্র বিদগ্ধ তথা জানপদ শব্দ চয়নদ্বারা সমৃদ্ধ ভাষা ও শৈলী, ঐতিহাসিক নয় মাসের বিভীষিকাময়ী সুদীর্ঘ লক্ষ যামা করাল রজনী, সর্বোপরি লেখিকার আম্মা, নানী, বৃদ্ধা মাতৃসমা পরিচারিকাটির ভিন্নেৎসহ আচারনিষ্ঠ, শান্ত, নম্র পঞ্চোপাসনান্তে লব্ধ অবকাশে নিত্যচারু-কলারত একটি মুসলমান পরিবারের যে-চিত্রটি লেখিকা দরদী হৃদয় দিয়ে এবং প্রধানত ব্যঞ্জন ও সুনিপুণ পরিচালনা দ্বারা অঙ্কন করেছেন, সে-ছবিটির বৈচিত্র্যগুণ রসগ্রাহীজনের সপ্রশংস চিত্তাকর্ষণ করেছে। বস্তুত সদ্য প্রস্ফুটিত বুদ্ধিবৃত্তি তথা নীতি-বিকশিত স্পর্শকাতরতাসহ কিশোরীর প্রাগুক্ত সাহিত্যিক রচনার চেয়েও।

লেখিকার বড় মাসীর সূফীতত্ত্বমূলক মা(১) রিফতী গীতি (মিস্টিক্ সঙ্স্) তাঁর অকালমৃত্যুর পর জনগণের স্বীকৃতি লাভ করেও ঢাকা বেতার কয়েক বৎসর ধরে তাঁর সূফী পল্লীগীতি প্রচার করে আসছে। এই মাসীর কনিষ্ঠপুত্র, লেখিকার অগ্রজ অক্লান্ত সাহিত্যসেবী, ভগ্নীর প্রতি সদা স্নেহশীল মরহুম অলির কাছ থেকে লেখিকা সাহিত্যের যাত্রাপথে পদাপর্ণের প্রথম উষাকাল থেকে অকুণ্ঠ উৎসাহ ও সর্বাধিক অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। অতিশয় নিরীহ, সত্যার্থে বিরলতম এই অজাতশত্রু অলিভাইকে খানরা গুলি করে মারে তাদের বর্বর অভিযানের সঙ্গে সঙ্গেই—চট্টগ্রামে। শোকাতুর লেখিকা তাঁর জনপদ কল্যাণী মাসীকে স্মরণে এনে অশ্রুসিক্ত নয়নে পুস্তিকাটি উৎসর্গ করেছেন তাঁর প্রিয় দাদাভাই সাহিত্যসখা অলিকে। কবিতাগুচ্ছের অনেকগুলিই অশ্রুশিশিরে সিক্ত।

---

(১) সামলা চৌধুরী, "অংশীদার আমি", সিলেট, ১৩৭৯।

শতাধিক বৎসর পূর্বে এই চট্টগ্রামেরই আরেক নারী, রহিম্যুন্নেসা তার ভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে কাতর হৃদয় বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছিল :*

নয়া সন নয়া মাস ফিরে বার বার,
মোর জাদু চলি গেল ফিরিল না আর।

উভয় বাঙলা—সদাই হাতে দড়ি, সদাই চাঁদ

গত শতকের শেষের দিকে, এবং এ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজ চিন্তামগ্ন ভারতবর্ষকে আর কোন্ কোন্ দ্রব্যে শোষণ করা যায়। একাধিক চতুর লোকের মাথায় খেলল বাঙলা মুল্লুকের মাছ। মৎস্যের প্রতি যে বাৎসল্য বাঙালীর আছে, সে রকম উদাহরণ পৃথিবীর কোনো জাতের কোনো বস্তুর প্রতি আছে কি না সেটি গভীর গবেষণার বিষয়। অতএব ভারত সরকারের পুরো মদদ, পুলিসের কড়া শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় দুই ইংরেজ মাছের ব্যবসা খুলতে গেল, দুটি কলের জাহাজ নিয়ে। কথিত আছে অস্মদ্দেশীয় নমস্য ভেড়িওয়ালারা (শব্দটি আমি হরি, জ্ঞান রাজ কারো অভিধানে পাইনি—মৎস্য উৎপাদনকারী অর্থে যে অর্থে অর্বাচীন লেখক এ-স্থলে সভয়ে ব্যবহার করছে) মহুরতের পূর্বরাত্রে দুটি জাহাজ পুড়িয়ে দিলেন পুলিসকে বিশেষ অঙ্গুলি প্রদর্শন করত এবং সরকারকে উভয় হস্তের। অতঃপর আবার ইংরেজ চেষ্টা দিলে "দুশমনদের" আওতার বাইরে চিল্কা হ্রদে। কথিত আছে, সর্ব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবার প্রাক্কালে কে বা কাহারা চিল্কাপারের সরকারী বিশ্রামাগারে গভীর নিশীথে একাধিক ইংরেজ হনু মৎস্য ব্যবসায়ীকে পেঁদিয়ে লম্বা করে দিয়ে যায়। অবশ্য ভেড়িওয়ালাদের এহেন অপ্রশংনীয় আচরণের মধ্যে অন্তত একটি প্রশংসনীয় "ভদ্রস্ততা" ছিল : উভয় প্রচেষ্টার প্রারম্ভেই তাঁরা গোরারায়দের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, এ ধরনের প্রচেষ্টা তাঁদের স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক নাও হতে পারে....অর্বাচীন বঙ্গীয় ইতিহাসে এর চেয়ে বিস্ময়জনক ঘটনা আমার জানা নেই; কোথায় তখন "স্বদেশী", ক্ষুদিরাম, গান্ধী—ইংরেজের সেই দোর্দণ্ডতম প্রতাপের মধ্যাহ্নে? যদি অনুমতি পাই তবে নির্ভয়ে নিবেদন, কম্যুনিজম ফ্যাসিজম সাংখ্যবেদান্ত মাকালী মৌলা আলি এঁদের কারোরই প্রতি আমার অখণ্ড বিশ্বাস নেই এবং সঙ্গে সঙ্গে সভয়ে নিবেদন আমার সাতিশয় অবিচল দৃঢ়তম বিশ্বাস, ভারত এবং কিংবা বাঙলা সরকার এমন কি প্রয়োজন হলে বাঙলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে মৎস্য রপ্তানির আশ্বাসে বলীয়ান হলেও তাঁরা কস্মিনকালেও আমাদের ভেড়িওয়ালাদের আয়ত্তে এনে মৎস্য মূল্য ভদ্রজনোচিত স্তরে আনতে পারবেন না, না, না। নিতান্তই যদি শিলা জলে ভেসে যায় ধরনের অসম্ভব কল্পনাবিলাস করতেই হয়, তবে বলি, যদি কখনো পারেন, তবে সেই সন্ধ্যায়ই ভারতের তাবৎ ট্রেড ইউনিয়ন করায়ত্ত হবে, আহমদাবাদী, অন্যান্য কোটিপতি তথা কালোবাজারীরা পড়িমরি হয়ে কিউ লাগাবেন গত পঞ্চাশ বছরের ঠকানো ইনকাম ট্যাক্স শোধ করতে, যাবতীয় কার্টেল মনপলিকে নিধন করতে সরকারের এক মাসও লাগবে না, গরীব চাষাকে দাদন দিয়ে তার সর্বনাশ সাধনরত সট্টাবাজার—এক কথায় এমন কোনো সংগঠনই তখন নির্বিঘ্নে আপন অসামাজিক আচরণে লিপ্ত থাকতে পারবে না। ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ না করেও সাধারণ পর্যটকের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আমাদের ভেড়িওয়ালাদের ঐক্য ও তজ্জনিত

শক্তির সঙ্গে তুলনা দিতে পারি এমন কোনো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ধর্মীয় সমন্বিত শক্তি আমি কোথাও দেখিনি, পড়িনি, শুনিনি। ঈশ্বর তাঁদের মঙ্গল করুন এবং আমাকে যেন পরজন্মে ভেড়িওয়ালাকুলে স্থান দেন।

বোহরা, খোজা তথা পাঞ্জাবীরা যখন পূব বাঙলার পাট, চা, চামড়া থেকে আরম্ভ করে বিদেশীর সহায়তায় নির্মিত আলপিন তক তার মারফত তাদের রসাল কলনিটির আঁটিতে কামড়াতে আরম্ভ করেছেন তখন কতিপয় উদ্যোগী পাঞ্জাববাসীর মনে একটি অতিশয় মৌলিক অভিযানচিন্তা উদিত হল। "পূরব্ পাকিস্তানের মর্দ-লোগ তো বটেই ঔরৎলোগভী বহুৎ বহুৎ কিতাব পড়ছে। এই কিতাব-মার্কেটটাকে যদি কব্জাতে আনা যায় তবে কুল্লে পাকিস্তানে যে বাইশটি পরিবার দেশের অধিকাংশ ধনদৌলতের মালিক আমরা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারব"। মাছের বেলা যে বকম ইংরেজ উদ্যোগী পুরুষদের পশ্চাতে আপন সরকার দাঁড়িয়েছিল তাদেরই বা মদদ দেবে না কেন পিণ্ডি-ইসলামাবাদ? পূর্ববঙ্গে তখন পুস্তকোৎপাদনে ভেড়ি দূরে থাক, কটা এঁদোপুকুর ছিল, এক আঙ্গুলে গুনে বলা যেত।

ব্যাপারটার গোড়াপত্তন কিন্তু এক নূতন পরিস্থিতি এবং তাবই ফলে এক নূতন প্রয়োজনীয়তা থেকে। পূব বাঙলাকে যথারীতি শাসনশোষণ করাব জন্য পশ্চিম পাক বিশেষত পাঞ্জাব থেকে নিরবচ্ছিন্ন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পর্যায়েব কর্মচারী পাঠাতে হলে মুশকিল এই যে তারা "ন-পাক" বাঙলা ভাষাটার সঙ্গে মোটেই পবিচিত নয় এবং যতদিন না সে ভাষা সম্পূর্ণ লোপ পায়—সে পুণ্যকর্ম করার জন্য সবকাব অবশ্যই সদা জাগ্রত ও যত্নবান—ততদিন এদের তো কাজ চালাবার মত বাঙলা শিখতে হবে। ওদিকে কলেজের ছাত্ররাও হৃদয়ঙ্গম করেছে, সিন্ধী বেলুচী বা পশতু শিখে বিশেষ কোনো লাভ নেই। সিন্ধু দেশে তো যথেষ্ট উচ্চশিক্ষিত সিন্ধীজন আছেই, তদুপরি অর্ধবর্বর পাঠান-ভূমি, বেলুচিস্থান এমন কি সিন্ধু প্রদেশ পূব পাকিস্তানের তুলনায় এতই ক্ষুদ্র যে সেখানে চাকরির সংখ্যা অতি অল্প। এবং এ কথাও সত্য বেলুচ পাঠানের উপর ডাণ্ডা চালানো অতটা সহজ নয়। বেলুচিস্তানের উপর তো পরবর্তী কালের "বুচার অব বেঙ্গল" টিক্কা খান বোমা ফেলে "বমার অব বেলুচিস্তান" খেতাব পেয়েছেন—পূব বাঙলার উপর এখনো বোমা ফেলতে হয়নি। অতএব শেখো বাঙলা—প্রেমসে। করাচী, লাহোর এমন কি যে পাঠানের মাতৃভাষা পশতু, বলতে গেলে এখনো যে ভাষা লিখতে রূপ পায়নি, সেই পাঠান উঠে পড়ে লেগে গেল পেশাওয়ার বিদ্যালয়ে বাঙলা শিখতে।

এ বড় মজার পরিস্থিতি। খুদ পশ্চিম পাকে বাঙলা শেখা হচ্ছে পূর্ণোদ্যমে, আর সেই বাঙলা ভাষাকে নিধন করার জন্য পূব পাকে গোপনে প্রকাশ্যে দমন নীতির সঙ্গে সঙ্গে আইনকানুনও নির্মিত হল। তারই একটা ফরমান সম্পূর্ণ বেআইনী কায়দায় ঘোষণা করলো, পূব বাঙলা এলাকায় পশ্চিম বাঙলার জীবিত কি মৃত—মৃত লেখকের কপিরাইট তামাদি হয়ে গিয়ে থাকলেও—কোনো লেখকের বই ছাপানো চলবে না এবং পশ্চিম বাঙলার প্রথম প্রকাশিত যে কোনো বই পূব বাঙলায় ছাপানো যাবে না। এর ফলে পূব পাকিস্তানের অধ্যাপক ও কবি জসীম উদ্দীনের কাব্য "নক্সি কাঁথার মাঠ" ইত্যাদি পূব বাঙলায় ছাপানো নিষিদ্ধ হল কিনা স্মরণে আসছে না; কবির তাবৎ পুস্তকই তো কলকাতার ছাপাখানাতেই জন্ম নেয়, প্রথম প্রকাশ তো সেখানেই।

পশ্চিমবঙ্গের লেখকমণ্ডলী নিশ্চয়ই এ ব্যানের সংবাদ শুনে উল্লাস বোধ করতেন যদি তখন সেটা জানতে পেতেন। বিশেষ করে নীহার গুপ্তর মত জনপ্রিয়, শঙ্করের মত বহুদর্শী ও সমরেশের মত নির্ভীক লেখক নিশ্চয়ই এ সংবাদ শুনে কথঞ্চিৎ শান্ত হতেন, কারণ কালোবাজারের চোরাই সংস্করণের এঁরাই ছিলেন শিকারের প্রধান প্রধান বাঘসিঙি। কিন্তু ইত গজটা এখনো বলা হয়নি। পশ্চিম বাঙলার বই পূব পাকিস্তানে ছাপানো ব্যান্ হল বটে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে ছাপানো ব্যান হল না।

কি কারণে কার স্বার্থে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। পাঞ্জাবের উদ্যোগী পুরুষসিংহরা—যদিও সিংহগুলো কালোবাজারী পুস্তক ছাপানোর অনৈসর্গিক ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত—যাতে করে পূব বাঙলার বুক-মার্কেট পরিপূর্ণরূপে গ্রাস করতে পারেন। বিধি বলুন, বিজ্ঞান বলুন তিনি/তাঁরা এঁদের প্রতি অকস্মাৎ সদয় হলেন। ফোটো-ফ্ল্যাশ নামক পদ্ধতি ততদিনে আবিষ্কৃত হয়েছে—যার প্রসাদে সরাসরি যে-কোনো বই সস্তায় পুনর্মুদ্রণ করা যায়—নতুন করে কম্পোজ প্রুফরীডিং ইত্যাদির ঝামেলা পোয়াতে হয় না। প্রাগুক্ত পশ্চিম পাকের বাঙলাভাষা অধ্যয়নরত ছাত্রদের জন্য এঁরা সর্বপ্রথম ছাপলেন তাঁদেব বাঙলা পাঠ্যপুস্তক ব্যাকরণ ও অভিধান। চট্‌সে প্রকাশিত হল চলন্তিকা। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ পশ্চিম পাকে বই বিক্রি হবে অল্প, পূব পাকের ভূমাতে শাস্ত্রসম্মত সুখম। ওদিকে উল্লেখ প্রয়োজন পশ্চিম পাক থেকে পূব পাক যে কোনো বই উর্দু হোক বাঙলা হোক, যে কোনো পরিমাণে আমদানি করতে পারে—তার উপব কোনো ব্যান্ নেই। কাজেই পাঞ্জাবী উদ্যোগীরা ছাপতে লাগলেন, শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ কবে বটতলা পর্যন্ত। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কালে বা তাব কিঞ্চিৎ পূর্বে কলকাতায় প্রকাশিত গীতাঞ্জলির একটি শোভন পকেট সংস্করণেরও অত্যুত্তম ফোটোফ্ল্যাশ সংস্করণ তাঁরা বাজারে ছেড়েছিলেন। সকণ্ঠে কাষ্ঠ হাসি হেসে বলি, "গুণিজনের মনোরঞ্জনার্থে"! বাজারটা কিন্তু খুব বেশী দিন বাঁচলো না। ইতিমধ্যে লেগে গেল ১৯৬৫ব লড়াই। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায একাধিক প্রকাশক "দুশমন মুল্লুকের তামাম মাল হালাল" অর্থাৎ শাস্ত্রানুমোদিত এই অছিলায় বেধড়ক ছাপতে শুরু কবলেন পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রকারের পুস্তক। ইতিপূর্বে যে আদৌ করেননি তাও নয। মি ব্ল্যাক অনুচর স্মিথও অপাংক্তেয় রইলেন না।. পূব পাক স্বাধীন হওয়াব পব এখনো কি পরিমাণ "পাইরেটেড" মুদ্রণের প্রচার ও প্রসার আছে তার অনুসন্ধান কবিনি।

কী অদ্ভুত পবস্পব-বিরোধী পলিটিকস চালালে চব্বিশ বছর ধরে পশ্চিম পাকের দণ্ডধরগণ। পূব বাঙলায় পলিসি ছিল তার সাহিত্য ও ভাষার যথাসাধ্য বিনাশ করা এবং দ্বিতীয়ত পূব বাঙলা যেন পশ্চিম বাঙলার সঙ্গে কি সাহিত্যে কি সঙ্গীতে কোনো প্রকারের যোগসূত্র রক্ষা করতে না পারে। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকে হবে বাঙলা বড় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের জন্য ছাপতে দিল বাঙলা বই অভিধান। ওদিকে কলনি শোষণনীতি অনুসবণ করে পশ্চিম বাঙলায় প্রাকশিত পুস্তক পাঞ্জাবে যদৃচ্ছ ছাপতে ও পূব বাঙলায় বে-লাগাম বিক্রয় করতে বাধা দিল না।

বিস্তর বিদগ্ধ পাঠক স্বভাবতই শুধোবেন, ইকবাল? ইকবাল তো পাঞ্জাবী? কবি হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি আছে। তা হলে পশ্চিম পাঞ্জাবীদের সঙ্গে উর্দুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই, বলা যায় কি প্রকারে? তুলনা দিয়ে বলা যায়, জোসেফ কনরাডের মাতৃভাষা ছিল পোলিশ। তিনি ইংরিজিতে সাহিত্য সৃষ্টি করে বিখ্যাত হয়েছেন। তাই বলে পোল্যান্ডবাসীর সঙ্গে ইংরিজির অন্তরঙ্গতা আছে, এ কথা বলা যায় না।

হেমচন্দ্রের স্থান বাঙলা সাহিত্যের কোন শ্রেণীর আসনে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বাক্যবিন্যাস করার অধিকার এ অর্বাচীন লেখকের আছে; আমার বিস্তর পাঠকের প্রভূত পরিমাণে থাকার কথা। কিন্তু উর্দু কাব্যের সঙ্গে আমার পরিচয় এতই সীমাবদ্ধ যে সে কাব্যে ইকবালের স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করবার মত কাব্যাধিকার আমার অত্যল্পের চেয়েও কম। তথাপি বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধশ্রেণীকে সাধ্যানুযায়ী পূর্ণতর করার উদ্দেশ্যে সেটা অবর্জনীয়।

ইকবাল, আমার যতদূর জানা আছে, জর্মন কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে—খুব সম্ভব ম্যুনিক থেকে—দর্শন বিভাগে ডক্টরেট পান। কোনো কোনো পাঠকের কৃপাধন্য এ গর্দভও দর্শন বিভাগ থেকে ডক্টরেট পায়—জর্মনির অন্যতম বিখ্যাত বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এবং বললে পেত্যয় যাবেন নিশ্চিৎ মত্তুল্য এবং "মদাপেক্ষা" সহস্রগুণে খঞ্জতর ভূরি ভূরি গর্দভ গর্দভী জর্মনি থেকে—জর্মনি কেন, সর্বদেশেই—নিত্যি নিত্যি ডক্টরেট পেয়েছে ও পাবে। অতএব ইকবাল 'ভক্ত' মদোৎকট পঞ্চনদবাসী কবি ইকবালের ডক্টরেট নিয়ে যতই ধানাই পানাই করুক, ঢক্কা-ডিণ্ডিম-নাদ ছাড়ুক, তদ্বারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হওয়ার কারণ নেই। বিশেষত আমরা যখন বিলক্ষণ অবগত আছি, উচ্চাঙ্গের কাব্য রচনার জন্য দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন নেই, এবং ঐ উদ্দেশ্যে ম্যুনিক পানে ধাবমান হওয়াও বন্ধ্যাগমন। বস্তুত কবি ইকবালের ঢক্কাবাদক পঞ্চনদ সম্প্রদায় তাঁর যে-সব "দার্শনিক কবিতা"। প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ সেগুলি না দর্শন না কবিতা। অবশ্য আমাব এই ধারণাব মূল্য নাও থাকতে পারে। তাঁর বিশেষ ধরনের কবিপ্রতিভা ছিল, সে তথ্য সুবিদিত।

ইকবাল যে-সব কবিতায় অতীতের মুসলিম সভ্যতা ও কৃষ্টির গুণ-কীর্তন করেছেন এবং তাঁর যুগে মুসলিম জাহানের সর্বত্র সে-সভ্যতা ও কৃষ্টির অস্তমিত অবস্থার যে কারণ বর্ণনা দিয়েছেন সেগুলোই সবচেয়ে জনপ্রিয়। ইতিহাসের দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখলে সেগুলিতে ভুল-ত্রুটি নগণ্য এবং স্থলে স্থলে কবিজনসুলভ অতিশয়োক্তি নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য।

> এক-এক জলজন্তু পর্বতপ্রমাণ।
> সাগর করিবে গ্রাস হয় অনুমান॥

যে সাগরে জলজন্তু বাস করে সেই গোটা সাগরকে যদি সেই জলজন্তু গ্রাস কবতে পারে তবে ইউক্লিডের মুখে ছাই দিয়ে স্বীকার করবো, কোনো বস্তুর খণ্ডিত অংশ সেই বস্তু থেকে বৃহত্তর হতে পারে! কিন্তু কাব্য বিজ্ঞান নয়, দর্শনও নয়। যদিও আলঙ্কারিক দণ্ডিন তাঁর "'কাব্যাদর্শে" মত প্রকাশ করেছেন, এ-জাতীয় অসম্ভাব্য বর্জনীয়।

একতায় হিন্দুরাজগণ
সুখেতে আছিল সর্বজন
সে ভাবে থাকিত যদি
পার হয়ে সিন্ধু নদী
আসিতে কি পারিত যবন?

রঙ্গলাল বঙ্গভূমে একদা এই শ্লোক ছন্দে প্রকাশ করে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। ইকবালের শোকপ্রকাশশৈলী অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের। কিন্তু যে মুসলিম কৃষ্টির ন্যায্য প্রশস্তি ইকবালের কাব্যে আছে তাতে পাঞ্জাবী মুসলিমদের "অবদান" সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন কি না, আমার মনে পড়ছে না। তবে এ কথা স্পষ্ট মনে আছে, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় প্রতি বৎসর একটা জব্বর ডিবেট হয়। বিষয়: "কে শ্রেষ্ঠতর কবি?—ইকবাল না গালিব?" এবং পাঞ্জাবীরা একদা দলে ভারি থাকতো বলে ডিবেট শেষের ভোট-মারে গালিব প্রতি বৎসর মার খেতেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা সত্যই কবিতা কিনা, এ নিয়ে যাঁরা বক্তৃতা দেন কবি স্বয়ং তাঁদের নিয়ে মস্করা করেছেন। তদুপরি তাঁর কিংবা কোনো কবির কাব্য থেকে পছন্দমত, যেটা লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয়কে সাহায্য করে সেটা গ্রহণ, যেটা করে না সেটা বর্জন করে করে কবির জীবনদর্শন নির্মাণ করাটা তিনি নেকনজরে দেখতেন কিনা, রসিকজন দেখেন কিনা, সে বিষয়ে আমি শঙ্কা পোষণ করি। ইকবাল যখন গাইলেন, "চীন ও আরব আমাদের হিন্দুস্থান আমাদের" তখন এই 'আমাদের'-এর আমরা খুব সম্ভব একমাত্র মুসলমানগণ, কারণ চীন ও আরবে হিন্দু আছেন বলে শুনিনি। পক্ষান্তরে তিনি যখন বলেন "হিন্দুস্থান সর্ব বিশ্বে শ্রেষ্ঠতম" তখন নিশ্চয়ই তিনি আপন মাতৃভূমিকে (সে যুগে ভারত ইসলামের জন্মভূমি আরবের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আসন দিচ্ছেন। অতএব তিনি প্রথম মুসলিম তারপর ভারতীয়, না প্রথম ভারতীয় তারপর মুসলিম এ-সমস্যা থেকেই যায়—অন্তত আমার কাছে। সর্বশেষ প্রশ্ন, দেশ, ধর্ম, ভগবান ইত্যাদির প্রতি রচিত কবিতা আজ পর্যন্ত বিশ্বকাব্যে কতখানি সফল হয়েছে, কোন পর্যায়ে উঠতে পেরেছে, সেটাও পাঠক বিবেচনা করে দেখবেন।

রঙ্গলালের কবিতা বাঙালীকে অকস্মাৎ যবনবৈরী করে তুলেছিল বলে কখনো শুনি নি; ইকবালের কাব্য পাঞ্জাবী মুসলমানকে তার স্বধর্ম সম্বন্ধে শ্লাঘা অনুভব করতে সাহায্য করলো। এটা প্রশংসনীয়। কিন্তু এই স্বধর্মাভিমান যখন অন্য ধর্মকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে এমন কি বৈরী ভাবে দেখতে আরম্ভ করে—বিশেষ করে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর—তখন প্রতিবেশী ভারতীয় হিন্দুর প্রতি পাঞ্জাবীদের রাজনৈতিক আচরণও যে বৈরীভাবাপন্ন হবে সেটা নিতান্তই স্বাভাবিক। এমন কি পাঞ্জাবে প্রচলিত ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের পাঞ্জাবী মুসলিমও নিপীড়িত হয়। তবে এর মূলে আছেন ইকবাল—এ অপবাদ আমি কখনো শুনিনি।

দেশ বিভাগের পর পাঞ্জাবীদের ভিতর দেখা দিল দুই প্রকারের আত্মম্ভরিতা। পাকিস্তান পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র অতএব পাকিস্তানীরা বিশ্ব মুসলিমের প্রতিভূ, এবং যেহেতু তাঁরা প্রতিভূ, অতএব তাঁরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান; বলা বাহুল্য সেই সর্বশ্রেষ্ঠদের মুকুটমণি স্বভাবতই, অতি অবশ্যই পাঞ্জাবী মুসলমান। সূত্রটি সত্য কিন্তু তার থেকে যে দুতিনটি সিদ্ধান্ত হল সেগুলো যুক্তি ও ইতিহাসসম্মত নয়। কামাল

আতাতুর্ক স্বদেশ তুর্কীব কর্ণধাব হওয়ার পূর্বে সে দেশেব সুলতান ছিলেন বিশ্ব মুসলিমেব অধিনায়ক—খলিফা। তুর্কীব বর্তমান অধিবাসী সংখ্যা চাব কোটিব মত। খলিফাব আমলে মোটামুটি ঐ ছিল। সেকালে একাধিক দেশে ঢেব ঢেব বেশী মুসলমান বাস কবতেন। আব সংখ্যাগুরুত্বই যদি সর্বক্ষেত্রে স্পর্শমণি বা কষ্টিপাথব হয তবে পাকিস্তানীবা খলিফাব শূন্য আসনে তাদেব বাষ্ট্রজনক জিন্নাসাহেব, বা পবে জাতভাই পাঞ্জাবী গুলাম মহম্মদ কিংবা মদ্যপ লম্পট ইযেহিযাকে বসালে না কেন? অক্সফোর্ডেব অধ্যাপক সংখ্যা ৮৭০, ছাত্র ৬৯০০, মার্কিন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালযেব অধ্যাপক সংখ্যা ২১৭৪, ছাত্র ১০২৩৮। (এই অধ্যাপক-ছাত্র-শুমাবী ১৯৫০-১৯৫২-এব) তাবই জেবে হার্ভার্ড তো কখনো প্রাধান্য বা তাব ছাত্রাধ্যাপক অক্সফোর্ডেব চেযে শ্রেষ্ঠতব এমনতবো দাবি কবেনি। মানুষেব মাথা একটা, সে-মাথাতে যদি উকুন থাকে তবে সে-উকুন অসংখ্য।

পাঞ্জাবী মুসলমানবা পাক-ভাবতে শ্রেষ্ঠ—সর্বশ্রেষ্ঠ না—যোদ্ধা হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। পঞ্চাশাধিক বৎসব ধবে আমি সিভিল মিলিটাবি উভয শ্রেণীব পাঞ্জাবীকে চিনি এবং কস্মিনকালেও এই খ্যাতিতে বিশ্বাস কবিনি। ইযোবোপেব বিখ্যাত যোদ্ধা যুঙ্কেব (JUNKER) গোষ্ঠীব সঙ্গে আমাব পবিচয আছে এবং তাদেব এক পবিবাবে বেশ কিছুকাল আমি বাস কবেছি, ফবাসী অফিসাবদেব স্যাঁ সীব মিলিটাবি অ্যাকাডেমিব কযেকজনকে আমি চিনতুম, এক ইংবেজ কর্নেলেব কাছে প্র্যাকটিসহীন পুস্তকে সীমাবদ্ধ অ্যামেচাব বণনীতিতে আমাব হাতেখড়ি হয, আফগান অফিসাবদেব চিনতুম ঝাঁকে ঝাঁকে, আমাবই এক ছাত্র বাচ্চা-ই-সকওযেব "আ র্মি তে" হযে গিযেছিল বাতাবাতি "কর্নেইল" এবং এই সর্বাঙ্গ গোষ্ঠীব ভিতব সবচেযে দুর্দান্ত "ডাকু" অফিসাব ছিল জাবেব ফৌজে—ডুযেল লড়া সামান্য অসম্মানে আত্মহত্যা কবাটা যাদেব ছিল নিত্যদিনেব তুচ্ছ আচবণ। মত্তাবস্থায শেষবাত্রে অন্ধকাব ঘবে চেযাব টেবিলেব আড়াল থেকে একজন ডাকলে 'কু—উ—উ', অন্যজন ছুঁড়বে সেদিকে পিস্তলেব গুলি, এটা যাদেব সর্বপ্রিয খেলা (!) বাস্‌পাতিনহন্তা গ্র্যান্ড ডিউক ইউসপফ এদেবি একজন—এদেব কযেকজনকেও ভালো কবেই চিনতুম।

যে নাৎসিবা ইহুদীদেব পাইকাবী হাবে খুন কবে, তাদেব সঙ্গে সনাতন আর্মিব কোনো যোগ ছিল বলে শুনিনি—ব্যত্যযগুলো অন্যান্য অফিসাব কর্তৃক তীব্রকণ্ঠে তিবস্কৃত হযেছে; যাদেব ছিল তাবা হিটলাবেব স্বহস্তে নির্মিত নাৎসি পার্টিব সদস্য দ্বাবা গঠিত, হিটলাবেব নিজস্ব আর্মি এস এস—ব্ল্যাক কোট পবিহিত। কি সনাতন আর্মি, কি এস এস কেউই ধর্ষণকর্মে লিপ্ত হযনি। ন্যুবেনবের্গ মোকদ্দমায অপবাধেব দফাওযাবি যে ফিবিস্তি পেশ কবা হয সেটাতে ধর্ষণ নেই।

ইযেহিযাব একাধিক সেপাই দ্বাবা পব পব ধর্ষিতা অগণিত নাবী সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ কবেছে। অফিসাবদেব জন্য প্রতি কেন্টনমেন্টে নির্মিত হযেছিল ব্রথেল—অনেক মেযেকেই লুঠ কবে আনা হযেছিল মেযে-বোর্ডিং থেকে। ঢাকাস্থ সাধাবণ পাঞ্জাবী সেপাই ঢাকাব সামান্য বাইবে মুক্তি ফৌজেব ভযে এমনই মুক্ত-পাজামা হযে গিযেছিল যে আমাব নিকটতম "সৈযদ" আত্মজনকে অনুবোধ কবতো, তাবা যেন আল্লাব কাছে প্রার্থনা কবে ওদেব যেন মফঃস্বলে বদলি না কবা হয। এবং পবাজয অনিবার্য জানামাত্রই অফিসাব গোষ্ঠী প্রাইভেটদেব না জানিযে প্লেন, হেলিকপ্টাব, লঞ্চ চুবি কবে পালায—

এগুলোর অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন ছিল আহত খান সৈন্যদের হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য। এদের আমি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলি কি করে?

উভয় বাঙলা—"হুজ্জৎ-ই-বাঙ্গাল"

"হুজ্জৎ" কথাটা ন-সিকে খাঁটি আরবী এবং অর্থ "যুক্তি", "আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যুক্তি", "আপত্তি প্রকাশ করণ" ইত্যাদি। শব্দটির কোনো কদর্থ আরবীতে আছে বলে আমার জানা নেই। ইরানবাসীরা যখন শব্দটি তাদের ভাষা ফার্সীতে গ্রহণ করলো তখন তার স্বাভাবিক অর্থ তো রইলই, উপরন্তু শব্দটির একটা কদর্থ গড়ে উঠতে লাগলো। মানুষের স্বভাব এই যে, সে বিপক্ষের যুক্তিতর্ক স্বীকার করতে চায় না। তদুপরি বিপক্ষ যদি নিছক "যুক্তি" ভিন্ন অন্য কোনো প্রকারের বিবেচনা না দেখায়, যেমন ধরুন প্রমাণ করা গেল যে, সমাজে বিশেষ কোনো রীতি বা অনুষ্ঠান বহুকাল ধরে বিনা আপত্তিতে সর্বজনগ্রাহ্য, এমন কি সম্মানিত হয়েছে, যদ্যপি সে রীতি যুক্তিবিরুদ্ধ—এবং তখনো সে বারংবার একই যুক্তির দোহাই দিতে থাকে, তবে মানুষ স্বভাবতই বিরক্ত হয় এবং ব্যঙ্গ করে তাকে তর্কবাগীশের স্থলে "তর্কবালিশ", "দ্বন্দ্বপ্রিয়", "ঝগড়াটে" ইত্যাদি কটুবাক্যে পরিচয় দেয়। এবং মানুষের এই স্বভাবই তখন কটু থেকে কটুতব হতে হতে মূল "যুক্তি" (হুজ্জৎ) শব্দটাকে "অযথা তর্ক", "ভণ্ডাচরণের অজুহাত" কদর্থেও ব্যবহার করতে থাকে। বাঙলা এই শব্দটা ফার্সী থেকে গ্রহণ করার সময় এটাকে 'অহেতুক তর্কাতর্কি" অর্থে নেওয়ার দরুণ সেটার ওই "ঝগড়াটে" অর্থটাই জনপ্রিয় হয়ে গেল। তাই কবি হেমচন্দ্র বাঙালি মেয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বচেছেন "হুজ্জতে হারিলে কেঁদে, পাড়া করে জয"।

এব সব কটা অর্থই আমি মেনে নিয়েছি, কিন্তু বাঙালি কোষকারগণ যদিও "হুজ্জুতে" বলতে প্রধানত "কলহপ্রিয়" অর্থেই ধবে নিয়েছেন তবু বহুক্ষেত্রে যেখানে "হুজ্জুৎ" শব্দ ব্যবহার হয়েছে এবং হয তাব বাতাববণ, পূর্বপব, প্রাসঙ্গিকতা বিচার করে আমার মনে হয়েছে, শব্দটার অর্থ "ঝগড়াটের" চেযে ঢেব ঢের ব্যাপকতর। কোন স্থলে মনে হয়েছে এব অর্থ "জেদী" "একগুঁয়ে" "অবস্টিনেট" "দুর্দমনীয়", "কিছুতেই বশ মানতে চায না"। মূল আরবীতে লেখারম্ভে নিবেদন করেছি, শব্দটার একটা অর্থ আপত্তি প্রকাশ করা এবং "দৃঢ় কণ্ঠে মতদ্বৈধ প্রকাশ করা"। সরল বাংলায় সহজ অর্থ "বিদ্রোহ করা", দীর্ঘতর অর্থ "অন্যান্য দাবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা"।

হুতোম যখন তাঁর প্রাতঃস্মরণীয় নকশাতে একটি ফার্সীপ্রবাদ আংশিক অনুবাদ করে লিখলেন "সাধাবণ কথায় বলেন, 'হুনরে চীন' ও 'হুজ্জুতে বাঙ্গাল' তখন তিনি "হুজ্জুতে" কি বুঝেছিলেন বলতে পাববো না, কাবণ এই তুলনাহীন গ্রন্থখানার লেখক শ্রীতালাহুল ব্ল্যাক ইযারের অনুগত তাবেদার মোসাহেব এ-অধম সে-গ্রন্থখানা বটতলা থেকে শুরু কবে অনবদ্য শোভন সংস্করণ পর্যন্ত কতবার যে কিনেছে এবং তার কাছ থেকে কতবার ধারের ছলে চুরি হয়েছে সে-কথা স্মরণে আনলেই সে তৎক্ষণাৎ পরশুরামের মত শপথ গ্রহণ করে, এই গৌড়ভূমিকে সে বারংবার নিষ্পুস্তক-চৌর করবে—আমৃত্যু, এবং জন্মনি জন্মনি, প্রতি জন্মে।...এ-স্থলে কিন্তু লক্ষণীয় প্রবাদটির ফার্সী মূলরূপ "হুনর্-ই-চীন ওয়া হুজ্জৎ-ই-বাঙ্গাল"। অস্যার্থ 'স্কিল অব চায়না অ্যান্ড

রেবেঁলিয়াসনেস (অবসটিনেসি) অব বেঙ্গল'। কাজেই 'হুজ্জৎই-ই-বাঙ্গাল'-এর মধ্যবর্তী 'ই'টি 'হুজ্জুতে'-এর একার হয়ে বিশেষণে পরিবর্তিত হয়নি, যে-রকম 'চাষাড়ে, ঝগড়াটে, তামাটে'। এ-স্থলে "—ই—" টির অর্থ অফ। যে রকম মরহুম ফজলুল হকের জনগণদত্ত উপাধি ছিল 'শের-ই-হিন্দ' 'টাইগার অব্ বেঙ্গল'। বাঙলায় লেখা হত 'শেরে হিন্দ'। এই সূক্ষ্ম ব্যাকরণগত পার্থক্য না করলেও অর্থ দাঁড়ায়, চীন বিখ্যাত তার নৈপুণ্যের জন্য, বঙ্গদেশ তার পৌনঃপুনিক বিরোধিতার (একগুঁয়েমির) জন্য। নীচ ইতর অর্থে না নিলে 'ঝগড়াটে'ও বলা যেতে পারে। শান্তস্বভাব বিদ্যাসাগর যবে থেকে বিধবা বিবাহের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, সেই থেকে বড্ড ঝগড়াটে হয়ে গেছেন বললে তো 'ঝগড়াটে' শব্দটি এ-স্থলে উচ্চাঙ্গের প্রশস্তিসূচক।

অথচ সত্যার্থে বাঙালি বিদ্রোহী নয়,—অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী অর্থে যদি সে-শব্দ ব্যবহার করা হয়। পুনরায় দ্রষ্টব্য, 'বিদ্রোহী' শব্দটি কে ব্যবহার করছে তার উপর এর সদর্থ, কদর্থ দুইই নির্ভর করছে। মাদজীনিকে ইতালির তৎকালীন 'সরকার', দ্য গল-কে ভিশি 'সরকার' বিদ্রোহী, দেশদ্রোহী পদবী দিয়ে জনসমাজে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা দিয়েছে। ঠিক ওই একই ভাবে কবে, কবেকার সেই গুপ্তযুগ থেকে যুগ যুগ ধরে বলা হয়েছে 'অতঃপর বঙ্গদেশ' 'বিদ্রোহ' করিল। পাঠান যুগে বঙ্গদেশ নিত্যনিয়ত বিদ্রোহ করে ব'লে দিল্লী সরকার দুটি শব্দে এদেশের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত সে-শব্দদ্বয় আমি ভুলে গিয়েছি কিন্তু সৌভাগ্যবশত প্রতিবারে যে অখণ্ড শ্লাঘা অনুভব করেছি সেটা ভুলিনি এবং অর্থটাও ভুলিনি; মোটামুটি 'বিদ্রোহী জনপদ' "উৎপাত-ভূমি" "জঙ্গীস্থান" এই ধরনের কিছু একটা নিন্দাসূচক—অধম 'গুষ্টিসুদ্দু' সে-নিন্দা চন্দনেব মত শ্রীরাধার অনুকরণে সর্বাঙ্গে অনুলেপন করেছে। কিন্তু গভীর বিস্ময় ও ঘৃণা অনুভব করেছি এবং এখনো করি, যখন দেখি পাঠান মোগল ইংরেজ ঐতিহাসিকের দোহার গেয়ে বাঙালি—আবার বলছি বাঙালি প্রখ্যাত বাঙালি—ঐতিহাসিক অসঙ্কোচে মাছিমারা কেরানীর মত পুনঃ পুনঃ পুনরাবৃত্তি করেন, 'অতঃপর বঙ্গবাসী দিল্লীর বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ' ঘোষণা করলো।' পাঠান মোগল ঐতিহাসিকের মুখে এহেন বাক্য স্বাভাবিক! তারা দিল্লীশ্বরের অনুগত দাস, দিল্লী সরকারের সঙ্গে তাদের একাত্মানুভূতি বিচিত্র নয়। কিন্তু বাঙালি ঐতিহাসিক আজ পর্যন্ত বাঙালির দৃষ্টিবিন্দু থেকে বরঞ্চ দৃঢ় প্রত্যয়সহ বলি বিশ্বমানবের দৃষ্টিকোণ থেকে এই 'বিদ্রোহটার' রেজোঁ দেৎর স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ব হেতুটার অনুসন্ধান না করে নিন্দাসূচক 'বিদ্রোহ' শব্দটা প্রয়োগ করেন কেন?

বার্ধক্যজনিত ভারবহনক্ষম 'বিদ্রোহী' স্মৃতিদৌর্বল্যের উপব নির্ভর করে নিবেদন, বাদশা জাহাঁগির যখন শেষ 'বিদ্রোহী' বাঙালি পাঠানরাজ ওসমানকে আত্মসমর্পণ করার জন্য আদেশ পাঠালেন তখন ওসমান অতিশয় ভদ্রভাষায় উত্তরে যা লেখেন তার সারমর্ম : আপনি ভারতেশ্বর, আপনার রাজ্য সুবিস্তৃত, আপনার ক্ষমতা অসীম। আমি পড়ে আছি ভারতের এক কোণে। আমার স্বাধীনতা আপনার কোনো প্রকারের ক্ষতিসাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম। জঙ্গলের চিড়িয়াটাও স্বাধীন থাকতে চায়।

ওসমান বলতে চেয়েছিলেন, বনের পাখির স্বাধীনতা একান্তই স্বভাবজাত, নৈসর্গিক। সে-স্বাধীনতা কারো প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে না, পরধনলোভ সে-স্বাধীনতার অন্তর্নিহিত স্বধর্ম নয়। কিন্তু তার চেয়েও মোক্ষম সত্য প্রকাশ করেছেন যখন বললেন, আমি ভারতের এককোণে পড়ে আছি। তার পূর্ণ অর্থ কি?

আর্যজাতি তার সর্বপ্রাচীন আদিবাস কেন্দ্র থেকে নির্গত হয়ে উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে সঠিক কোন্ জায়গায় এসে আর অগ্রসর হল না সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু পূর্বদিকে বঙ্গদেশই যে তার সর্বশেষ অভিযান সীমান্ত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পূর্বদিগন্তে বাঙলাই শেষ আর্যভাষা।

এ বঙ্গদেশ ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা দ্বারা চিরকাল নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস। উত্তরে হিমালয়, পূর্বে আরাকান, দক্ষিণে সমুদ্র। অথচ পশ্চিম থেকে যুগ যুগ ধরে শক হূণ তুর্ক পাঠান মোগল ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে হানা দিয়েছে দলে দলে। তাদের চাপ পড়েছে পাঞ্জাবের উপর, সে-দেশের লোক চাপ দিয়েছে উত্তর প্রদেশের উপর—করে করে সর্বশেষ চাপ পড়েছে বাঙলার উপর। সে হতভাগা উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ কোনো দিকেই চাপ দিতে পারে না, পালাবার পথ পর্যন্ত তার নেই। সে তখন রুখে দাঁড়াবে না তো কি করবে? সেটা বিদ্রোহ নয়,—এমন কি সেটাকে স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যা দিলেও মোক্ষমতম তত্ত্বটি প্রকাশ পায় না। প্রতিবারেই তার রুখে দাঁড়ানোটা নিতান্তই, একান্তভাবে আপন জীবনরক্ষার্থে—ওসমানের সেই কোণ-ঠাসা ছোট্ট চিড়িয়াটিকে ধরতে গেলে সেও ঠোকর মারত। এ প্রচেষ্টাকে 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' 'মুক্তিযুদ্ধ' 'দেশাত্মবোধজাত আত্মাহুতি' ইত্যাদি গম্ভীর অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী সদৃশ উচ্চনামে ডাকুন আর নাই ডাকুন, ওটাকে কাশ্মীর কান্যকুব্জ পাঠান মোগল রাজন্যবর্গেব মুখপাত্র হয়ে 'বিদ্রোহ' নাম দিয়ে স্পর্শকাতর জনকে বিড়ম্বিত করবেন না। বলা বাহুল্য সে পরাজিত হয়েছে একাধিকবার। সে তখন দেখেছে বিজয়ী 'বীরবৃন্দ' তার পুত্র-ভ্রাতাকে হত্যা করেছে, অবলাদের ধর্মনষ্ট করেছে, তার ক্ষেত ফসল কেড়ে নিয়েছে, তার শেষ রক্তবিন্দু শোষণ করার পর ক্রীতদাসরূপে তাকে বিদেশের হট্ট-পণ্যালয়ে নির্বাসিত করেছে।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে হল বিলকুল একটা নয়া খেল। হঠাৎ কোথা থেকে হাজার হাজার বিহারী দারওয়ান, মিস্ত্রি বাবুর্চি ঢুকলো তাদের দেশে। এ-দেশ তারা যুদ্ধে জয় করে ঢুকলে সেটা অভূতপূর্ব অস্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হত না। তার উপর এল পাঞ্জাবী, পাঠান সুদূর পশ্চিম ভারত থেকে, খোজাবোর অতিদূর বোম্বাই করাচী থেকে। স্বাভাবিক পদ্ধতিতে আসতে হলে এদের যুদ্ধে পরাজয় করতে হত প্রথম হরিয়ানা রাজধানী দিল্লী, তারপর উত্তরপ্রদেশ, তারপর বিহার, সর্বশেষ বঙ্গদেশ। এহেন স্ববীর্যে করায়ত্ত সমুদ্রে সেতু নির্মাণ না করে দুর্ধর্ষ রাবণ, ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ অজেয় জগতে বীরগণকে আত্মনাশা সর্বনাশা সংগ্রামে পর্যুদস্ত না করে হনুমান এক লম্ফে বসে গেলেন রাবণের রাজসিংহাসনে!

বিনা যুদ্ধে যারা এল, এরা এক একটা আস্ত হনুমান—অবশ্যই ভিন্নার্থে অর্থাৎ মর্কটার্থে। না, মাফ চাইছি। মর্কটকুলকে অপমান করতে যাব কেন আমি? ওরা যারা এসেছিল তাদের যা বর্বর আচরণ তারা দেখালে কোনো মর্কট তো কস্মিনকালেও সে-বর্বরতার সহস্র যোজন নিকটবর্তী হতে পারেনি। পরবর্তীকালে জঙ্গীলাটের পদ অলঙ্কৃত করেনি।

গভীর বনানীর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে এক কাঠুরে। হাতে একটা কুড়োল। সদ্য কিনে এনেছে গভীর বনের ওপারের গাঁয়ে, কামার বাড়ি থেকে। তাই কুড়োলে এখনো কাঠের লম্বা হাতলটা লাগানো হয়নি। জল্লাদের হাতে তলওয়ার দেখলে যার মুণ্ডু কাটার বাদশাহী হুকুম হয়ে গিয়েছে, সে যেরকম কাঁপতে থাকে, লম্বা লম্বা আকাশছোঁয়া গাছগুলোও কাঠুরের হাতে নয়া কুড়োলের ঝকঝকে লোহা দেখে তেমনি দারুণ ভয় পেয়ে শিউরে উঠলো। সেটা প্রকাশ পেল তাদের বাতাসহীন আবহাওয়াতে। অকারণে ডাইনে বাঁয়ে দোলা লাগানো থেকে। মর্মর ধ্বনি জেগে উঠলো শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়। এই-এল এই-পড়ল কালবৈশাখী যখন বেগে ধেয়ে আসে বনস্পতিকে লণ্ডভণ্ড করে দেবার জন্য তখন যে-রকম প্রথম সবচেয়ে উঁচু গাছগুলো আসন্ন কালবৈশাখীর আভাস পেয়ে মর্মর রবে কিশোর গাছগুলোকে হুঁশিয়ারি দেয়, তারা কচি গাছগুলোকে ঠিক তেমনি বলে "খবরদার", বিনা বাতাসে বনে বনে ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে মর্মরে মর্মরে আসমানে মাথা হেনে হেনে কাঠুরের হাতে যে কুড়োল সেটা একে অন্যকে দেখিয়ে দিলে এবং তারা যে এত শত বৎসর ধরে শান্তিতে দিন কাটিয়েছিল তার যে সমাপ্তি আসন্ন সেটাও বুঝিয়ে দিলে।

তখন এক অতি বৃদ্ধ সুদীর্ঘ, ঈষৎ ন্যুব্জদেহ তরুরাজ চিন্তাপূর্ণ গম্ভীর মর্মরে সবাইকে বললে, "বৎসগণ! আস্ত কুড়োলের ওই লোহার অংশটুকু মাত্র আমাদের বিশেষ কোনো ক্ষয়ক্ষতি করতে পারবে না। হয়তো সামান্য একটু আঁচড় জখম আমাদের গায়ে লাগতে পারে—তাতে করে কাঠুরের কোনো লাভ নেই—খামোখা সে-মেহনত করতে যাবে কেন সে? মরণ আসবে আমাদের সেই কুক্ষণে যে-দিন আমাদেরই একজন কাঠ হয়ে ওই লোহার টুকরোটিতে ঢুকে হাতল হয়ে তাকে সাহায্য করবে। তখন ওই কুড়োল হবে বলবান। কাঠুরের কঠিন পেশীর সুপ্ত বল আমাদেরই একজনের মিতালীতে তৈরী হাতলের ভিতর দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে আমাদের দ্বিখণ্ডিত করবে।"

কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশে পূব পাকে নিযুক্ত পাঞ্জাবী বেহারীরা উঠে পড়ে লেগে গেলেন পূব পাকের বাঙালী মুসলমান হাতলের সন্ধানে। এই পাঞ্জাবী বুদ্ধ ও বেহারী বিচ্ছেদের জন্য কুঠার-লৌহদণ্ড হয়ে এলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানী চীফ সেক্রেটারি তাঁর প্রাতঃভর্ৎসনীয় গোধূলি কর্তনীয় নাম মি. আজিজ আহমদ। এঁকে রাজধানী পাঠিয়েছিল পূর্ব পাকে অখণ্ড পাকিস্তানের দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণের জন্য; তিনি পুঁতে গেলেন লক্ষাধিক টাইম-বম, যেগুলো ফাটলো চব্বিশ বছর পর।

তাঁর কীর্তিকাহিনী দীর্ঘ। আজ যে-রকম পূব পাকের "সেবা করে টিক্কা" খান জঙ্গীলাটের আসন পেয়েছেন, ঠিক তেমনি ইনিও একদিন পূব বাঙলার বাঙালী সিভিলিয়ানদের সর্বনাশ করে ও পশ্চিমাদের সর্বানন্দ দিয়ে অখণ্ড পাকের ফরেন মিনিস্টার অ্যাডভাইজার আরো কত কী হন। সে-সব থাক। আমার উদ্দেশ্য শুধু দেখানো—পার্টিশেন সত্ত্বেও উভয় বাঙলাতে যে চিন্ময়-বন্ধন ছিল সেটার সত্তানাশ মহতী বিনষ্টি কি প্রকারে করা যায় সেইটেই ছিল চীফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদের গুরসম রাজধানী-দত্ত সাধনার চিন্তামণি। স্বদেশী আন্দোলনবৈরী পুলিস কর্মচারী শামসুল

(আলম? হুদা? হক?) বন্দী দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে প্রথম দোস্তী জমিয়ে বিস্তর গোপন তথ্য বের করে ওইগুলো দিয়ে নির্মাণ করেন সরকার পক্ষের মারণাস্ত্র। তাই আসামীরা তাঁর উদ্দেশে বলতো, "ওহে শামসুল! তুমিই আমাদের 'শ্যাম' তুমিই আমাদের 'শূল'।" আজিজের বেলা অতখানি টায় টায় শিব্রামীয় পান তৈরি হল না বটে, তবু—। আজিজ-এর অর্থ প্রিয় মিত্র; আহমদ-কে আমেদ, ইংরিজিতে "ডী" অক্ষরযোগে আমেডও লেখা হয়। দি ফ্রেন্ড—আমেড—Ah! mad! কারণ প্রবাদ আছে, মূর্খ মিত্রের চেয়ে জ্ঞানী শত্রু ভালো। এস্থলে মূর্খ মিত্র না, পূব বাঙলার উন্মাদ মিত্র।

তাঁর প্রথম উদ্দেশ্য ছিল বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চা বিনাশ করা।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য : পূব বাঙলার লোক এ চর্চাতে অনুপ্রেরণা প্রায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে : বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্য বহুলাংশে পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হয়েছে। অতএব উভয় বাঙলার মাঝখানে নির্মাণ করতে হবে অভেদ্য লৌহ যবনিকা।

তৃতীয় উদ্দেশ্য : ওই রবীন্দর্‌নাথ নামক লোকটির ইমেজ সম্পূর্ণ বিনষ্ট করতে হবে; সেস্থলে জাজ্জ্বল্যমান করতে হবে পাঞ্জাবী কবি ইকবালকে, তাঁর ইসলামী জোশ-সহ।

কিন্তু তিনি সেই কাষ্ঠখণ্ড পান কোথায় যেটা দিয়ে তিনি কুঠারটি নির্মাণ করতে পারেন? উচ্চপদের বাঙালী মুসলমান সিভিলিয়ানদের সেক্রেটারিয়েট থেকে খেদিয়ে তাদেব পাঠানো হলো ডিস্ট্রিক্ট্‌গুলোতে—এঁদের বেশীর ভাগ এসেছিলেন শিলঙ সেক্রেটারিযেট থেকে, সিলেটেব লোক, হেথাকার রাইটারস বিল্ডিং থেকে উচ্চপদস্থ গিয়েছিলেন অল্প পরিমাণ, ছিলেনই অত্যল্প। পাঞ্জাবী বেহারীদের আধা ডজন প্রমোশন দিয়ে দিযে ভর্তি করা হল সেক্রেটারিয়েট—যতদূর সম্ভব। কিন্তু বাঙলার 'ক' অক্ষর দেখলেই এরা সামনে দেখে করালী। তদুপরি এদের যুক্তি "বাঙলাকো জড়সে উখাড়নেকে লীয়ে (উৎপাটন কবতে) আমরা এসেছি জিহাদ লড়তে, আর বলে কিনা, শেখো বাঙলা!"....আজিজ দেখলেন, এরা সরকারী কাজই চালাতে অক্ষম, এদের দ্বারা সূক্ষ্ম প্রপাগান্ডা, রবীন্দর্‌নাথের ইমেজ নাশ অসম্ভব। চাই বাঙালী।

মক্তবের মোল্লা, মাদ্রাসার নিম্নমানেব মৌলবী ও ছাত্র এলেন এগিয়ে। এঁরা বাঙলা প্রায় জানেনই না। উর্দুজ্ঞান যৎসামান্য বললেও বাড়িয়ে বলা হয়। এঁরাই ছিলেন উর্দুকে পূব পাকের রাষ্ট্রভাষারূপে চাপিয়ে দেবার তরে সবচেয়ে সরব। কলকাতা বা ঢাকার বি-এ এম-এ এক বর্ণ উর্দু জানেন না। অতএব উর্দু চালু হলে মাদ্রাসার ম্যাট্রিক মানের পড়ুয়া হয়ে যাবে কমিশনার, ক্লাস সিকসের ছোঁড়া হবে ডি-এম! "উর্দু জবান জিন্দাবাদ!"

এরা দিল পয়লা নম্বরী ধাপ্পা আজিজ এবং তাঁর প্যারা উর্দুভাষী ইয়ারদের। এরা কতখানি বাঙলা জানে, সে বাঙলা দিয়ে বাঙলা কৃষ্টি ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে কি না সেটা বোঝবার মত বাঙলা এলেম তো আজিজ গোষ্ঠীর নেই। এদেরই অনেকে পববর্তীকালে অল-বদবে দাখিল হয়ে দক্ষতার সঙ্গে খান অফিসারদের খবর যোগায়, কোথায় কোন্ বুদ্ধিজীবী বাস করে, কাকে কাকে খুন করতে হবে। আত্মসমর্পণের দিন অর্থাৎ ১৬ই ডিসেম্বর সকালবেলা যখন যুদ্ধ সমাপ্তি তথা আত্মসমর্পণের দলিলাদি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে বলে আমারই পরিচিত দুজন বাঙলা-প্রেমী বুদ্ধিজীবী, এতদিন পালিয়ে পালিয়ে থাকার পর নিশ্চিন্ত মনে আপন আপন পরিবারে ফিরে এসে এসে স্বস্তিতে ঘুমুচ্ছিলেন, তখন এই অ॰ বদব্‌রাই মা, স্ত্রী, শিশু পুত্রকন্যার সামনে দুই

হতভাগ্যকে বন্দুকের সঙ্গিন দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে চোখে পট্টি বেঁধে কোনো এক অজানা জায়গায় নিয়ে যায়। সেখানে নিষ্ঠুর অত্যাচারের পর তাঁদের গুলি করে মারে।

ওদিকে বাঙালী মুসলমান উঠে পড়ে লেগেছে, ভাষা আন্দোলন নিয়ে। তারা এটা চায় ওটা চায়, সেটা চায়। মারা গেল কিছু প্রাণবন্ত তেজস্বী ছেলে বন্দুকের গুলিতে। আন্দোলন তীব্রতর রূপ ধারণ করতে লাগলো প্রতিদিন।

অতিশয় অনিচ্ছায় পাক সরকার দুধের ছলে কিঞ্চিৎ পিটুলি-গোলা পরিবেশন করলেন "বাঙলা আকাডেমি" নীম দিয়ে। তার ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন গোটা কয়েক বিচ্ছু—বিসমিল্লাতেই। এঁরা সেই মোল্লা মুনসীর মত—যাদের কথা এই মাত্র নিবেদন করেছি—অত্যল্প শিক্ষিত নন। এঁরা বেশ কিছুটা শাস্ত্র জানেন, অল্পবিস্তর বাঙলাও লিখতে পারেন।

সরকার দিয়েছে টুইয়ে। এঁযা ধরলেন জেদ অ্যাকাডেমির সর্বপ্রথম কর্তব্য রূপে স্বীকৃত হয়ে গিয়েছে (কে কখন স্বীকৃতি দিল, জানিনে) বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে হবে আরবী ভাষায় লিখিত বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থের বাঙলা অনুবাদ করে! প্রতিবাদ করেছ কি মরেছ! তদ্দণ্ডেই তোমার নামে "কাফির" ফৎওয়া জারী হয়ে যাবে। অথচ ভেবে দেখনি আমাদের সাহিত্য পরিষদ যদি জন্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গে মেতে উঠতো বেদ থেকে আরম্ভ করে ঘেরন্ডসংহিতা আর খট্টাঙ্গ পুরাণের বাঙলা অনুবাদ করতে, তবে লুপ্তপ্রায় বাঙলা পাণ্ডুলিপি থেকে অমূল্য গ্রন্থরাজি উদ্ধার করে খাস বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতো কে? কোন্ পাষণ্ড অস্বীকার করবে সংস্কৃত এবং আরবী প্রচুর গ্রন্থ বাঙলাতে অনুবাদ করা অতিশয় কর্তব্য কর্ম? কিন্তু প্রশ্ন, সেইটেই কি সাহিত্য পরিষদ বাঙলা অ্যাকাডেমির সর্বপ্রধান ধর্ম?

পাঠক, তুমি বড় সরল। বিলকুল ঠাহর করতে পারো নি কার ঘুমন্ত হাত দিয়ে কে, কোন তৃতীয় ব্যক্তির তামাক চুপসে—না ভুল বললুম—সগর্বে খেয়ে গেল।

অ্যাকাডেমি পয়লা ধাক্কাতেই স্থির করলেন—একদম পয়লা ধাক্কাতে কিনা আমার সঠিক মনে নেই—কোন একাদশ ভলুমী আরবী কেতাব (হয়তো অত্যুত্তম গ্রন্থ) বাঙলায় বেরুবে বিশভলামী কলেবর নিয়ে। খাস বাঙালী সাহিত্যিক দল তদ্দণ্ডেই হয়ে গেলেন অপাঙ্‌ক্তেয় খারিজ বাতিল ডিসমিস। কারণ তাঁরা তো আরবী জানেন না। কোনো এক মৌলবী সাহেব অনুবাদ কর্মের জন্য দক্ষিণা পাবেন ষাট না সত্তর হাজার টাকা!

বেচারী ডিরেক্টর! সে আপ্রাণ লড়েছিল। শেষটায় বোধ হয় মৌলবীরাই তাঁর চাকরিটি খান।

আমি হলপ করতে পারবো না বিশ ভলুমের অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছিল কিনা। ক-ভলুম এ-তাবৎ বেরিয়েছে তাও বলতে পারবো না। এ-প্রতিবেদনে আরো ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের মৎলব কি ছিল সেটা বুঝিয়ে বলাটাই ছিল আমার উদ্দেশ্য।

উভয় বাঙলা—গজভুক্ত পিণ্ডিবৎ

বড় বড় শহরের লোক বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে বড্ডই বে-খবর। তাদের ভাবখানা অনেকটা যেন কুল্লে দুনিয়ার মেয়েমদ্দে যখন হুমড়ি কেয়ে আমাদের এই হেথায় জমায়েত

হচ্ছে, তখন তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আমরাই ইনট্রস্টিং, আমরাই ইমপর্টেন্ট। মা-কালী তো কালীঘাট ছেড়ে ধাক্কাধাক্কি খেয়ে ট্রামে-বাসে আসেন না আমার বাড়িতে, কিংবা মহরমের তাজিয়া-তাবুদ তো লাটবাড়ির বৈঠকখানায় বসে হা-পিত্যেস করেন না হুজুরকে এক নজর দেখবার তরে।...এ বাবদে সবচেয়ে বেশী দেমাক ধরে প্যারিস। আর ধরবেই না কেন? যে মার্কিন মুল্লুক দুনিয়ার যে দেশকে খুশী রুটীটা আণ্ডাটা বিলিয়ে দেয়—মতলবটা কি সব সময় মালুম তক হয় না—সেই দেশের লোক হন্দমুন্দ হয়ে ছোটে ছুটি কাটাতে, প্যারিসের তাজ্জব তাজ্জব এমারত-তসবীর দেখতে, কুল্লে জাতে ভর্তি নানান রঙের নানা ঢঙের খাপসুরৎ খাপসুরৎ পটের বিবিদের মোলায়েম-সে-মোলায়েম হাত থেকে সাকীর ভরা পেয়ালা তুঁলে নিতে আর তারি সঙ্গে খাপ খাইয়ে খৈয়ামের স্মরণে বেখাপ্পা খাদে গান জুড়তে—

বিধি-বিধানের শীত, পরিধান
প্যারিসে-আগুনে দহন করো।
আয়ু বিহঙ্গ উড়ে চলে যাবে
হে সাকী, পেয়ালা অধরে ধরো। (অনুবাদক?)

এ-বাবদে আমরা, কলকাত্তাইয়ারা ঘোড়ার রেসে মোটেই 'ব্যাড থার্ড' নই, 'অলসো ব্যান' বললে তো আমরা রীতিমত মান-হানির মোকদ্দমা রুজু করবো।

আমরা ভাই ঢাকা তথা পূব-বাঙলার সাহিত্য-চর্চা সম্বন্ধে চিরকালই কিঞ্চিৎ উদাসীন ছিলুম—দেশবিভাগের পর তো আব কথাই নেই। আর হবই না কেন,—রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র সবাই তো শেষ পর্যন্ত কলকাতাতেই থানা গেড়েছেন। এস্তেক যশোরের 'বাঙাল' মাইকেল।

পার্টিশনের পরে অবস্থাটা খারাপ হল। কবি জসীমউদ্দীন, চিত্রকর জয়নুল আবিদীন, উদীয়মান কবি/সাহিত্যিক আবুল হোসেন, শওকৎ উসমান, গোলাম মুরশিদ, পণ্ডিত শহীদুল্লা—বোধ হয় পূর্বেই চলে গিয়েছিলেন—মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের শদতাত্ত্বিক আব্দুল হাই যাঁর অকালমৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, একাধিক মহিলা কবি আরো বহু বহু সাহিত্য-সঙ্গীত-কলাসেবক চলে গেলেন পূব বাঙলায়। এবং এঁরা যে পেনসেন নেওয়ার পর এবং/অথবা বার্ধক্যে, বিশেষ করে যাঁদের জন্মভূমি পশ্চিম বাঙলায়—তাঁরা যে সে সব জায়গায় বা কলকাতায় ফিরে এসে, মহানগরীর সুযোগ সুবিধে নিয়ে বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতর সেবা করতে পারবেন সে-আশাও রইল না। ...বলা বাহুল্য আমার দেওয়া সাহিত্য-সেবীদের এ ফিরিস্তি লজ্জাকব অসম্পূর্ণ।

পূব-বাঙলার যে সব লেখক ও অন্যান্য কলাকার এখানে রয়ে গেলেন ও ওপার বাঙলা থেকে যাঁরা এলেন, তাঁদেব অধিকাংশই হিন্দু। কেউ কেউ পাঞ্জাবীকণ্টকিত পাক-সরকার কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়ে পূব-বাঙলা ত্যাগ করতে বাধ্য হন, কিন্তু এঁদের সকলেই আপন আপন সহকর্মীদের প্রতি এবং মাতৃভূমি পূববাঙলার প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। ৭১-এর নয় মাসে সেদেশে বুদ্ধিজীবী নিধনে এঁদের অনেকেই ভ্রাতার চেয়ে প্রিয়তম আত্মজন হারিয়েছেন। দার্শনিক গোবিন্দবাবু এবং তাঁরই মত একাধিক অধ্যাপকের নিষ্ঠুর হত্যা আমাকে ও তাঁদের অগণিত অনুরক্ত জনকে কী গভীর বেদনা দিয়েছে, তা প্রকাশ করার ক্ষমতা বিধি আমাকে দেননি।

পূর্বোক্ত দুই পক্ষই—এ-বাঙলা থেকে যাঁরা ও-বাঙলা গেলেন এবং ওদিক থেকে

এদিক এলেন, এঁরাই ছিলেন উভয় বঙ্গের সর্বপ্রধান চিন্ময় বন্ধন, মূর্তিমান সেতু, পিণ্ডির পাশবিক বৈরী ভাব ছিল প্রধানত এঁদেরই প্রতি। তাই সে নির্মাণ করেছিল লৌহযবনিকা প্রস্তর-প্রাচীর। অতীতেও নির্মিত হয়েছিল নিশ্চয়ই, নইলে নিউটন আক্ষেপ করলেন কেন—

হায়রে মানুষ
বাতুলতা তব
পাতাল চুমি :—
প্রাচীর যত না
গড়েছো, সেতু তো
গড়োনি তুমি!

এই দুই পক্ষই সবচেয়ে বেশী খবর নিতেন উভয় বাঙলার সাহিত্য-চর্চার। এঁদের কেউ কখনো অপর বাঙলায় যাবার দুরূহ অতএব বিরল সুযোগ পেলে সেখানে রাজ-মর্যাদায় আপ্যায়িত হতেন। পূব-বাঙলা স্বাধীন হওয়ার পূর্বে আমি ১৯৭০-এ যাই ঢাকা। মরহুম শহীদুল্লা তখন হাসপাতালে। ঢাকায় প্রকাশিত পুস্তক ও কলকাতায় প্রকাশিত একাধিক পুস্তিকা তিনি ৬৯-এই মমাগ্রজের গৃহে সেই বৃদ্ধ বয়সে স্বয়ং এসে আমাকে সস্নেহ আশীর্বাদসহ উপহার দিয়ে যান। (তাঁর কৃতী পুত্রেরও একাধিক পুস্তকও তিনি তার সঙ্গে যোগ দেন) আঞ্চলিক অভিধানের প্রথম খণ্ড, হাফিজের অনুবাদ, চর্যাপদের আলোচনা কী না ছিল তাঁর ত্রিপিটকপূর্ণ সওগাতে! গুণী আবদুল কাদের যে কী পরিশ্রম, অন্বেষণ ও অধ্যয়নান্তে কাজী নজরুল ইসলামের সম্পূর্ণ গদ্য-পদ্য সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন, সেটা বর্ণনাতীত। অনবদ্য এই মণিমঞ্জুষা। সম্প্রতি কাগজে দেখলুম, বাংলাদেশে প্রকাশিত তাবৎ পুস্তক বিক্রয়ের জন্য এখানে একাধিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ত্বরা করুন, ত্বরান্বিত হোন, গৌড়-সাহিত্যামোদিগণ! সর্বশেষ অঙ্গবস্ত্রটি অকাতরে চক্রবৃদ্ধিহারে কুসীদার্পণ প্রতিশ্রুতিসহ সমর্পণ করে প্রয়োজনীয় কার্ষাপণ সংগ্রহ করুন—অমূল্য এই গ্রন্থাবলী ক্রয়ার্থে। 'বিলম্বে হতাশ হইবেন'—বিজ্ঞাপনের অতিরঞ্জিত অত্যুক্তি নয়, সকল শাস্ত্রবিচারদক্ষের অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী।

মৌলিক গ্রন্থ হিসাবে বিজ্ঞানের রাজ্যে এমন একখানা পুস্তক ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে, যার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন বই উভয় বাঙলায় পূর্বে বেরোয়নি, আগামী শত বৎসরের ভিতর বেরুবে কিনা সন্দেহ। পণ্ডিত আব্দুল জব্বর রচিত এই 'তারা পরিচয়' গ্রন্থখানিকে 'শতাব্দীর গ্রন্থ' বলে তর্কাতীত দার্ঢ্যসহ পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়। এ-গ্রন্থের উল্লেখ আমি পূর্বেও করেছি, ভবিষ্যতে সবিস্তর বর্ণনা দেবার আশা রাখি। ...কাজী কবির গ্রন্থাবলী ও এ-গ্রন্থ উভয়ই প্রাগুক্ত আব্দুল কাদের যখন 'বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের' কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন, তখন তাঁরই উৎসাহে বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

এতক্ষণে পাঠক নিশ্চয়ই সম্যক হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার আপ্রাণ চেষ্টা দিয়েছিলেন, বাঙলা অ্যাকাডেমি, 'বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানই যেন জন্মগ্রহণ না করতে পারে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোড়াতে ক্ষীণ কণ্ঠে বাঙলার ভাষা ও সাহিত্যের জন্য যে সব দাবি উত্থাপন করা হয়, সেটাকে ঠেকাবার জন্য স্বয়ং মি. জিন্না ঢাকায় "তশরীফ" আনেন এবং ছাতির খুন বেকার বেফায়দা ঠাণ্ডা পানিতে বরবাদ অথবা শীতল জলে অপচয় করলেন—যেটা

বরফে বেশী কাছাকাছি সেইটেই বেছে নিন—সেই দাবি প্রতিদিন কঠিনতর ভাষায় এবং সর্বশেষে রুদ্ররূপ ধারণ করলো। আমরা এ বাঙলায় বসে তার কতটুকু খবরই বা রাখতে পেরেছি। শুধু জানি, কয়েকটি তরুণ দাবি জানাতে গিয়ে নিরস্ত্র অবস্থায় নিহত হল—শহীদের গৌরব লাভ করলে।

কিন্তু সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন অ্যাকাডেমি, বোর্ড, এমন কি এশিয়াটিক সোসাইটি অব ইস্ট পাকিস্তান, যাদুঘর (এরই নবীন হর্ম্যের প্রস্তর স্থাপনা কালে গবর্নর মেনায়েম খান "যাদু" শব্দটা সংস্কৃত মনে করে তীব্র কণ্ঠে উষ্মাভরে গোসসা জাহির করেন) সর্ব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা, ভিতর থেকে, সরকারের তথাকথিত 'ইসলামী তমদ্দুম" (ইসলামী সভ্যতা—শব্দার্থে নাগরিকতা) দ্বারা অনুপ্রাণিত নির্দেশ সাবোটাজ করেছেন অমান্য করে, টালবাহানা দিয়ে ফন্দিফিকির মারফত বানচাল করে দিয়ে । এ সংগ্রামের কাহিনী খুদ ঢাকাবাসীদের মধ্যেই জানেন অল্প লোক।

প্রাগুক্ত "রাজমর্যাদায় আপ্যায়নের" ফলে আমার মত অকিঞ্চিন জন পরিচিত, সম্পূর্ণ অপরিচিত লেখকদের কাছ থেকে প্রায় ষাটখানা পুস্তক-পুস্তিকা উপহাব পায়। আমাকে (এ-সব সজ্জন) ভ্রমবশত পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যচর্চার অন্যতম প্রতীকরূপে ধরে নিয়েছিলেন, এবং সে-চর্চার প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ছিল। "দেশ" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় বলতে পারবেন, কত না দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর, লৌহযবনিকাব ছিদ্র দিয়ে তাঁর কাছে পৌচেছে পূব বাঙলার বই সমালোচনার জন্য—চব্বিশটি বৎসর ধরে। পশ্চিম বাঙলার স্বীকৃতি ছিল তাঁদেব হার্দিক কামনা।

লৌহযবনিকাপ্রান্তে পুস্তকগুলি বাজেযাপ্ত হয়ে যাবাব ভয তো আছেই, তদুপবি পুস্তক স্মাগলিং নামক পাপাচাব প্রচেষ্ট ব্যক্তির যে নূন্যতম শাস্তি—সেটা অর্থদণ্ড। সীমান্ত অতিক্রম করবার সময য়ে বিংশতি মাত্র পাকিস্তানী মুদ্রা আইনত অনুমোদিত, সে-মুদ্রা কটি অশ্যই ওই অর্থদণ্ড পরিশোধ করার জন্য অপ্রচুর। ফলং? শ্রীঘর বাস।

কিন্তু আল্লা মেহেরবান। সীমান্তেও কিছুসংখ্যক বঙ্গসন্তান ছিলেন যাঁরা পূর্বোক্ত বাষ্ট্রাদেশ লঙঘনকাবীদের ন্যায় সুচতুর এবং সদৃশ পাপী-তাপীদের প্রতি সদয়। তাই মমাগ্রজদের লিখিত দুচারখানা পুস্তক বৈতবণীব এ-কূলে আনতে সক্ষম হয়েছি—প্রতিবাব।

উভয় বাঙলা—স্বর্ণসেতু রবীন্দ্র সঙ্গীত

এ বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, এক বাঙলা আবেক বাঙলা থেকে যদি পাকেচক্রে কোনোদিন স্নেহপ্রীতির ভুবনে দুই দিনান্ত চলে যায়, এস্তেক ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে মোহনবাগানেব ফুটবল খেলা বন্ধ হযে যায়, ঘটিমাত্রই ইহসংসারে বাঙাল নামক যে একটা প্রাণী আছে সে তত্ত্ব বেবাক ভুলে গিয়ে তাকে হাইকোর্টটা পর্যন্ত দেখাতে রাজী না হয়, এবং পদ্মাব ওপারে কুট্টির সঙ্গে ঘটির ভাড়া নিয়ে দর কষাকষি শুনে ঘোড়াটা যদি না হাসে, তবু একটি বেরাদরী রেওয়াজ দুই বাঙলা থেকে কিছুতেই লোপ পাবে না।

রবীন্দ্র সঙ্গীত।

কেন্দ্রীয় পাক সরকার উভয় বাঙলায় চলাচলের পথ প্রতিদিন দুর্গমতর করতে লাগলো—আন্তর্জাতিক জনসমাজে নিতান্ত হাস্যাস্পদ হবে বলে বনগাঁ-যশোরের সঙ্কীর্ণ

পথটিকে কণ্টকাকীর্ণ অগম্য করার জন্য দু-কান-কাটার মত বে-আব্রু বে-হায়া হতে তার বাঁধলো—খবরের কাগজ, বই-পত্র গ্রামোফোন রেকর্ড এমন কি আমাদের পরম শ্লাঘার "ট্রপিকাল স্কুলের" গবেষণাজাত অমূল্য তত্ত্ব তথ্য যেগুলো পূর্ব বাঙালীর পক্ষে নিরঙ্কুশ অর্জনীয় যার স্থান নেবার মত দম্ভাধিকার প্রাচ্য প্রতীচ্যের কোনো প্রতিষ্ঠানই করতে গিয়ে বিশ্ব-বৈদ্য-সমাজে হাস্যাস্পদ হতে চাইবে না, সব-কিছুরই আদানপ্রদান নিরন্ধ্র বন্ধ করে দিল তখনো কিন্তু কলকাতার একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পূব বাঙলার যোগসূত্র ছিন্ন করতে পারলো না। দিনের পর দিন, গভীর রাত্রি অবধি কলকাতা বেতার, পরে একেবারে খিড়কি দরজার গোড়ায় জুটলো আরেক বৈরী, আগরতলা-কেন্দ্র রবীন্দ্র সঙ্গীত গায় যন্ত্রে সুর শোনায় রেকর্ড বাজায় পণ্ডিত পঙ্কজ সে-সঙ্গীত শেখান, অনুরোধের আসরে অকাতরে—আমার পাপমনে কেমন যেন একটা সন্দ আছে পূব বাঙালীর অনুরোধের প্রতি কলকাতা বেতারের একটু বিশেষ চিত্তদৌর্বল্য ছিল—একই রেকর্ড দশবারের স্থলে বিশ বার বাজিয়ে কলকাতা বেতার যে প্রতিহিংসা-বিষে জবজবে হৃদয় দিয়ে বিঘ্নসন্তোষীর কৈবল্যানন্দ, বিজয়ী বীরের আত্মপ্রসাদ অনুভব করে নিজেকে কৃতকৃতার্থ চরিতার্থ মনে করতো। কারণ কলকাতা বেতার অবগত ছিল, পিণ্ডি-ভাতারের হুকুমে ঢাকা বেতারের রাধারাণীর তরে তখন রবীন্দ্র সঙ্গীত কানুর পীরিতিব মত নিষিদ্ধ পরকীয়া প্রেম। কলকাতা বেতার তখন বললে, "বটে! আচ্ছা দেখা যাবে, তুমি কালাচাঁদের বাঁশীর সুরটি ঠ্যাকাও কি কৌশলে?"

ধ্বনি মাত্রই ঠেকানো বড় কঠিন। কারণ ধ্বনির আসন আত্মন্-ব্রহ্মাণের পরেই।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে রাজর্ষি জনক ও ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে আছে, জনক শুধোলেন, "মানুষের জ্যোতি কি?" অর্থাৎ তাদের বেঁচে থাকা, কাজকর্ম করা কিসের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়? যাজ্ঞবল্ক : "সূর্য।" জনক : "সূর্য অস্ত গেলে?" "চন্দ্রমা।" "সূর্য চন্দ্র উভয়ই অস্তমিত হলে?" "অগ্নি।" "সূর্যচন্দ্র অস্তমিত অগ্নি নির্বাপিত তখন কোন্ জ্যোতি পুরুষের সহায়ক হয়?—অস্তমিত আদিত্যে, যাজ্ঞবল্ক্য-চন্দ্রনসস্যস্তমিতে শাঞ্জেগ্নৌ কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষ?"

"ধ্বনি। এই জন্যই যখন নিজের হাত পর্যন্ত ভাল করে দেখা যায় না, তখন যেখানে কোনো শব্দ হয়, মানুষ সেখানে পৌঁছতে পারে।"

কলকাতা বেতারের ধ্বনি-তরঙ্গ সমস্ত পূব বাঙলায় দিনযামিনী সে-দেশের বাতাবরণে সঞ্চারিত ছিল। এ ধ্বনি-তরঙ্গকে যন্ত্র সাহায্যে কোনো অবস্থাতেই বিকৃত অবোধ্য করা যে যায় না, তা নয়। যাজ্ঞবল্কও জনকের শেষ প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, শব্দও যদি নিরুদ্ধ হয়ে যায় তবে "আত্মাই" তখন তার "জ্যোতি"; আত্মজ্যোতি প্রসাদাৎ সে তখন সর্ব কর্ম সমাধান করে। কিন্তু ধ্বনিতরঙ্গ সংগ্রামে পিণ্ডি নামতে সাহস করেনি। কারণ পূব বাঙলার চতুর্দিকে ঘিরে রয়েছে আমাদের যথেষ্ট বেতার-কেন্দ্র। আমাদের ভাণ্ডারে আছে প্রচুরতর। পিণ্ডি পূব বাঙলা থেকে আমাদের একটা কেন্দ্র জ্যাম করতে না করতেই আমরা তাদের ছটা কেন্দ্রকে সম্পূর্ণ অবোধ্য করে দিতে পারব। ফলে পূব বাঙলা করাচী-পিণ্ডি থেকে প্রেরিত সংবাদ তো পুনঃপ্রচার করতে পারবেই না, তদুপরি নিজের দেশের সংবাদ সরকারি হুকুম কিছুই বেতার মারফৎ বিকিরণ করতেও পারবে না। এমন কি মিলিটারির গোপন বেতারে ফরমান আলীর ফরমান পর্যন্ত অনায়াসে রুদ্ধশ্বাস করা যেত।

খৃষ্ট বলেছেন, মানুষের পক্ষে রুটিই যথেষ্ট নয়। তার হৃদয়-মনেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে।

বহু অভিজ্ঞতার পর আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, পূব বাঙলার তরুণ-তরুণী, যুবক যুবতী আমাদের তুলনায় আজ বেশী রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়। এদের এবং আমাদের অনেকের কাছেই হয় তো কবির ছোট গল্প প্রিয়তর। কিন্তু পূব বাঙলায় একদিন এমন দুঃসময় এল যখন কবির কোনো পুস্তকই সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। শুনেছি, কোন্ এক হিন্দু কবি মুসলমান রমণী বিয়ে করার পর জন্মভূমি কাশীতে যখন ফিরলেন তখন পূজারী-পুরোহিত সমস্ত মন্দিরের দ্বার বন্ধ করে দিল। কবি নিরাশ হলেন না। মা গঙ্গার উদ্দেশে বললেন, তোমাকে মা রুদ্ধদ্বার করতে পারে এমন লোক আজও জন্মায়নি। কবি তাঁরই উদ্দেশে স্তোত্র রচনা করলেন।

· হুবহু রবিতীর্থে যাত্রা করার জন্য সর্ব পন্থা যখন রুদ্ধ হয়ে গেল তখন রইল শুধু কলকাতা বেতারের রবীন্দ্র সঙ্গীত। সেই হয়ে গেল তাদের সুরধুনী (যতদূর জানি ধুনী শব্দের অর্থ নদী), গঙ্গা। কবির গানেও আছে,

'হাটের ধূলা সয় না যে আর
কাতর করে প্রাণ।
তোমার সুর-সুবধুনীব ধারায়
করাও আমায় স্নান।'

হুবহু একই পদ্ধতিতে হয়ে গেল সমস্যার সমাধান—আংশিক, কিন্তু মধুর। পিণ্ডিব রাজা রাজর্ষি জহ্নু নন যে সে-সুর-ধুনী পান করে নিঃশেষ করবেন।

আরো একাধিক কারণ, যোগাযোগ, জনপদসুলভ সহজাত হৃদয়াবেগ রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি পূব বাঙলায় আসক্তি নিবিড়তর করে তুলেছে, যেমন ধরুন সঙ্গীতজগতে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতম উপহার—তাঁর বর্ষার গান। শান্তিনিকেতন বীরভূমে দীর্ঘ গ্রীষ্মের খরদাহনে দগ্ধপ্রায় বিবর্ণ জীবন্মৃত আতাম্র তৃণপত্র যখন মুহ্যমান বিষণ্ন বিশ্ব যখন নির্মম গ্রীষ্মের পদানত, শুষ্ক কানন শাখে ক্লান্ত কপোত ডাকে, এবং রজনী নিদ্রাহীন দীর্ঘ দগ্ধ দিন, তৃষাতপ্ত জনপদবধূ কাতর কণ্ঠে রুদ্রকে অনুনয় জানায়, সম্বরো এ চক্র তব, একচক্রা রথের ঠাকুর! রক্তচক্ষু অগ্নি-অশ্ব মূর্ছি পড়ে, আর তারে ছোটাবে কতদূর—সে-সময়কার শুষ্ক কালবৈশাখীর নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ, তার দু-তিন দিন পরেই যখন নামে প্রবল বেগে বারিধারা, আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে যখন বৃষ্টি নামল, সকালে উঠে দেখি, এ কি কখন বাদল-ছোঁওয়া লেগে মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি সবুজ মেখে মেখে'—অকস্মাৎ এই কল্পনাতীত পরিবর্তন পূব বাঙলায় রাজশাহী বারেন্দ্রাঞ্চল, আরো দুচারটি জায়গা ছাড়া অন্যত্র বিরল। কিন্তু পূব বাঙলার লোক বর্ষার যে রূপেব সঙ্গে সুপরিচিত—'ছাড়ল খেয়া ওপার হতে ভাদ্রদিনের ভরা স্রোতে, দুলছে তরী নদীর পথে তরঙ্গবন্ধুর', কিংবা হয়তো 'কে ডাকিছে বুঝি মাঝি রে, খেয়াপারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে, কারণ দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে যখন পদ্মা তরঙ্গে তরঙ্গে মেতে ওঠে তখন কি করে গাই, 'পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে বিনা কাজে সময় কাটে, পাল তুলে ঐ আসে তোমার সুরের তরী'—খেয়া ঘাট, ভরা পাল তুলে পাগল-পারা ছুটেছে তরী তার সঙ্গে কত না সুখ কত না দুঃখের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়—'সে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে

সিন্ধু পারে আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে হয়েছে আমার চেনা—' সঙ্গে সঙ্গে যেন এক কঠোর আঘাতে বুকের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়, কবি কী সামান্যতম ইঙ্গিতে স্মরণ করিয়ে দিলেন তিনি তাঁর কত না প্রিয়জনের অকারণে-অকালে তার পড়ল যখন ডাক তখন তাকে খেয়ায় একান্ত একাকী উঠতে দেখেছেন শোকাতুর চিত্তে, অশ্রুহীন শুষ্ক নয়নে। এখন তিনি সে-খেয়ার সঙ্গে বেদনা বেদনায় এতই সুপরিচিত যে তিনি যেন প্রস্তুত হয়ে আছেন, ভাবছেন—নিয়ে যাব ইহার উত্তর নিজ হাতে করে আমি ওই খেয়া পার করি ভয়!

রবীন্দ্র-স্পেশালিস্ট আমি নই, কাজেই শপথ করতে পারবো না, কবির বর্ষাগীতিতে পূব বাঙলার অধিকতর বর্ণনা আছে। কিন্তু একথা সত্য খেয়া ঘাট, ভাসাও তবণী হে কর্ণধার, হে বিরাট নদী, এ-সব মোতীফ ভাটিয়ালি গীত মারফত বহুকাল ধরে পূববঙ্গীয়ের নিত্য-দিনের সখা। কভু বা পার্থিবার্থে—চিন্তা-মণির সন্ধানে সে ও-পারে যেতে চায়, কভু বা সে নদীকে দেখে বৈতরণী রূপে। গহীন গাঙের নাইয়া, তুমি যদি হও গো নদী, তুমি কেবা যাও রে, লাল নাও বাইযা, একখান কথা শুন্যা যাও নীল বৈঠা তুল্যা, মানিকপীর ভবনদীপার হইবার লা—এসব দিযে গড়া তার হৃদয। সেইখানেই তো রবির প্রথম আলোর চরণধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তারা জেগে উঠে সাডা দেবে—এতে আর কিমাশ্চর্যম?

উভয় বাঙলা—ফুরায় যাদেরে ফুরাতে

মেদিনীপুর, বাঁকুড়ায় অর্থাৎ রাঢ়ভূমির পশ্চিমতম প্রান্তে, অতএব উভয বাঙলাবই অস্তাচলে বসবাস করার সৌভাগ্য থেকে আমি বঞ্চিত, কিন্তু বাল্যে ববীন্দ্রনাথেব একনিষ্ঠ সেবক ঈশ্বর রাজেন বন্দ্যো, নন্দলাল, অবন ঠাকুরেব শিষ্য ঐ পবিবাবেব চিত্রকর শ্রীযুত সত্যেন, শাস্তিনিকেতন লাইব্রেবির আজীবন একনিষ্ঠ সেবক ঈশ্বব সত্য, পরবর্তীকালে তাঁর কন্যা উভয় বঙ্গের গণমোহিনী গায়িকা, স্বয়ং পূর্ববঙ্গের প্রতি সবিশেষ অনুরক্তা শ্রীমতী কণিকা মোহর, এঁদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ কবেছি কযেক বৎসব ধরে। শ্রীযুত সত্যেনকে কলাজগতের বিস্তর রসগ্রাহী চেনেন সবল, নিরলঙ্কাব, দৈনন্দিন জীবনের সহজ চিত্রকর রূপে, কিন্তু তাঁকে আমি পেয়েছিলুম উপগুরুর ছদ্মবেশে। আমার খাজা বাঙলা উচ্চারণ তিনি মেবামৎ করার চেষ্টা দিতেন কথাচ্ছলে, আমাকে অযথা আত্মসচেতন না করে দিয়ে। এবং একটু মৃদু হাস্য যোগ দিযে বলতেন, "বাঁকড়োয় আমরা কিন্তু বলি....।"

পূর্বতম প্রান্ত সিলেট-কাছাড় আমি ভালো করেই চিনি। দুই অঞ্চলে নিশ্চয়ই নানা বিষয়ে পার্থক্য আছে। বস্তুত প্রথম দর্শনে অনভিজ্ঞজনেব চোখে পার্থক্যগুলোই ধবা পড়বে বেশী। কিন্তু একটু গভীবে তলালেই চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই হৃদযঙ্গম করে ফেলবেন যে সাদৃশ্যটাই ঢেব বেশী। এবং এত বেশী যে ঠিক ঐ কাবণেই পার্থক্যগুলো আরো যেন স্পষ্টতর হয। সাদৃশ্যের স্বচ্ছ জলে পার্থক্যের একটি মাত্র কালো চুল চোখে পড়ে। আবিল আবর্তে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড লুকিয়ে থাকে। গুণীরা তাই বলেন, সাধুজনের অতি সামান্য পদস্খলন নিয়ে পাঁচজন সমালোচনা করে, অসাধুর পর্বতপ্রমাণ পাপাচার সম্বন্ধে মানুষ অপেক্ষাকৃত উদাসীন।

কথাপ্রসঙ্গে দুই বাঙলার পার্থক্যের প্রতি যদি আমি ইঙ্গিত করি তবে উভয় বাঙলার পাঠক যেন সাদৃশ্যের মূল তত্ত্বটা ভুলে গিয়ে অনিচ্ছায় আমার প্রতি অবিচার না করেন।

মহানগরী কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের সুদূরতম প্রান্তে, এমন কি পূব বাঙলারও কিয়দেশে যে প্রভাব বিস্তার করে সে তুলনায় মফঃস্বলের উপর ঢাকার প্রভাব যৎসামান্য। তদুপরি কলকাতা যে শুধু ঢাকার তুলনায় বহুলাংশে বৃহত্তর তাই নয়, বোম্বাই মাদ্রাজ দিল্লীকেও অনায়াসে বহু বিষয়ে অপাংক্তেয় রেখে সে চীন জাপানের সঙ্গে পাল্লা দেয়। কিন্তু সে আলোচনা আরেকদিন হবে। উপস্থিত আমার বক্তব্য, যদিও কলকাতা পরশু দিনের আপস্টার্ট নগর তবু ধীরে ধীরে তার একটা নিজস্ব নাগর্য বা নাগরিকতা গড়ে উঠছে। নাগরিক বলতে একটা শিষ্ট, ভদ্র, রসিক এবং বিদগ্ধজনকে বোঝাত। এমন কি চলতি কথায়ও নাগরপনা, নাগরালি এবহং শহরবাসী অর্থে নগুরে, আজকাল বলি শহুরে, এককালে খুবই প্রচলিত ছিল। উর্দুতে কৃষ্টি, বৈদগ্ধ্য অর্থে ইদানীং তমদ্দুন শব্দ ব্যবহার করা হয়। তারও মূল মদীনা বা শহর—আমরা মদীনা বলতে যে নগর বুঝি সেটার পূর্ণ নাম "মদীনাতুন নবী" অর্থাৎ নবীর (প্রেরিত পুরুষের) নগর।

উন্নাসিক নাগরিক জনের কৃত্রিম আচার ব্যবহার সর্বদেশেই সুপরিচিত। তাই ইংরিজিতে সফিসটিকেটেড শব্দের অর্থে যেমন কৃত্রিমতার কদর্থ আছে তেমনি উচ্চাঙ্গের সার্থক জটিলতার সদর্থও আছে। ১৯৭১-এ আমরা প্রায়ই বিদেশী রিপর্টারের লেখাতে পড়েছি, "সাদামাটা বাইফেল নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা কি করে লড়বে পশ্চিম পাক আগত সর্বপ্রকারের সফিসটিকেটেড হাতিয়ার, যেমন রাডার, স্বযংক্রিয় মেশিনগান ইত্যাদিব বিরুদ্ধে?...তাই হাফবয়েলড, অর্ধসিদ্ধ আসিদ্ধ সফিসটিকেটেড জন, প্রাচীনার্থে নাগরিক যদি তাব নাগরিমায় সত্যকার বৈচিত্র্য, উদ্ভাবনশীলতা না দেখাতে পারে তবে সে নিছক "নূতন কিছু কবো" প্রত্যাদেশ মেনে নিয়ে অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন উদ্ভাবনায় লেগে যায়।

প্রাক্তন বেতার মন্ত্রী শ্রীযুত কেশকার একদা ফরমান দিলেন, যার ভাবার্থ : আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভূরি ভূরি রাগ-রাগিণী অনাদরে অবহেলায় লোপ পেয়ে যাচ্ছে। আকাশবাণী যেন অচলিত রাগ-বাগিণী যাঁরা আজো গাইতে পারেন তাঁদের পরিপূর্ণ মাত্রায় উৎসাহিত করে।

এ-কথা অবশ্যই সত্য গণতন্ত্রের যুগে গানের মজলিসে আসে হরেক রকমের চিড়িয়া। তাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শী শ্রীমতী অর্চনা রীতিমত বিহ্বল বিভ্রান্ত হয়ে শুনিয়েছেন হাবিজাবি লোকের কথা বাদ দিলেও তিনি আদৌ বুঝতে পারেন না, সঙ্গীতের প্রতি যাদের কণামাত্র আকর্ষণ নেই সে-সব হোমরাচোমবারা শাস্ত্রীয় উৎকৃষ্টতম সঙ্গীতের আসরে আদৌ আসেন কেন?

তাঁদের আসাটা অর্থহীন নয়, উভয়ার্থে। কিন্তু ক্ষতি যেটা হয় সেটা সুস্পষ্ট। কর্মকর্তাগণ, এবং তাঁদের চাপে পড়ে আকছারই ওস্তাদরাও অতি প্রচলিত হালকা, এমন কি তার চেয়েও নিরেস গানেই নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রাখেন, হোমরাদের প্রীত্যর্থে। অচলিত দূরে থাক, অপেক্ষাকৃত বিদগ্ধ কিন্তু বহুজনপ্রিয় রাগ-রাগিণীও অবহেলিত হয়।

কিন্তু শ্রীযুত কেশকারের ফরমান আনলো বিপরীত ফল। সরকারী প্রতিষ্ঠান মাত্রই "ডেকে আন" বললে "বেঁধে আনাটাই" প্রশস্ততম পন্থা বলে সমীচীন মনে করেন—জাসট টু বি অন দি সেফ সাইড। তাবৎ ভারতের কুল্লে স্টেশন থেকে "মার মার" শব্দ ছেড়ে বেরুলেন কর্মচারীরা 'অচলিতের' সন্ধানে। হাওয়ার গতি ঠাহর করে যতসব

আজেবাজে গাওয়াইয়ারা অচলিত রাগ-রাগিণীর স্থলে বাঘ-বাঘিনীর লম্বা লম্বা ফিরিস্তি পাঠাতে লাগলেন বেতারের কেন্দ্রে কেন্দ্রে। তাঁরা গাইলেন সেগুলো, বহু ক্ষেত্রে কেন্দ্রেরই কর্মচারী রচিত নাতিদীর্ঘ বাগাড়ম্বরসমৃদ্ধ ভূমিকাসহ;-সে অবতরণিকায় বোঝানো হল, "এই ভয়ঙ্কর রাগটি কি প্রকারে যুগ যুগ ধরে অবহেলিত জীবন্মৃত থাকার পর অদ্য রজনীতে ওস্তাদস্য ওস্তাদ অমুক তাকে সগরসন্তানবৎ প্রাণদান করলেন।" আমার মত ব্যাক-বেঞ্চারের কথা বাদ দিন—আমার কান ঝালাপালা—একাধিক বিদগ্ধজনকে দেখলুম, বেতারের কান মলে সেটাকে বন্ধ করতে।

কেউ শুধলো না, যুগ যুগ ধরে এসব রাগ জীবন্মৃত ছিলই বা কেন আর মরলই বা কেন?

একটা কারণ তো অতি সুস্পষ্ট। রসিক বেরসিক কারোরই মনে রসসঞ্চার করতে পারেনি বলে।

তুলনাটা টায় টায় মিলবে না, তবু সমস্যাটা কথঞ্চিৎ পরিষ্কার হবে। ঋতুসংহার নাকি টোলের ছাত্রেরা পড়তে চায় না; সর্বনাশ, ওটা অচলিত ধারায় পৌঁছে যাবে। বন্ধ করো মেঘদূত। চালাও ঋতুসংহার, জগদানন্দ জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেললেন বলে! বন্ধ করো চণ্ডীদাস, অষ্টপ্রহর গাও, "ভনয়ে জগদানন্দ দাস।" কী বললে, কবিগুরুর প্রথম কাব্য কবিকাহিনী অনাদৃতা। বন্ধ করো পূরবী। চালাও দশ বছর ধরে কবিকাহিনী।

এইবারে আমি মোকামে পৌঁছেছি।

জানেন আল্লাতালা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এই অচলিতের সন্ধান কি প্রকারে কখন মহানগরীর বিদগ্ধ সফিস্টিকেটেড রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক-গায়িকার ভিতর সঞ্চারিত হয়ে গেল—আচম্বিতে। তাঁদের চেলারা লেগে গেলেন শতগুণ উৎসাহে। শুনেছি সে-সব প্রাচীন গানের অনেকগুলোরই স্বরলিপি নেই, এমন কি সামান্যতম রাগ-রাগিণীরও নির্দেশ নেই। খোঁজো খোঁজো অথর্ব বৃদ্ধবৃদ্ধাদের যারা হয়তো বা কোনো দিন ব্রহ্মমন্দিরে ঐসব অচলিত গানের দু-চারটে শুনেছিলেন এবং কষ্ট করলে হয় তো বা স্মরণে আনতে পারবেন। অবশেষে এই প্রচণ্ড অভিযানের ফলে এমন দিন এল যখন কেউ "এস নীপবনে" বা "আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি' গান ধরলে আর সবাই,

কেহ বা তোলে হাই, কেহ বা ঢোলে,
কেহ বা চলে যায় ঘরে—

হয়তো বা ফিসফিসিয়ে একে অন্যকে শুধোয়, "এর চেয়ে হ্যাকনিড গান কি খুঁজে পেল না মেয়েটা?"

প্রথম যুগের গানে উত্তম গান নেই এহেন প্রগল্ভ বচন বলবে কে?

আনন্দের দিনে, গানের মজলিশ শেষ হয়ে গিয়েছে কবিও চলে গিয়েছেন, কিন্তু দীনেন্দ্রনাথ, ভীমরাও শাস্ত্রী, উৎসব উপলক্ষে কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত দুচার জন প্রবীণ গায়ক, অপেক্ষাকৃত নবীনদের ভিতর নুটুদি, হয়তো অনাদিদা—পরে হযতো এসে জুটবেন কাঙালীচরণ—এঁরা তখন সবেমাত্র তেতে উঠেছেন। এঁদের মুখে তখন শুনেছি কিছু কিছু প্রাচীন দিনের গান। প্রধানত সুরের বৈশিষ্ট্য, অজানা কোনো বৈচিত্র্যের জন্য বা আমার অজানা অন্য কোনো কারণে, কিন্তু তাঁরা বার বার ফিরে আসতেন প্রচলিত গানে। কিন্তু ভুললে চলবে না, এঁদের সকলেরই ছিল শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে অপর্যাপ্ত অধিকার। ১৯১৯ সালে সিলেটে কবিগুরুর কণ্ঠে শুনেছিলুম, "বীণা বাজাও হে মম অন্তরে।" তার

কয়েক-বছর পরে শুনলুম আরেক ওস্তাদের গলায়। মাত্র তিনটি ছত্র—গেয়েছিলেন প্রায় আধঘন্টা ধরে।...কিন্তু অচলিত গানের তরে এই উৎসাহেরও একটা মাত্রা থাকা উচিত। অবশ্য জানিনে অধুনা এ সফিস্টিকেশন কোন্ সপ্তকে গিটকিরির টিটকিরি দিচ্ছে, বা অন্য কোনো সফিস্টিকেশনে মেতে উঠেছে।

পূব বাঙলায় এ হাওয়া কখনো বয়েছে বলে শুনিনি। খুদ ঢাকা-ই সফিস্টিকেটেড নয়—ছোট শহর গ্রামাঞ্চলের তো কথাই ওঠে না। একটা কথা কিন্তু আমি বলবো, এ বাঙলার রসিকজন আমার উপর যতই অপ্রসন্ন হন না কেন, পূব বাঙলার তরুণ-তরুণী যখনই রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রোগ্রাম তৈরী করে বা প্রাণের আনন্দে গান গায় তাদের নির্বাচন প্রায় ব্যত্যয়হীন চমৎকার। তারা লিরিকাল শব্দের সঙ্গে সুরের সামঞ্জস্য হৃদয় দিয়ে চিনে নেয় অক্লেশে, গান গায় অতি সহজ ভঙ্গিতে। মাস কয়েক পূর্বে টেলিভিজনে দেখলুম, শুনলুম, এক বিলিতি পাদ্রী সাহেব রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাপ্তিস্ম হয়ে গাইলেন, বাঙালের সরল ভঙ্গিতে : "ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো, প্রভু।" অপূর্ব! অপূর্ব!!

উভয় বাঙলা—অকস্মাৎ নিবিল দেউটি দীপ্ততেজা রক্তস্রোতে

এ বাঙলার পুস্তক প্রকাশকরা অবশ্যই পাকিস্তানী ব্যান দ্বারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হন। দেশ বিভাগেব পূর্বে পশ্চিম বাঙলায় প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক, তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রেফারেনস পুস্তক, কথাসাহিত্য, মাসিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি ইত্যাদি বিস্তর পুস্তক পূব-বাঙলায় নিয়মিত বিক্রি হত। একদা সাধনোচিত ধামে গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বলেন, কলকাতার পরই জেলা হিসেবে ধরলে সিলেটে তাঁর কাগজ 'প্রবাসী" সবচেয়ে বেশী বিক্রী হত। প্রকাশক সম্পাদক ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের চেয়েও বেশী বিপদে পড়ে লেখক। তখন কিছু লেখক-বিক্রি বাড়াবার জন্য আরো "জনপ্রিয়" হতে গিয়ে লেখার মান নামিয়ে দেন। একাধিক সম্পাদক প্রকাশক পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক, জটিল সামাজিক বাজনৈতিক সমস্যাময় কথাসাহিত্য ছাপতে দ্বিধাবোধ করেন। পক্ষান্তরে হুজুগে বাঙালী কোনো-কিছু একটা নিয়ে মেতে উঠলে সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর প্রকাশক সেটা নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাশি রাশি ফরমাইশি বই রাতারাতি ঝপাঝপ বাজারে ছাড়তে আরম্ভ করেন। তড়িঘড়ি লেখা ফরমাইশি কেতাব অধিকাংশ স্থলেই নিম্নমানের হতে বাধ্য। পাঠকের রুচিকে এরা নিম্নস্তরে টেনে নামায় এবং তথাকথিত "গ্রেশামের' সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উচ্চমানের পুস্তক সম্মান হারায় ও মুক্ত হট্ট থেকে বিতাড়িত বা অর্ধ-বহিষ্কৃত হয়।

পশ্চিম বাঙলার প্রকাশক লেখক ওই নিয়ে অত্যধিক প্রতিবাদ আর্তনাদ করেছিলেন বলে মনে পড়ে না। না করে ভালোই করেছেন। একে তো তাতে করে কণামাত্র লাভ হত না, উল্টে পিণ্ডি সেগুলো বিকৃতরূপে ফলাও করে পশ্চিম পাকে প্রপাগান্ডা চালাত—যে পশ্চিমবঙ্গ পুস্তকাদির মারফত পূর্ববঙ্গীয় "মোহাচ্ছন্ন" মুসলমানদের উপর তার "সনাতন 'কাফিরী হিন্দু' প্রভাব প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে, তারা কিছুতেই বাঙালী মুসলমানকে খাঁটি মুসলমান হতে দেবে না।" সম্পাদকরা অবশ্য তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন—সেটা করা তাঁদের কর্তব্যও বটে। পিণ্ডি তার পূর্ণ "সদ্ব্যবহার" তখন করেছে : এখনো মি. ভুট্টো নানা কৌশলে এদেশের খবর, সম্পাদকীয় মন্তব্যের কদর্থ

নিত্য নিত্য করে যাচ্ছেন। আইয়ুব-ইয়েহিয়ার জুন্টার জুতো মি. ভুট্টো পরে নিয়েছেন,—এইটুকুই সামান্য পার্থক্য। এমন কি জুন্টা পূব বাঙলার সম্মানিত নাগরিক মৌলানা ভাসানী, শেখ সায়েবকেও প্রপাগান্ডা থেকে নিষ্কৃতি দেয়নি—২৫ মার্চ ১৯৭১-এর আগেও। ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে মৌলানা ভাসানী কল্পনাতীত বিরাট এক জনসভাতে তুমুলতম হর্ষধ্বনির মধ্যে পূর্ব বাঙলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন—অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারাও মৌলানাকে সমর্থন জানান। শেখ তখনো আপ্রাণ চেষ্টা দিচ্ছেন পশ্চিম পাকের সঙ্গে দেশের মর্যাদা রক্ষা করে একটা সমঝোতার আশায়। ভাসানীর ঘোষণা যেন ছাপ্পর ফোড় করে অপ্রত্যাশিত ভাবে কিস্মতের কারণহীন বখশিশের মত জুন্টার মস্তকে বর্ষিত হল। পিণ্ডি, লাহোর, করাচীতে তখন দিনের পর দিন ভাসানীর আপন দেশের অবিরল বারিধারার মত, লাহোর পিণ্ডি ক্লাব-কাবারের উচ্ছ্বসিত মদিরা ধারাকে পরাজিত করে চললো কুৎসা প্রচার : "ভাসানী আসলে 'হিন্দু ভারতের' এজেন্ট। ভারতেরই প্ররোচনায় লোকটা হাটের মাঝখানে হাঁড়ি ফাটিয়েছে। শুধু তার দলই যে পূর্ণ স্বাধীনতা চায় তাই নয়, ভাসানীর (একদা) সহকর্মী অনুগামী শেখও ঠিক এইটেই চায়, সমঝোতার নাম করে শুধুমাত্র ভণ্ডামির মুখোশ পরে আপন 'ন্যায়সঙ্গত সামান্যতম দাবী'র একটা কেস (আলিবি) খাড়া করতে চায় বিশ্ববাসীর সামনে, শেষটায় যাতে করে পাকিস্তানের নিতান্ত ঘরোয়া মামুলী মতভেদটাকে এক ভীষণ প্রলয়ঙ্কর আন্তর্জাতিক সঙ্কটময় রূপ দিয়ে ইউ-এন-এ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, দু'একটা অর্বাচীন পক্ক-নিতম্ব ছোটাসে ছোটা দেশের দরদভী হাসিল করতে পারে। মোদ্দা কথা : ভাসানী যা শেখও তা।"...যতদূর জানি আচারনিষ্ঠ মৌলানা আপন সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন, কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষবশত (যদি সে বিদ্বেষ তিনি পোষণ করেন) তিনি বিশেষ বিশেষ নিরপরাধ হিন্দুর প্রতি না-হক নির্দয় হবেন এটা চট করে মেনে নিতে মন চায় না। যা হোক, তা হোক—তাঁকে "ভারতপ্রেমী" আখ্যা দিলে তিনি খুব সম্ভব মৌল ইদের মত "তুর্কী নাচন" আরম্ভ করবেন না, আম্মো পূর্ববৎ এটা চট করে গলতল করতে পারবো না। কিন্তু এহ বাহ্য।

এদিকে কিন্তু ঢাকার প্রায় তাবৎ পাবলিশার মিশ্রিত উল্লাস বোধ করলেন বটে কিন্তু পশ্চিম বাঙল্যর কোনো বই-ই ছাপাতে পারবেন না—সে লেখক ভারতচন্দ্রই হোন, বিদ্যাসাগব, বঙ্কিমই হোন। যাঁদের পুস্তকে কোনো কপিরাইট নেই, কাউকে কোনো রয়েলটি দিতে হবে না—সেইটে হল তাঁদের প্রধান শিরঃপীড়া। কিছু কিছু লেখক অবশ্য অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগ করলেন। তাঁদের ধারণা : পশ্চিম বাঙলার সরেস বই গায়েব হয়ে গেলে তাঁদের নিরেস বই হু-হু করে, গরমকালে ডাবের মত, শীতের সাঁঝে চায়ের মত বিক্রি হবে। এই কিছু কিছুদের অনেকেই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করেন, তাঁদের সৃষ্টি আদৌ নিরেস নয়, বিশেষত যাঁরা 'ইসলামী তমদ্দুন"—সভ্যতা বৈদগ্ধ্য—সম্বন্ধে কেতাব রচনা করতেন। একজন কথাসাহিত্যস্রষ্টা আমাকে বলেন, "পূর্ব বাঙলার লোক যে কলকাতার বই পড়ে সেটা একটা বদ অভ্যাস মাত্র। সেই কফি হোঁস, গড়ের মাঠ, কলেজ স্ট্রীট, ট্রাম গাড়ি, বোটানিকাল কিংবা 'ছেরামপুরী' পাদ্রী, হেস্টিংসের কেলেঙ্কারী ওসব ছাড়া অন্য পরিবেশের বই, যেমন বুড়ীগঙ্গা, রমনা মাঠ, নবাব বাড়ি, মৌতিঝিলের কর্মচঞ্চলতা, নারায়ণগঞ্জের জাত-বেজাতের বিচিত্রতা—এদের গায়েতে এখনো সেই রোমান্টিক শ্যাওলা গজায়নি, ব্রোনজ মূর্তির গায়ে প্ল্যাটিনার পলস্তরা পড়েনি—ইত্যাদি

ইত্যাদি।" আমি বললুম, "পূব বাঙলার পরিবেশ, পূব বাঙলার জীবন নিয়ে যদি একটা সার্থক সাহিত্য গড়ে ওঠে তবে পশ্চিম বাঙলার কাছে সেটা হবে নূতন এক রকমের রোমান্টিক সাহিত্য। পাঠক হিসেবে বলছি, আমার মত বহু সহস্র লোক সেটা সাদরে গ্রহণ করবে। আর এই তো হওয়া উচিত। অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ডের এক বৃহৎ অংশ আর খাস জর্মনি তিন ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে জর্মন সাহিত্যের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধারা বয়ে আসছে বহুকাল ধরে—পরিপূর্ণ সহযোগিতাসহ। টমাস মান-এর জন্ম উত্তর জর্মনিতে অথচ জীবনের বেশীর ভাগ কাটালেন সসম্মানে সুইটজারল্যান্ডে। সঙ্গীতে দেখি, বেটোফেনের জন্ম বন শহরে অথচ জীবন কাটালেন ভিয়েনাতে। পূব বাঙলা যে একদিন নূতন গানের ঝরনা-তলা রসের ধারা নির্মাণ করবে সে বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই।"

কিন্তু কার্যত দেখা গেল ঢাকার প্রকাশকমণ্ডলী খেয়ালী পোলাও খাওয়ার জন্য অত্যুৎসাহী হতে চান না।

"নগদ যা পাও হাত পেতে নাও
বাকির খাতায় শূন্য থাক!
দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে
মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।"
(কান্তি ঘোষ)

ওদিকে আবার আছে তাদের দেদার নিউজপ্রিন্ট, নেই কিন্তু যথেষ্ট বই ছাপাবার কাগজ এটা ওটা সেটা বিস্তর জিনিস। এবং টেকসট বই যে সর্বাধিকার পাবে সে তত্ত্ব তো তর্কাতীত।

এবং যে-নিদারুণ সত্য পূব বাঙলায় তো বটেই, পশ্চিম বাঙলারও ভুলতে সময় লাগবে সেটা যখন ঠেকাবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও স্মৃতিতে আসে তখন দেহমন যেন বিষিয়ে যায় : শহীদ হয়েছেন যেসব অগ্রণী পথপ্রদর্শক লেখক তাঁদের সংখ্যা আদৌ নগণ্য নয়, প্রতিভাবান উদীয়মান লেখক অনেক, ছাত্রসমাজের উজ্জ্বল উজ্জ্বল মণিরাশি, অসংখ্য গুণগ্রাহী পাঠক, বিত্তশালী পৃষ্ঠপোষক, আমার ভাগ্নের মত শত শত যুবক যুবতী যারা সাহিত্যিকদের সেবা করতো সগর্বে সানন্দে, সাহায্য করতো তাদের অতিশয় ক্ষীণতম বটুয়া থেকে যা বেরোয় তাই দিয়ে, বই কিনত সিনেমা জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে, বাঙলা ভাষার কণ্ঠরোধ করার জন্য পিণ্ডির হীন খল প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যারা সম্পাদককে পাঠাতো স্বনামে তীব্রতম তীক্ষ্ণতম ভাষায় বেপরোয়া প্রতিবাদ—যার অধিকাংশ ছাপা হলে সম্পাদক লেখক গয়রহ নিঃসন্দেহে হতেন গবর্নর মোনায়েম খানের "রাজসিক" মেহমান। এরাই ছিল পূর্ণার্থে সর্বার্থে স্পর্শকাতর। তাই এরাই ছিল সব প্রগতিশীল আন্দোলনের পুরোধা, এরাই মুক্তিযুদ্ধের আহ্বায়ক, সহায়ক এবং নায়করূপে প্রথমতম শহীদ। এদের অনেকেই বেরিয়েছিল বিচ্ছিন্নভাবে একা একা, বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ, এসেছে চৈত্র সন্ধ্যা কিন্তু হায়, "চৈত্রদিনের মধুর খেলা" খেলতে নয়, সেই চৈত্র মুসলিম গণনায় ছিল মহরমের মাস, আদর্শের জন্য শহীদ মাস—

"আমারে ফুটিতে হল
বসন্তের অন্তিম নিঃশ্বাসে
বিষণ্ণ যখন বিশ্ব
নির্মম গ্রীষ্মের পদানত,

রুদ্র তপস্যার বনে
আধো ত্রাসে আধেক উল্লাসে
একাকী বাহিরি এনু
সাহসিকা অপ্সরার মত।”
(সত্যেন দত্ত)(১)

পিশাচের দাবানলে ভস্মীভূত হবার জন্য।

উভয় বাঙলা—বাঙলা দেশের প্রধান সমস্যা

মাতৃভাষার ইতিহাস অধ্যয়ন, মাতৃভাষাকে জনসমাজে উচ্চাসন দান, সে ভাষাকে “পূত-পবিত্র” করার জন্য তার থেকে “বিদেশী” শব্দ লৌহ-সম্মার্জনী দ্বারা বিতাড়ন নানা রূপে নানা দেশে বার বার দেখা দিয়েছে এবং দেবে। এর সঙ্গে অনেক স্থলেই রাজনীতি জড়িয়ে পড়ে, কিংবা বিদেশী রাজার প্রতাপে যখন প্রপীড়িতজনের আপন বলে ডাকবার আর কোনো কিছুই থাকে না তখন অনেক ক্ষেত্রেই নিছক আত্মানুভূতির জন্য—“আমি আছি, আমার কিছু একটা এখনো আছে” সে তার শেষ আশ্রয় অবহেলিত মাতৃভাষার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, তাকে পরিপুষ্ট করার জন্য দেশে আন্দোলন চালায়, চরমে পৌঁছে কভু বা মাতৃভাষা থেকে তাবৎ বিদেশী শব্দ ঝেঁটিয়ে বের করে, কভু বা মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষার মাধ্যমে যে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করা হয় তাকে বয়কট করে, ২১শে ফেব্রুয়ারি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করে, সেদিনটাকে বড়দিনের মত সম্মানিত করার জন্য হয় হরতাল করে নয় সরকারের উপর চাপ আনে সেটাকে যেন হোলি ডে রূপে স্বীকার করা হয় ও হলি ডে রূপে অনধ্যায় দিবস বলে গণ্য করা হয়। আন্দোলন জোরদার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা বাবদে এযাবৎ উদাসীন সুবিধাবাদী পলিটিশিয়ানরা (সুবিধাবাদী বলাটা নিষ্প্রয়োজন—অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রির বর্ণনাতে অন্ধকার না বললেও চলে) গুড়ি গুড়ি দলে ভিড়তেন কেন এবং যারা সত্য সত্য মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগতবশত বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আন্দোলনটাকে শক্তিশালী করে তুলেছিল তাদের হাত থেকে আন্দোলন পরিচালনা করার ক্ষমতা কেড়ে নেন?

এর পর যদি ধীরে ধীরে স্বরাজ আসে তবে মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত তথা সে-ভাষায় সুশিক্ষিত জন কিছুটা অবকাশ পান ভাষাটাকে গড়ে তোলার জন্য, যাতে করে স্বরাজ লাভের পর মাতৃভাষার সাহায্যেই সব শিক্ষাদীক্ষা রাষ্ট্রের সর্ব দৈনন্দিন কাজকর্ম সমাপন করা যায়। এ জাতীয় গঠনমূলক কর্মের জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনা খবরের কাগজে ফলাও করে আত্মপ্রশস্তি গাওয়ার সুযোগ নেই, স্বরাজ লাভের পর তো আরো কম।

জনপ্রিয়, শ্রদ্ধেয় লেখক “শঙ্কর” মাস দুই পূর্বে ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখ উপলক্ষে

---

(১) উদ্ধৃতিতে ভুল থাকাটা আদৌ অস্বাভাবিক হবে না। ৫০।৫৫ বছর হল ‘চম্পা’ কবিতাটি প্রথম পড়ি তারপর এটি দৃষ্টিগোচর হয়নি। “চম্পার” প্রথম দর্শনেই কবিগুরু এমনি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে সেটি তিনি ইংরিজিতে অনুবাদ করেন। আমার বাসনা যায় জানতে আর কোন্ কোন্ বাঙালী কবির কবিতা তিনি ইংরিজিতে অনুবাদ করেছেন। বহুকাল ধরে আমার আন্তরিক প্রার্থনা ছিল, সত্যেন দত্তের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী সম্পাদন করার।

ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, "বাংলা ভাষা আজ ওপার বাংলাতেও তেমন প্রাণোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে না, যা কিছুদিন আগেও দেখা গিয়েছে। বাংলা ভাষাকে একাদশ কোটি মানুষের ভাবপ্রকাশের সার্থক মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলতে যে বিরাট কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন, তার সূচনা কোথায়?"

পশ্চিম বাঙলা বাবদে তাঁর ক্ষোভ: "এক শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত বাঙালী আবার মাতৃভাষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।....ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলে, ইংরিজি গান শুনে...এঁরা অজান্তে নিজ বাসভূমে পরবাসী সৃষ্টি করছেন। এঁদের ধারণা সন্তানদের বাংলা শিখিয়ে লাভ নেই। চাকরির জন্য প্রয়োজন ইংরিজি ইত্যাদি।"

এর সঙ্গে শ্রীযুক্তা উমা চট্টোপাধ্যায় যোগ দিয়েছিলেন, "কোনো কোনো স্বনামধন্য লেখক আজও ইঁট পাটকেলের মত অযথা ইংরাজী শব্দের ব্যবহার করেন।"

অনায়াসে বোঝা যাচ্ছে উভয় বাঙলার সমস্যা এক নয়। যদিও চিরন্তন সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে উভয় বাঙলার সমস্যা প্রায় একই, বিশ্বসাহিত্যেও প্রায় তাই-ই। উভয় বাঙলার সার্থক সাহিত্য সৃষ্টিতে পার্থক্য থাকবে অত্যল্প এবং সেগুলো রসের বিচারে গৌণ। পূব বাঙলার অধিকাংশ লেখক মুসলমান—তাঁদের সৃষ্টিতে মুসলিম সমাজ চিত্রিত হবে অপেক্ষাকৃত বেশী। পশ্চিম বাঙলায় চিত্রিত হবে হিন্দু সমাজ। এ-স্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে উল্লেখ করি, একশ বছর পূর্বে যখন বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে পড়ছিলেন তখন বাঙলাদেশের অনেকেই আশা করেছিলেন এঁরা তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ নগরের আলেখ্য অঙ্কন করবেন, অন্ততপক্ষে দূর দেশে বাঙালীব জীবনধারা তাঁদের নির্মিত অশ্রুজলে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি রসের মাধ্যমে কিছুটা চিনতে শিখবে। সে-আশা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় নি ঠিক, সেই রকম পূর্ব বাঙলা থেকে আমরা সার্থক সাহিত্য তো আশা করিই। তদুপরি সে-সাহিত্যে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু অজানা অচেনা নয়া নয়া ছবি দেখতে পাবেন নিছক ফাউ হিসাবে গ্রেস মার্কের মত। "জয় বাঙলা"।

কিন্তু উপস্থিত পূব বাঙলার মোট সর্ববৃহৎ সমস্যা—এবং একদিন সে সমস্যা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সে-সত্যও জানি—সেটা বাঙলাদেশের তাবৎ সরকারী বে-সরকারী কাজকর্ম বাঙলারই মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায় কি প্রকারে? যেমন ধরুন, খাদ্য-সমস্যা। ঢাকায় খবর এল চাটগাঁয়ে চাল বড্ড আক্রা, রংপুরে ভালো ভালো ফসল হয়েছে। সে চাল তড়িঘড়ি ট্রেনে করে পাঠাতে হবে চাটগাঁ। ইতিমধ্যে ঢাকাতে টেলিফোনের নামকরণ হয়ে গেছে "দূরালাপনী" বা "দূর-আলাপনী"—'দূরালাপী" বোধ হয় নয়। আমি অবশ্য "দূর-বাকী", "দূর-বাচনী" নাম দিতে চেয়েছিলুম, কারণ প্রয়োজন হলে উষ্মা প্রকাশার্থে সন্ধি করে নিলেই হল, "দুর্বাকী" "দুর্বাচী" যা খুশি। কিন্তু কি দরকার। দীর্ঘ-উ-কে হ্রস্ব করে দিলেই হল। "দুরাশয়গণ অহরহ দুরালাপ করে", এই অর্থে "দুরালাপনী" বললে চলে যেতে পারে। কিন্তু "অনপনেয় কালি দিয়ে নাম সই করবেন' সত্যি প্রথম দর্শনে আমার মুখ কালিমাখা করে দিয়েছিল। কিন্তু ইনডেলবিল্-এর অন্য কি বাঙলা শব্দ হতে পারে? দূরপনেয় কলঙ্ক বাঙলাতে খুবই চলে। সে কলঙ্ক কষ্টসহ "মুছতে হয়" সেই ওজনে যে কালি কিছুতেই "মোছা যায় না"। অবশ্য উন্নসিক সম্প্রদায় আপত্তি তুলতে পারেন। "অনপনেয় কালিতে" গুরুচণ্ডালি দোষ বিদ্যমান। বলা উচিত ছিল অনপনেয়

মসি। তদুত্তরে বক্তব্য, ইহলোক ত্যাগ করার তিন বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চলতি বাঙলা ভাষার একটা খতিয়ান নেন বা সিংহাবলোকন (সার্ভে) করেন; ইতিপূর্বে কবি বাঙলা ভাষা শব্দ-ধ্বনি-তত্ত্ব ব্যাকরণ নিয়ে অজস্র রচনা প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু সেগুলো প্রধানত বা সর্বত সাধুভাষা নিয়ে। কিন্তু চলতি ভাষা এনে দিয়েছে নূতন নূতন সমস্যা। সে সমস্ত আদ্যন্ত আলোচনা করার পর বাঙ্ময় সম্রাট দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে রাজাদেশ প্রচার করেন।

"সাহিত্যিক দণ্ডনীতির ধারা থেকে গুরুচণ্ডালি অপরাধের কোঠা উঠেই গেছে।"

অপিচ

"অমুকের কণ্ঠে গানে 'দরদ' লাগে না বললে ঠিক কথাটি বলা হয়। গুরুচণ্ডালির শাসনকর্তা যদি দরদের বদলে "সংবেদনা" শব্দ চালাবার হুকুম করেন তবে অমান্য করলে অপরাধ হবে না।" (বাংলা ভাষা পরিচয়, র র ২৬ খণ্ড পৃ ৩৯৫ ও পঃ)

কিন্তু এহ বাহ্য। তবু যে এই সঙ্কটের কথাটা উল্লেখ করলুম, তার কারণ পূব বাঙলার লোক গুরুচণ্ডালি পতৎপ্রকর্ষতা দোষ সম্বন্ধে পশ্চিম বাঙলার চেয়ে ঢের বেশী সচেতন।

মোদ্দা কথা এই ফোন যন্ত্রটির পরিভাষা কি হল না হল তার চেয়ে ঢের বেশী মারাত্মক রেলের এঞ্জিনচালক, সিগনেল ম্যান, গার্ড সাহেব, বিজলির মিস্ত্রি ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য লোক তাদের তরো বেতরো যন্ত্রপাতি কলকব্জার কি পরিভাষা নির্মাণ করছে। সামান্য ভুল বোঝাবুঝির ফলে দুর্ঘটনা ঘটাটা মোটেই অকল্পনীয় নয়।

ওদিকে প্রাচীন দিনের ব্যুরক্রেটরা রাতারাতি বাঙলাতে জটিল জটিল সমস্যার বিশ্লেষণ তাদের টীকা, প্রস্তাবের মুসাবিদা লিখবেন কি প্রকারে? সিকিশিক্ষিত এক ইমাম সাহেব খামোখা বেমক্কা আমাকে বলেন, "আপনি তো 'বাঙলা বাঙলা' বলে চেল্লাচ্ছেন কবে সেই বাবা আদমের কাল থেকে—যদিও এ বাবদে আমাদের ইঁটের মান দিকধিড়িঙ্গে প্রামাণিক গ্রন্থে আপনার উল্লেখ নেই—।" আমি হাতজোড় করে বললুম, "রক্ষে দিন, ইমাম সাহেব! আপনার পরবর্তী ইস্টিশন বেহেশতে ফিরিশতাদের বাঙলা বলতে হবে এহেন ফতোয়া তো আমি কখনো দিই নি—।" "জানি, জানি। কিন্তু ঐ যে আপনাদের সংবিধান না কি যেন তৈরি হল তার দুটো তসবীর। একটা বাঙলাতে অন্যটা ইংরিজিতে। এবং সাফ জবানে বলা হয়েছে, অর্থ নিয়ে মতবিরোধ যদি হয়, তবে ইংরিজি তসবীরই প্রামাণিক আপ্তবাক্য।" আমি বিশ্বাস করিনি এবং হলেও আমার কণামাত্র ব্যক্তিগত আপত্তি নেই।

কিন্তু এ বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই যে, স্বয়ং শেখজী থেকে বিস্তর লোক হরহামেশা বাঙলার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছেন। কিন্তু তাঁদেরও তো মাঝে মাঝে ধোঁকা লাগে, কোনো ইংরিজি শব্দের সঠিক বাংলা পরিভাষা কি। তখন ফোন করা হয়, কিংবা ডাক পড়ে প্রবীণ সাহিত্যিককে বা সাহিত্যিকদের। তাঁরাই বা কজন সর্বসাকুল্যে বেঁচে আছেন এখনো টিক্কা, অল-বদর, শান্তি কমিটি, বেহারীদের টেলিস্কোপ মাইক্রোস্ক্রোপ সংযুক্ত 'ডবল জালে'র ছাঁকনি এড়িয়ে! দেশের কাজকাম যদি বন্ধ হয়ে যায়—হবে না, আমি জানি—তবে,

কাগজ কলম মন
লেখে তিন জন

এর প্রথম দুটি বস্তু আসবে কোথা থেকে? কিছুদিন পূর্বে বাঙলাদেশের সদরে সে দেশের মোস্ট ইমিডিয়েট নির্ঘন্টের যে বয়ান শুনলাম, জনৈক করিতকর্মা ব্যক্তির কাছ থেকে, তার থেকে আমার মনে হল, উভয় বাঙলার যে সব সাহিত্যিক, শব্দতাত্ত্বিক পরিভাষা নিয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা কবেছেন তাঁদের প্রত্যেকের কুইন্টপ্লেট থাকলেও মোটামুটি চলনসই কিন্তু অতি অবশ্য দেশ শাসনের সর্ব শাখা প্রশাখা পবিব্যাপ্ত পরিভাষা নির্মাণ শেষ হবে না। এবং যেটুকু হবে, তাতেও থাকবে প্রচুর অসম্পূর্ণতা, বিস্তর অনূদিত ইংরাজী লাতিন শব্দ পূব বাঙলার শস্যশ্যামল দেশে সঙ্গিনের মত খোঁচা খোঁচা খাড়া দাঁড়িযে স্পর্শকাতরা শ্রদ্ধেয়া উমা চট্টোপাধ্যায়ের মত একাধিক নব-নারীকে পীড়া দেবে, যদিও তাঁবা প্রধানত সাহিত্যেই এ-অনাচারে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু উপায় কি? একমাত্র আশা ঐ অসম্পূর্ণ দুর্বল পরিভাষা দিয়েই কোনো গতিকে কাজ চালিয়ে যাবে।

বারান্তরে সমস্যাগুলো নিয়ে আরো আলোচনা কবাব আশা রাখি।

গ্রন্থ-পরিচয়
পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়

১

'পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়' প্রথম প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৪২ সালে। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭৩। পৃষ্ঠা ১৪০-৪। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ আশু বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত। এই গ্রন্থটি সম্ভবত লেখকের শেষতম রচনা। 'বাংলাদেশ'-এর স্বাধীনতার পরে লেখক বাংলাদেশে যখন কিছুকাল অবস্থান করেন, সেই সময়ই এই প্রবন্ধগুলি লেখা হয়। সেখানকার পাঠক মহল ও সাহিত্যিক সমাজ বরাবরই লেখকের রচনার অনুরাগী ছিলেন। যেহেতু তদানীন্তন শাসকমণ্ডলী সে দেশে ভারতীয় সাহিত্যের প্রচার চাইতেন না, উপরন্তু সৈয়দ মুজতবা আলীর রাজনৈতিক মতে তাঁদের বীতরাগ ছিল সেজন্য তাঁর রচনা বড় একটা সে দেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে "পূর্বদেশ" পত্রিকার আগ্রহে এই রচনাটি উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের প্রায় সমসাময়িককালে আফগানিস্তানে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন হয়। "পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়" সেই পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত। "পূর্বদেশ" পত্রিকায় 'পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়'র পরে আরও কয়েকটি বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেগুলিও এই গ্রন্থেব শেষে সংযোজিত হয়েছে। এই গ্রন্থে প্রকাশকের ভূমিকার অংশবিশেষ লক্ষণীয় : "এই বচনার প্রথম ও প্রধান বক্তব্য রাজনীতিতে সর্বথা সর্বদা পুরাতনই পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। যা আপাতদৃষ্টিতে পরিবর্তন বলে মনে হয়, আসলে তা পুরাতনেরই বেশ-পরিবর্তন। এই প্রসঙ্গে লেখক আফগানিস্তান ও অনুরূপ দুর্বল দেশের পৃষ্ঠপটে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মহাশক্তিগুলির রাজনীতি ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে তাঁর বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠ কবেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই তাঁর যাওয়ার সুযোগ হওয়ায় পাকিস্তানের নেতাদের বিশেষ করে ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার রাজনীতিক মতলব কি ছিল, তাদের কোথায় কোথায় মূর্খতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তা তাঁর অভিজ্ঞ বিচক্ষণ দৃষ্টিতে ধবা পড়ে। এই গ্রন্থের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত লেখকের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সরস লেখনীর যেন এক নূতন পবিচয় পাওয়া যায়।"

২

বিদেশে

'বিদেশে' রচনাটি ১৯৪১ সালে সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় পঞ্চতন্ত্র শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। এখনও পর্যন্ত এই রচনাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। তবে এর প্রথমদিকের কিছু অংশ 'মুসাফির' গ্রন্থের শেষের দিকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উক্ত অংশটি এখানে পুনর্মুদ্রণেব কারণ এই অংশটির সঙ্গে 'বিদেশে'র বাকী অংশের অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে। অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির সন্ধান করার সময়ে এই রচনার পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রায় ত্রিশ বৎসর ব্যবধানে সৈয়দ মুজতবা আলী আবার ইউরোপ যাত্রা করেন। পুরাতন স্মৃতি ও পুনর্দর্শনের অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে আনন্দবেদনায় ভরা এক

অতুলনীয় ভ্রমণ-সাহিত্য বাঙালী পাঠক লাভ করেছে লেখকের এই ভ্রমণযাত্রার ফলে। মুসাফির, বিদেশে প্রভৃতি রচনা তারই দৃষ্টান্ত। লেখকের তরুণ বন্ধুরা এখন অধিকাংশই প্রৌঢ়। তাঁদের সঙ্গে বসে বসে পুরাতন স্মৃতির রোমন্থন, পুরাতন প্রিয় স্থানগুলির পরিবর্তনে ও সমাজের বিবর্তনে লেখকের মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, লেখকের বন্ধু-বান্ধবের বিগত ত্রিশ বছরের ঘটনাবলীর বর্ণনা 'বিদেশে' গ্রন্থের বিষয়বস্তু।'

৩

বাঙলাদেশ ও উভয় বাঙলা

এই রচনা দুটিও এযাবৎ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। এগুলি পঞ্চতন্ত্র শিরোনামায় ১৯৪২ সালে সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পাকিস্তানের নানা রাজনৈতিক কূটনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির ষড়যন্ত্র ও তার তৎকালীন নেতাদের চরিত্রের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এই গ্রন্থে। দেশ-বিভাগজনিত সমস্যা ও তার জন্য উভয় বাংলার অধিবাসীদের সুবিধা-অসুবিধার কথাও লেখক চিন্তা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলাদেশ পূব পাকিস্তান থাকাকালে সেখানে বসবাসকারী লেখকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের বিপদাশঙ্কায় লেখক ইতিপূর্বে পাকিস্তানের স্বৈরাচাবী নেতাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্তভাবে লেখনী ধাবণ করতে পারেন নি। এই রচনাতেই তাঁব লেখনী প্রথম স্বৈরাচারী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সক্রিয় হযেছে। সেদিক দিয়ে এই রচনা লেখকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের একটি প্রামাণ্য দলিলরূপে গণ্য হবে।

—চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

—অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত